মিশর-সম্রাজ্ঞী হতশেপসুত

শ্রীপারাবত

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯
প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৪/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ : মানবেন্দ্র পাল (বাচ্চু)
মুদ্রাকর : শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মাইতি : জগদ্ধাত্রী প্রেস
৮১/১ই, রাজা দীনেন্দ্রনাথ স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

সবার উদ্দেশে

হতশেপসুত জানে যে সে অনন্যা। অনন্যা শুধু রূপে নয়, গুণে বুদ্ধিবৃত্তিতে কোমলতায় এবং কঠোরতায়ও। সে এ বিষয়ে সচেতন যে এত অল্প বয়সে যা সে বুঝতে পারে সমবয়সীরা কেউ তা পারে না। এমন কি তার চেয়ে বয়সে বড় এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিরাও বুঝতে ব্যর্থ হয়। অথচ তার শৈশবকাল এখনো অতিক্রান্ত হয়নি। কৈশোরে পদার্পণ করতে এখনো দু'এক বছর বাকী। আশ্চর্য তার স্মৃতিশক্তি। কিছুই সে ভুলে যায় না। প্রাসাদের নানা স্থানে অঙ্কিত ছোট বড় চিত্রের মত সমস্ত ঘটনা তার মনের মধ্যে ছাপ ফেলে যায়। সবে যখন সে এক পা এক পা করে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যেত, সেই সময় সে মায়ের সদ্য কেচে আসা শুকিয়ে রাখা স্তূপীকৃত পোশাকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ গুঁজে দিত। সূর্যের উত্তাপে উত্তপ্ত সেই বহুমূল্যবান নরম মসৃণ পরিচ্ছদের এক মন-মাতানো সুগন্ধ তার দেহমনকে আবিষ্ট করে তুলত। তার গর্ভধারিণী সম্রাজ্ঞী অহমেস এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হতেন। কারণ তিনি বরাবর নিজেকে সুসজ্জিত এবং আকর্ষণীয় করে রাখতে ভালবাসেন। তাঁর সাজঘর নানারকম সুগন্ধি আরক, অঙ্গের শোভাবর্ষণকারী নানা উপাদান চক্ষুর্দ্বয়কে আরও সুন্দর করে তোলার বিবিধ রকমের কজ্জল প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত। সেই সব আতর-দানি, কাজল-দানি, সুগন্ধি তেলের আধার, কোনটি হস্তীদন্ত নির্মিত, কোনটি শ্বেতপাথর, কোনটি কাষ্ঠ, কোনটি বা স্বর্ণ অথবা রৌপ্য দ্বারা তৈরী। সেগুলির এক একটিকে দেখতে এক এক রকমের। কোনটা দেখতে হাঁসের মত, কোনটা অন্য পাখির মত, কোনটা পশুর মত, কোনটা বা ফুলের মত। সেই সাজঘরে কারও প্রবেশ তিনি সহ্য করেন না। তবু কন্যারূপে তাঁরই গর্ভে জন্মানর সুযোগে সে ছয় সাত বছর আগে মাঝে মাঝে সেখানে গেলে সেই উত্তপ্ত বস্ত্রাদির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ লুকোতো। মনে আছে, মা কয়েকবার অসন্তোষ প্রকাশ করে একদিন হেঁচকা টানে তার হাত ধরে শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর হয়ত ভেবেছিলেন, হাতে চোট লেগেছে। তাই দেখতে গিয়ে তার চোখের দিকে চেয়েছিলেন। নিশ্চয় কন্যার দৃষ্টির মধ্যে আহত বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখেছিলেন। তাই একটু হেসে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। বলেছিলেন—লাগেনি তো ?

সঙ্গে সঙ্গে হতশেপসুতের মনে হয়েছিল, মা তার কাছে পরাজিত হলেন। কেন মনে হয়েছিল, সে জানে না। হয়ত মায়ের মুখের অভিব্যক্তির মধ্যে সব সময় একটা দাম্ভিকতা প্রকাশিত দেখে দেখে তার শিশুমন পীড়িত হয়ে উঠেছিল। সেদিন তাই মাকে হাসতে দেখেও সে নিজে হাসেনি। এখনো মনে আছে সে কথা। না হেসে মুখ গম্ভীর করে রেখে মাকে পরাজিত করেছিল।

হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে আছে সেদিনের কথা এই দশ এগারো বছর বয়সেও। তখন থেকেই বুঝে নিয়েছিল, প্রাসাদে তাকে একা চলতে হবে। তার পিতা তার প্রতি খুবই স্নেহশীল। ফ্যারাও হয়েও জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ নজর।

রাজকার্য পরিচালনা করা এবং হারেমে অবকাশ যাপনের ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সুযোগ তিনি পান, কন্যাকে সঙ্গদান করেন। আসলে তিনিই তাকে বুঝিয়েছেন এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী হল সে। সে শুধু দেবমহিষী নয়, সে স্বয়ং ভবিষ্যতের ফ্যারাও। হ্যাঁ, পুরুষের মত তাঁরও ফ্যারাও হওয়ার দাবী রয়েছে। উত্তরাধিকার বলে অন্য কোন ভাই বা সৎ ভাইকে বিয়ে করে তাকে ফ্যারাও হতে দিয়ে তার পাশে মহিষী হয়ে বসে নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে করার প্রয়োজন নেই। তার পিতা অবশ্য তেমন নন। তিনি মা অহমেসকে বিবাহ করার সুবাদেই আজ ফ্যারাও। তাই বোধ হয় মায়ের এত বেশী অহমিকা।

মায়ের প্রতি তার বিরক্তিভাব ধীরে ধীরে বিতৃষ্ণায় পরিণত হচ্ছিল এই বয়সেই। কিন্তু তার পিতা কন্যার মনোভাব এতটুকুও আঁচ করতে পারেননি। হতশেপসুতের ধারণা হয়েছে সব পুরুষেরা সব সময় মেয়েদের মনের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। তারা বাইরেরটুকু দেখেই সন্তুষ্ট থাকে। বাইরের মিষ্টি হাসি দিয়ে যেমন মনের অশান্ত ঝড়কে ঢেকে রাখা যায়, তেমনি নিশ্চয় মনের কলুষতা আর পাপকেও গোপন রাখা সম্ভব পুরুষের কাছে। ঠিক জানে না সে। তবে ফ্যারাও এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে আর মিশে এই ধারণা হয়েছে তার।

কিন্তু একজন পুরুষই আবার তাকে সতর্ক করে দিলেন, আর নিভৃত মনের একটি অসন্তুষ্টিকে উদ্ঘাটিত করে দিলেন। তিনি হলেন তার গৃহশিক্ষক। তিনি জানেন, হতশেপসুত অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না বালিকা। তার এই ব্যক্তিত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। তিনি আরও জানেন যে এই বয়সেই নিজের অধিকার সম্বন্ধে মেয়েটির স্পষ্ট ধারণা জন্মেছে, যা প্রায় দুর্লভ। তবু তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারিণী প্রিয়তম ছাত্রীর মঙ্গলের কথা ভেবেই একদিন বললেন—তোমার মনের খাঁজে খাঁজে উত্তপ্ত বালুকা সঞ্চিত হয়েছে। এখন থেকেই ঝেড়ে ফেলে দিতে সচেষ্ট হও।

শিক্ষকের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা। তাই ভ্রূকুঞ্চন সামলে নিয়ে সে বলে—আপনার কথার অর্থ বুঝলাম না।

—নিজের মনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেই বুঝতে পারবে। তুমি অন্য পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মত নও।

হতশেপসুতের কণ্ঠস্বর এবারে দ্বিধাজড়িত। সে বলে—তবু ঠিক বুঝলাম না।

সে তার শিক্ষাদাতার দৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু দেখতে পেয়েছিল যার ফলে ভুলে গিয়েছিল যে সে ফ্যারাও কন্যা। তাছাড়া প্রাসাদে গৃহশিক্ষকতা যাঁরা করে থাকেন তাঁরা সবাই অত্যন্ত উচ্চপদাধিকারী এবং প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁদের অধিকাংশ ফ্যারাও-এর সভাসদ। তবে হতশেপসুতের শিক্ষকের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তিনি আর সভাসদ নেই। সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর পুত্র এখন ধীরে ধীরে বিখ্যাত হয়ে উঠছে। তিনি রাজকুমারীর শাণিত

বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে নিজে যেচে তাকে পড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে কোনরকম দুর্বিনীত ভাব প্রকাশ করার উপায় নেই।

গৃহশিক্ষক বলেন—আমাদের এই মহান দেশের শিক্ষার মূল কথাই হল মায়ের প্রতি কোমল ব্যবহার করা। তাঁকে ভালবাসা। যদি না বাসতে পার তাহলে দেবতারা তোমার প্রতি বিরূপ হবেন।

হতশেপসুত বুঝতে পারে শিক্ষকের অন্তর্দৃষ্টি প্রখর। সে মস্তক অবনত করে বিনীতভাবে বলে—আমি চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না।

—পারতে যে হবে রাজকুমারী। বিধাতার নির্দেশ অমান্য করলে বে তোমার অমঙ্গল হবে। তোমার উচ্চাশা হয়ত কোনদিনও পূর্ণ হবে না। কতটুকু বা বয়স তোমার। এই বয়সে সাধারণ একজন মেয়ের বুদ্ধিই হয় না। তুমি অসাধারণ, তাই এত বুঝতে পার। তবু তোমার মন কচি। কচি মনের পরিবর্তন ঘটাতে নিশ্চয় তুমি পারবে। তোমার ইচ্ছাশক্তি প্রবল।

হতশেপসুত একটু চিন্তিত হয়। সে বলে—আমার মায়ের মধ্যে এমন কতকগুলো—

গৃহশিক্ষক হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন—ব্যস্। আর সমালোচনা নয়। শুধু এইটুকু মনে রেখো, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তোমার মা তোমাকে গর্ভে ধারণ করে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। তোমাকে জন্ম দিতে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তোমাকে বড় করে তুলতেও তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাঁর এইসব কাজের মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না।

—আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।

পিতা প্রথম থুথমসের রাজমুকুট দুটি কয়েকবার নাড়াচাড়া করার সুযোগ ঘটেছে হতশেপসুতের। শত হলেও সে ফ্যারাও-এর একমাত্র কন্যা। সুযোগ না পাওয়ার কারণ নেই। বেশ ভারী মুকুট দুটি। একটি শ্বেত, অপরটি রক্তবর্ণের। শ্বেতবর্ণের মুকুট রাজধানী থীব্‌স্-কেন্দ্রিক মিশরের উপরিভাগের রাজাধিপত্যের নিদর্শন আর রক্তবর্ণের মুকুট নিম্নভূমির ওপর আধিপত্যের অভিজ্ঞান। এই নিম্নভূমির রাজধানী হল মেমফিস। অর্থাৎ সমগ্র মিশর দেশ দুই ভাগে বিভক্ত এবং এই দুই ভাগের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর হলেন স্বয়ং ফ্যারাও। অনেক সময় দুই শিরোভূষণ একত্রিত করে তৈরী এক ধরনের মুকুটও ফ্যারাও ব্যবহার করেন। সেটি একটু বেশী ভারী। সেটি তিনি মায়ায় দিলে সবাই বুঝতে পারে ফ্যারাও মিশরে অদ্বিতীয়। এছাড়া চামড়ার পট্টি লাগানো নীলবর্ণের সমর-মুকুট তো রয়েইছে। এটি মাথায় পরলে বোঝা যায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর হলেন ফ্যারাও। ধরিত্রীতে তিনি অপরাজেয়। সূর্য দেবতার সবচেয়ে নিকটের জন কিংবা সশরীরে সাক্ষাৎ দেবতা তিনি। নীলনদের উভয় পার্শ্বের মানুষ, খনিসমৃদ্ধ নুবিয়া থেকে শুরু করে নীচের দিকে নদী যেখানে পদ্মফুলের আকার ধারণ করে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে, এই সুদীর্ঘ জনপদে যাদের বাস, তারা একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। হ্যাঁ, ফ্যারাও

সাক্ষাৎ দেবতা। এ বিশ্বাস তো আজকের নয়, এ বিশ্বাস অতি প্রাচীনকাল থেকে অন্তরের অন্তস্থলে বাসা বেঁধে রয়েছে, যখন পৃথিবীর জন্মলগ্নের সূত্রপাত হল আদি দেবতা পটহ্-এর নির্দেশে। তার পূর্বে কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। তারপর রয়েছে ওসিরিস এবং একাধারে তাঁর ভগিনী, পত্নী এবং প্রেমাস্পদা আইসিস-এর কাহিনী। সে সব কাহিনী মিশরবাসীর কাছে রক্তমাংসের মত সত্য। ওসিরিস ও আইসিস রক্তমাংসের মানব মানবীর মত হলেও তাঁরা দেব দেবী। তবু ওসিরিসকে মরতে হয়েছিল স্বীয় ভ্রাতা সেথ-এর হাতে। মিশর-বাসীরা এসব কথা চন্দ্রসূর্যের মত বিশ্বাস করে। অনেক দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী কোন এক অজানা অচেনা ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। তারা চেয়ে এসেছে তাদেরই মত একজন অতি কাছের, অতি আপন দেবতা যিনি রক্তমাংসের মধ্যে প্রতিভাত হবেন। তিনি অবিনশ্বর হবেন না। তাঁরও বার্ধক্য আসতে পারে যদি সুদীর্ঘ কাল জীবিত থাকেন। সাধারণ মানুষের নানা দুর্বলতা তাঁর মধ্যেও প্রকাশিত হবে। তাই তো তিনি এত আপন মিশরবাসীদের কাছে। তাই মিশরের কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা ওসিরিসের ভ্রাতা সেথ, যিনি ভ্রাতৃহন্তা, তাঁর দিক থেকেও একেবারে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। তিনিও পূজিত হন কোথাও কোথাও। অথচ দেবতা ওসিরিস এবং সেথ এবং দেবী আইসিস ও নেফথিস, এঁরা চারজন হলেন পৃথিবীর ঈশ্বর গেব এবং স্বর্গের ঈশ্বরী নুত-এর চার সন্তান। ওসিরিস বিবাহ করেন আইসিসকে এবং সেথ বিবাহ করেন নেফথিসকে। পরে অবশ্য ওসিরিসের হত্যাকারী সেথকে নেফথিস ঘৃণায় পরিত্যাগ করেন।

আইসিসের গর্ভে ওসিরিসের একমাত্র পুত্র হোরাসও পূজিত। অথচ তিনি পিতৃহন্তা তাঁর পিতৃব্যের প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। আবার শোনা যায়, একসময় তিনি নাকি তাঁর এক মাকেও হত্যা করেছিলেন। তবু আইসিস যেমন আদর্শ স্ত্রী ও মাতা, তেমনি হোরাসও আদর্শ পুত্র। তাই এখনো যখন কোন নতুন ফ্যারাও-এর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় সেই নবীন ফ্যারাও সেদিন হন স্বয়ং হোরাস। সবাই তাঁকে সেদিন জীবন্ত হোরাস রূপে গণ্য করে। কারণ হোরাসের পর থেকেই ফ্যারাও-এর পদ দেবতার কাছ থেকে মানুষ অধিগ্রহণ করে। তাঁর পর যিনি মিশরের ফ্যারাও হন তিনি হোরাসের পুত্র রূপে মিশরের ভার গ্রহণ করেন। তাই আজও ফ্যারাও-এর মধ্যে দেবতায় অংশ বিরাজ করে। আজও অভিষেকের দিন নতুন ফ্যারাও হোরাস হয়ে যান এবং যতদিন ফ্যারাও থাকেন ততদিন অতি সহজেই দেবতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন।

হতশেপসুত মিশরের দেবতাদের অধিকাংশের কাহিনীই জানে। বিশ্বাসও করে মনে প্রাণে। এসব কখনো মিথ্যা হতে পারে? মিশরের নীলনদে নিরন্তর প্রবাহিত অগাধ জলরাশির প্রতিটি বিন্দুতে, মরুভূমির প্রতিটি বালুকণায়, প্রখর সূর্যালোকের প্রতিটি রশ্মিফলকে আর উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহের মধ্যে এর

অস্তিত্ব এবং সত্যতা প্রকট হয়ে আছে। এক এক সময় তার মনে হয়, নারী হয়ে ফ্যারাও পদে অভিষিক্ত হলে সাধারণ মানুষ কি তাকে হোরাস বলে মেনে নেবে? বলা যায় না। কি যেন ভেবে দশ এগারো বছরের বালিকার অমন সুন্দর মুখখানাও কয়েক মুহূর্তের জন্য সংকল্পে দৃঢ় হয়ে ওঠে।

কিছুটা দূরে প্রাসাদের সীমানার ভেতরে মনোরম সরোবরের এক ছায়া সুশীতল বৃক্ষের নীচ থেকে তার নাম ধরে কেউ ডাকে। বালকের কণ্ঠস্বর। নিশ্চয় তার কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা উয়াচমেস কিংবা অমেনমেসের মধ্যে একজন। তাঁরা দুজনেই বড় বোনকে আদর্শ বলে ভাবে, তাকে ভালওবাসে খুব। পুরাকালের ওই বিরাট পিরামিডের প্রতিভাধর স্রষ্টা মনীষী ইমহোটেপ যদি পিরামিডের দিকে মন না দিয়ে মনুষ্যমূর্তি তৈরী করতেন তিলে তিলে তাহলে সেই সুন্দর মূর্তির সঙ্গে ভাই দুটির সৌন্দর্যের তুলনা করা চলত। ফুটফুটে দুই ভাই তার। বড় হলে কতটা সুঠামদেহী হবে এখনো বলা যায় না। তবে কতটা সুদর্শন হবে সেটুকু সহজেই অনুমান করা যায়। দুজনারই চোখ মুখ তারই মত কাটা কাটা। সে মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে যেমন দেখতে হত ঠিক তেমনি। মনের মধ্যে মাঝে মাঝে এই ভেবে টন্‌টন্‌ করে ওঠে, দেবতা তাকে পুরুষ করে গড়ে পাঠালেন না কেন? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধমকে ওঠে নিজেকে। বিড়বিড় করে বলে, তিনি সব সময় যা শ্রেষ্ঠ সেই কাজই করেন। তাঁর উদ্দেশ্য বোঝার ক্ষমতা তার মত ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে কি করে সম্ভব? এই সব কথা মনে স্থান দিতে নেই।

হতশেপসুতের অপর একটি ভাই-ও আছে। বয়সে সে সবার চেয়ে বড়। একই মাতৃগর্ভের নয় বলে নিজের দুই ভাই-এর মত অতটা আপন বলে কখনো তাকে ভাবে না সে। সেই ভাই-এর গর্ভধারিণী হলেন ফ্যারাও-এর অপর মহিষী মুতনেফার্ত, যিনি তার মায়ের মত দেবমহিষী নন। আভিজাত্যে অনেক নীচে। তাছাড়া তার মা হলেন অসাধারণ রূপবতী। তাঁকে বিবাহ করার দৌলতে পিতা ফ্যারাও-এর পদটি লাভ করে প্রথম থুথমস পদবী পেয়েছেন।

দুই ভাই এতক্ষণে গলা ফাটিয়ে ডাকছে তাকে। মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে তার। ওরা তাকে কি করে দেখতে পেল? সে তো বলতে গেলে একটি স্তম্ভের আড়ালে রয়েছে। তার পরিচ্ছদের সামান্য একটু উজ্জ্বল অংশ বোধ হয় হাওয়ায় ভেসে বাইরে গিয়ে পড়েছিল। সেই অংশটুকু দেখেই চিনে ফেলেছে। ওদের কাছে তার কোন কিছুই লুকানো নেই। ভবিষ্যতে হয়ত ওদের একজনের কাছে একেবারেই থাকবে না। কারণ তার সৎ ভাই বয়সে তার চেয়ে কিছুটা বড় হলেও পছন্দের নয় তার। প্রথমত সে মুতনেফার্তের সন্তান। এই নারীর সৌন্দর্য থাকলেও তার মুখের একটি বিশেষ রেখা তাঁর কোমলতাকে কিছুটা হ্রাস করে দিয়েছে। ওই রেখাটি না থাকলে তিনি রূপে তার নিজের মায়ের কাছাকাছি যেতে পারতেন। এক এক সময় মনে হয় ওই রেখা তাঁর নিভৃত মনের লুকিয়ে রাখা নিষ্ঠুরতার প্রতীক। হয়ত এর মূলে কোন যুক্তি নেই। হয়ত তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের নীতিনিষ্ঠ নারী। কিন্তু মন সব সময় যুক্তি

মানে না। বরং যুক্তি মানতে গেলে মুতনেফার্তকে অত্যন্ত বাস্তববাদী এবং বিবেকবতী বলে মনে হয়। তিনি তাদের প্রতিও সমান স্নেহশীলা। তবু তাঁকে ঠিক ভালবাসতে পারে না সে।

মুতনেফার্তের পুত্র চবরোসের প্রতি সে আদৌ আকৃষ্ট হয় না। কেমন যেন দুর্বলচিত্তের বলে মনে হয় তাকে। দেখতে কুৎসিত না হলেও পুরুষালি ভাব কম। অথচ মায়ের মুখের সেই বিশেষ রেখাটি আরও নির্মমভাবে তার মুখের ওপর মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। তখন তাকে মনে হয় সম্পূর্ণ অন্য মানুষ, যার হৃদয়ে নির্দয়তা আর নির্মমতা ছাড়া অন্য কিছু স্থান পায় না। এই রেখাটিকে কি হাকিমরা সংশোধিত করে দিতে পারে না? দেশে তো চিকিৎসকের অভাব নেই। এক এক চিকিৎসক এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কেউ-ই সব ব্যাধির চিকিৎসক বলে নিজেকে দাবী করে না। এমন কোন চিকিৎসক কি নেই যে মলম মাখিয়ে ওই রেখাটিকে মিলিয়ে দিতে পারে? কিংবা কোন শল্য চিকিৎসক পারে না কি সামান্য একটু অদলবদল করে ওই কাঠিন্যকে কোমল করে দিতে?

চবরোসের প্রতি ফ্যারাও-এর সামান্য পক্ষপাতিত্ব থাকলেও বিশেষ কোন নজর নেই। অত সময় কোথায়? তাহলে হয়ত তাব বিশেষ বিশেষ আচার আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তাঁর সহস্র চক্ষু কর্ণ মিশরের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রাসাদেও নিশ্চয় রয়েছে। কিন্তু তাদের এই সব তুচ্ছ বিষয়ে দৃষ্টি নেই। কিংবা এই সব সামান্য বিষয় নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। তারা হত্যা ষড়যন্ত্র প্রভৃতি স্থূল এবং মারাত্মক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়। এই সব বিষয়ে আগাম খবর সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকে বেশী। এই প্রাসাদ তো ক্ষুদ্র একটি অট্টালিকা মাত্র নয়। বিজাতীয় হিকসোসদের বিতাড়ন করার পর থেকেই এই প্রাসাদকে বিরাটাকার করার সূত্রপাত। তারপর থেকে এটির পরিধি যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে এর সৌন্দর্যও তেমনি দিনে দিনে বাড়ছে। এখন এটি যেন স্বর্গপুরী। মৃত্যুর সিংহদ্বার পার হওয়ার পরে মানুষ যে দৃশ্য দেখে এই প্রাসাদের অভ্যন্তরেও সেই একই মনোরম দৃশ্য, সেই একই পরিবেশ। মৃত্যুর পর যে রাজ্যে মানুষ প্রবেশ করে, দ্বারদেশের পরেই সেখানে প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয় একটি অতি মনোহর সুবিশাল বৃক্ষ। হতশেপসুত কল্পনা করে তার সহোদর ভ্রাতাদ্বয় যে বৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেখান থেকে তাকে চেঁচিয়ে ডেকে চলেছে ওই বৃক্ষই যেন পরপারের সেই প্রথম বৃক্ষ। ওই বৃক্ষের ক্লান্তি-হরণকারী ছায়ায় দাঁড়িয়ে একজন দেবী পৃথিবী থেকে আগত যাত্রীদির মধুর হেসে খাদ্য ও পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করেন। খাদ্য হল ওই বৃক্ষেরই সুমিষ্ট ফল। তাই মিশরের অধিবাসীরা ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সামর্থ্য অনুযায়ী বৃক্ষরোপণ করে নিজ নিজ জমিতে। তাদের অভিলাষ মৃত্যুর পরেও তারা যেন এসে স্বীয় হস্তে বপন করা বৃক্ষের ছায়ায় বসে প্রাণ জুড়ায়, ওই বৃক্ষের ফল খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

হিকসোসরা বিতাড়িত হয়েছে বটে, কিন্তু সারা দেশটিকে তারা যেন তছনছ করে দিয়ে গিয়েছে। তারা তো আর এই দেশের ভূতল-জঠর থেকে উঠে আসা

কোন জাতি নয়। তারা বহিরাগত। তাদের কৃষ্টি, তাদের ধর্মবিশ্বাস সবই ভিন্ন। তারা মিশরের দেবদেবীদের মানত না। তাঁদের মান্য না করলে, বিশ্বাস না করলে কি কখনো অস্তিত্ব বজায় রাখা যায়? এত বছর যে টিকে ছিল তাই যথেষ্ট। বিতাড়িত হওয়ায় সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

হতশেপসুত ধীরে ধীরে প্রাসাদের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করতে থাকে। সে উদ্যানের দিকে অগ্রসর হবে যেখানে তার দুই ভাই অপেক্ষা করছে।

বালিকা হতশেপসুতের মত মিশরের অধিকাংশ মানুষের মনেই হিকসোসদের দীর্ঘকালের অত্যাচাব আর অনাচারের প্রভাব এখনো বোঝার মত চেপে বসে রয়েছে। তাদেব সৃষ্ট ক্ষতস্থানগুলি এখনো দগদগে ঘায়ের মত জ্বালা ধরায়। অথচ তারা কবেই বিতাড়িত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তারা মিশরবাসীদের বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কারবদ্ধ মনের ওপর পীড়ন করে যাওয়ায় এখনো বিভীষিকা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এদেশের জনসাধারণ। তারা প্রায় ভুলতে বসেছিল তাদেব শিক্ষাদীক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য আর স্থাপত্য-বিদ্যাব কথা। হিকসোসরা ছিল অশিক্ষিত এবং কিছুটা বর্বরও বটে। মিশর-বাসীবা পূর্বের যে দেশগুলিকে বলে অন্ধকারের দেশ সেখান থেকেই এসেছিল ওরা। নইলে দেশের এই দুর্গতি হবে কেন? তারা চলে যাবার পরও তো অনেক বছর কেটে গেল।

হয়ত তারা কোনদিনই যেত না। কিন্তু থীবস-এ তাদেরই অধীনে ছিল এক নৃপতি যাঁর মধ্যে প্রবাহিত ছিল আদি মিশরীয় রাজবংশের শোণিতের ধারা। তাকে হিকসোসরা নিরাপদ ভেবেই রাজত্ব চালিয়ে যেতে দিয়েছিল। এই নৃপতির অন্তরে ছিল তীব্র আত্মসম্মানবোধ ও অদম্য দেশপ্রেম। রাজার নাম সেকেনেন্‌রি। হতশেপসুতের কয়েক পুরুষ পূর্বের ঘটনা এটি। হিকসোস-অধিপতি এই প্রাচীন বংশের নৃপতিকে প্রথমে আস্কারা দিলেও পরে উচ্ছেদ করার জন্য অজুহাত খুঁজছিল। কারণ মনে মনে সে বুঝতে পেরেছিল, মিশরে তাদের বিরুদ্ধে কখনো যদি বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়, তবে সেটি হবে এই রাজবংশের মাধ্যমেই। হিকসোসরা লক্ষ্য করেছিল, এই নৃপতির শক্তি না থাকলেও মিশরবাসীর হৃদয়ে তার সম্মান আকাশচুম্বী। তাই একদিন হিকসোস-রাজ অপেপি রাজধানী অবরিস থেকে সেকেনেন্‌রিকে লিখে পাঠালেন: জলহস্তীদের শায়েস্তা করুন। তাদের চিৎকার চেঁচামেচিতে সারাদিনের পরিশ্রমের পর রাতে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাবার উপায় নেই।

এটা একটা নির্জলা অজুহাত মাত্র। কোথায় অবরিস আর কোথায় থীবস। যাতায়াত করতে তিনদিন লেগে যায়। সব কয়টি জলহস্তী যদি একসঙ্গে চিৎকার শুরু করে তবুও হিকসোস-রাজ অপেপির কর্ণগোচর হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। সেকেনেন্‌রি বুঝলেন এবারে তাঁর ওপর আক্রমণ শুরু হবে। তাছাড়া প্রকৃতির জীব ওই বিশালাকার অসংখ্য জন্তুদের সহসা শান্ত করে

দেবার মত প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করার ক্ষমতা কারও নেই। তাই তিনি পরামর্শ-দাতাদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন।

কিছুদিন পরেই হিকসোস-রাজ আবার হুমকি দিলেন—জলহস্তীরা আগের মতই বেয়াদপি করে চলেছে। আর সহ্য করব না বলে দিচ্ছি।

সেকেনেন্‌রি নিজের সৈন্যসামন্ত একটু গুছিয়ে নিলেন। বিদেশীদের যারা আদৌ সহ্য করতে পারে না এমন কিছু দেশপ্রেমী সহায়কদেরও সঙ্গে পেলেন তিনি। তবু তিনি বুঝতে পারলেন ওই সব বর্বর পরদেশীদের তুলনায় তাঁর শক্তি কিছুই নয়।

তিনি হিকসোস অধিপতিকে জানালেন : জলহস্তীদের শান্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তার চেয়ে যদি বলেন, মরু অঞ্চলে গিয়ে কিছু সিংহ শিকার করে আনতে সেটা অনেক সহজ কাজ হবে।

থীবস-এর রাজার এই পত্রের মধ্যে হিকসোস-রাজ অপেপি ঔদ্ধত্যের প্রকাশ দেখতে পেলেন। তিনি জানালেন—আপনার মরণের দিন ঘনিয়ে এসেছে। একমাত্র পথ হল আমাদের দেবতা সুতেখকে মেনে নেওয়া। রাজ্যে সুতেখ দেবতার পূজার প্রচলন করুন।

সেকেনেন্‌রির জানা আছে যে ওসিরিসের ভাই সেথকে সুতেখ নামে হিকসোসরা পূজা করে। ভ্রাতৃহন্তা বলে এবং হোবাসের শত্রু বলে এমনিতেই সেথকে দেশবাসীরা পছন্দ করে না। কিন্তু হিকসোসরা তাঁকে দেবতা বলে মান্য করে বলে তিনি এখন সাধারণ মিশরবাসীর কাছে অসহ্য।

সেকেনেন্‌রি নীরব থেকে বুঝিয়ে দিলেন প্রাণ থাকতে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং অনিবার্যভাবে একদিন আক্রমণের ঢেউ আছড়ে পড়ল তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্যের ওপর।

রানী তেতাশেরেত স্বামীর কাছে এসে বললেন—এর পরিণাম তো বুঝতেই পারছি।

সেকেনেন্‌রি বিষণ্ণ হাসি হেসে পত্নীর প্রতি স্বপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—কি বুঝলে ?

—তুমি আমাদের ছেড়ে চললে সেই পশ্চিমের দেশে ?

—হ্যাঁ। তোমাকে আমি শুধু কয়েকটি কথা বলে যাব। পুত্র কামেস যেন শত্রুদের হাতে না পড়ে। তুমি প্রাণ দিয়ে তাকে রক্ষা করবে। দেখবে সে একদিন ওসিরিস ও আইসিসের পুত্র হোরাসের মত প্রতিশোধ নেবে। আর একটা কথা বলে যাচ্ছি। আমার বড় ইচ্ছা ছিল মৃত্যুর পরে একটা অক্ষয় আবাসে বাস করব। হয়ত হবে না। তুমি দেবতা অমন রা, ওসিরিস, অনুবিস সব দেবতার কাছে আমার হয়ে প্রার্থনা করবে যাতে আমি রা-এর দিবারাত্রির তরীতে একটু স্থান পাই। এখানে যুদ্ধে যেমন আমি পরাঙ্মুখ নই, তরীতেও অভিযানের সময় পৃথিবীর তলদেশ দিয়ে যখন গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সেটি চালিত হবে, তখন আমি অনুভব করব দেবতাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তখন কোন বিপদ এলেও আমি এগিয়ে যাব। আমার হয়ে এই প্রার্থনা তুমি করো। আমার

তো আর সময় নেই।

রানী অতিকষ্টে অশ্রুসংবরণ করে স্বামীর গ্রীবা বেষ্টন করে বুকে মুখ লুকিয়ে বলেন—আমি প্রার্থনা করব তোমার জন্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে নৃপতি বীরের মত প্রাণ দিলেন। তাঁর পুত্র কামেস সত্যসত্যই দেবপুত্র হোরাসের মত পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সেই থেকে হিকসোসদের পরাজয়ের সূত্রপাত। কারণ কামেস শত্রুদের তাদের বহুদিনের রাজধানী অবারিস থেকে বিতাড়িত করে অনেক দূর পর্যন্ত ঠেলে দিলেন—সেই হেরাকলিওপোলিশ অবধি। বাকীটুকু শেষ করলেন একাধারে তার স্ত্রী ও ভগিনী অহেটেপ-এর গর্ভজাত পুত্র অহমেস। অহমেস তাঁর বীরত্বের দ্বারা প্রজাদের মন জয় করেছিলেন। নইলে তিনি দেখতে খুব একটা সুদর্শন ছিলেন না। প্রথমত, তিনি দীর্ঘদেহী ছিলেন না। সাধারণ মানুষের চেয়েও বেঁটে। তাঁর দৈর্ঘ্যকে কখনো রাজকীয় দৈর্ঘ্য বলা যায় না। তার ওপর তাঁর কুঞ্চিত কেশদাম দেখে লোকের মনে যে একেবারে সন্দেহের উদ্রেক হত না এমন নয়। রাজা কামেস এমন ছিলেন না। পুত্রের কেন এই রকম কেশদাম হল কেন? এ যে আরও দক্ষিণের অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য। তবে কেশের রঙ বাদামী, এই যা রক্ষা। কিন্তু তাঁর দন্তশ্রেণীও ভাল ছিল না। বাইরের দিকে বের করা। তাহলে কি হবে, তিনিই নৃপতি। এমনই নৃপতি তিনি, যিনি কয়েক শতাব্দীর অত্যাচার আর নিপীড়ন থেকে সমগ্র দেশবাসীকে রক্ষা করেছেন। এও নিশ্চয় দেবতাদের অভিপ্রায়। তাছাড়া, দেখতে তিনি যেমনই হোন, তাঁর দেহ ছিল মজবুত, কাঁধ চওড়া এবং তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ। সবাই দেখেছে—আপামর জনসাধারণ থেকে শুরু করে তাঁর সঙ্গী অসংখ্য সৈন্যরা স্বচক্ষে দেখেছে দিনের পর দিন কী অমানুষিক পরিশ্রম করে হিকসোসদের তিনি নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। তাদের প্রতিটি ঘাঁটিতে অপ্রত্যাশিত ভাবে অসময়ে হানা দিয়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। হাজারে হাজারে শত্রুকে বিধ্বস্ত করেছেন। পালাবার পথ খুঁজে পায়নি তারা।

অহমেসের বীরত্ব কাহিনী থীবস্-এর রাজপথে লোক জড়ো করে সোচ্চার কণ্ঠে অহরহ বলত তাঁরই নামে নাম অপর এক অহমেস। এই অহমেস হল এক সাধারণ পরিবারের সন্তান। পিতার নাম আবানা। সেই আবানা ফ্যারাও অহমেসের পিতামহ সেকেনেন্‌রির অধীনে যুদ্ধ করে তাঁর নৌ-বাহিনীর নায়ক হয়েছিল। আবানার পুত্র অহমেস হাত পা নেড়ে বলে চলত, কিভাবে তাদের নরপতি পূর্ব-বদ্বীপের হিকসোস-রাজধানী অবারিস অধিকার করে নিয়েছিলেন। সে নৃপতির সঙ্গে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে শারুহেন নগরী পর্যন্ত গিয়ে সেই নগরী অধিকার করে নিয়েছিল। ফ্যারাও অহমেস নুবিয়ায় সৈন্য পাঠিয়ে সেই অঞ্চল এবং অল-কাব নিজের অধীনে নিয়ে আসেন।

আবানার এই পুত্র অহমেস শুধু কামেস-পুত্র অহমেসের অধীনেই যুদ্ধ করেছে তাই নয় সে দীর্ঘজীবী হয়ে অহমেস পুত্র অমেনহোটেপ এবং তাঁর পুত্র থুথমসের অধীনেও বহু যুদ্ধ করেছে। অসাধারণ শৌর্য প্রদর্শনের জন্য সে

বহুবার রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছে। অনেক স্বর্ণ দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে বারবার। সৈন্যদলেও সে ধীরে ধীরে উন্নতি করে অনেক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তাই অতি বৃদ্ধ বয়সেও সে ফ্যারাও-এর পুত্র এবং রাজকুমারী হতশেপসুতের সঙ্গে প্রাসাদে প্রবেশ করে খুশীমত দেখা করতে পারে। কেউ তাকে বাধা দেয় না। বাধা দেবার কথা ভাবতেও পারে না কেউ। সে যে বীরত্ব, সাহসিকতা আর দেশপ্রেমের প্রত্যক্ষ প্রতীক।

আসলে ফ্যারাও-এর সন্তানদের কাছে দেশের অতীত কাহিনী তার ধর্ম, সংস্কৃতি ও আরও নানা বিষয়ের কথা বলে দেশকে ভালবাসতে শেখায়। দেশপ্রেমের বীজ তাদের অন্তরে বপন করে দিতে চায়। তাই নিজের বীরত্ব-কাহিনী বলার ফাঁকে ফাঁকে দেশের গৌরব-গাথা বলে চলে। আগে পথের ধারে লোক জড়ো করে বলত, এখন বলে প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে বসে। তার প্রিয়তম স্থানটি হল প্রাসাদ-সরোবরের সন্নিকটের পাদমূল। মরু অঞ্চলের তপ্ত আবহাওয়া থেকে বৃক্ষটির ছায়া নিষ্কৃতি দেয়। এই বৃক্ষ খর্জুর বৃক্ষের ন্যায় নগ্ন নয়। হতশেপসুতের মত তারও মনে হয় এটাই বুঝি সেই বৃক্ষ যেখানে দেবী থাকেন। যাদের হৃৎপিণ্ড মানদণ্ডে ওজন করে প্রমাণিত হয় যে সেটি একেবারে নিষ্কলুষ এবং নির্ভেজাল শুধু তাদেরই এখানে আমার অধিকার রয়েছে। স্বয়ং অনুবিস দেবতা থথ-এর দৃষ্টির সম্মুখে ওজন করেন মৃত ব্যক্তিদের হৃৎপিণ্ড। বৃক্ষের কথা ভাবতে ভাবতে বৃদ্ধের চমক ভাঙে। সে তো আর রাজকন্যায় মত বালিকা নয় যে স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে থাকবে। বৃদ্ধ বয়সের স্বপ্ন বড় ক্ষণস্থায়ী। রূঢ় বাস্তবের অভিজ্ঞতায় ক্ষণে ক্ষণে নেই স্বপ্ন টুটে যায়। দানা বাধতে দেয় না। আবানা-পুত্র অহমেস ভুলতে পারে না তার প্রভু অহমেসের কথা। হ্যাঁ, ফ্যারাও তো বটেই। এতদিনে যেন মিশর-রাজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। আবানা-পুত্র ভুলতে পারে না যৌবনের সেই দিনগুলির কথা। অথচ বৃদ্ধ বয়সে বর্তমান ফ্যারাও-এর অধীনেও অসাধারণ শৌর্যের পরিচয় রেখেছে সে। কিন্তু অহমেসের কথা বলতে গেলে সে বড় বেশী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। অল্প বয়সের কথা স্মৃতির মণিকোঠায় বড় বেশী রেখাপাত করে যায়, বেশী বয়সে যা আর সম্ভব হয় না। তাঁর মৃত্যুর দিনে সে নির্জনে বসে অশ্রুপাত করেছিল। তপ্ত বালুকারাশিতে সেই অশ্রু ঝরে পড়ায় কোন চিহ্ন রাখতে পারেনি। কিন্তু অন্তরের নিভৃত কোণে সেই ক্রন্দনধ্বনি শোনা গিয়েছে বহুদিন ধরে। আজও কখনো কখনো শোনা যায়। তার প্রভু এত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও খুবই সুখের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। কারণ সেদিনের যুদ্ধে অন্য ধরনের উন্মাদনা ছিল। বহুদিনের পরাধীনতার পরে স্বাধীনতার স্বাদ মিলেছে সবে। যুদ্ধের অর্থ ছিল আরও স্বাধীনতা, আরও সমৃদ্ধি। কোন সন্দেহ নেই ফ্যারাও অহমেস মরণের পরে স্বর্গে গিয়ে সূর্য-দেবতার সঙ্গে গিয়ে মিশেছেন।

অহমেস তাঁর জীবিতকালে হিকসোসদের বহুবার পরাজিত করে একেবারে কোণঠাসা করে ফেললেও তাঁর পুত্রে অমেনহোটেপের সময়ও তাঁরা একেবারে

নিশ্চিহ্ন বা নির্বিষ হয়ে যায় নি। তখনো তারা মিশরের বিপদ ঘটাবার মত শক্তি নিয়ে অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। ফলে অমেনহোটেপকেও তাদের বিরুদ্ধে একাধিকবার যুদ্ধযাত্রা করতে হয়েছে। সেই সব যুদ্ধেও আবানার পুত্র তাঁর সঙ্গী হয়েছে। এই যুদ্ধের ফলে দেশের অস্থিরতা হ্রাস পেয়ে একটা স্থিতি এসেছিল।

তাঁর পরেই ফ্যারাও হলেন তাঁর পুত্র, যাকে বলা হয় থুথমস। অমেনহোটেপের পুত্র হয়েও তিনি কিন্তু কোন দেবমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেননি। অর্থাৎ তাঁর মাতা এমন কোন রাজকন্যা নন যাঁর দেহে ফ্যারাও শোণিত বইছে কিংবা যাঁর মাতা ছিলেন দেবমহিষী। তাঁর নাম ছিল সেনসেনেব। তবুও তিনি ফ্যারাও-এর পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। ফ্যারাওদের এই ধরনের পুত্রলাভ প্রাচীনকাল থেকেই চালু আছে। মসনদে বসার মত পুরুষের অভাব যাতে না ঘটে সেই জন্যই ফ্যারাওদের অবাধ নারীসঙ্গ লাভের ব্যবস্থা রয়েছে। যে কোন বংশের, যে কোন সম্পর্কের রমণী হলেও বাধা নেই। ফ্যারাও হয়ে থুথমস নিজের মসনদ পাকাপোক্ত রাখার জন্য তাঁর পিতার কন্যা রাজকুমারী অহমেসকে বিবাহ করলেন। অহমেস হলেন অমেনহোটেপের বিধিসম্মত রাজ্ঞীর গর্ভজাত অর্থাৎ থুথমসের সৎ বোন।

আবানা-পুত্র যতই তার প্রথম প্রভুর স্মৃতি রোমন্থন করুক না কেন, বর্তমান ফ্যারাও-এর পরাক্রমকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। মনেপ্রাণে সে অনুভব করে যুদ্ধ পরিচালনায় বর্তমান ফ্যারাও-এর পারদর্শিতা পূর্বের সব ফ্যারাও-এর প্রতিভাকে অতিক্রম করেছে। হয়ত তাঁরা অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করেছেন, হয়ত তাঁদের সময় হিকসোসরা অনেক বেশী পরাক্রমশালী ছিল, তবু সৈন্যদলকে যে অভিনব কৌশলে ইনি পরিচালনা করেন, তা সত্যই অপূর্ব। তাঁর নুবিয়া অভিযানের কথা সে ভুলতে পারে না। তাই সরোবরের ধারে বসে সরোবরের জলে নিজের নুয়ে-পড়া দেহযষ্টি আর বিশুষ্ক মুখমণ্ডলের ছায়ার পাশে রাজকন্যা আর রাজপুত্রদের সুকোমল সুমিষ্ট তরতাজা মুখগুলো প্রতিবিম্বিত হতে দেখে সে উৎসাহ ভরে বলে ওঠে—তোমাদের পিতা, আমাদের বর্তমান ফ্যারাও-এর অনুগ্রহে এই বয়সেও আমি প্রশংসা পেয়েছি। তিনি মসনদে বসেও নুবিয়ার দিকে দৃষ্টি ফেললেন। দুই ভাগে নুবিয়াতে ভাগ করলো। কারণ স্থানটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। অনেক খনি ওখানে। তিনি বুঝলেন ওখানে স্থায়ীভাবে একজন প্রশাসককে রাখা প্রয়োজন। নুবিয়া তো কুশ প্রদেশের অন্তর্গত। তাই কুশের অধিপতি করা হল একজনকে।

হতশেপসুত বলে ওঠে—তবু তো সেখানে বিদ্রোহ হয়েছিল বলে শুনেছি।

আবানা-পুত্রের নিষ্প্রভ চোখের দৃষ্টিতেও প্রশংসার দ্যুতি দেখা যায়। সে বলে—তুমি অনেক কিছুই জান দেখছি।

ছোট ভাই অমেনমেস বলে—ও অনেক কিছু জানে। কত গল্প বলে আগেকার দিনের।

বৃদ্ধ অমেনমেসের দিকে চেয়ে হেসে বলে—হ্যাঁ, রাজকন্যা অসাধারণ

বুদ্ধিমতী। কিন্তু তোমার চোখের দিকে চাইলে মনে হয়, তোমার মধ্যেও কি যেন লুকিয়ে রয়েছে। এখনো সুপ্ত সেটি। রাজকন্যা ঠিকই বলেছে। ফ্যারাও সাবধান হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহ হয়েছিল নুবিয়ায়। আর ওই বিদ্রোহ দমনে অংশ নিতে আমার মত বৃদ্ধেরও ডাক পড়ল। ভাব একবার।

বালক উয়াচমেস বলে ওঠে—কেন ?

বৃদ্ধ বলে—আসলে ফ্যারাও ভাবলেন, চিরকাল সব যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছি, শেষ বয়সে শেষ গৌরবটুকু থেকে কেন বঞ্চিত হই। তাছাড়া কোন যুদ্ধে আমি পরাজিত হয়নি। জয় যেখানে আমিও সেখানে, একথাও তিনি হয়ত ভেবেছিলেন। তাই আমিও সঙ্গে চললাম। আর হ্যাঁ, দেখলাম বটে তোমাদের পিতার বিক্রম। যেন স্বয়ং অমন দেবতা ঝলসে উঠলেন সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে। চিতাবাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুদের ওপর। উনি বর্শা নিক্ষেপ করলেন শত্রুর দলপতিকে লক্ষ্য করে। সেই বর্শা ভেদ করল দলপতির দেহ। কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুসৈন্য শক্তিহীন নির্জীব হয়ে পড়ল।

হতশেপসুত তখন বলে—যুদ্ধ তো মাটিতে হয়নি। হয়েছিল নীলনদের বুকে। তেমনই শুনেছি।

—ঠিক। ওই যুদ্ধকে বলা যেতে পারে জলযুদ্ধ। আর আমাদের নৌবাহিনীর দলপতি কে ছিল সেকথা জান ?

দুই ভাই একসঙ্গে বলে ওঠে—কেন, ফ্যারও।

তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রানী মুতনেফার্তের গর্ভজাত পুত্র চবরোস বৃদ্ধের কথা একটু দূরে বসে শুনছিল। তবে তার মধ্যে তেমন কোনরকম আগ্রহ দেখা যাচ্ছিল না। বৃদ্ধের গল্প শোনার চেয়ে তার লক্ষ্য বেশী ছিল রাজকুমারীর মুখের দিকে। রাজকুমারী হাসলে সেও হাসছিল। রাজকুমারী গম্ভীর হলে সেও গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে বৃদ্ধের অতি-আগ্রহভরা কথা শুনে ঠোঁট উলটে মুখের রেখায় একটা বিদ্রূপাত্মক ভাব ফুটিয়ে তুলে সেই আগ্রহকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বৃদ্ধ কিংবা অন্য তিনজন তার দিকে বিশেষ দৃকপাত করেনি। এমন কি হতশেপসুতও নয়। তার এখনো সেই বয়স হয়নি যে বয়সে নারীরা অন্যের দৃষ্টির জ্বালা-ধরা কিংবা মধুমাখা পরশ দেহের ত্বকে না দেখেও অনুভব করতে পারে। তাছাড়া তার সৎ ভাই কিছুটা মেয়েলী স্বভাবের। সে তার চুলের বাহার নিয়ে বড় বেশী ব্যস্ত থাকে। তার মুখে বীরত্বের কথাও জলোজলো বলে মনে হয়। তার মনটাও আদৌ স্বচ্ছ নয়। বরং বলা যেতে পারে কিছুটা কুটিল। সে শুধু জানে হতশেপসুতের সঙ্গে যদি তার বিবাহ হয় তাহলে পরবর্তী ফ্যারাও রূপে সে সুনিশ্চিতভাবে মসনদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে। তার মা তাকে অনেক আগেই একথা বলেছেন। একথাও বলেছেন, হতশেপসুতের যা না-পছন্দ তেমন কাজ সে যেন কখনো না করে। কিন্তু মায়ের নির্দেশ যতই সে মান্য করুক না কেন, তার মুখের রেখায় ভাঁজে একটা নিষ্ঠুরতার প্রকাশ হতশেপসুতের মোটেই ভাল লাগে না। নইলে তারও অজানা নয় যে সৎ ভাই মোটামুটিভাবে যারা তার সম্ভাব্য স্বামী হতে

পারে তাদের মধ্যে একজন।

উয়াচমেসদের কথায় উত্তরে বৃদ্ধ বলে—ফ্যারাও ছিলেন সর্বপ্রধান। কিন্তু নৌ-যুদ্ধের দলপতি ছিলাম আমি। ফ্যারাও এই রাজধানী থেকে যাত্রার সূচনাতেই আমাকে বলেছিলেন—"শুনেছি নৌ-বাহিনীতে তোমার হাতে-খড়ি। তুমি কিশোর বয়সে অতি সামান্য একটি কাজ নিয়ে নৌবাহিনীতে জীবন শুরু করেছিলে। তোমায় পিতা আবানার অধীনে তুমি ছিলে। তারপর অনেক যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ নায়ক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছ। অনেক উন্নতি করেছ তুমি। শেষ বয়সে একবার শেষ চমক দিতে হবে কিন্তু।" আমি কৃতার্থ হয়ে বললাম—"আপনার আজ্ঞা, আমার কাছে দেবতা হোরাসের আজ্ঞা। আপনার আদেশ শিরোধার্য।" তারপর কি ঘটেছিল সেকথা তোমায় ফ্যারাও-এর মুখেও শুনতে পারে। কিন্তু তাঁর তো অত সময় নেই। আমার মত নিষ্কর্মা তিনি নন। সমস্ত দেশবাসী তাঁর মুখের দিকে সব সময় চেয়ে রয়েছে।

হতশেপসুত বলে ওঠে—আপনি নিষ্কর্মা? বলেন কি? কেউ বিশ্বাস করবে না। হিকসোসদের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলেছিল কে? বাবা নিজে একথা বলেছেন আমাকে। হিকসোসদের বিরুদ্ধে অন্যান্য যুদ্ধের মত ফ্যারাও শুধু সৈন্যবাহিনী নিয়ে লড়াই করেনি। সমস্ত দেশবাসী তাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। দেশবাসীকে আপনিই জাগিয়েছিলেন।

বৃদ্ধ বিগলিত কণ্ঠে বলে—ফ্যারাও আমাকে স্নেহ করেন বলে ওকথা বলেছেন।

—না! শুধু ফ্যারাও নন। আমি শুনেছি ছোট ছোট শিশুরা, যারা মায়ের হাত ধরে প্রতিদিন সকালে লেখাপড়া করতে যায় শিক্ষালয়ে, তাদেরও আপনার কথা বলা হয়। তারা যাতে দেশের প্রকৃত খবর পায়।

—তুমি তো সাংঘাতিক মেয়ে দেখছি। এ খবর আমি নিজেই রাখি না।

—কি করে রাখবেন? সেদিন আপনি বলেছিলেন আপনার বয়স বিরানব্বই। এই বয়সে যে আপনি হেঁটে হেঁটে আমাদের কাছে আসতে পারছেন এটাই যথেষ্ট।

বৃদ্ধ আর কিছু বলতে পারে না। সেই সময় সে কিংবা আর কেউ যদি লক্ষ্য করত তাহলে দেখতে পেত ফ্যারাও-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র চবরোস একটি ফড়িং ধরে তার ডানা দুটো একটি একটি করে টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। যেন সেটি প্যাপাই-রাসের তৈরী একটি নিষ্প্রাণ পতঙ্গ। মুখে তার অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছে।

আবানা-পুত্র বলে—নীলনদের বক্ষের সেই দিনের যুদ্ধ আমার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ সেই যুদ্ধের পরই নদীর তৃতীয় প্রপাত পর্যন্ত আমাদের অধিকার বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

—নুবিয়ার সেই নেতার কি হল?

—তাকে মাথা নিচের দিকে করে আমাদের ফ্যারাও-এর বড় নৌকোর সম্মুখে ঝুলিয়ে রাখা হল।

—এটাই তো আপনার শেষ যুদ্ধ?

—শেষ আর হল কোথায়? ফ্যারাও ছাড়লেন না। বললেন—"এবারে তোমাকে যে আবার যেতে হবে পুবের দিকে। আমি ভাবছি ইউফ্রেটিস অবধি আমাদের সীমা বাড়াতে হবে। একটু নিশ্চিন্ত হতে চাই। নইলে চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুই এগোচ্ছে না।" ফ্যারাও-এর আদেশ সঙ্গে সঙ্গে মাথা পেতে নিলাম। তিনি যে দেবতা।

ওদের সৎ ভাই হঠাৎ বলে ওঠে—এবারে তো আপনি বসে থেকে থেকেই যুদ্ধ দেখলেন। তাই না?

আচমকা এ ধরনের মন্তব্যে হতশেপসুত অত্যন্ত বিরক্ত হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও কেমন হতচকিত। তারা এই বৃদ্ধকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। বৃদ্ধের মুখ কিন্তু আগের মতই প্রশান্ত। যেন সুপ্রাচীন কালের এই মিশরেরই অধিপতি জোসেরের রাজত্বকালে প্রতিভাবান ইমহোটেপের নির্মিত বিরাটাকার পিরামিডের ওপর কেউ যেন এক টুকরো পাথর নিক্ষেপ করল। বৃদ্ধের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

আবানার পুত্র হেসে বলে—তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। আমি ইচ্ছা করলে ফ্যারাও-এর অশ্বচালিত যানের পাশে দাঁড়িয়ে কিংবা অন্য কোন যান বা বাহনে বসে যুদ্ধ দেখতে পারতাম। কিন্তু আমি তা চাইনি। শত্রুপক্ষের প্রস্তুতি দেখে আমার মধ্যে সেই যৌবনের শোণিত-প্রবাহ বড় ঝড় তুলল। আমি ফ্যারাও-এর অনুমতি নিয়ে সৈন্যদল পরিচালনা করলাম। আর তুমি তো নিশ্চয় জান রাজপুত্র, সৈন্যদল পরিচালনা করতে হলে সবার আগে থাকতে হয়। যারা সেভাবে না থেকে নিজে পেছনে থেকে অন্যের সাহায্য নেয় তাদের তো বীরপুরুষ বলা যায় না। আমাদের ফ্যারাও তাই নিজেই এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বলেছিলাম—"এই শেষ বার। যদি আমার মৃত্যু হয় আপনি সামনে আসবেন। এই আমার প্রার্থনা। আমি পরপারে দেবতাদের সঙ্গে মিলতে চাই।" ফ্যারাও আমার কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি। তারপরই তিনি চমৎকৃত হয়ে দেখলেন বুড়ো হাড়ের ভেল্‌কি। আমি একটা গোটা চার অশ্বচালিত যান দখল করলাম। সেই অশ্বদের একটাকেও আহত হতে দিইনি। তার মধ্যে যে সব মানুষ ছিল তারাও অক্ষত রইল।

বৃদ্ধ এবারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—হ্যাঁ, আমার সত্যিই বয়স হয়েছে। তাই তো নিজের সমাধিমন্দির নির্মাণ করে রেখেছি। আমাদের এই পৃথিবীর জীবন খুব বেশী হলে একশো বছর। কিন্তু পরকালের জীবন যে অনন্ত। সেজন্য আমরা পাথরের তৈরী অত্যন্ত মজবুত সমাধিস্থল নির্মাণ করে রাখি, যাতে নিশ্চিন্তে অনন্তকাল চির শান্তিতে থাকতে পারি। আমাদের আদি পুরুষেরা তাই শিখিয়ে গিয়েছেন।

দেশের পুরাতন সংস্কৃতি আচার-আচরণ এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর হতশেপসুত সব সময় এক অদম্য আকর্ষণ অনুভব করে। পুরাতনের সঙ্গে দুই

শতাব্দীর বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়েছিল হিকসোসরা একথা সে শুনেছে প্রাসাদের অনেক প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে। তাই হিকসোসদের সে সহ্য করতে পারে না এই বয়সেই। যার ফলে সে দেবতা ওসিরিসের ভ্রাতা ও হত্যাকারী সেথকেও ঠিক মানতে পারে না। কারণ তাঁকে সুতেখ নাম দিয়ে হিকসোসরা দেবতা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। এর মধ্যেও নিশ্চয় নিহিত ছিল তাদের অসৎ উদ্দেশ্য। তারা জানত ওসিরিস এবং তাঁর প্রিয়তমা পত্নী আইসিস মিশরবাসীদের কাছে কত প্রিয়। তাঁদের পুত্র হোরাস তাদের খুবই আপনার দেবতা। তাই যেহেতু ওসিরিসকে সুতেখ হত্যা করেছিল সুতরাং তিনি তাদের দেবতা। দেবতা নিয়েও চক্রান্ত। হিকসোসরা ভাল করেই জানত যে তাদের সুতেখ আইসিসের অপর এক ভগিনী নেফথিসকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু একাধারে স্বামী এবং ভ্রাতা সুতেখের জঘন্য আচরণের জন্য নেফথিস স্বামীর সংসর্গ থেকে ধীরে ধীরে সরে এসে ভগিনীপতি ওসিরিসের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছিলেন, অশ্রুপাত করেছিলেন। ওসিরিস তো শুধু তাঁর ভগিনীপতি নন, তিনি তাঁর সহোদর ভ্রাতাও বটে। তাই সুতেখ বা সেথ পত্নীর এই মনোভাব বুঝতে পেরে দেবী ত-আর্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। এই দেবী হলেন অন্তঃসত্ত্বা রমণীর ও শিশু প্রজননের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এঁর মস্তক এবং দেহ জলহস্তীর, পশ্চাতের অংশ সিংহ এবং লঙ্গুল কুমীরের। সেথ বুঝেছিলেন এঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে তেমন কোন কথা উঠবে না। আবার তিনি পূজিত হবেন মিশরের সাধারণ অধিবাসীদের দ্বারা। সেথ যে দেবতা হতশেপসুত নিজেও সেকথা অস্বীকার করতে পারে না। অনেকের মত তারও দৃঢ় বিশ্বাস সূর্য দেবতার প্রখর তাপের ধ্বংসাত্মক শক্তি হলেন সেথ। সৃষ্টিশীল কোন কিছু করার ক্ষমতা তাঁর আছে বলে সে বিশ্বাস করে না। তবে একথাও সে জানে সেথকে অনেক মিশরবাসী অন্য চোখে দেখে। তাঁকে মনেপ্রাণে সম্মানও করে তারা।

শুধু দেবতাদের প্রতি নয়, পুরাতন আচার-আচরণের প্রতিও গভীর আস্থা তার। সে জানে তার পিতার উচ্চতা খুবই কম। বালিকা হয়েও সে বুঝতে পারে তিনি খর্বকায়। তিনি বলিষ্ঠ হলেও তাঁর উচ্চতা সাধারণ একজন রমণীর উচ্চতার সমান কিংবা তার চেয়ে সামান্য বেশী। তার ওপর তাঁর মাথায় কেশদাম বলতে কিছুই নেই। মাথায় টাক। তবে ফ্যারাওরা এমনিতেই মাথায় চুল রাখেন না। এটাই নিয়ম। মিশরীয় নর এবং নারীরা অনেকেই পরচুল ব্যবহার করতে অভ্যস্ত, নিজের চুল থাকুক বা না থাকুক। ফ্যারাওরা পরচুলও বিশেষ পরেন না। প্রয়োজন হয় না। তাঁদের মস্তক শোভিত থাকে শ্বেত কিংবা রক্তবর্ণ শিরোভূষণ দ্বারা। ফ্যারাও-এর পদে অভিষিক্ত হবার পর থেকে কোন মিশরীয় তাদের ফ্যারাও-এর অনাবৃত মস্তক কখনো দেখতে পায় না। এটা চিরকালের প্রথা। মিশরীয় অধিপতিকে ফ্যারাও উপাধিতে অভিহিত করার পূর্ব থেকেই এই প্রথা। তাই মস্তক ঘন কেশদামে আবৃত থাকুক বা ইন্দ্রলুপ্ত ঘটুক কিছুই এসে যায় না।

হতশেপসুত জানে, প্রজাদের সম্মুখে কিংবা কোন উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ

দিতে হলে ফ্যারাওকে সুসজ্জিত হতে হয়। তাঁকে পরিধান করতে হয় দীর্ঘ পোশাক। মস্তক থাকে মুকুট শোভিত। তাঁর নিজস্ব শ্মশ্রুগুম্ফের প্রয়োজন হয় না। কারণ চিবুকের কাছ থেকে নেমে আসে মূল্যবান ধাতুনির্মিত চকচকে একটি কৃত্রিম শ্মশ্রু। সেই ধাতব দ্রব্যটি গণ্ডের দুই পাশে বন্ধনীর দ্বারা বেঁধে রাখা হয়। অভিজাত পরিবারের পুরুষেরাও কৃত্রিম শ্মশ্রু ব্যবহার করে বটে তবে সেটা ফ্যারাও-এর শ্মশ্রুর মত অতটা দীর্ঘ নয়।

ফ্যারাও হলেন মানবরূপী দেবতা। তাই অমনের মত তিনিও প্রতিদিন জন্মগ্রহণ করেন। সূর্যদেব যেমন তমসাচ্ছন্ন রাজ্য অতিক্রম করে প্রতিদিন পূর্বাকাশে উদিত হন, ফ্যারাও-ও তেমনি। প্রতিদিন প্রভাতে তাঁর নবজন্ম লাভ হয়। তাই নবজাত দেবতাকে অভ্যর্থনা করার জন্য অনেক আয়োজন। প্রতিদিন তাঁর নিদ্রাভঙ্গের পর গাত্রোত্থান একটি পবিত্র ঘটনা। তাই একে বলা হয় প্রাসাদের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান। প্রথমেই পবিত্র সরোবর থেকে নিয়ে আসা বারি দ্বারা ফ্যারাও-এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রক্ষালন করা হয়। যেন তাঁর নবজন্ম হচ্ছে। এবারে দুজন পুরোহিত এগিয়ে আসেন। তাঁদের একজনের মুখে বিদ্যার অধিষ্ঠাতা দেবতা থথ-এর মুখোশ। অপর জনের মুখে থাকে হোরাস দেবতার মুখোশ। এঁরা দুজনা ফ্যারাও-এর সর্বাঙ্গ সুগন্ধি তৈল দ্বারা মর্দন করেন। তারপর তাঁকে রাজকীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করা হয়। থথ এবং হোরাস-রূপী পূজারীদ্বয় তাঁর হাত ধরে নিয়ে যান দেবালয়ে। এই দেবালয় যেন আকাশ। এখানে এসে ফ্যারাও দেবালয়ের দ্বারের শীলমোহর ভেঙে দেন। যেন সূর্য-দেবতার বহির্গমনের জন্য তিনি আকাশের দুয়ার ভঙ্গ করলেন। সেই দুয়ার দিয়ে অন্ধকার কক্ষ থেকে সূর্যদেবতা বাইরে আসবেন। এরপর ফ্যারাও অবনত ও শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে দেবতাকে জাগ্রত করার জন্য তাঁর স্তব গান শুরু করেন ঃ —জাগ্রত হন হে দেবতা! শান্তির পরিবেশে জাগ্রত হন।

এরপর পূজারীরা তাঁকে যেভাবে শুদ্ধিকরণ করেছিলেন তিনিও তেমন স্বহস্তে দেবতার মূর্তিকে পবিত্র করেন। দেবতাকে তাঁর বাহুদ্বয়ের ওপর অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শুইয়ে দেন। তারপর তাঁকে খাওয়াবার ভঙ্গি করেন মুখের সামনে খাদ্য তুলে নিয়ে। তাঁকে বিচিত্রবর্ণের পোশাকে সজ্জিত করান এবং ফ্যারাও-এর প্রতীক দ্বারা ভূষিত করেন। এরপর মূর্তিকে তিনি স্বস্থানে স্থাপন করে আনত হন শ্রদ্ধাভরে। তারপর এক পা এক পা করে পিছু হটতে থাকেন। দেবতার সম্মুখে পেছন ফিরে যাওয়া তাঁকে অমর্যাদা করার সমান। তাঁর সামনে পাদুকা পরিধানের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই ফ্যারাও-এর পাদুকাবাহক মন্দিরের বাইরে তাঁর পাদুকা নিয়ে অপেক্ষা করে। তবু অনেক সময় ফ্যারাও নগ্ন পদেই দেবালয় থেকে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেন। কারণ মিশরীয় শিক্ষা হল কোন গুরুজনের সম্মুখ দিয়ে পাদুকা পরিহিত অবস্থায় যাবার অর্থ হল তাঁকে অসম্মান করা। এই শিক্ষা অন্য সব মিশরবাসীর মত তিনিও পেয়েছেন শৈশব থেকে। গুরুজনকে দেখলে উঠে দাঁড়ানো কিংবা পথিমধ্যে তাঁকে দেখলে একপাশে সরে দাঁড়ানো, এইসব শিষ্টাচার মিশরবাসীর অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে রয়েছে।

তারা তো হিকসোসদের মত বর্বর নয়। তারা এসেছিল অন্ধকারের দেশ থেকে। সভ্যতা বলে তাদের কিছুই ছিল না। হতশেপসুত জানে এ দেশের সভ্যতা কত প্রাচীন আর কত মহান। তার গৃহশিক্ষক শৈশব থেকে তাকে সব শিখিয়ে এসেছেন।

থুথমসের নিদ্রাভঙ্গের অনুষ্ঠান হতশেপসুত কয়েকবার নিজে প্রত্যক্ষ করেছে। এই সব পুণ্য অনুষ্ঠান তার দেখতে খুব ভাল লাগে। মনে হয় শুধু অমন রা নয়, সব দেবতাই সেই সময় ফ্যারাও-এর আশেপাশে উপস্থিত থাকেন। সেই সময় হতশেপসুত নিজেও তাঁদের সান্নিধ্য স্পষ্ট অনুভব করেছে। সে স্পষ্ট অনুভব করেছে আদি দেবতা পটহকে এবং তাঁর পুত্র নেফের-অতমুকে, অনুভব করেছে হোরাস, রা এবং থথকে। তার মনে হয়েছে পাশেই যেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন অনুবিস, শু, হাপি এবং চন্দ্রদেবতা খেনসু। এসব ভেবে সে রোমাঞ্চিত হয়েছে। তার মনে হয়েছে তারই মত পিতার শয্যাত্যাগের দৃশ্য অবলোকন করছেন বিড়ালাকৃতির দেবী বাস্ত্, নুত, নেত, মুত এবং গেব। নুত-এর স্বামী লু এবং দেবী হথোরও কি না এসে পারেন? সে মাঝে মাঝে সঙ্গোপনে গর্ব অনুভব করে যে দেবতাদের এত সব কাহিনী তার চেয়ে বয়সে বড় সৎ ভাই চবরোসও জানে না।

দুই পূজারী যখন পিতাকে নিয়ে দেবালয়ে যান তখন সেও তাঁদের সঙ্গ নিয়েছে কতবার। তার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এই যে তাকে কোন বিষয়ে বাধা দেবার স্পর্ধা কারও নেই। সে তার পিতার সবচেয়ে বেশী স্নেহভাজন। তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্বন্ধে পিতার মনোভাব স্পষ্টভাবে না বুঝলেও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না তার। বিশেষ করে প্রাসাদের অতি পুরাতন বাঁদীরা অনেক সময় অযাচিত ভাবে অত্যন্ত কৌশলে তাকে অনেক কিছু বলে দেয়। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনার ছল করে একবার বলেছিল যে ফ্যারাও তাঁর কন্যাকে যে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন তার কারণ আছে। অন্যজন প্রশ্ন করেছিল—কেন? ছেলে থাকতে মেয়েকে কেন? মেয়ে উত্তরাধিকারিণী হলেও তো আর ফ্যারাও হবে না। এর উত্তর প্রথম জন বলেছিল—তাতে কি হয়েছে? মেয়ে যে আসল রানীর গর্ভের সন্তান। জ্যেষ্ঠ পুত্র তো তা নন। তাঁর মা সাধারণ রানী মাত্র, সম্রাজ্ঞী নন। তবে শোনা যায় ফ্যারাও নাকি তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবার পক্ষপাতী। কনিষ্ঠ পুত্রদের তিনি অত পাত্তা দেন না।

কথাগুলো যে তাকে শুনিয়ে বলাবলি করেছিল ওরা এটা বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। এমন আরও অনেক কিছুই তার গোচরে আনার চেষ্টা করা হয় যা তার পছন্দ না হলেও পৃথিবীতে চিনতে সাহায্য করে। এই অল্পবয়সেই সে বুঝতে শিখেছে পৃথিবীর সবটাই স্বপ্ন মাখানো নয়। প্রতি মুহূর্তেই স্বপ্ন এখানে খান্‌খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে।

পরিচারিকাদের ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা শুনে এক এক সময় মনে হয়, মন বুঝি কলুষিত হয়ে গেল। হয়ত সকালে উঠেছে প্রফুল্ল মন নিয়ে, একটা কবিতার কলি হয়ত সুর হয়ে ফুটে উঠেছিল তার কণ্ঠে, এমন সময় ছোট্ট

একটি কথা তার কর্ণগোচর হল। কোথায় গেল কবিতা আর গান, কোথায় গেল প্রফুল্লতা। মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। অথচ সে জানে দাসদাসীকে এ সম্বন্ধে কিছু বলা অনুচিত। কোন কিছুই শুনতে পায়নি। এইভাবেই থাকতে হয়। কারণ তারা ছিদ্র খোঁজে ফ্যারাও পরিবারের পরিজনদের মধ্যে। ব্যক্তিত্বের সামান্য বিচ্যুতি ঘটলে ওরা পেয়ে বসে। বেশী ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ খোঁজে। তখন অনেক কথা সোজাসুজি এসে বলে। এমন কি কানের কাছে মুখ এগিয়ে এনে ফিসফিস করে বলার স্পর্ধা দেখায়। কঠিন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে কেউ হতশেপসুতকে শিখিয়ে দেয়নি। সে শুধু পিতার ভাবভঙ্গি দেখেছে। পিতাই তার আদর্শ। সে জানে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোটেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নয়। কারও মুখে নিজের সামান্য প্রশংসা শুনলে সে বিগলিত হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতের ফ্যারাও এমন হলে চলবে না। বরং তার সহোদর দুই ভ্রাতা উয়াচমেস আর অমেনমেস অনেক গম্ভীর এবং স্বল্পবাক্। বিশেষ করে উয়াচমেসের তুলনা হয় না। অমেনমেস একটু বেশী ছোট। তাছাড়া সে অন্যরকমের। দেখলে এক এক সময় মনে হয় জগতের সব কিছু জেনে বসে আছে সে। ফ্যারাও হবার প্রতি তার কোনদিন বাসনা জন্মাবে বলে বোধ হয় না। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে কখনো হাসে, কখনো কথা বলে। বয়স এত কম হলেও সে যেন সবার বড়। তাই হতশেপসুতের মনে একান্ত ইচ্ছা উয়াচমেসকে সে বিবাহ করে। খুব ভাল হবে তাতে। এখন থেকেই তাকে সেই দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করে। বয়সে দু-এক বছরের ছোট। এতে দোষও নেই। ফ্যারাও পরিবারের চালু প্রথা। উয়াচমেসকে একদিন হুট্ করে বলে ফেলে কথাটা। উয়াচমেস জোরে হেসে ওঠে। হতশেপসুতও হাসে। তারপর দুই ভাইবোন হাত ধরাধরি করে ছুটে যায় সম্রাজ্ঞী অহমেসের কাছে।

পুত্র কন্যাকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে অহমেস কম বিস্মিত হননি। কারণ তিনি কখনো তাদের আস্কারা দেন না। নিজের সাজসজ্জা আর রূপচর্চা নিয়ে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকেন। তাঁর রূপচর্চার কক্ষে শৈশব থেকেই চোরের মত প্রবেশের অভ্যাস আছে হতশেপসুতের। মায়ের কাছে এজন্য কম গঞ্জনা সইতে হয়নি তাকে? তার অস্পষ্ট ধারণা হয়েছে তখন থেকে এইভাবে নিজের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে যেমন আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায় তেমনি পুরুষরাও সন্তুষ্ট হয়, আকৃষ্ট হয়। সে লক্ষ্য করেছে একটু সেজেগুজে বের হলে প্রাসাদের ক্রীতদাস থেকে সৎ ভাই পর্যন্ত সবাই তার দিকে বারবার আড়চোখে চায়। তবু তার সাজতে অতটা ভাল লাগে না। নিজেকে কেমন যেন বন্দী বলে মনে হয়।

সম্রাজ্ঞী তাদের মুখের দিকে চেয়ে বলেন—কি হয়েছে?

কথাটা বলতে হতশেপসুতের মুখে আটকে যায়। এদিকে উয়াচমেস বলার জন্যে ছটফট করে।

মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে মা আবার প্রশ্ন করেন—বললে না?

উয়াচমেস হেসে বলে ওঠে—ও আমাকে বিয়ে করবে। আমি ফ্যারাও হব।

মায়ের মুখে কথা সরে না। তিনি একবার কন্যা, আর একবার পুত্রের মুখের

দিকে চাইতে থাকেন। শেষে বলেন—এই উদ্ভট কল্পনা এত তাড়াতাড়ি না করাই ভাল। তোমাদের চেয়ে বড় একজন রয়েছে।

হতশেপসুত ঠোঁট উলটে বলে—সে তো আর রাজকন্যার পুত্র নয়। সে কিভাবে ফ্যারাও হবে?

—তোমাকে বিয়ে করলেই হবে।

—বয়ে গেছে ওকে বিয়ে করতে।

—মনে রেখ, ফ্যারাও-এর কথাই শেষ কথা।

মেয়ে হেসে বলে—বাবাকে আমি যা বলব তাতেই রাজী হবেন।

ভ্রূভঙ্গি করে মা বলেন—তাই নাকি? এতটা?

—হ্যাঁ মা। বাবাকে বলব, সকালে ফ্যারাও-এর ঘুম ভাঙানোর অনুষ্ঠানের সময় মাঝে মাঝে তুমি যেমন ফ্যারাও-এর শয্যা থেকে ধড়মড় করে উঠে চলে যাও আমিও তেমনি উয়াচমেসের পাশ থেকে উঠে পালাব। খুব ভাল লাগে সেই সময় তোমাকে দেখতে। সাজগোজ কিছুই থাকে না। শুধু ওই চোখের কোলের কাজলটুকু ছাড়া। তোমার বেশবাস কেমন আলুথালু হয়ে থাকে। অন্য কক্ষে যাবার সময় লুটিয়ে তোমার পেছনে চলে তোমার বসন।

সম্রাজ্ঞী অহমেসের মুখ আগুনের মত রাঙা হয়ে ওঠে। ক্রোধে, না সংকোচে বোঝা যায় না। তিনি কন্যাকে কি বলবেন বুঝে উঠতে পারেন না।

হতশেপসুত এই মুহূর্তে যেকথা বলল, তার মর্মার্থ বোঝার বয়স হয়ত তার হয়েছে, কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমতী হলেও তার দেহে এখনো সেই পরিবর্তন আসেনি যে পরিবর্তনে কথাগুলো বলার সময় স্পষ্ট ধারণা করে বলতে পারে। যা সাদা চোখে দেখেছে তাই বলেছে। অথচ ফ্যারাও-এর সঙ্গে মাসের মধ্যে কয়দিনই বা রাত্রি যাপন করেন তিনি। বড় জোর তিন চার দিন। ফ্যারাওকে জাগ্রত করার সময় ইচ্ছা করেই তিনি অনেক সময় শুয়ে থাকেন ধরা দেবার জন্য। এতে প্রমাণিত হয় উভয়ের মধ্যে অনুরাগের কোন ঘাটতি নেই। নইলে ফ্যারাও-এর নারীর অভাব নেই। দিন রাত বলে কোন কথা নেই। রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে যখনই ইচ্ছা হয় ফ্যারাও তাঁর নিজস্ব হারেমের কোন না কোন কক্ষে এসে প্রবেশ করেন। এতে কোন বাধা নেই। তাছাড়া ফ্যারাওদের যথেচ্ছা বিবাহ করার অধিকার রয়েছে, যদি সেই বিবাহের পাত্রী ফ্যারাও বংশের হয়, তাহলে তো কথাই নেই। কারণ অনেক ফ্যারাও রাজমহিষীর গর্ভজাত হন না। তাঁরা তাঁদের মহিষীর দৌলতে ফ্যারাও পদ অলঙ্কৃত করেন। সেই মহিষীর ধমনীতে ফ্যারাও বংশের নিখাদ শোণিত প্রবাহিত। সেই মহিষীর কোন কারণে সহসা মৃত্যু ঘটলে ফ্যারাও-এর পদ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। তাই নিজেদের পদের নিরাপত্তার জন্য, তাকে নিশ্চয়তা দেবার জন্য রাজবংশের একাধিক কন্যাকে বিবাহ করে রাখেন। সেই কন্যার বয়স এক মাসও হতে পারে আবার আশি বছরও হতে পারে। সম্পর্কে কন্যাও হতে পারে আবার পিতামহীও হতে পারে।

তবে থুথমস এখনো তেমন বিবাহ করেননি। প্রয়োজনও হবে না। কারণ তাঁর কন্যা ছাড়াও রাজমহিষীর গর্ভের দুই পুত্রসন্তান রয়েছে। তাঁর পরে

পুত্রদের কেউ ফ্যারাও হতে পারবে। এজন্য তিনি অহমেসের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞ একথা সম্রাজ্ঞী জানেন।

হতশেপসুতের কথা শুনে তিনি বুঝলেন, যে কটি রাত তিনি ফ্যারাও-এর শয্যায় শুয়েছেন তার মধ্যে কয়েকবার তাঁর কন্যা প্রভাতের রাজকীয় অনুষ্ঠান দর্শনের জন্য উপস্থিত থেকেছে। এখন এমন সময় বলল যে মুখে কোন উত্তর এল না।

হতশেপসুত মায়ের নীরবতা দেখে উৎসাহিত হয়। ভাবে তাঁর অসম্মতি থাকলে নিশ্চয় রাগ করতেন। তাই মাকে বলে—ফ্যারাওকে তাহলে গিয়ে বলিগে?

রানীর অগ্নিবর্ণা টকটকে মুখখানি রক্তশূন্য হয়ে যায়। তিনি কন্যার একটি হাত ধরে কাছে টেনে এনে খুব শান্ত স্বরে বলেন—না না। এখন বলতে হবে না। এসব কথা কি যখন তখন বলতে হয়? আমিই বলব সুযোগমত।

হতশেপসুত মায়ের ভাবভঙ্গি কথাবার্তায় এক অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে অবাক হয়। সে দীর্ঘক্ষণ মায়ের চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। দেখে, শেষ পর্যন্ত মা তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকান। সে বুঝতে পারে তার কাছে মায়ের পরাজয় হল যে কোন কারণেই হোক। সে আর কিছু বলে না। মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভাই-এর হাত ধরে ছুটতে ছুটতে বাইরে চলে যায়।

বিদেশী হিকসোসদের অধীনে বহুদিন থাকার ফলে ফ্যারাওরা বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশের হালহকিকত জানার জন্য মাঝে মাঝে ভ্রমণের প্রয়োজন। এতে প্রজারা ভরসা পায়, আনন্দও পায়। তারা তাদের মানুষ-রূপী দেবতাকে আরও নিকটজন বলে ভাবতে পারে। ফ্যারাও নিজেও জানতে পারেন দেশের মানুষের মনের আস্থা, তাদের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির কথা। এতে দেশে সুশাসন বজায় রাখা যায়। স্বকর্ণ আর স্বচক্ষুই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। ধার করা সহস্র কর্ণ আর চক্ষু দ্বারা সব সময় সঠিকভাবে সব কিছু দেখা বা শোনা যায় না। অনেক ফাঁক থেকে যায়। হিকসোসদের আক্রমণের পূর্বে দেশের এই অবস্থাই হয়েছিল। মসনদে বসে সেই সময়ের মিশরের অধিপতিরা নিজেদের চক্ষুকর্ণ বন্ধ রেখে অন্যের ওপর বড় বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। তারই ফল ভুগতে হয়েছে কয়েক শতাব্দী ধরে।

ফ্যারাও-এর ভ্রমণের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত পথ হল নদীপথ। নীলনদই হল মিশরের মুখ্য রাজপথ। এই পথে প্রমোদ ভ্রমণ থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, পিরামিডের জন্য দূর দূরান্তের পাহাড় থেকে প্রস্তর আনয়ন, সব কিছুই সম্ভব। মিশরের ওপর থেকে নীচের সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত যাওয়া যায় নীলনদের বুকের ওপর দিয়ে। নুবিয়া থেকে মেমফিস ছাড়িয়ে আরও দূরে। নীলনদের তুলনা নেই। তার সম্পর্কে উপমাটিও সার্থক। সত্যই যেন

মৃণালের মাথায় একটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। নুবিয়ার ওখান থেকে শুরু করে দুপাশের পাথুরে খাদের মধ্য দিয়ে একটি সরু বৃত্তের মত প্রবাহিত হয়ে মেমফিস নগরীর ওখান থেকে নরম মাটি পেয়ে ফুলের পাপড়ির মত খুলতে শুরু করে। যেন কয়েকটি দ্বীপের সৃষ্টি করে পদ্ম ফুটল। পদ্মের এই উপমা মিশরের কোন্ কবি প্রথম দিয়েছেন কেউ বলতে পারে না। তবে সার্থক উপমা। তাই পদ্ম বোধহয় দেশের প্রতিটি রমণী এবং যুদ্ধে গমনকারী যোদ্ধাদের কাছে এত প্রিয়। সেই পদ্ম হল নীলপদ্ম।

প্রথম থুথমস জলবিহার খুব পছন্দ করেন। এ বিষয়ে তাঁর বিলাসিতাও রয়েছে। তাই অন্য দেশ থেকে উপযুক্ত কাষ্ঠ এনে নৌযুদ্ধের উপযোগী নৌ-যান নির্মাণের সময় নিজের ভ্রমণের জন্য কয়েকটি বহৎ নৌকো প্রস্তুত করেছেন। তাঁর নৌ-বাহিনীর সুখ্যাতি রয়েছে। শত্রুরাও সেই সংবাদ রাখে। কিন্তু তাঁর নিজস্ব জলযান অন্য ধরনের। আর তাঁর ভ্রমণের সময় জলযানের রক্ষী হয়ে নৌ-বাহিনীর রণতরী এবং সৈন্য তাঁর সঙ্গী হয়।

কন্যা হতশেপসুত নৌ-ভ্রমণে ফ্যারাও-এর সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। তার নতুন স্থান দেখার, সেখানকার অট্টালিকা উদ্যান ইত্যাদি দেখার খুব আগ্রহ। কিন্তু তার আবদার রক্ষা করা সম্ভব হয়নি ফ্যারাও-এর পক্ষে। কারণ নদীবক্ষের ওপর এই চলমান আবাসস্থল রাজপ্রাসাদের মত সুবিশাল নয়। এখানকার কোন কিছুই কন্যার দৃষ্টি এড়াবে না। মেয়েরা অল্পবয়সে কতকগুলো বিষয়ে বেশী পরিপক্ক হয়। তার ওপর তাঁর কন্যা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। ফ্যারাও তিন চারজন সুন্দরী ক্রীতদাসীকে সঙ্গে করে এনেছেন। তারা বহুদিন থেকেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে আসছিল। কয়েকজনের মধ্যে তো হতাশা দেখা দিতে শুরু করেছিল। ক্রীতদাসীদের মধ্যে একটা ধারণা থাকে যে প্রভু কিংবা প্রভুর কোন যুবক পুত্রের দৃষ্টিতে না পড়লে জীবন বৃথা। ফ্যারাও এখনো নিজেকে প্রৌঢ় বলে ভাবেন না। ভাববার অবকাশ হয়নি। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদিও তরুণ, তাকে পরিপূর্ণ যুবক এখনো বলা যায় না। ফ্যারাও এই রমণীদের সঙ্গে করে এনেছেন বলে তারা আনন্দে ডগমগ। জীবন তাদের সার্থক। এদের মনোভাবের কথা ফ্যারাওকে জানিয়েছিল তাঁরই শৈশবের এক পরিচারিকা। এখন সে বৃদ্ধা। তবু ফ্যারাও-এর দাক্ষিণ্যে প্রাসাদের প্রাচীরের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে সে তার জীবনের বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে অন্তঃপুরে আসে। সম্রাজ্ঞীকেও সে শৈশব থেকে দেখে আসছে। তিনিও বৃদ্ধার প্রতি নির্দয় নন। ফ্যারাও-এর সঙ্গে ক্বচিৎ কখনো দেখা হয়ে গেলে সে ফ্যারাওকে টুকটাক খবরাখবর দেয়। এই চার ক্রীতদাসী উদ্যানের এক কোণে প্রাচীরের গায়ে তার কুটিরে অনেকবার গিয়েছে। মনের আক্ষেপের কথা প্রকাশ করেছে। বলেছে, এতবার ফ্যারাও-এর সামনে পড়ে গিয়েও তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারেনি। বলেছে, এ জীবন রেখে লাভ কি? এই যৌবন এর রূপ, এই কোন মূল্য নেই। বৃদ্ধার কল্যাণে এতদিনে তাদের কপাল খুলেছে। তাদের চারজনকে একসঙ্গে মিশরে আনা হয়েছিল একই দেশ থেকে। সিনাই ছাড়িয়ে হাত্তিতি ছাড়িয়ে আরও দূর দেশ

থেকে। তারা জানে যে মিশরীয় নারীদের মত সাজসজ্জা বা সুগন্ধির ব্যবহার তারা না জানলেও দেখতে তারা এদেশের রমণীর চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। তবু ফ্যারাও তাদের রূপের দিকে একবারও ফিরে চাননি। কি করে চাইবেন? হারেমে এসে উপস্থিত হওয়া মাত্র যেভাবে রমণীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায় সেই জটলার মধ্যে তাদের মত অপেক্ষাকৃত নবাগতা ক্রীতদাসীদের স্থান হবে কি করে? নইলে তারা জানে, ফ্যারাও যদি তাদের একান্তে দেখার সুযোগ পেতেন তাহলে তারা অবহেলিত হয়ে থাকত না। তারাও চোখের কোণে কাজল দিতে জানে। তবে মিশরীয় রমণীরা, বিশেষ করে প্রাসাদের ললনারা অনেক কিছু ব্যবহার করে রূপ অনেক বেশী আকর্ষণীয় করে তোলার কৌশল জানে। তারা ওসব কোথায় পাবে? কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করতে পারবে না কেউ যে এদেশের নারী ও পুরুষদের মত কথায় কথায় তাদের চক্ষুপীড়া হয় না। চোখ লাল, চোখে পিচুটি দেখলে গা কেমন করে। এদেশের সবারই কথায় কথায় চোখের অসুখ হয়। যা রোদ্দুর, যা তেজ। ওদের দেশে এসব নেই। এখানে এসে ওদের চোখও মাঝে মাঝে কেমন করে। বুঝতে পারে একই রোগ তাদেরও ধরবে। প্রায় তিন বছর হতে চলল এসেছে এদেশে। তখন বলতে গেলে কিশোরী ছিল। এখন ভরা যৌবন।

ওরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেয় নৌকোর মধ্যে ফ্যারাও যখন যাকে চাইবেন, সে যাবে। এই নিয়ে মন কষাকষি কিংবা অন্যকে জব্দ করা চলবে না।

—রাজী?

—রাজী।

—নেমকহারামী নয়?

—কখনো না।

চারজন হাত মেলায়। একান্তে বসে ফিসফিস করে আলোচনা করে। একজন বলে—ধর যদি আমাদের কারও তেমন সৌভাগ্য হয়?

—কি সৌভাগ্য?

—আহা, কিছু বোঝে না যেন।

আর একজন হেসে বলে—তেমন হলে আর কি হবে? ভয় নেই আমাদের ছেলে কখনো ফ্যারাও হবে না।

—না হোক। ভাল কাজ তো পাবে। ভুলে যাসনে, স্বয়ং ফ্যারাও-এর ছেলে। মেয়ে হলেও লাভ।

সবাই পুলকিত হয়ে ওঠে এক অজানা সম্ভাবনায়। তারা দেখেছে, তাদের মত আরও ক্রীতদাসী যারা এই দেশের দক্ষিণ দিক থেকে এসেছে, যাদের গায়ের রঙ নিকষ কালো হলেও একটা অপূর্ব শ্রী রয়েছে। যাদের অতি কুঞ্চিত কেশদামের সৌন্দর্য অস্বীকার করা যায় না, তারাও ফ্যারাও-এর মন যোগাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে একজন কিছুটা কৃতকার্যও হয়েছে।

ফ্যারাও থুথমসের জলযান মেমফিসের দিকে এগিয়ে চলে। পথে তিনি অবিদসে অবতরণ করলেন। সেখানে রয়েছে ধর্মীয় মন্দির আর দেবদেবীর

মূর্তি। তারপর কয়েকদিন পরে নদীর ধারে বদরি নামে একটি স্থানে নামেন। এখানে রয়েছে বহু পুরাকালের নিদর্শন। এরপর তিনি আসেন এল-অমরনায়। এটি একটি বর্ধিষ্ণু স্থান। এখান থেকে পূর্বের দিকে বেদুইনদের একটা বড় ঘাঁটি রয়েছে। তাই এখানে সৈন্যদের একটি ছাউনি রাখতে হয় তাঁকে। বেদুইনরা ব্যাপকভাবে আক্রমণের ক্ষমতা না রাখলেও তাদের উৎপাতে ধনপ্রাণ এবং সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হয়ে এসেছে চিরকাল।

এরপর ফ্যারাও চলে আসেন পিরামিড অঞ্চলে। দহশুর, সক্কারা, গিজা, সর্বত্রই পিরামিড আর পিরামিড। মেমফিসের অদূর পিরামিডের অনেকগুলি চুনা পাথরে নির্মিত। এই পাথর আনা হয়েছে নদীর পূর্বপারে তুরা পাহাড় থেকে। থুথমন সবই জানেন, সবই দেখেছেন। তবু রাজ্য পরিভ্রমণের সময় এগুলো না দেখলে তো মন ভরে না। যতবার তিনি দেখেন বিস্ময় আর কাটতে চায় না। জোসেরের রাজত্বকালে প্রতিভাবান ইমহোটেপের নির্মিত পিরামিড কতবার দেখেছেন। আবার দহশুরে স্নেফরু এবং তাঁর পুত্র খুফুর রাজত্বকালের দুটো পিরামিডও তিনি দেখেছেন। দহশুরের পিরামিড দুটির তুলনা নেই। সৌন্দর্য অতুলনীয়। শোনা যায় স্নেফরুর পুত্র খুফু স্বৈরাচারী নৃপতি ছিলেন। হয়ত ছিলেন। হয়ত তাঁর সময়ের ওই মনোমুগ্ধকর পিরামিড নির্মাণের সময় অনেক রক্ত, অনেক অশ্রু ঝরেছে হতভাগ্য শ্রমিকদের। হয়ত তিনি ভরা কৃষি মরশুমে কৃষকদের ধরে ধরে এনেছেন নীলনদের সিক্ত মোলায়েম পলি অঞ্চল থেকে রুক্ষ পিরামিডের অঞ্চলে। তবু এই পিরামিড যেন একটি কবিতা। থুথমস ভাবেন, মানুষের আনন্দঘন মুহূর্তের চেয়ে বোধহয় তার বেদনাময় মুহূর্তেই কবিতা অশ্রুর মত স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বের হয়ে আসে। তাই বলে তিনি নিজে কখনো এমন নির্মম হতে পারবেন না। কোন কীর্তি স্থাপনের জন্যও নয়। পিরামিডের যুগকে তাঁর পিতৃ পিতামহ পেছনে ফেলে এসেছেন এটা একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। তবে খুফুর সময়েও যে দেশে দক্ষ প্রশাসন ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ অরাজকতার মধ্যে কখনো কোন মহান শিল্পের সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু সেই যুগ আর এ-যুগ এক নয়। এখন কৃষিকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করতে হবে। এখনকার প্রজারা অনেক সচেতন। ইতিমধ্যে মিশরে কয়েকবার পটপরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। সর্বশেষ পরিবর্তন এনেছেন হিকসোসরা। জোসের, স্নেফরু বা খুফুর সময়ে বহিরাক্রমণের আশংকা ছিল না। মিশর ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এখন নীলনদের পূর্বে এবং পশ্চিমে অনেক শক্তি উদয় হচ্ছে ধীরে ধীরে। কেউ কেউ আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তাই তাঁর পিতৃপুরুষেরা পিরামিডের বিলাস পরিত্যাগ করে ভালই করেছেন। পরিবর্তে পশ্চিমের সুবিস্তীর্ণ পার্বত্য উপত্যকার গাত্র খনন ও খোদাই করে সমাধিস্থল নির্মাণ করে সেখানে ফ্যারাওদের সমাহিত করার সূচনা করেছেন। সমস্ত উপত্যকাটি ভবিষ্যতের মৃত ফ্যারাওদের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। পশ্চিমের দিকেই তো স্বর্গদ্বার। সেই দিক দিয়েই আবার সূর্যদেবতা দেবদেবী সমভিব্যাহারে নৌ-চালিত হয়ে অন্ধকারের

মধ্যে প্রবেশ করেন। এখন থেকেই তাই দেশবাসীরা ওই স্থানটিকে বলে ফ্যারাওদের উপত্যকা।

থুথমস রাজ্য পরিদর্শনের সময় শুধু পুরাকীর্তি দেখেই ক্ষান্ত হন না। নীলনদের উভয় পার্শ্বের কৃষিক্ষেত্রও তদারক করেন। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন। কয়েকটি অধিকতর কালোমাটি অঞ্চলে কার্পাসের চাষ দেখেন। কৃষকেরা অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয় ফ্যারাওকে তাদের মধ্যে দেখে। তাদের মনে হয় গরীবের বন্ধু হোরাস যেন তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন। তারা থুথমসের পাশে অপর একজন বৃদ্ধকে দেখে বুঝতে পারেন, তিনি নিশ্চয় কোন অমাত্য।

কৃষির কথা আলোচনার পর থুথমস একজনকে প্রশ্ন করেন—তোমরা অবসর সময়ে কি কর?

লোকটি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলে—বন্যার সময় আমাদের কাজ থাকে না।

—আমি সেকথা জানি। সেই সময় তোমাদের খুব কষ্টে দিন চলে। চেষ্টা করছি সেই সময় তোমাদের অন্য কোন কাজ দিতে। কিন্তু আমি সেকথা জানতে চাইছি না। এখন তো তোমাদের কাজ আছে। এর মধ্যে অবসরও আছে। দিনের শেষে স্ত্রীপুত্র পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ কর নিশ্চয়।

এবারে কৃষকটির মুখে হাসি ফোটে। বলে—হ্যাঁ প্রভু। অবসর সময়ে আমাদের খুব আনন্দে কাটে। আমরা গানের জলসা বসাই।

—গানের জলসা?

—হ্যাঁ প্রভু। গলা ছেড়ে গান গায় অনেকে। অনেক সময় সবাই মিলে একসঙ্গে গাই।

—বাঃ খুব ভাল লাগল একথা শুনে। আর কি কর?

—কুস্তি লড়ি। ছেলে বুড়ো সবাই।

দুটি অল্পবয়স্ক ছেলে অদূরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ফ্যারাও-এর দিকে চেয়েছিল। তিনি তাদের কাছে ডাকেন।

তারা ইতস্তত করে। বড়রা তখন বলে—ইনি সাক্ষাৎ দেবতা। এঁর কাছে যেতে হয়।

ওরা তখন গুটিগুটি পায়ে এসে দাঁড়ায়।

ফ্যারাও প্রশ্ন করেন—তোমরা কুস্তি লড়তে জান?

তারা হেসে ঘাড় হেলায়।

—তোমরা দুজনা লড়। আমি দেখব।

ছেলে দুটি সঙ্গে সঙ্গে ফ্যারাও-এর সামনে মল্লযুদ্ধ শুরু করে দেয়। এতে ওরা খুবই আনন্দ পায়। ধনীদের মত ওদের শখ মেটাবার অন্য খেলা নেই। তাই কুস্তি ওদের প্রিয়।

ওরা উভয়ে হাস্বিতম্বি শুরু করে দেয়। কুস্তির অঙ্গ হিসাবে একে অপরকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য বড় বড় কথা বলতে শুরু করে দেয়। ফ্যারাও-এর মুখে হাসি ফোটে তাদের রকমসকম দেখে। এই অভিজ্ঞতা তাঁর প্রথম।

কিছুক্ষণ পরে একজন অপরজনের পায়ের নাগাল পেয়ে সেটিকে জাপ্‌টে ধরে দাঁত চেপে বলে ওঠে—একটু পরেই যে তোর নাক মাটি ছোঁবে ?

অপরজন উল্টো প্যাঁচ দিয়ে বলে ওঠে—হুঃ। যথেষ্ট হয়েছে। লম্বা চওড়া কথা না বলে নিজেকে সামাল দে।

অন্যজন তখন আর এক কসরৎ দেখিয়ে নিজেকে একটু মুক্ত করে নিয়ে বলে —এবার ? এবার দেখ কে হারে।

ফ্যারাও খুব খুশী হয়ে এগিয়ে গিয়ে ওদের থামিয়ে দিয়ে বলেন—চমৎকার ! দুজনাই সমান সমান।

ওরা হাঁপাতে হাঁপাতে হাসতে থাকে।

ফ্যারাও কৃষকদের সুখ-দুঃখের আরও কাহিনী শুনলেন ধৈর্য ধরে। তিনি জানেন ব্যবসার গুরুত্ব আছে ঠিকই কিন্তু দেশকে বাঁচিয়ে রাখে এরাই।

ফ্যারাও তাঁর দলবল নিয়ে যখন জলযান অভিমুখে রওনা হলেন তখন সূর্য পশ্চিম গগনে অস্তায়মান।

রাজধানীতে থাকার সময় অধিকাংশ মিশরীয়দের মত থুথমসও একাহারী। অর্থাৎ ভারী খাবার দিনের শেষে একবারই খেয়ে থাকেন। সকাল থেকে তাই বলে নিরম্বু উপবাস করেন না কখনো। তিনি নানা রকমের ফল খান। সেই সব ফলের মধ্যে রয়েছে তরমুজ, খেজুর, সেখেপ্ট, ডুমুর ইত্যাদি। তাছাড়া সুরা তো রয়েছেই ! তিনি আঙুর দিয়ে তৈরি সুরা ছাড়াও যব আর জল দিয়ে তৈরী এক ধরনের কালো মদও খুব পছন্দ করেন। সুরা না হলে দিনটা এবং সেই সঙ্গে জীবনটা বিস্বাদ বলে মনে হয়।

নৌকায় পা দিয়েই তাই তিনি সুরার হুকুম দেন। আর ডেকে পাঠান ক্রীতদাসীদের মধ্যে বয়সে এবং উচ্চতায় সবচেয়ে ছোট মেয়েটিকে, যার নাম তেতা।

ফ্যারাও-এর সঙ্গে সঙ্গে থাকে বলে ওরা এই ভ্রমণের সময় আর ক্রীতদাসীর পর্যায়ে নেই। একি সোজা কথা ? যে ফ্যারাও-এর সম্মুখে আসা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের, এদের চারজনের মধ্যে কেউ না কেউ তাঁর সান্নিধ্যে শুধু নয় কখনো দিনে কখনো রাতে তাদের রূপ দিয়ে দেহ দিয়ে হাস্যলাস্য দিয়ে ফ্যারাওকে পরিতৃপ্ত করছে, তাঁর অবসাদ বিমোচন করছে। এদের আর সাধারণ ক্রীতদাসীর মত ভাবতে পারা যায় না। এদের সঙ্গে সাধারণ আর পাঁচটা ক্রীতদাসীর মত অবহেলাভরে কথা বলা যায় না। এদের দেহের রেখা আর ভঙ্গিমার দিকে বেহায়ার মত তাকানো যায় না। নদীর পারে এরা যখন ঘুরে বেড়ায় তখন এদের সঙ্গে রক্ষী থাকে। নৌকাতেও এদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা।

একজন এদের কাছে গিয়ে খবর দেয় যে ফ্যারাও তেতাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তেতা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তার মুখে হাসি ঝলমল করে ওঠে। সে নিজের বেশভূষা একবার দেখে নিয়ে সুগন্ধি আতর ঢেলে নেয় এখানে ওখানে। সে জানে ফ্যারাও এর কাছে গিয়ে প্রথমেই তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে সুরার পাত্র তুলে ধরতে

হবে। ফ্যারাও-এর চোখ দুটো একটু একটু করে রক্তিম হয়ে উঠবে। তাঁর সেই সদাসতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ধীরে ধীরে মোলায়েম হবে। সে তখন তাঁর শির থেকে শ্বেত ও রক্তবর্ণের মিলিত শিরোভূষণ খুলে রাখবে। ফ্যারাও-এর কেশহীন মস্তক প্রকাশিত হবে। সাধারণ প্রজারা এই মস্তক দেখতে পায় না। তাদের অতটা সৌভাগ্য হবে না কখনো। তেতা জানে এরপর ফ্যারাও তাকে একথা সেকথা বলবেন। অত কথা সে বুঝতে পারে না। ফ্যারাও কত জ্ঞানী, দেবতা তিনি। তাঁর জ্ঞানের কি সীমা পরিসীমা আছে? তবু তাঁকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সে কখনো হাসবে, কখনো মাথা ঝাঁকাবে। তারপর একসময় ফ্যারাও অনুগ্রহ করে তাকে নিজের কোলে তুলে নেবেন। রাজধানী থেকে নৌ-যাত্রার দ্বিতীয় রাতে প্রথম যেদিন তিনি ওভাবে তাকে তুলে নিয়েছিলেন সেদিন তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠেছিল।

ফ্যারাও বলেছিলেন—কাঁপছ কেন?

—আনন্দে, ভয়ে—জানি না।

ফ্যারাও তাকে অভয় দিয়েছিলেন। এখন আর তার ভয় হয় না। কিন্তু আনন্দ একই রকম অনুভব করে। দেহের মধ্যে একটা শিহরন, একটা অনুভূতি জাগে।

তেতা থুথমসের কক্ষে চলে গেলে বাকী তিনজনের একজন বলে ওঠে—এটা কেমন হল?

আর একজন প্রশ্ন করে—কোনটা?

—তেতা কালও গিয়েছিল। সাতদিনের মধ্যে তিনদিন সে গেল। আমরা তবে আছি কেন?

অন্য একজন বিমর্ষ কণ্ঠে বলে—আমরা কি করতে পারি? আমাদের তো হাত নেই। ফ্যারাও-এর অভিরুচি।

একজন ফিসফিস করে বলে—ঠেকানো যায় না?

—কিভাবে?

সে হিংস্র কণ্ঠে বলে—রাতের অন্ধকারে তেতাকে জলে ফেলে দিয়ে?

—পাগল হয়েছিস? মরতে চাস? তুই কি পুরুষ?

—না মেয়ে। তাই ও যখন ঘুমোবে তখন গলা টিপে মারব। তারপর রাতের অন্ধকারে জলে ফেলে দেব।

—না না, আমি এর মধ্যে নেই। যেটুকু অনুগ্রহ ফ্যারাও করেছেন আমাকে তাতেই আমি কৃতার্থ।

কিন্তু হিংসায় উন্মত্ত আতেস নামে মেয়েটির চোখের আগুন নিভতে চায় না। সে বলে—আমি একটা কিছু করবই। তোরা না বলিস, আমি তোদের মধ্যে সবচেয়ে রূপসী।

—এখনো বলি সেকথা। কিন্তু ফ্যারাও তেতাকে অন্য চোখে দেখেন। তাঁর দৃষ্টিতে হয়ত তেতা অপ্সরী।

—আমি প্রবাসী হওয়া সত্ত্বেও?

—তিনি পুরুষ। পুরুষেরা কিভাবে রূপের যাচাই করে মেয়ে হয়ে আমরা তার কি বুঝব? তাছাড়া রূপই তো শেষ কথা নয়।

—আর কি আছে ওর?

—তোর মধ্যে এত রাগ, নিশ্চয় ফ্যারাও বুঝতে পারেন। তিনি দেবতা। সবার মনের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন। তেতাকে দেখিস তো। কত মিষ্টি সে। কথাতেও মধু ঝরে। ফ্যারাও তাতেই মুগ্ধ বোধ হয়। তাছাড়া—

—তাছাড়া?

—না, সেকথা থাক।

—না, বলতে হবে। সব শুনতে চাই আমি।

—তাছাড়া, মনে হয় আসল বিষয়ে সে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। ও জিনিস শেখার নয়—ভেতরের জিনিস। ও বিদ্যায় দেহের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় লাগে, রূপ তো লাগেই। ও আমাদের হারিয়ে দিয়েছে সব দিক দিয়ে। জন্মের দিন থেকেই ও আমাদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

আর একজন বলে—দেহটাই প্রধান বলে আমার মনে হয়। আতেস যে এত সুন্দরী, কিন্তু সে ফ্যারাও-এর চেয়ে একটু বেশ লম্বা। হয়ত মনে মনে ফ্যারাও অস্বস্তি অনুভব করেন। আমরা দুজনা প্রায় তাঁর সমান সমান। কিন্তু তেতা দীর্ঘাঙ্গী নয়। সে ক্ষুদ্রকায়। ফ্যারাও নিজেও ছোটখাটো। তাই ওকে মনে ধরেছে।

এতক্ষণে সবার যেন কথাটা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়।

তবু আর দুদিন পরে দেখা গেল মিশরের সেই বিখ্যাত চোখের অসুখে আক্রান্ত হয়েছে তেতা। চোখ দুটো করকর করতে থাকে। লাল হয়ে ওঠে। আরও বেশী লাল হয়ে ওঠে তার অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জনের জন্য। মনে হতে থাকে তার স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হল সে। তাকে আর কখনো ডাকবেন না ফ্যারাও। রোগগ্রস্ত নোংরা নারীর স্থান নেই তাঁর কাছে। সত্যই স্বর্গে আরোহণ করেছিল সে এই কদিনে। পুরুষের সান্নিধ্য কাকে বলে সে জানত না। তাও আবার ফ্যারাও-এর মত পুরুষ। ভাবতেই কান্না পায় তার। এবার আতেস কিংবা অন্য কেউ ফ্যারাও-এর আদর ভোগ করবে। তার কোলে বসবে, তার বুকের মধ্যে মিশে যাবে। ভাবতে ভাবতে পাগলের মত হয়ে ওঠে তেতা। একে তো চোখের যন্ত্রণা তার ওপর এই অপরিসীম মানসিক কষ্ট তাকে নীলনদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্ররোচিত করে। দুদিন আগেই সে একা ফ্যারাও-এর সঙ্গে গিয়েছিল সক্কারার পিরামিড দেখতে। থাক-কাটা ওই পিরামিড ধাপে ধাপে যেন দূর আকাশে গিয়ে মিশেছে। ফ্যারাওকে বড় আপন বলে মনে হয়েছিল ওই ধূ ধূ প্রান্তরে। তাঁর বুকে মাথা রেখে ধৃষ্টতা প্রকাশ করে বলেছিল—এই পিরামিড দেখে মনে হয় যেন সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে উঠে যাওয়া যায়।

তার এই কথা শুনে ফ্যারাও-এর এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার কথা সে ভুলতে পারে না। ফ্যারাও তাকে চেপে ধরে বলেছিলেন—তুমি মিশরবাসী না হয়েও অতি বুদ্ধিমতী। নিশ্চয় তুমি মিশরকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে চাও। তাই না?

সে ঘাড় হেলিয়ে সায় দিয়েছিল। তখন তার মনের যা অবস্থা তাতে সে অনুভব করেছিল পৃথিবীতে মিশরের চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান আর নেই। এই দেশই তার দেশ। নিজের দেশ কবে ছেড়ে এসেছে। অনেক কিছু ভুলে গিয়েছে সেই দেশের। তবে মাকে মনে আছে। আর মনে আছে ছোট ভাইকে। তাদের স্মৃতিও এখন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। মুখও স্পষ্ট ভেসে ওঠে না তেমন। তবে মায়ের জোড়া-ভ্রু আর উন্নত নাসিকা আর ভাই-এর গলার কাছে লাল জড়ুলের চিহ্নের কথা ভুলে যায়নি সে। এই স্মৃতিটুকু আর কতদিন টিকে থাকবে জানে না সে। ফ্যারাও তাকে এভাবে অনুগ্রহ করে গেলে বেশীদিন থাকবে না একথা সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিল থাক-কাটা পিরামিডের পাশে দাঁড়িয়ে।

ফ্যারাও তাকে বলেছিলেন—মনে হয়, তুমি কোন এক সময়ে এদেশের মেয়ে ছিলে। নইলে আসল সত্যটা অত সহজে বললে কি করে? তুমি কি করে বুঝলে, ধাপে ধাপে যাতে মিশরের সেই অধিপতি স্বর্গের দ্বারে পৌঁছতে পারেন সেই জন্যই পৃথিবীর বুকে এই বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল। তুমি অনন্যা। প্রাসাদে ফিরেও তোমাকে ভুলব না।

কথাটা মনে হতেই তেতা উদ্‌ভ্রান্তের মত উঠে দাঁড়ায়। এখনি সে জলে ঝাঁপ দেবে।

আতেস তার হাবভাব দেখে আনন্দ-সাগরে ভাসছিল। তাকে উঠতে দেখেও সে চুপ করে বসে থাকে। ভাবে, মরুক হতচ্ছাড়ী। কিন্তু অন্য দুজনা হাত চেপে ধরে তার।

সেই সময়ে ফ্যারাও-এর ব্যক্তিগত হকিমকে নিয়ে আসে এক বান্দা। তেতার চোখ পরীক্ষার জন্য ফ্যারাও তাকে পাঠিয়েছেন।

আতেসের বুক ভেঙে যায়।

হাকিম নিরাময়ের সব রকম দাওয়াই দিয়ে চলে যায়। তেতার কান্না থামে।

পরপর সাতদিন তেতার ডাক পড়ল না। প্রথম দিনেই আতেসকে ডেকে পাঠালেন ফ্যারাও।

আতেস দাঁতে দাঁত চেপে বলে গেল—দেখব এবার, ওকে ফ্যারাও আর ডাকেন কিনা।

যাবার আগে সে নিজেকে সুসজ্জিত করে তোলে। সত্যই তার রূপ রয়েছে বটে। যেন ফেটে পড়ে। ফ্যারাও-এর রানী বা তাঁর কন্যার রূপের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। কারণ সম্রাজ্ঞীর এখন বয়স হয়েছে। তবে কন্যা হতশেপসুত অসাধারণ। কিন্তু সে এখনো সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়নি। তাই আতেস অদ্বিতীয়া। এক পলক দেখলেই বোঝা যায়।

কিন্তু সেই একদিনেই আতেসের সুযোগ শেষ হয়ে গেল। এর পরের পাঁচ দিন পালা করে সুযোগ পেল বাকী দুইজন। এবারে আতেসের পাগল হবার পালা। রাজধানীর ঘাটে যখন ফ্যারাও-এর জলযান ভিড়ল, তখন সত্যই আতেসকে আপন মনে বিড়বিড় করে কথা বলতে দেখা গেল। একবারও ভাবল না, অন্তঃপুরের হাজার রমণীর মধ্যে তেতাও হারিয়ে যাবে এবারে।

মুতনেফার্ত সাক্ষাৎ রাজকন্যা না হলেও তাঁর গর্ভের সন্তান স্বয়ং ফ্যারাও-এর ঔরসজাত। সুতরাং হতশেপসুত বা তার সহোদর দুই ভাই উয়াচমেস বা অমেনমেসের ধমনীর রক্তের মত তার শোণিতপ্রবাহের কৌলিন্য ততটা না থাকলেও সে জ্যেষ্ঠ পুত্র তো বটেই। একজন রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ হলেই তার ফ্যারাও-এর পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে অন্য দুই রাজপুত্র যদি কোন রাজকন্যাকে বিবাহ করে তাহলে তাদের অধিকার সবার আগে।

মুতনেফার্তের পুত্রের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত আছেন। অন্য দুই রাজপুত্রের জন্য যেমন ধনী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা রয়েছেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্যও তেমনি একজন রয়েছেন। নাম তাঁর হেকারনেহেহ্। অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি তিনি। অন্যান্য রাজপুত্রের গৃহশিক্ষকের মত তিনিও রাজসভা আলোকিত করেন। সুতরাং জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সমদৃষ্টিতেই দেখেন ফ্যারাও। তবে হতশেপসুত যাঁর কাছে এখন পড়াশোনা করে তিনি এখন অতি বৃদ্ধ। আগে যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকলেও এখন নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন রাজনীতি আর প্রশাসন থেকে। শুধু রাজকুমারীর পড়াশোনা দেখিয়ে দিয়েই তিনি তৃপ্ত। বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে পড়িয়ে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পান। হতশেপসুত তার গৃহশিক্ষককে শ্রদ্ধা করে। তবে জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের শিক্ষক হেকারনেহেহ্র সঙ্গে পরিচিত হতে সচেষ্ট হয় সে। কারণ তিনি নাকি শ্রেষ্ঠ প্রশাসকদের মধ্যে অন্যতম। প্রধান অমাত্য হবার যোগ্য। রাজ্যের সমস্ত সংবাদ তাঁর নখদর্পণে। তাছাড়া জ্ঞানের পরিসীমা নেই তাঁর। ইচ্ছা করলে হতশেপসুত ফ্যারাওকে বলে হেকারনেহেহ্কে তার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধের কাছে সে ভালই শিখছে। বহুবছর পূর্বের অনেক ইতিহাস গোটানো প্যাপাইরাস খুলে খুলে বৃদ্ধ অতি যত্নের সঙ্গে তাকে পড়ান। হেকারনেহেহ্র এত সময় নেই। সদা-ব্যস্ত মানুষ তিনি। অন্য অনেক কাজ আছে তাঁর।

বৃদ্ধের কাছেই সে জেনেছে, একসময় গৃহশিক্ষকদের কাছে রাজপুত্ররা ছাড়াও বড় বড় কর্মচারীদের সন্তানরাও একই সঙ্গে পড়াশোনা করত। তখন রাজপুত্রেরা শিশুকাল থেকে সাধারণ ঘরের ছেলেদের মতো উলঙ্গ অবস্থায় খেলা করত। খেলার সাথীও ছিল অনেক। আভিজাত্যের মোড়কে তাদের দেহ আর মনকে ঢেকে দেওয়া হত না। তারপর ধীরে ধীরে তাদের একটু সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। শত হলেও তারা ফ্যারাও বংশের। তবে অমাত্য এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ভূম্যধিকারীদের সন্তানদের রাজপরিবারের সন্তানদের সঙ্গে একটু আধটু মেলামেশার সুযোগ এখনো রয়েছে।

শিক্ষার মর্যাদা যে কতখানি গৃহশিক্ষক হতশেপসুতকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন—পৃথিবীতে এমন কোন পেশা নেই, যা কারও বা কারও দ্বারা পরিচালিত না হয়েছে। কিন্তু একমাত্র বিদ্বান ব্যক্তিই নিজেই নিজেকে পরিচালিত

করে। বিদ্যার দৌলতে তার খাওয়া পরার অভাব হয় না। তুমি তো নিজে দেখছ। যারা ভালভাবে লেখা শিখেছে, সুন্দর হস্তাক্ষর যাদের, তারাই রাজ্যকে চালনা করতে সহায়তা করে। কিন্তু কিতাব যাদের ভাল লাগে না ভাগ্যদেবী তাদের পরিত্যাগ করেন। তবে তুমি রাজকুমারী। তোমার কথা আলাদা। তবু এসব তোমাকে জানতে হবে। তোমার তীব্র আকাঙ্ক্ষাও রয়েছে সব কিছু জানার।

—হ্যাঁ, আমি জানতে চাই। অনেক কিছু জানতে চাই।

—যাদের বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, বিদ্যার দেবতা থথ-এর কাছে তারা কৃতজ্ঞ থাকে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, হে থথ! আমার পাশে এসে আমাকে পরিচালিত করুন। যে বিদ্যার অধিপতি আপনি, সেই বিদ্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি আপনার দাসানুদাস।

হতশেপসুত শুধু এই প্রার্থনা নয়, অন্য প্রার্থনার কথাও শুনেছে। সে তাই প্রশ্ন করে—শুধু ছেলেদের পড়ায় উৎসাহ দেওয়া হয় কেন? মেয়েরাও তো পড়তে পারে।

—ছেলেদের ওপর সংসারের ভার পড়ে। লেখাপড়া আর অঙ্ক না শিখলে তাদের চলবে কি করে? মেয়েদের অতটা বোঝা বইতে হয় না।

হতশেপসুত জানে, ছেলেদের বয়স চার বছর হতে না হতেই তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় আবাসিক বিদ্যালয়ে। ফ্যারাও-এর ভূমি বিভাগ, কর বিভাগ, যুদ্ধ বিভাগ, নৌ বিভাগ ইত্যাদি যত রকমের বিভাগ রয়েছে প্রতিটি বিভাগে পড়ার জন্য নিজস্ব বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। নিজের পুত্রকে যে যেই বিভাগে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায় তাদের পিতা সেই বিভাগে পুত্রকে পাঠিয়ে দেয়। তবে ভবিষ্যতে ইচ্ছা করলে কিংবা প্রয়োজন হলে বিভাগ পরিবর্তন করা হয়। আবাসস্থলে ছেলেদের খাবার ব্যবস্থা নেই। প্রতিদিন প্রভাতে প্রতিটি ছাত্রের মায়েদের নিজ নিজ গৃহ থেকে তাদের খাদ্য ও পানীয় বয়ে নিয়ে যেতে হয়। প্রভাতেই নিয়ে যেতে হয়। কারণ পরে সূর্যের উত্তাপ অসহ্য হয়ে ওঠে। বেশীর ভাগ ছাত্রই মন দিয়ে পড়াশোনা করে। কারণ তারা জানে, এখানে এসে লেখা-পড়া এবং অঙ্ক না শিখলে তারা কখনো ফ্যারাও-এর নকল-নবিস বা করণিক হতে পারবে না। তবু তাদের বিদ্যালয়ে অনেক সময় শাস্তি পেতে হয়।

হতশেপসুত গৃহশিক্ষককে বলে—আমি একদিন ওদের দেখতে যাব।

—কাদের?

—বিদ্যালয়ে যারা লেখাপড়া করে।

—হঠাৎ?

—এমনি ইচ্ছে করছে। ওরা কিভাবে শেখে দেখব।

গৃহশিক্ষক বুঝতে পারেন, তাঁকেই নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে করে। কারণ রাজকুমারী ফ্যারাও-এর প্রিয় এবং ফ্যারাও তাঁকে একান্তে বলেছেন যে তাঁর ইচ্ছা কন্যাকে তিনি সহ-শাসকরূপে নিযুক্ত করবেন একটু বড় হলেই, সে যাতে প্রশাসনের কাজ পরিচালনা করার শিক্ষা পায়।

সুতরাং তিনি বিনা দ্বিধায় বলেন—তোমার যখন এতই কৌতূহল, তাহলে এখনি চল।

—এখন ?

—হ্যাঁ, বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে এখন। সূর্য সবে উঠছে। ছাত্রদের পড়াশোনা দেখতে পাবে। এরপর তাপ বাড়বে।

—আমি আজকের কথা বলিনি।

—না, ফেলে রাখা উচিত নয় কোন কিছু। তুমি হয়ত জান না কতটা শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হয় ওই সব ছোট বড় ছেলেদের। ঘুম থেকে তাদের উঠতে দেরি হলে শিক্ষকরা নিজে এসে তাদের ডেকে তুলে দিয়ে বলেন—"তোমরা পোশাক পরে নাও। তোমার কিতাব আগেই বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি।" কোনরকম সময়ের অপব্যয় নয়।

—বেশ চলুন।

থীবস এবং মিশরের বহু স্থানের পথঘাট হতশেপসুতের চেনা। তবু প্রাসাদের বাইরে বের হলেই একটা মুক্তির স্বাদ অনুভব করে সে। পথের যেখানে ধনী ব্যক্তিদের অট্টালিকা রয়েছে, সেখানে সযত্নে পালিত বৃক্ষ দেখা যায়। ওই বৃক্ষ ফল দেয়, ছায়া দেয়। সবাই মনে মনে একই ইচ্ছা পোষণ করে। মৃত্যুর পরে এসে ওখানে একটু বসা এবং ফল ভক্ষণ করা।

কিন্তু নগরী এবং নগরীর বহির্ভাগের সব গৃহই ধনীদের নয়। বরং বলা যেতে পারে ধনীর সংখ্যা নিতান্ত কম। বাকী সবাই সাধারণ মানুষ। তাদের ছোট ছোট গৃহ রয়েছে। সেগুলি আদৌ দর্শনীয় নয়। সেগুলির আশেপাশে বৃক্ষের ছায়া নেই। সেই সব মানুষেরা ছায়ার প্রত্যাশী হলেও ছায়া সৃষ্টি করার সামর্থ্য বা সময় নেই। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেই দিন ফুরিয়ে যায়। তাদের গৃহের আশেপাশে কখনো-সখনো হয়ত প্রকৃতিদত্ত কিছু খেজুর বা ডুমুর গাছের সাক্ষাৎ মেলে। কিংবা কিছু কাঁটাগাছ। নীলনদের পলিমাটি হল তাদের মায়ের মত। আর সূর্যতপ্ত বালুকারাশি হল দারিদ্র্য-পীড়িত সংসারভারে জর্জরিত জনকের মত। নীলনদের দেবতা হাপি তাদের মরণ-বাঁচনের কর্তা। তাঁর হাতের পুতুল তারা।

তবু প্রাসাদের বাইরে বের হলেই হতশেপসুত স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। তার মনে হয় এঁকেবেঁকে যে পথ দূরদূরান্তে চলে গিয়েছে সেই পথের প্রান্ত-দেশে এমন কোন স্থান নিশ্চয় রয়েছে যেখানে মিশরের কোন না কোন দেবতা বা দেবীর দর্শন মিলে যাবে। সেখানে আদিকালের নরপতিগণের দেখাও মিলে যেতে পারে। ওই পশ্চিমেই তাঁরা থাকেন। ওখানে আর মৃত্যু নেই। দুঃখ-যন্ত্রণা কিছু নেই।

প্রাসাদ ছেড়ে আসার আগে রাজকন্যা কোন মনুষ্য-বাহিত আসন কিংবা অশ্বচালিত যানের ব্যবস্থা করতে হুকুম না দেওয়ায় বৃদ্ধ বিস্মিত হয়েছিলেন।

—হেঁটে যাবে ?

—হ্যাঁ। আপনার কি কষ্ট হবে ?

—না। আমাকে ততটা শক্তিহীন ভেব না। আমি হাঁটতেই ভালবাসি। প্রতিদিন অনেকখানি চলাফেরা করি। তোমার জন্য বলেছিলাম!

—আমিও হাঁটতে ভালবাসি।

—তবু দুজনার হাঁটার মধ্যে অনেক তফাৎ।

—কেন?

—আমি বৃদ্ধ। আমার মত অনেক বৃদ্ধই পথ চলে। কিন্তু তুমি রাজকুমারী। বয়স আর একটু বেশী হলে দেখতে রাস্তার চলাফেরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেত।

—রাজকুমারী বলে?

—হ্যাঁ, তা তো বটেই। কিন্তু শুধু তাই নয়। আজও দেখতে পাবে পথিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে। কিন্তু তাদের কাজকর্মের গতি শ্লথ হলেও নিশ্চল হবে না।

—কেন?

বৃদ্ধ হেসে বলেন—আরশিতে নিশ্চয় নিজের মুখ দেখ। প্রাসাদে অনেক উন্নত ধরনের তামা আর দস্তা ঘষে তৈরী আরশি আছে দেখতে পাই। দু-একটা তো বেশ দর্শনীয়। তবু তুমি এখনো বুঝতে পার না? জানি, বোঝবার বয়স হয়নি। তুমি দুতিন বছরের মধ্যে অসামান্যা রূপসী হয়ে উঠবে। তখন ফ্যারাও নিজেই তোমাক এভাবে পথ চলতে দেবেন না।

হতশেপসুত মনে মনে হাসে। বৃদ্ধ যা বললেন, সেটা তার অজানা নয়। প্রাসাদে অনেকের মুখে অনেক ভাবে শুনেছে। সে বলে —আমি রূপসী হতে ততটা চাই না, যতটা চাই অন্য কিছু হতে।

বিস্মিত বৃদ্ধ বলেন—মেয়ে হয়ে জন্মে রূপসী হতে চাও না?

—না।

—তবে কি হতে চাও?

—এখন বলব না। পরেও বলব না। আগে সেটি হই, তখন দেখতে পাবেন।

বৃদ্ধ কৃত্রিম হতাশার সুরে বলেন—তখন কি আর আমি বেঁচে থাকব?

—থাকবেন। না থাকলেই বা কি? আমি আপনার অনন্তকালের বিশ্রাম কক্ষের সামনে গিয়ে বলে আসব।

—আমি ফ্যারাও নই। আগে তাঁদের ছিল পিরামিড। ছিল মস্তব। এখন তো ফ্যারাওদের উপত্যকা রয়েছে। কিন্তু আমার তেমন কিছু নেই। একটা হয়ত হবে। কিন্তু কতদিন ওখানে থাকার মত মজবুত হবে বলতে পারি না।

—আমি যা বলব, কাউকে বলবেন না?

—না। তুমি আমার ছাত্রী।

—আমি ফ্যারাও হব।

গৃহশিক্ষক একথা অনুমান করেছিলেন। তবু তিনি বিস্ময়ের ভান করে বলেন—খুব ভাল কথা। আমি সমস্ত দেবতার কাছে প্রার্থনা করব। যদি বুঝতাম আমার পরমায়ু ততটা দীর্ঘ হবে তাহলে কী আনন্দই হত।

—কেন হবে না ?

—সেটা অসম্ভব। তাই তোমাকে আমি এই জীবনে পরিপূর্ণ ফ্যারাও রূপ দেখতে চাই না।

হতশেপসুত বিরূপ কণ্ঠে বলে—কেন ? আমি মেয়ে বলে ?

—না। তোমার পরিপূর্ণ ফ্যারাও হবার অর্থ হল পৃথিবী থেকে তোমার পিতার বিদায়। তাঁকে আমি তাঁর শৈশব থেকে দেখে আসছি। তাঁর প্রতি আমার আনুগত্য রয়েছে যেমন, তেমনি রয়েছে স্নেহ। তাই—

হতশেপসুত চুপ করে যায়। পরে আস্তে আস্তে বলে—কিন্তু তার আগে ফ্যারাও তো আমাকে তাঁর সহ-শাসক করতে পারেন। তেমন যদি হয় ?

বৃদ্ধ রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে হস্তের সিংহমুখী যষ্টি আকাশের দিকে উত্তোলন করে চেঁচিয়ে ওঠেন—তাহলে তো দারুণ হবে। আমি সর্বপ্রথম গিয়ে তোমাকে অভিবাদন জানাব। আনুগত্য জানিয়ে আসব।

হতশেপসুত দেখে রাস্তাটি জনশূন্য। কেউ বৃদ্ধের চিৎকার শুনতে পায় না। সে স্বস্তি পায়।

ওরা একটি বিদ্যালয়ের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়। বাইরে থেকে শিক্ষকের কণ্ঠস্বর ও ছাত্রদের টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছিল।

বৃদ্ধ বলেন—কাছাকাছির মধ্যে এটি বেশ বড়। চল ভেতরে ঢোকা যাক।

বৃদ্ধকে দেখে শিক্ষক চিনতে পারে। না চেনার কারণ নেই। আসন ছেড়ে এগিয়ে এসে হতশেপসুতকে দেখে তার খুবই পরিচিত বলে মনে হয়। কিন্তু ঠিক চিনতে পারে না। তাই বৃদ্ধের প্রতি মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়। এখানে কোন মেয়ে নেই। শিশু, বালক, কিশোর, সবাই ছেলে। তারা পড়াশোনা বন্ধ করে মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে থাকে।

শিক্ষক অনুমান করে মেয়েটি প্রাসাদের কেউ হলেও হতে পারে। সে সবিনয়ে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে—আপনি এখানে হঠাৎ ?

—রাজকুমারীকে নিয়ে এলাম। উনি তো বিদ্যালয়ে পড়েন না। আমার কাছে প্রাসাদে পড়েন। তাই বিদ্যালয় দেখার ইচ্ছা হয়েছে।

শিক্ষকের মুখে সঙ্গে সঙ্গে আকর্ণবিস্তৃত হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে—বেশ তো, বেশ তো। আসুন, এইখানে বসুন। একটু অসুবিধা হবে।

এরপর শিক্ষক তার আসনের কাছে ছুটে গিয়ে দাঁড়ায়। ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলে—হাঁ করে দেখছ কি পেছন ফিরে ? তোমাদের একমাত্র কর্তব্য হল অধ্যয়ন। কোনদিকে কর্ণপাত কিংবা দৃষ্টিপাত ঠিক নয়। তাতে থথ দেবতার অসন্তোষ বাড়বে।

ছাত্ররা আড়ষ্ট হয়ে সামনের দিকে শিক্ষকের মুখের প্রতি অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তাদের মন পড়ে থাকে পেছন দিকে, যেখানে এক বৃদ্ধ আর এক বালিকা বসে রয়েছে।

শিক্ষক মনে মনে ভাবে, রাজকুমারীকে একটা গল্প শুনিয়ে দেওয়া যাক শিক্ষার ছলে। তাতে রাজকুমারী মনে মনে খুশী হবেন তার ওপর। হয়ত

ভবিষ্যতে প্রাসাদেও ডেকে পাঠাতে পারেন।

সে ছাত্রদের বলে—তোমাদের আমি আমাদের মহান দেশের পূর্ববর্তী নরপতিদের নাম এবং তাঁদের অনেক কাহিনী বলেছি। বলেছি কিনা?

কিছু কিছু ছাত্র কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলে ওঠে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আজ তোমাদের আমি যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের দেশের পুরাকালের একটি কাহিনী শোনাব।

ছাত্ররা নড়েচড়ে বসে। তারা হাঁফ ছাড়ে। ভেবেছিল রাজকুমারীর সামনে শিক্ষক তাদের কঠিন কঠিন প্রশ্ন করে অপদস্থ করবেন।

হতশেপসুতও বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠে। মনে মনে প্রার্থনা করে গল্পটি যেন তার অজানা হয়। নতুন গল্প শোনার মজা আলাদা।

শিক্ষক একটু কেশে নিয়ে বলে—জাদুবিদ্যায় আমাদের দেশ বরাবর খুব পারদর্শী। হবেই বা না কেন? এত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি অন্য দেশে জন্মান নি। দেবদেবীর এত আশীর্বাদ কোন দেশের ভাগ্যে জোটে না। বহুকাল আগের কথা। প্রায় দেড় হাজার বছর হতে চলল, জোসেরের রাজত্বকালের প্রথম পিরামিড তৈরী তখন হয়ে গিয়েছে। তারও প্রায় একশো বছর পরের কথা। মিশরের নৃপতি খুফু। তিনি দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, বীর যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু গল্প শুনতে ভীষণ ভালবাসতেন। অবসর বিনোদন করতেন গল্প শুনে। তাঁর একটি পুত্র ছিলেন। একদিন তিনি রাজকুমারদের ডেকে বললেন—ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে যে সব কাহিনী তোমাদের জানা আছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের সভায় যে সব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, এমন সব কাহিনী আজ আমাকে শোনাও তোমরা।

তখন একে একে রাজপুত্ররা বলতে শুরু করলেন, তাঁদের জানা সেই সব আশ্চর্য কাহিনী যার মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রজালের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হতে থাকে।

একজন রাজকুমার শোনালেন ব্যভিচারিণী এক স্ত্রীর কাহিনী। সেই স্ত্রীলোককে এবং তার প্রেমিককে জাদুর প্রভাবে ঘরের মধ্যে মোম দ্বারা প্রস্তুত করে রাখা একটি ছোট্ট কুমীর কামড়ে ধরে রেখেছিল। তারা দুজন ধরা পড়ে গিয়েছিল।

বৃদ্ধ বুঝলেন এই কাহিনীটা ছোটদের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নয়। তবে তাদের মাথায় গল্পের রস ছাড়া অন্য কিছুই ঢুকছে না। অন্য কিছু বোঝার বয়স এখনো হয়নি। সুতরাং তিনি চুপ করেই রইলেন। কারণ সবার সঙ্গে রাজকুমারীর চোখে মুখেও আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে।

শিক্ষক এবারে দ্বিতীয় রাজকুমারের কাহিনীর কথা বলল। সেই রাজকুমার একজন ঐন্দ্রজালিকের কথা শোনালেন যিনি গভীর জলে নিক্ষিপ্ত একটি সোনার হার মন্ত্রবলে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। সব রাজকুমারের গল্পই খুফু একে একে শুনলেন এবং আনন্দিত হয়ে তাঁদের পুরস্কৃত করলেন।

অবশেষে এল রাজপুত্র হারডডফের পালা। তাঁকে কাহিনী শোনাতে বললে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—কাহিনী শুনিয়ে কি হবে? স্বচক্ষে দেখাই তো

ভাল। আপনার রাজ্যে এমন একজন জাদুবিদ্ বাস করেন যিনি অতীতের যে কোন ঐন্দ্রজালিকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। নাম তাঁর ডেডে। বাস করেন ডেডস্নেফ্রুতে। তিনি একশো দশ বছরের এক যুবক। একতাল মাংসের সঙ্গে পাঁচশোটা পিঠে খান তিনি এখনো। সেই সঙ্গে একশো পাত্র সুরা। তিনি স্কন্ধচ্যুত মস্তককে জাদুবলে জোড়া লাগাতে পারেন। তিনি মরুভূমির ভয়ংকর সিংহকে মন্ত্রবলে পোষা কুকুরের মত তাঁর পেছনে পেছনে চলতে বাধ্য করতে পারেন।

এরপর রাজপুত্র হারডডফ একটু মুচকি হেসে বলেন—কিন্তু তিনি এমন একটি দ্রব্যের হদিস জানেন যার কাছে এই সব ইন্দ্রজালও একেবারে তুচ্ছ।

খুফু কৌতূহলান্বিত হয়ে প্রশ্ন করেন—কোন্ সেই দ্রব্য ?

—যে দ্রব্য দেবতা থথ-এর আবাস থেকে চুরি করে নিয়ে কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

খুফুর কৌতূহল আরও তীব্র হয়ে ওঠে। কারণ ওই দ্রব্যটিই তাঁর একান্ত প্রয়োজন তাঁর প্রাসাদের জন্য। তিনি রাজপুত্র হারডডফকে অবিলম্বে সেই বিজ্ঞ ব্যক্তিকে তাঁর সভায় উপস্থিত করার জন্য তাঁর গৃহে পাঠান। রাজপুত্র তখন নৌকাযোগে ডেডস্নেফ্রুতে উপস্থিত হন। তিনি সেই অতিবৃদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তির গৃহাভিমুখে রওনা হন। সঙ্গে তাঁর হস্তীদন্ত নির্মিত মনুষ্য বহনের উপযোগী আসন। এই আসনে বসিয়ে বৃদ্ধকে নৌকা পর্যন্ত বহন করা হবে। তারপর রাজধানীতে পৌঁছে ওই আসনে বসিয়েই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে রাজসভায়। আসনটিতে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে যায়। সামনে এবং পেছনের দুদিকে ধরে কাঁধে করে বইবার জন্য প্রলম্বিত চারটি দণ্ড রয়েছে।

রাজপুত্র হারডডফ বৃদ্ধের গৃহে পৌঁছে দেখেন তিনি পা দুটি সামনে বাড়িয়ে একটি আরাম-কেদারায় বসে রয়েছেন। তাঁকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করে রাজকুমার প্রথমেই তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলেন এবং পরিশেষে বললেন—আমি দূর থেকে এসেছি আমার পিতার বার্তাবাহক রূপে। আমার পিতা মিশরের অধিপতি খুফু।

এ কথা শুনে বৃদ্ধ বিস্মিত হন।

তখন রাজকুমার হারডডফ বলেন—আমি রাজার আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি আপনাকে। তিনি আপনার জন্য অত্যুৎকৃষ্ট ভোজের আয়োজন করেছেন। আর আপনার পিতৃপুরুষ, যাঁরা অপর পারের নগরীতে রয়েছেন তাঁদের জন্যও চমৎকার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে আমরা কৃতার্থ হব।

বৃদ্ধ ডেডে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান। রাজপুত্র তখন তাঁর হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধকে ধীরে ধীরে তোলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে বসানো হয় হাতির দাঁতের আসনে। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় নীলনদে অপেক্ষারত তরীতে। তবে ডেডের অনুরোধে আর একটি নৌকার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ তিনি চান তাঁর যাবতীয় পুস্তকভাণ্ডারকে সঙ্গে নিয়ে যেতে।

রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেই রাজকুমার পিতা খুফুর সম্মুখে এসে

অভিবাদন জানিয়ে বলেন—আমি শ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রজালিক ডেডেকে সঙ্গে করে এনেছি।

অতি উৎসাহী রাজা বলে ওঠেন—এনেছ ? যাও শিগ্‌গির তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে রাজসভায় নিয়ে এস। আমি নিজেও রাজসভায় যাচ্ছি এখনি।

রাজসভায় রাজার সম্মুখে জাদুকরকে আনয়ন করা হয়। খুফুর প্রথম উক্তিই হল—এটা কেমন কথা ডেডে ? আপনার সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাৎ ঘটেনি কেন ?

ডেডে একটু হেসে বলেন—রাজা যাকে ডেকে পাঠান, সেই শুধু আসে। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দেখুন, আমি সব কিছু ফেলে রেখে আপনার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছি।

রাজা বলেন—লোকে যা বলে, তা কি সত্যি ? আপনি কাটা-মুণ্ডু জুড়ে দিতে পারেন ?

—হ্যাঁ প্রভু। সত্যি।

—কারাগার থেকে একজন বন্দীকে তাহলে আনা হোক পরীক্ষা হয়ে যাবে।

জাদুকর মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলেন—না প্রভু। মানুষ নয়। বরং চমৎকার কোন পশু অথবা পাখির ওপর পরীক্ষা করা হোক।

তখন খুফুর আদেশে একটি রাজহংসী আনা হল। ডেডের ইঙ্গিতে তার মাথা কেটে ফেলা হল।

মুণ্ডহীন রাজহংসীকে কক্ষের পশ্চিম কোণে শুইয়ে রাখা হল এবং তার মুণ্ডটিকে রাখা হল পূর্বপ্রান্তে।

ডেডে বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকেন। একটু পরেই সবাই হতবাক হয়ে দেখে পশ্চিম কোণ থেকে মুণ্ডুহীন হংসী লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসে আর পূর্বদিক থেকে ছিন্ন মুণ্ডটি তেমনি এগিয়ে আসে। দুটি খণ্ড কাছাকাছি এসে জোড়া লেগে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে রাজহংসী ডেকে ওঠে।

এই দৃশ্য দেখে বিস্ময় বিমূঢ় দর্শকেরা শোরগোল করে ওঠে। খুফু হাত উঠিয়ে তাদের চুপ করতে বলেন। তখন তাঁর আদেশে একটি ছোট হাঁস আনা হল। সেটিরও মুণ্ডচ্ছেদের পর জাদুকর তাকে বাঁচিয়ে তোলেন। রাজা তখন একটি ষণ্ডকে আনিয়ে তার মুণ্ডটিকে কেটে মাটিতে নিক্ষেপ করতে বলেন। বৃদ্ধের মন্ত্রের অমোঘ প্রভাবে সেটিও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

নৃপতি খুফুর মনে বৃদ্ধের অত্যাশ্চর্য প্রতিভা ও গুণ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। এই ভোজবাজী গল্পের চেয়েও অদ্ভুত। তখন তিনি তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা সর্বসমক্ষেই ব্যক্ত করেন। বলেন—বিদ্যা আর প্রাজ্ঞের অধিষ্ঠাতা দেবতা থথ-এর গৃহ থেকে অপহৃত সেই দ্রব্যটি কোথায় রক্ষিত আছে অনুগ্রহ করে আমাকে বলে দিন।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়ে জাদুকর বলেন—আমি জানি হেলিওপোলিসের কোন গৃহে সেটিকে রাখা হয়েছে। কিন্তু সেটিকে আপনার কাছে আনার কথা আমার নয়।

—কে তবে এনে দেবে ?

—রেড্ডেডট। তিনি যে কটি সন্তান ধারণ করবেন, তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রব্যটি আপনাকে এনে দেবে গোপন স্থান থেকে।

বিস্মিত রাজা বলেন—রেড্ডেডট আবার কে?

—তিনি হলেন সচেবু নগরের দেবতা রা-এর যে পূজারী রয়েছেন, তাঁর পত্নী। তিনি এখন অন্তঃসত্ত্বা। দেবতারা কর্তৃক উৎপাদিত তিনটি পুত্র-সন্তানকে একসঙ্গে তিনি গর্ভে ধারণ করে রয়েছেন। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠটি হেলিওপোলিসের উচ্চতম পূজারীও হবেন। তিনিই আনবেন।

বৃদ্ধের কথা শুনে খুফু বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন জাদুকর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। একটি নতুন বংশের তিনজন নরপতির কথা তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন।

শিক্ষক নীরব হল। রাজকুমারী হতশেপসুত ছাত্রদের মত স্তব্ধ বিমোহিত। কারণ এই গল্প সে প্রথম শুনল। বৃদ্ধ ভাবলেন শিক্ষিকটি গল্পের জাল বিস্তার করতে পারে বটে। তার গল্প বলার ভঙ্গিটি সুন্দর এবং আকর্ষণীয়।

শিক্ষক রাজকুমারীর দিকে দৃষ্টি ফেলে বুঝতে পারে সে যে সার্থক। তাই দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে সে প্রশ্ন করে বসে—এরপর কি ঘটল তোমাদের কেউ অনুমান করতে পারনি?

কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে হতশেপসুত অনুচ্চকণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলে ওঠে—না।

শিক্ষক তার উক্তি শুনতে না পেলেও বৃদ্ধ ঠিকই শুনলেন।

শিক্ষক তখন বলে চলে—রেড্ডেডট-এর সন্তান প্রসবের দিন ঘনিয়ে আসে। দেবতা রা তখন স্বয়ং দেবী আইসিস, তাঁর ভগিনী নেফথিস এবং দেবী মেসেচেণ্ট আর হেক্তকে বললেন—তোমরা সচেবু নগরীতে এস। যত তাড়াতাড়ি পার রেড্ডেডটকে ভারমুক্ত কর। তাঁর তিন সন্তানকে প্রসব করাও। এরা তিনজনেই ভবিষ্যতে দেশকে চালিত করবে। এরাই হবে সমগ্র দেশের কর্ণধার। এরাই দেশের নানা স্থানে তোমাদের জন্য মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা করবে। তোমাদের জন্য তৈরী সৌধে যাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় তার ব্যবস্থা করবে।

রা দেবতার ইচ্ছায় দেবীরা ছদ্মবেশে রেড্ডেডটের স্বামী পূজারী রাউওসেরের কাছে গিয়ে বলেন যে তাঁরা হলেন প্রসবের বিষয়ে অতি অভিজ্ঞ ধাত্রী। পূজারী অভাবিতভাবে এই সুযোগ একে যাওয়ায় তাঁদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীর জন্য তিনি বড়ই উতলা হয়ে পড়েছিলেন। কাকে ডাকবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। তিন দেবী তখন তিন পুত্রসন্তানের জন্মে সাহায্য করলেন। আইসিস তাদের প্রত্যেকের নামকরণ করলেন। মেসেচেণ্ট ভবিষ্যৎবাণী করলেন, এরা প্রত্যেকে সারা দেশের রাজা হবে।

বিদায় কালে গৃহকর্তা রাউওসের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁদের অনেক শস্য দিলেন। তাঁদের সঙ্গে ভৃত্যের বেশে দেবতা চনুমু এসেছিলেন। তিনি সেই শস্য বহন করে নিয়ে চললেন।

অনেকটা পথ চলার পর দেবী আইসিস সহসা বলে উঠলেন—এটা কেমন

হল ?

নেফথিস বলেন—কি হল আবার ?

—আমরা চলে এলাম, অথচ অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটল না। শিশুদের মা-বাবা বুঝবে কি করে আমরা কার নির্দেশে এসেছিলাম ? আমরা কারা তা-ই বা জানবে কি করে ?

অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা একটি সুন্দর মুকুট তৈরী করেন। সেই মুকুটটি শস্যরাশির মধ্যে রাখলেন। তারপর এমন ঝড়ের সৃষ্টি করলেন যে সেই শস্যরাশি উড়তে উড়তে ফিরে গেল রেন্ডেডট-এর গৃহের শস্যভাণ্ডারে। এরপর এক পক্ষকাল কেটে গেল। সুস্থ হয়ে রেন্ডেডট আবার গৃহস্থালীর কাজকর্ম করতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর দাসীর কাছে একদিন শুনলেন, ধাত্রীদের যে শস্য দেওয়া হয়েছিল সেগুলো শস্যগৃহে যথাস্থানে পড়ে রয়েছে। শুনে তিনি অবাক হলেন। দাসীকে সেই শস্য থেকে কিছুটা নিয়ে আসতে বললেন। দাসী গিয়ে সেই শস্যভাণ্ডারের দরজা একটু ফাঁক করতেই দেখে অবাক কাণ্ড। ভেতরে নাচগান আর বাজনার আসর বসেছে। কী সুমধুর সেই ধ্বনি, যেন কোন রাজার অভিষেক হচ্ছে। দাসী ভয় পেয়ে ছুটে গেল রেন্ডেডটের কাছে। রেন্ডেডট তখন গিয়ে মুকুটটি পেলেন। তিনি বুঝলেন সব কিছুর মর্মার্থ। দাসীও বুঝল।

একদিন রেন্ডেডট কোন কারণে দাসীকে শাস্তি দিলেন। দাসী চিৎকার করে বলে উঠল—যাঁর গর্ভে তিনজন রাজার জন্ম তাঁর পক্ষে এই কাজ করা অনুচিত হয়েছে। আমি এখুনি নরপতি খুফুর কাছে চললাম এর একটা বিহিত করতে।

রেন্ডেডট ছুটে গিয়ে তাকে আটকান।

এই তিন ভাই-ই হচ্ছেন ফ্যারাও বংশের প্রকৃত পূর্বপুরুষ। তাই ফ্যারাওরা আজও বলে থাকেন তাঁরা হলেন সূর্যদেবতা অর্থাৎ রা-এর উত্তরপুরুষ।

শিক্ষক থামেন। নীরবতা বিরাজ করে।

শিক্ষক রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করেন—কেমন লাগল ?

—চমৎকার।

বৃদ্ধ রাজকুমারীকে বলেন—চল এবারে।

ইতিমধ্যে প্রতি ছাত্রের মায়েরা তাদের জন্য খাদ্য ও পানীয় নিয়ে আসতে শুরু করেছে। সূর্যের তাপও বাড়ছে ধীরে ধীরে।

হতশ্লেপসুত উঠে দাঁড়ালে শিক্ষক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে—এখনো রাজকুমারীর সবটা দেখা হয়নি। ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য আমি যত্নবান। কিন্তু কিছু কিছু অমনোযোগী ছাত্র রয়েছে যাদের মনোযোগী করে তুলতে হয়। আজ একজন অত্যন্ত অমনোযোগী ছিল।

ছাত্রদের চোখে ভীতির প্রকাশ।

শিক্ষক ডাকে—নেকো ?

একটি ছাত্র উঠে দাঁড়ায়।

—বলত সেই অসামান্য জাদুকরের নাম কি ?

নেকো কিছুক্ষণ ওপর দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে। অন্যান্য ছাত্ররা বিস্মিত হয় নেকোর ব্যর্থতায়। কারণ সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং পড়াশোনায় ভাল।

শিক্ষক তখন একটি চাবুক তুলে নিয়ে তার কাছে গিয়ে নির্দয়ভাবে তার পৃষ্ঠে আঘাত করে। রাজকুমারীর অসহ্য লাগে। সে চিৎকার করে ওঠে। শিক্ষক থেমে যায়।

ছাত্রদের মধ্যে একজন রাজকুমারীকে বলে—উনি তো ঠিক কাজই করছেন।

—কেন ?

—আমাদের সবার পেছনে একটি করে কান আছে। চাবুক মারলে সেই কান মনোযোগী হয়ে ওঠে। শিক্ষকের সব কথা শুনে মনে রাখতে পারি তখন!

শিক্ষক বলে—ও সত্যি কথা বলেছে।

ততক্ষণে বাইরে মায়েদের ভিড় বেড়ে যায়। তারা ওখানে রাজকুমারীকে দেখে আনন্দিত হয়। একটু অবাকও হয়।

বৃদ্ধ হতশেপসুতকে নিয়ে বাইরে আসেন।

সে বৃদ্ধকে প্রশ্ন করে—শিক্ষক যা বললেন, তা কি সত্যি ?

—আমরা চিরকাল একে সত্যি বলে জেনেছি। তাতে লাভবানই হয়েছি।

—আমি যদি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি ? তাহলে ?

—তুমি অন্যমনস্ক হবে না।

—কেন ? আমি রাজকুমারী বলে ?

—না। তুমি ছেলে নও। ছেলেদের মাথায় দুষ্টুমীর নানান্ ধান্ধা। চঞ্চলও বেশী হয় তারা।

হতশেপসুত হেসে বলে—মেয়েরাও কম নয়। আপনি জানেন না।

বৃদ্ধ এড়িয়ে যান এই প্রসঙ্গ।

এত কিছুর পরেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহশিক্ষক হেকারনেহের কথা হতশেপসুত মনের মধ্যে রেখে দিল। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে একদিন।

সম্রাজ্ঞী অহমেস একদিন কন্যা হতশেপসুতকে ডেকে পাঠান। একটু অবাক হয় সে। মা কখনো কোন কিছুর মধ্যে থাকেন না। নিজের সাজসজ্জা নিয়ে ব্যস্ত অধিকাংশ সময়। সে হারেমের দাসীদের মধ্যে বলাবলি করতে শুনেছে যে তার বাবাকে মায়ের তেমন পছন্দ নয়। ফ্যারাও হলে কি হবে, বাবার সামনের দাঁত একটু বেশী উঁচু। যখন শুনেছে তখন সে আরও ছোট ছিল বলে শুনতে পেয়েছে। যারা বলাবলি করেছিল তারা জানত ওসব কথা বোঝার বয়স তার হয়নি। ঠিকই জানত। এখন ওই ধরনের কথা আর শুনতে পায় না। এখন সে বুঝতে পারবে বলে কেউ বলে না তার সামনে। তাই বলে কি আর ফিসফিসানি বন্ধ হয়েছে ? হতে পারে না। ওদের জীবনে সাধ-আহ্লাদ বলে তেমন কিছুই নেই। ওরা ফ্যারাও-এর মত নৃত্যগীত উপভোগ করতে পারে না। ওরা রাজকুমার আর কুমারীদের মত যথেচ্ছভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে না। ওরা নৌকা-বিহারে যেতে পারে না। ওদের স্বামী নেই। ঘরসংসার নেই বলে নিজেদের মত

করে আনন্দও করতে পারে না। ছন্দহীন একঘেয়ে জীবন। খুবই গণ্ডীবদ্ধ। ওই গণ্ডীর মধ্যে কথা চালাচালি করে যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় ততটুকুই ওদের জীবন-রস। এই বয়সেই এসব কথা বুঝতে শিখেছে হতশেপসুত। এ কথাও বুঝতে শিখেছে ওদের অনেক কথা না শোনার ভান করে থাকতে হয়। ওদের অনেক হাসাহাসি অঙ্গভঙ্গি না-দেখার মত নির্বোধ সেজে থাকতে হয়। নইলে ফ্যারাও বংশের মান থাকে না, সম্মান থাকে না। ওদের সব কিছু দেখার চেষ্টা করে, ধমক দিয়ে, শাস্তি দিয়ে নিজের প্রতিপত্তির দাপট দেখান যায় বটে, কিন্তু তাতে পৃথিবীর দেবতা গেব কিংবা আকাশের দেবী নুত কেউই স্বস্তি পাবেন না। নুতকে যিনি দুহাতে তুলে ধরে রেখেছেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেই শু দেবতারও পা টলে যেতে পারে। কারণ এই সব দেবতাদের সৃষ্ট ধরিত্রীতে সবরকমের মানুষই থাকবে। সেই অধিকার তাদের রয়েছে। তারা তাদের মত করে বেঁচে থাকবে। সেই ভাবেই পৃথিবীতে এসেছে তারা। প্রতিটি পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের যেমন প্রয়োজন রয়েছে পৃথিবীতে তেমনি প্রতি স্তরের মানুষেরও প্রয়োজন রয়েছে। তাতে মঙ্গলই হয়। পিতার প্রতি মায়ের মনোভাব ওদের কাছ থেকে জেনে তার কোন ক্ষতি হয়নি। বরং লাভ হয়েছে। তার শিক্ষক বলেন, ক্ষুদ্রবৃহৎ সব কিছু থেকে মানুষ জ্ঞান আহরণ করেন। কোন কিছুই তুচ্ছ নয় এই জগতে।

মাকে কোথায় পাওয়া যাবে সে জানে। মায়ের নিজস্ব সাজঘরে। কারণ এখনো দুপুর হয়নি। ফ্যারাও তাঁর প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান শেষে সভাগৃহে কাজে ব্যস্ত। তার আজ ইচ্ছা ছিল সভার কাজকর্ম দেখার জন্য যে গোপন স্থানটি রয়েছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে। সেখান থেকে দেখবে ফ্যারাও-এর প্রশাসনিক কাজকর্ম। কারণ আজ তার পড়াশোনা নেই। আজকের দিনটিতে শিক্ষক আসেন না। বলেন, প্রতিদিনই লেখাপড়া আর অঙ্ক করতে হবে এমন কোন কথা নেই। তাতে একঘেয়েমি বাড়ে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে হয়। বিশ্রাম মানে অলসতা নয়, বিশ্রাম মানে অন্য কিছুতে মন দেওয়া। বিশ্রাম মানে মনটাকে অন্য চিন্তা কিংবা কল্পনায় ভাসিয়ে দেওয়া। তাতে মনের দিগন্ত আরও উন্মোচিত হয়।

মাঝে মাঝে তারও মায়ের মত সাজতে সাধ হয়। কিন্তু তত ভাল লাগে না। মায়ের মত সুগন্ধি মেখে, চোখের ওপরে আর নীচে আবছা রঙের প্রলেপ মাখিয়ে, কেশদামকে সুন্দর ভাবে তৈলসিক্ত করে নানান ঢং-এ কবরী বেঁধে নিজের রূপ পালটাতে তারও যে ইচ্ছা হয় না এমন নয়। বাঁদীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সেইভাবে সেজেছে কতদিন। বাঁদী বিহ্বল দৃষ্টিতে তার রূপ দেখেছে। পরক্ষণেই সে সব খুলে ফেলেছে।

বাঁদী ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছে—আমি কোন্ অপরাধ করেছি রাজকুমারী? আপনাকে তো দেবী আইসিসের মত দেখতে লাগছিল।

—তোমার কোন দোষ নেই। খুব ভাল হয়েছিল তোমার সাজানো।

—তাহলে?

—এমনিতে। তুমি এখন যাও।

শুধু একবার নয়। বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে। সেজেগুজে অপ্সরী হয়ে, আবার সব খুলে ফেলে মুক্ত হয়ে খোলসের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কথাটা প্রতিবারই জানাজানি হয়েছে পরিচারিকাদের মধ্যে। তারা অদ্ভুত বোবা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছে বারবার। সেই চাহনির অর্থ প্রথমে সে বুঝতে পারেনি। পারল একদিন যেদিন বহুদিনের এক বৃদ্ধা পরিচারিকা এসে তাকে স্নেহের স্বরে বলে—সুন্দরকে ওভাবে খুন করতে নেই।

—খুন ?

—খুন বৈকি। তুমি যে কত সুন্দরী তাকি জান না? সাজলে তুমি অসামান্যা হয়ে ওঠ। তারপর নিজেই সেই খোলস খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়। যে সাজায় সে এতে ভীষণ আঘাত পায়। তিন চার দিন তার চোখে নিদ্রা থাকে না। আহারে রুচি থাকে না। এও এক ধরনের হত্যা।

হতশেপসুত বৃদ্ধার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। এই পরিচারিকা ফ্যারাওকেও শৈশব থেকে দেখে আসছে। প্রাসাদ সীমানার প্রান্তে সে থাকে সবাই জানে। বৃদ্ধার ঘোলাটে হাসি হাসি চোখের দিকে চেয়ে সে বলে—বুঝেছি। বেশ, আমি আর সাজব না।

—সেকি! নিজের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগৎকে এভাবে বঞ্চিত করতে নেই।

—আমার ভাল লাগে না।

বৃদ্ধা প্রশ্রয় দেবার ভঙ্গিত বলে—বেশ।

সে জানে আর একটু বয়স বাড়লে এই সাজই তার ভাল লাগবে। তখন তার রূপ আরও দুর্নিবার হয়ে উঠবে। সব কিছুরই সময় আসে। ফুলের কুঁড়িকে জোর করে ফোটান যায় না। নিজেই ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে একদিন পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে। রাজকুমারী এখন সবে কুঁড়ি। যেদিন প্রস্ফুটিত হবে সেদিন রূপও খুলবে। রাজকুমারীদের ভ্রূমর অবশ্য সুনির্দিষ্ট থাকে। সাধারণ সংসারের মেয়েদের মত তাতে অত রোমাঞ্চ থাকে না। তবু যা সুন্দর তা সুন্দরই। সেই সৌন্দর্যকে দূর থেকে দেখেও সুখ।

হতশেপসুতের অনুমান মিথ্যা নয়। মাকে যথাস্থানেই পাওয়া গেল। এই সাজঘর একটি বড় শয়নকক্ষের সমান। বাইরের প্রখর তাপে যাতে কক্ষ উত্তপ্ত না হয় অথচ যাতে সেটি আলোকিত থাকে সেজন্য অন্যান্য অনেক কক্ষের মত এটিরও দেওয়ালের অনেক উঁচুতে কয়েকটি জানলা রয়েছে। সাজঘরে উপবেশনের জন্য অনেকগুলি আসন রয়েছে। সেগুলির কোনটি কাঠের, কোনটি হস্তীদন্ত নির্মিত, কোনটি বা স্বর্ণের। এমন কি দুর্লভ রৌপ্য ধাতুরও একটি ক্ষুদ্র আসন রয়েছে। আসনগুলি নানা ধরনের কারুকার্যশোভিত। মা অহমেসের দেশীয় শিল্পের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। তাই তাঁর সাজঘর এবং নিজের শয়নকক্ষের প্রতিটি আসবাবপত্রে এই শিল্পের ছোঁয়া। তাঁর শয়নকক্ষের হস্তীদন্তনির্মিত এবং তাম্রনির্মিত ফুলদানীগুলির গায়ে কত আকর্ষণীয় চিত্রমালা। কোনটাতে মিশরের রুক্ষ প্রকৃতি ধরা পড়েছে, কোথাও বা অন্ধকারের

দেশের ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসীর মুখ। অনেক আসবাবপত্রের আকৃতি বিচিত্র পশুপক্ষীর মত।

সাজঘরে সম্রাজ্ঞী অহমেস যে আসনে বসেছিলেন সেটিতে হেলান দেবার ব্যবস্থা নেই। সেটির দৈর্ঘ্য একটি সিংহের সমান। তার একদিকে সিংহের হিংস্র মুখ, অন্য দিকে তার লাঙুল। মা তাঁর নয়নদ্বয়ের শোভাবর্ধনের জন্য ব্যস্ত তখন। বাঁ-হাতে ধরে রেখেছেন একটি হাতল-অলা সুদৃশ্য আরশি। আরশির সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে একটি ক্ষুদ্র পাত্র। তাতে রয়েছে এক ধরনের অত্যন্ত মূল্যবান তৈলমিশ্রিত রঙ। আরশি বাঁ হাতে ধরে মা ডান হাত দিয়ে রূপচর্চায় নিমগ্ন। তাই হতশেপসুতকে দেখতে পেলেন না। মায়ের পাশে যে দুজন পরিচারিকা তাঁকে সাহায্যের জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে তাদের একজন তাকে প্রবেশ করতে দেখেছে। কিন্তু সে কথা বললে মায়ের হাত কেঁপে যেতে পারে, রূপচর্চায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে ভেবে নীরব থাকে সে।

হতশেপসুত ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। কিন্তু মায়ের দিকে যেতে গিয়ে তার আটকে যায় কক্ষের এক কোণে স্বর্ণোজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে। দেওয়ালের ওপরের জানলা দিয়ে হয়ত কোনরকমে এক টুকরো আলো এসে পড়েছে। ওই আলো বহগুণ তেজ নিয়ে ঠিকরে বের হচ্ছে চোখ দুটি থেকে। মূর্তিটি একটি বিড়ালের। তাম্রনির্মিত বিড়াল এটি। খাঁটি তামা নয়, তার সঙ্গে অন্য ধাতুও মিশ্রিত রয়েছে। নইলে অমন কালচে রঙ হত না। কিন্তু চোখদুটি খাঁটি সোনা। এই মূর্তি মেমফিসের ওদিকের বদ্বীপ অঞ্চলের আরাধ্যা দেবী বাস্ত-এর। মা কবে কোথা থেকে এটি সংগ্রহ করে এনেছেন সে জানে না।

মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে বলে—আমাকে ডেকেছিলে?

মা কোনদিকে না চেয়ে নিষ্কম্প হস্তে তাঁর ভ্রূর ওপর তুলির শেষ টান দিয়ে বলেন—বস।

মা পরিচারিকাদ্বয়কে ইশারায় চলে যেতে বলেন।

—তোমাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে ডাকিনি। আমার মনে হয় তোমার সঙ্গে কিছুটা যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। তোমার বয়স হচ্ছে।

—তার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

সম্রাজ্ঞীর মুখের বিরক্তি তার দীর্ঘক্ষণের সৌন্দর্যচর্চাও ঢাকতে পারল না। তবু শান্ত কণ্ঠে তিনি বলেন—বল।

দেবী বাস্ত-এর মূর্তিটির দিকে দেখিয়ে সে বলে—আমি শুনেছি সূর্যের স্নিগ্ধ তাপের প্রতীক। ইনি শস্য এবং তরিতরকারি উৎপাদনের দেবী। ওঁকে এখানে রাখা কি ভাল? ওঁর স্থান হওয়া উচিত দেবালয়ে।

—জানি। সেই ব্যবস্থাই হবে। আপাতত এখানে রাখা হয়েছে।

—ও। আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম।

—কি ভেবেছিলে?

—আমাদের দেশের আসবাবপত্র, সব কিছুতেই তো পশুপক্ষির প্রাধান্য। ভেবেছিলাম উনিও বুঝি সেইভাবে এখানে স্থান পেয়েছেন।

মা সভয়ে চিৎকার করে ওঠেন—হতশেপ্।

—আমার ভুল হয়েছে মা। না বুঝে বলে ফেলেছি। ভাবলাম—

—ভাবলে, আমি কিছুই বুঝি না। ভাবলে, আমি বুঝি জানি না যে উনি সূর্যদেবতার প্রখরতা স্নিগ্ধ করে দিয়ে পলিমাটি অঞ্চল শাক-সবজীর ফুল ফলে পরিপূর্ণ করে দেন।

মায়ের কাছে পরাজিত হয় হতশেপসুত। সে আড়চোখে দেখে বাস্ত্-এর মূর্তির চোখ দুটো থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। সে নিজের চোখ বন্ধ করে মায়ের একেবারে সামনে তাঁর পায়ের কাছে বসে বলে—আমি অন্যায় করেছি।

সম্রাজ্ঞী অহমেস কন্যাকে এভাবে একান্তভাবে কাছে আসতে কখনো দেখেন নি। খুব ছোটবেলায় যখন সে কাছে আসত তখন কোলে উয়াচমেস এসে গিয়েছিল। বিরক্ত হতেন। ভাবতেন, তাঁর বেশবাস বুঝি অবিন্যস্ত হল, তাঁর সুন্দরভাবে বাঁধা কেশদাম বুঝি আলুলায়িত হল, তাঁর মুখের সযত্নে অঙ্কিত কোন রেখা বুঝি অস্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি অনেকবার শিশুকন্যাকে হাত দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা কন্যার প্রতি তাঁর দৃষ্টির মধ্য দিয়ে কোনদিন কোনরকমের প্রশ্রয় বা স্নেহ দেখাতে পারেন নি। তারপর আর একটি পুত্রসন্তান এল পৃথিবীতে। হতশেপসুত আরও দূরে সরে গেল। কিন্তু আজ তাকে ডেকে পাঠিয়ে যখন তাকে তাঁরই পায়ের কাছে ভীত অবস্থায় এসে বসতে দেখলেন তখন লক্ষ্য করলেন, কন্যা তাঁর এখনো শিশু। তার মুখ এখনো কচি। সেই মুখে যৌবনের বন্যার তেমন লক্ষণ দেখা যায় না। তবে দেখা যাবে শিগ্‌গিরই। কৈশোরে আসতে কটা দিন বাকী। এত যার রূপ তার কৈশোর আর যৌবনের সীমারেখা নির্ণয় করা কঠিন। যৌবন আসবে দুকুল ছাপিয়ে নীলনদের বন্যার মত আচম্বিতে।

কন্যার মাথায় হাত দিয়ে টেনে নিজের হাঁটুর ওপর রেখে মুখ নীচু করে বলেন—তোমার খুব একা একা লাগে তাই না?

হতশেপসুত শৈশবে যেমন সদ্য কেচে আসা শুকনো গরম কাপড়ের মধ্যে মুখ লুকোতো সেইভাবে মায়ের কোলের মধ্যে মুখ লুকোয়। মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। হতশেপসুতের মনে হয় না আজ কে হারল আর কে জিতল। নিজের ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য সব কিছুই সে হারিয়ে ফেলে। ভাবে, এইভাবে কি চিরকাল থাকা যায় না? এইভাবে মায়ের কাছে যদি সারা জীবন থাকতে পারত।

মা দুহাত দিয়ে তার মুখ তুলে ধরেন। সে সহসা সন্ত্রস্ত হয়ে বলে ওঠে—তোমার পোশাক নষ্ট করে দিলাম।

হেসে মা বলেন—না। আর দিলেই বা ক্ষতি কি? আবার ঠিক করে নেব।

—তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, উয়াচমেসকে তুমি বিয়ে করতে চাও একথা বলেছিলাম ফ্যারাওকে।

হতশেপসুতের মুখে আগ্রহ ফুটে ওঠে। বলে—সত্যি? উনি কি বললেন?

—প্রথমে একটু হাসলেন। তারপর বললেন যে তাঁর খুব একটা আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা।

—কোন্ কথা ?

—এই বিয়ের কথা যেন ঘুণাক্ষরেও পাঁচকান না হয়। এমন কি উয়াচ-মেসকেও আর বলা চলবে না।

—কিন্তু ও যে মাঝে মাঝে বলে।

—তুমি চুপ করে থাকবে। বলবে, ওসব নিয়ে এখন ভাবতে হবে না। আগে পড়াশোনা করতে হবে ভালভাবে। পড়াশোনা না করলে ফ্যারাও হওয়া অসুবিধে। তাছাড়া যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হবে, আইন শিখতে হবে।

—একটা কথা বলব মা ?

—বল।

—হেকারনেহেহ্‌কে ওদের দুজনাকে পড়াতে বললে হয় না ?

—কিন্তু তিনি তো শুনেছি মুতনেফার্তের ছেলেকে পড়ান।

রানী অহমেস কখনো জ্যেষ্ঠপুত্রকে বড় রাজকুমার বলে ডাকতে চান না। তিনি মনেপ্রাণে তাকে ফ্যারাও-এর পুত্র বলে মানতে পারেন না। কখনো তার প্রসঙ্গ উঠলে বলেন, মুতনেফার্তের ছেলে।

—হ্যাঁ। তাতে ক্ষতি কি ? উনি খুব ভাল পড়ান। তাছাড়া কত নাম। একজন বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তি। প্রশাসনেও অনেক অভিজ্ঞতা।

—তুমি দেখছি সবই জেনে বসে আছ। কোথায় জানলে এত সব ?

—আমি অনেকের কথাই জানি।

—ভাল কথা। কিন্তু তোমাকে যিনি পড়ান, তিনি কি অক্ষম ?

—না, কখনো নয়। তবে বয়স হয়েছে তাঁর। দুই রাজপুত্রকে সামলান তাঁর পক্ষে অসুবিধা হবে। ওদের পিঠের কানকে সজাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

—তুমিও জেনে ফেলেছ ?

হতশেপসুত এবারে হেসে ফেলে। তারপর সেই বিদ্যালয়ে যাবার অভিজ্ঞতার কথা বলে। সেখানে শিক্ষক নেকো নামে একটি ছাত্রের পিঠে কেমন করে বেত্রাঘাত করেছিল, সেকথাও বলে।

রানী গম্ভীর হয়ে বলেন—এ কথা মিথ্যা নয়।

—জানি। কিন্তু আমার দুই ভাই-এর পিঠের কানকে তিনি কি সজাগ করতে পারবেন ? অত শক্তি তাঁর নেই এখন।

—তুমি কি ভাবছ, ওদের দুজনাকে চাবুক খেতে হবে ? সেটা হতে দেব না। ফ্যারাও-এর পুত্রের সম্মান আছে।

—ওদের পিঠের কান যথেষ্ট সজাগ। সেইজন্যেই হেকারনেহেহ্‌-এর মত একজন জ্ঞানী ব্যক্তির ওপর ওদের ভার দিলে ভাল হয়!

—মুতনেফার্তের ছেলেকে যে পড়ায় সেই একই ব্যক্তি পড়াবে আমার ছেলেদের ? কখনো নয়।

হতশেপসুত নিরাশ হয়। মায়ের কথার ওপর কথা বলতে পারে না সে, যে মা বহুদিন পরে তাকে এমনভাবে কাছে টেনে নিয়েছেন। মায়ের ব্যবহার সবার সঙ্গে বেশ ভদ্রোচিত। এমনকি মুতনেফার্তের সঙ্গেও যখন কথা বলেন, তখনো অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে তাঁকে।

সে তাই বলে—তুমি যা ভাল বুঝবে, তাই হবে।

—তোমার হঠাৎ হেকারনেহেহ্-এর জন্যে এত আগ্রহ কেন?

—উনি খুব ভাল পড়ান। কিন্তু তোমার যখন এত আপত্তি তখন দরকার নেই।

—ঠিক আছে, আমি তোমার আগ্রহের কথা ফ্যারাওকে বলব।

হতশেপসুতের খুব আনন্দ হয়। মা যেন আজকে একেবারে অন্যরকম। একেবারে সবার মায়ের মত। বিদ্যালয়ে সেদিন কত মাকে দেখেছিল সে। ছেলেদের জন্য কত আকুলতা।

সে মায়ের হাঁটুতে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে—তুমি খুব ভাল।

মা বলে—তোমাকে তো আসল কথাই বলা হয়নি এখনো।

—কি কথা?

—শুনলাম, তুমি সাজতে একটুও ভালবাস না। কিন্তু সাজতে যে হবেই। তুমি তো পুরুষ মানুষ নও। পুরুষদের পরচুলা থাকে। মেয়েদেরও অবিশ্যি থাকে। কিন্তু পুরুষদের দাড়ি গোঁফ চুল সব কিছুই ঢাকা পড়ে যায় কৃত্রিম জিনিসের আড়ালে। মেয়েদের তো সব কিছু ঢাকা যায় না। তাছাড়া যে সুন্দরী, তার আসল রূপটা দেখানোই তো ভাল।

হতশেপসুত বলে—আমি জানি তোমাকে কে বলেছে। কিন্তু সে তো অনেকদিন আগের কথা।

—কিসের কথা বলছ?

—না কিছু না। তোমাকে ওই বুড়িটা বলেছে নিশ্চয়।

—কোন্ বুড়িটা?

—আমি জানি। ওকে আমি প্রাসাদের প্রাচীরের বাইরে দূর করে দেব। ফ্যারাও-এর ধাত্রী ছিল বলে ভেবেছে কি?

—আমাকেও দেখেছে এতটুকু বয়স থেকে। ও আমাদের মঙ্গল চায়। পৃথিবীর সবাই আমাদের বিরুদ্ধে গেলেও ও আমাদের সঙ্গে থাকবে।

বেশ সুন্দর কথা হচ্ছিল মায়ের সঙ্গে। ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল জীবনে প্রথম। হঠাৎ হতশেপসুতের মধ্যে দুষ্টুবুদ্ধি জেগে ওঠে অজ্ঞাতে। সে ফস্ করে বলে ফেলে—আচ্ছা মা, তুমি ফ্যারাওকে ভালবাস?

মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে সাংঘাতিক ভুল করে ফেলেছে। কিন্তু আর উপায় নেই।

সে অনুভব করল তার কেশদামের মধ্যে মায়ের সঞ্চালনশীল আঙুলগুলি শক্ত হয়ে থেমে গেল। তাঁর হাঁটুর কাছের মাংসপেশী কেমন সঙ্কুচিত হল। তাঁর দেহটা আড়ষ্ট—অদূরের বাস্ত্-এর মূর্তির মত। তাঁর চোখ দুটির দিকে চাইতে

ভরসা হল না। বুঝতে পারে, নিজে বুদ্ধিমতী বলে গোপন গর্ববোধ থাকলেও, তার বালিকাসুলভ চাঞ্চল্য কাটাতে পারেনি। বুদ্ধিও পরিণত হয়নি।

অনেকক্ষণ পরে মা অদ্ভুত গলায় বলেন—এ কথা তোমাকে কে বলেছে?

—কেউ বলেনি তো।

—নিশ্চয় বলেছে। নইলে এই বয়সে তোমার মনে এ কথা আসতে পারে না। সত্যি কথা বল।

হতশেপসুতের সত্যিই মনে পড়ে না, কে তাকে এ কথা বলেছে। সে ভাবতে থাকে। আরও ছোটবেলায় একথা বলাবলি করতে শুনেছে সে। কিন্তু বিশেষ কেউ বলেনি তাকে।

—কি হল? কে বলেছে?

হতশেপসুত এক হাত উঁচিয়ে মাকে নীরব থাকতে বলে ভাবে—আমি মনে করার চেষ্টা করছি।

একটু পরে সে মাকে বলে—আমার মনে হয়, হারেমের ক্রীতদাসী আর বাঁদীদের মধ্যে আলোচনা শুনেছি আরও ছোটবেলায়। ঠিক বলতে পারব না কারা বলাবলি করেছে। হয়ত তারা এখন আর হারেমে নেই।

—কি বলত তারা?

—বাবা বেঁটে, মাথায় টাক, দাঁত উঁচু, দেখতে খারাপ। তুমি কত সুন্দরী। তাই মনে মনে বাবাকে পছন্দ কর না। দেখতে অনেক সুন্দর পুরুষকে তুমি বিয়ে করতে পারতে। যাকেই বিয়ে করতে, সে ফ্যারাও হত।

একটু থমকে থেকে সম্রাজ্ঞী বলেন—পছন্দ না হলে ওকে বিয়ে করে ফ্যারাও হতে দেব কেন? ও আমার পিতামহের মত দেখতে হয়েছে।

—আমিও সেই কথা ভাবি।

—আর সব ভুলে যাও।

—হ্যাঁ, ভুলে যাব।

মেয়ের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ছন্দপতন ঘটে গিয়েছে। আগের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। হতশেপসুত একটু অস্বস্তি নিয়ে মায়ের সাজঘর থেকে চলে যায়। সম্রাজ্ঞী অহমেস অবিচল থাকলেও মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবেন, যে সব দাসী সর্বক্ষণ তাঁকে সঙ্গ দেয় তারা শত হলেও নারী। অপর একজন নারীর অন্তরের কথা তাদের পক্ষে একদিন দুদিনে না হোক, দিনের পর দিন পাশে পাশে থেকে বুঝতে পারা অসম্ভব নয়। তাছাড়া তারা কি শোনেনি, মিশরের রাজকন্যাদের কুমারী জীবনের কাহিনী? এও এক ধরনের প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলা যেতে পারে। হয়ত তাঁর কন্যাও একদিন যৌবন-জ্বালায় জর্জরিত হয়ে হুকুম পাঠাবে কোন সুন্দর বলিষ্ঠ ক্রীতদাসের কাছে। তার নিজস্ব পরিচারিকা গিয়ে সেই ক্রীতদাসকে রাজকুমারীর আদেশের কথা জানাবে। প্রথমে সে ভীত হয়ে পড়বে। তারপর পরিচারিকা মিষ্টি কথায় তাকে অভয় দিলে সে কিছুটা ভরসা পাবে। তাঁর নিজের বেলাতেও শুধু একটিবার তেমন হয়েছিল। তিনি হারেমে ফেরার

পথে প্রাসাদের ভেতরে দেখেছিলেন একজন সুদর্শন ক্রীতদাসকে কোন অপরাধের জন্য বেঁধে রাখা হয়েছে। শাস্তি পাবে সে। তিনি তাঁর পরিচারিকা মারফৎ হুকুম পাঠিয়েছিলেন ওকে শাস্তি না দেবার জন্য। রাজকুমারীর নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গে পালন করা হল। পরিচারিকা তখন ক্রীতদাসকে একান্তে ডেকে বলেছিল —চল, আমার সঙ্গে। রাজকুমারী ডেকে পাঠিয়েছেন তোমাকে। তাঁর ঘরে সন্ধ্যা কাটিয়ে আসবে।

সম্রাজ্ঞী অহমেসের এখনো স্পষ্ট মনে আছে সেই ক্রীতদাসটি ছিল পূর্ব-দেশের কোন স্থানের। সুন্দর দেখতে ছিল। এখনো চোখের সামনে ভাসে তার দেহটি। চিরকাল মনে থাকবে। কারণ জীবনে সে-ই প্রথম পুরুষ। বোধহয় ইউফ্রেটিস নদীর তীরে কোন গ্রামে তার শৈশব কেটেছিল। সে ভাঙা ভাঙা মিশরীয় ভাষায় রাজকুমারী অহমেসের কথার জবাব দিচ্ছিল। শুনতে খুব মিষ্টি লেগেছিল তাঁর, তারপর জীবনে অন্য কোন পুরুষের অত মিষ্টি কথা তিনি আর শোনেননি। যেন স্বয়ং হোরাস ক্রীতদাসের রূপ নিয়ে এসেছেন। শুধু সেই একবারই এমন হয়েছিল। তখনো তাঁর যৌবন তত পরিণত নয়। অন্য প্রাসাদবাসিনীদের এমন ডেকে আনতে দেখেছিলেন আগে। তাঁরও শখ হয়েছিল। সেই শখের স্মৃতি আজও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করে।

ক্রীতদাসটি প্রথম প্রথম ভীত কণ্ঠে তাঁর কথার জবাব দিচ্ছিল। তারপর কেন যেন তিনি তার সর্বাঙ্গে হাতে বুলিয়ে দিতে থাকেন। অন্য ধরনের দেহ দেখে তেমন ইচ্ছা করেছিল। এতে তার ভীতিভাব কেটে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। তার দন্তপংক্তিও ছিল সুন্দর। অহমেস তখন অন্যান্য নারীদের বেলায় যেমন দেখেছেন, তেমনিভাবে তার গ্রীবাবেষ্টন করে তাকে নিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন শয্যায়! এরপর ক্রীতদাস সাহসী হয়ে উঠেছিল। হয়ে উঠেছিল হোরাস। অহমেস তখন গৌণ।

তারপর কত বছর কেটে গেল। সে কোথায় কে জানে। হয়ত তাকে পশ্চিমের কোন উপত্যকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পাথর কেটে মৃত ফ্যারাওদের জন্য চিরন্তন আবাসস্থল নির্মাণের জন্য। কারণ একবার হারেমে প্রবেশ করলে তাকে রাজধানীতে রাখা অসুবিধা। বাইরের লোকে অনেক কিছু জেনে ফেলতে পারে। সে ছিল সামান্য ক্রীতদাস আর থুথমস হলেন সাক্ষাৎ ফ্যারাও। অথচ কত পার্থক্য। তিনি শুধু রানীর স্বামী নন, সহোদর না হলেও ভাই তো বটে। তবু তাঁর জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ জন্মায়নি কখনো। সন্তান অবশ্য হয়েছে তাঁদের। না হবার কথা নয়। কিন্তু থুথমসের আরও সন্তান আছে নিশ্চয়। রানী যদিও তাঁর দুইজন। কিন্তু ফ্যারাও-এর নিজস্ব যে হারেম রয়েছে তার অবকাশ বিনোদনের জন্য সে নারীর অভাব নেই। সেই হারেম রক্ষণাবেক্ষণের জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ রয়েছে। সেই হারেম প্রহরার জন্য অনেক প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে। যাতে কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। কোন হারেমবাসী নারী যাতে বাইরে না বের হতে পারে সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। ওখানে যেসব নারী থাকে, তারা যে শুধু ফ্যারাও-এর জৈবিক চাহিদা মেটায় তাই নয়,

তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক কুশলী গায়িকা, রয়েছে নৃত্যপটিয়সী।

ফ্যারাওদের নিজেদের চাহিদা মেটাতে যখন এত বিপুল আয়োজন তখন রাজকুমারীরা যদি এক আধজন ক্রীতদাসকে মাঝে মধ্যে নির্বাচিত করে তাদের কক্ষে নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করে তাতে কারও কিছু বলার থাকে না। বলেও না কেউ। এটাই প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওরা তিনজন সূর্যের উত্তাপ একটু কমতে না কমতেই প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে আসে রক্ষী না নিয়ে। তবে অলক্ষ্যে রক্ষীরা অনুসরণ করে ওদের। ফ্যারাও-এর তেমনই নির্দেশ। ওরা যাতে কখনো বুঝতে না পারে, ওদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। ফ্যারাও নিজেও শৈশবে সেটা পছন্দ করতেন না। এখনো মনে আছে সেকথা।

হতশেপসুত দুই ভাই-এর হাত ধরে এগিয়ে যায়। সূর্যাস্তের পর অন্ধকার হয়ে আসার আগেই প্রাসাদে ফিরতে হবে। হতশেপসুত জানে তার স্বাধীনতা অবাধ। এই স্বাধীনতা বোধহয় তার ভাই দুটিরও নেই। কারণ সে জানে এই মহান দেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় কন্যারা। মায়ের সম্পত্তি কন্যা পায়। এইভাবেই বংশের পর বংশ চলে। পুরুষদের কোনই অধিকার নেই। তাই ফ্যারাও হতে হলেও নির্ভর করতে হয় কোন ফ্যারাও-কন্যার ওপর। শুধু ফ্যারাও-এর বংশের কথাই নয়, মিশরের যারই কোন সম্পত্তি রয়েছে সেই সম্পত্তির অধিকারিণীর মৃত্যু হলে সেটি পাবে তার কন্যা। সুতরাং মেয়েদের স্বাধীনতার শেষ নেই এই দেশে। মেয়েরা ছেলেবেলা থেকেই এ বিষয়ে সচেতন। হতশেপসুত আরও বেশী সচেতন। কারণ বেশী বুদ্ধিমতী সে। দুই পাশে দুই ভাই-এর হাত ধরে এগিয়ে চলে সে। ডানদিকে উয়াচমেস, বাঁয়ে অমেনমেস। সে উয়াচমেসের হাতে একটু চাপ দেয়। উয়াচমেস সেই মৃদু চাপ বুঝতে পারে না। অথচ এই চাপের মাধ্যমে হতশেপসুত মনের অনেকখানি ঢেলে দিল ভাইকে। তাতে ছিল প্রগাঢ় স্নেহ, কারণ প্রেম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তার মধ্যে এখনো জন্মায় নি। হয়ত জীবনেও জন্মাবে না। কারণ প্রেম তো অমন বাঁধা রাস্তায় আসে না। ফ্যারাও পরিবারের সব কিছুই ছকে বাঁধা। তবে তার মধ্যেও প্রেম জন্মায় বৈকি কখনো-সখনো। হতশেপসুতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে সেই স্বাদও পেতে পারে। তবু সেটা আশা করা উচিত হবে না। কারণ ফ্যারাওদের জীবন একজনমাত্র নারী-কেন্দ্রিক হতে পারে না। ভবিষ্যৎ বংশধরের কথা ভাবতে হয়। ফ্যারাওকে তাই বহুবল্লভ হতে হয়। তাই প্রেম কখনো দানা বাঁধতে পারে না। কিন্তু তবু ওই স্নেহ আর সহোদরের ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত ও নিরাপদ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হতশেপসুতের হৃদয়কে অনেকখানি দ্রবীভূত করল এবং সেটিকে প্রবাহিত করে দিল উয়াচমেসের মধ্যে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চবরোসের কথা তার একটুও ভাবতে ইচ্ছা করে না। তাকে দেখে কখনো স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কেমন যেন কৃত্রিম। নিজের মধ্যে নিশ্চয় তার যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। সেই দুর্বলতাকে গোপন রাখার জন্য বাইরে একটা বীরত্বব্যঞ্জক খোলশ পরে থাকে।

তাই উয়াচমেস তার প্রথম পছন্দ। মনে মনে এমন একজন দেবীকে মাঝে মাঝে প্রার্থনা জানায় হতশেপসুত যাঁর স্বামীকে সে পছন্দ করে না। সেই স্বামী হলেন সেথ। নিজের সহোদরা এবং স্ত্রী নেফথিসের সঙ্গে সেথ-এর ঘনিষ্ঠতা বিনষ্ট হয় ভাইকে হত্যার পর। ওসিরিস খুন হলে নেফথিস কাতর হয়ে পড়েছিলো। বেগতিক দেখে সেথ নেফথিসকে ছেড়ে ত-আর্তের কাছে গিয়ে তাঁকে স্ত্রী করার মনোবাসনা জানালো। ত-আর্ত সম্মত হলেন। এঁর কাছে হতশেপসুত প্রার্থনা জানায় উয়াচমেসের সন্তান যেন সে গর্ভে ধারণ করে। কারণ ত-আর্ত গর্ভসঞ্চারের দেবী। জলহস্তী দেখলে আগে হতশেপসুত বিরক্ত হত। এখন আর হয় না। এখন জলহস্তীর মধ্যে একটা সম্ভাবনার সঙ্কেত পায়। তাই চোখের দৃষ্টি সিক্ত হয়ে ওঠে এই বিরাটাকার পশু দেখলে। কারণ ত-আর্তের প্রতীকী এটি।

উয়াচমেস সহসা দাঁড়িয়ে পড়ে।

হতশেপসুত বলে—কি হল ?

—কি ভাবছ অত ?

লজ্জিত হয় হতশেপসুত। বলে—কিছু না।

অমেনমেস হেসে ওঠে তার কথা শুনে।

উয়াচমেস জিজ্ঞাসা করে—হাসলি কেন ?

হতশেপসুতকে দেখিয়ে অমেনমেস হাসতে হাসতে বলে—ও কিছুই ভাবছে না। আমরা যেন বোকা।

হতশেপসুত ওর গাল টিপে দিয়ে বলে—খুব চালাক হয়েছিস। বল তো কি ভাবছিলাম ?

—তা কি করে বলব ? আমি কি দেবতা ?

—তাহলে কি করে বুঝলি ?

—তুমি আমাদের হাত চেপে ধরে নিয়ে আসছিলে। তারপর সেই হাত ঢিলে হয়ে গেল। এখন দেখ আমরা তোমার হাত ধরে রয়েছি।

—কী দুষ্টু ছেলে, দেখেছ ?

ওরা তিনজনে হেসে ওঠে। অদূরে একটি বালিয়াড়ির আড়াল থেকে রক্ষীরা নজর রাখে। তারা সেই হাসির কোন অর্থ খুঁজে পায় না। পাবার কোন কথাও নয়।

ওরা আরও কিছু দূরে এগিয়ে যায়। একটা উঁচু মত স্থানে গিয়ে ওঠে। সেখান থেকে সূর্যের দিকে তাকায়। ধু ধু প্রান্তর, মাঝে মাঝে বালির ঢিবি। কোথাও কোথাও একটা দুটো খেজুর বা অন্য কোন গাছ। সূর্য ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে। ওরা মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকে। যেন সাক্ষাৎ দেবতাকে দেখছে।

অমেনমেস হঠাৎ বলে ওঠে—সূর্যের ভেতরে কিরকম ফেটে ফেটে যাচ্ছে। তাই না ?

হতশেপসুত বলে—কে বলল ?

অমেনমেস বলে—আমি দেখলাম। মনে হল, অনেক আগুনের মধ্যে কি সব

ফাটছে, শুধু ফাটছে।

উয়াচমেস গম্ভীর হয়ে বলে—হতে পারে। ওর কথা ফলে যায়। আর এক-দিন বলেছিল, বিকেলে ঝড় উঠবে। ঠিক উঠেছিল।

হতশেপসুত বলে—কি জানি। নৌকোতে উঠবেন তাহলে কি করে? একটু পরেই তো অন্ধকারের দেশে গিয়ে প্রবেশ করবেন নৌকো নিয়ে।

দুই ভাই-এর মাথা ভগিনীর অকাট্য যুক্তি শুনে শ্রদ্ধাবনত হয়।

অমেনমেস বলে—আমি নিশ্চয় ভুল দেখেছি। আমি অমন অনেক ভুল দেখি। পিমাই বলে দেখা ওসব ভাল নয়।

—পিমাই কে? তোমার বান্দা?

—হ্যাঁ। সে বলে, আমি যা দেখি সব নাকি সত্যি। এত বেশী সত্যি দেখলে অমন রা তাড়াতাড়ি কাছে টেনে নেন।

হতশেপসুত রেগে ওঠে—পিমাই বলেছে! এত বড় আস্পর্ধা?

—না না, ওর কোন দোষ নেই। আগে বল ওকে কিছু করবে না?

—কিন্তু ও কেন এইসব বাজে কথা বলল।

—ওর এক ভাই ছিল। ওর চেয়েও ছোট। ওরা থাকত থিনিসে। অনেক দূর তাই না?

—হ্যাঁ, ওর ভাইয়ের কি হল?

—বলছি, কিন্তু পিমাইকে শাস্তি দেবে না তো? কথা দাও।

—ঠিক আছে। কথা দিলাম।

—সেই ভাই এইরকম সব দেখত।

—কি দেখত?

—আমি যেমন ভুল দেখি। সূর্যের মধ্যে ফাটতে দেখি, ঝড় উঠতে দেখি, আরও কত কি। আমি বোধহয় ভুল দেখি। কিন্তু সে যা দেখত সব সত্য হয়ে যেত।

—কি দেখেছিল সে?

—কত কিছু। কার ছেলে হবে, কার মেয়ে হবে বলে দিতে পারত। কারও অসুখ হলে সে বাঁচবে কিনা বলে দিত। ফসল কেমন হবে, ফ্যারাও যুদ্ধে যাবেন কিনা সেই বছরে—সব বলে দিত। কত লোক আসত ওর কাছে। একটা বড় পাথরের ওপর বসে ও বলত এইসব কথা। সবাই ওর বাবাকে বলত ফ্যারাও-এর কাছে নিয়ে আনতে। ভয়ে ওর বাবা আনতে চায়নি। যদি বেফাঁশ কিছু বলে দেয়?

—তারপর কি হল?

—গ্রামের লোকেরা অনেক বলে কয়ে পিমাই-এর বাবাকে রাজী করায়। সব শুনে পিমাই-এর ভাই হেসে বলে—ওখানে আমি যেতে পারব না। শিগ্‌গিরই আমার মৃত্যু হবে।

রুদ্ধশ্বাস হতশেপসুত প্রশ্ন করে—তারপর?

দুদিন পরেই সাপের কামড়ে সে মরে গেল।

হতশেপসুতের বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে। সে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে চাইতে থাকে। এই নির্জন জায়গায় ওসবের দেখা মেলে মাঝে মাঝে। সে মনে মনে পবিত্র উরেউস সর্পদেবতাকে প্রার্থনা জানায়। কারণ তিনি মন্দিরে দেবতাদেরও রক্ষাকর্তা। অমেনমেসকে যেন তিনি রক্ষা করেন। তাছাড়া সবার ওপর রয়েছেন দেবী আইসিস। তিনিও সর্পজাতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন। কিন্তু এই মুহূর্তে সে মনে মনে বহুমূল্যবান রক্তমুখী প্রস্তর এবং নানান ধরনের লাল রঙের কাচ ও প্রস্তরের তৈরী কবচের অভাব অনুভব করে। অমেনমেসকে পারিয়ে দিত।

অমেনমেস বলে—আমি হথোর দেবীকে মনে মনে ভালবাসি। পূজা করি।

উয়াচমেস বলে—নাম শুনেছি। কিন্তু কিসের দেবী তিনি?

হতশেপসুতের চোখেও বিস্ময়।

অমেনমেস বলে—বাঃ, তিনি তো আমাকে দেখা দেন। কী সুন্দর দেখতে। মায়ের চেয়েও কত সুন্দর। তুলনাই হয় না। তাঁর মুখে চোখে সব সময় আনন্দ আর স্ফূর্তি। চোখ দুটোতে কত ভালবাসা। আমি দেখেছি তাঁকে। কথাও শুনেছি। তিনি সবার মঙ্গল চান।

—কথা বলেছিস? তাঁর সঙ্গে?

উয়াচমেস ভাবে তার ছোট ভাই বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছে। তার মুখে এসব কথা কখনো শোনেনি। তবে এটা ঠিক, সেও সব সময় আনন্দসাগরে ভাসে তার দেখা দেবী হথোরের মত।

হতশেপসুতের কাছে নিজের কনিষ্ঠতম ভ্রাতাকে অপরিচিত কেউ বলে মনে হচ্ছে আজকে। এ যেন অন্য কেউ।

তার মুখের দিকে চেয়ে অমেনমেস বলে—তুমি নিশ্চয় হথোর দেবীর কথা জান। তুমি কত সব জান।

হতশেপসুত মাথা নীচু করে ভাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে—আমার স্পষ্ট ধারণা নেই। আমাকে বলে দে।

অমেনমেস বলে—কখনো যদি তুমি কোন দেবীকে দেখ যাঁর মুখ গাভীর মত, মাথায় একজোড়া শিংও রয়েছে। শুধু দুই শিং-এর মাঝখানে গোলাকার চকচকে একটি জিনিস, বুঝবে তিনিই দেবী হথোর। ওটাই তাঁর বাইরের রূপ। আসলে তিনি অসামান্যা সুন্দরী। সত্যিই তুমি জান না?

—না।

অমেনমেসের তখন অন্য রূপ। তাকে দেখায় বিজ্ঞের মত। হতশেপসুতের মনে হয়, সত্যই এমন বালক হয়ত পৃথিবীতে বেশী দিন থাকে না। তার কান্না পায়।

বালক বলে—তাঁকে দেশের কোথাও কোথাও হেত্-হের্তও বলে। শোনোনি?

—না।

—নুত অর্থাৎ আকাশ-গৃহই হচ্ছে আমাদের প্রিয় হোরাস দেবতার গৃহ। আমরা গাভীদের সবচেয়ে প্রথমে পশ্চিম দেশ থেকে নিয়ে আসি। গাভীর রূপ

নিয়ে হথোর দেবী রা দেবতার স্ত্রী। আইসিসের দুর্দিনে যখন তিনি তাঁর স্বামীর মৃতদেহ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন উন্মাদিনীর মত তখন এই হথোর দেবীই হোরাসকে স্তন্যপান করিয়ে বড় করেছিলেন। সেই জন্যেই বিশেষ করে তিনি পশ্চিম দিক থেকে নিয়ে আসা গাভীর রূপ ধারণ করেন। সেই রূপেই তিনি পূজিত। সত্যিই তুমি জান না?

হতশেপসুত ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তারপর ভাইকে জড়িয়ে ধরে বলে—না। কিন্তু তুই এত সব কি করে জানলি?

—আমি জানি।

—কোথা থেকে জানলি?

—তা তো জানি না।

নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য হতশেপসুতের আশঙ্কা হয়। এ যেন অবাস্তব কিছু দেখছে। সামনের বালকটি যেন তার ভাই নয়। রক্তমাংসেরও কেউ নয়। এ জগতেরও নয়। হঠাৎ এমন হল কেন? এর চেয়ে তার ভাই সাধারণ বালকের মত হবে সেটাই ভাল। এ যে অসহনীয়।

উয়াচমেস সেই সময় তাকে পরীক্ষা করার জন্য বলে—আচ্ছা বল তো, এখন নগরীতে কি ঘটছে?

ওপর দিকে একটু চেয়ে নিয়ে অমেনমেস বলে—ঘটনা তো সব সময়েই ঘটে। কিন্তু এই মুহূর্তে যা ঘটছে তাতে তোমাদের মন খারাপ হয়ে যাবে। খুবই খারাপ হবে।

—কি ঘটছে?

—আবানার পুত্র অহমেস চলে যাচ্ছেন।

—কোথায়?

অমেনমেস হাত উঁচিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে দেয়।

হতশেপসুত আর উয়াচমেস বিমূঢ় হয়ে যায়। তারা তিনজনে ছুটতে শুরু করে নগরীর দিকে। তাদের লক্ষ্য আবানা-পুত্র অহমেসের গৃহ। প্রাসাদ থেকে খুব বেশী দূর নয় সেই গৃহ।

ছুটতে ছুটতে অমেনমেস হাঁপাতে হাঁপাতে হতশেপসুতকে বলে—তুমি পিমাইকে শাস্তি দেবে না তো?

—না—না—না।

তাদের নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত রক্ষীরাও ছুটতে থাকে আড়ালে আড়ালে। তাদের মধ্যে একজনের মেদবহুল চেহারা। সে ছুটতে ছুটতে একটি পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। তবু ছুটতে হবে। না ছুটলে কপালে শাস্তি। সে ছুটতে থাকে আর মুণ্ডপাত করতে থাকে রাজকন্যা আর রাজপুত্রদের।

সারা পথটা হতশেপসুত জানা-অজানা সমস্ত দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা জানাতে জানাতে চলে, অমেনমেসের কথা যেন মিথ্যা হয়। তার কথা ফলে গেলে সে হয়ত সত্যিই আর বাঁচবে না।

কিন্তু অতি বৃদ্ধ আবানা-পুত্রের গৃহের সামনে উপস্থিত হয়ে হতশেপসুত

কনিষ্ঠতম ভ্রাতার কথার নির্মম সত্যতার প্রমাণ পেল। গৃহের সম্মুখে বহু মানুষের ভিড়। তারা সবাই বৃদ্ধের গুণমুগ্ধ। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ফ্যারাও-এর বাহিনীর অতীতের সেনানী, যারা স্বচক্ষে দেখেছে বৃদ্ধের অমিতবিক্রমের পরাকাষ্ঠা। তাদের অনেকেরই নয়ন শুষ্ক ছিল না। ওরা তিনজনও কেঁদে ফেলে। সবাই চিনতে পারে ওদের। পথ ছেড়ে দেয় সসম্মানে, ভেতরে প্রবেশের জন্য। ওরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। তারপর গিয়ে পৌঁছোয় সেই কক্ষটিতে যেখানে শায়িত রয়েছে বৃদ্ধ একটি অতি সাধারণ কাষ্ঠনির্মিত শয্যায়। জীবনে অনেক উপার্জন করেছে সে। কিন্তু কোনদিন এতটুকু বিলাসকে প্রশ্রয় দেয়নি। তার বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল এতটুকু বিলাসও একজন যোদ্ধার পক্ষে মারাত্মক। এতে যোদ্ধার কর্মক্ষমতা, তার তৎপরতা, এমনকি তার মানসিক বলও ভীষণভাবে হ্রাস পায়। তার নিজের জীবনেই তার বিশ্বাসের সত্যতা যাচাই হয়ে গিয়েছে।

হতশেপসুতের মনে হল, একটি অতি পরিপক্ক ফল বৃন্ত থেকে আলগোছে টুপ করে খসে পড়েছে। কোনরকম চেষ্টা নেই এভাবে পড়ে যেতে, তাই বৃদ্ধের মুখে অঙ্কিত রয়েছে অপরিসীম প্রশান্তি। যন্ত্রণার লেশমাত্র চিহ্নও নেই তাতে। ওরা ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে আসে।

উয়াচমেস বলে—ওঁর সমাধির ব্যবস্থা তো নিজেই করে রেখেছেন।

হতশেপসুত বলে—হ্যাঁ।

—তবু ফ্যারাওকে বললে হয়।

উয়াচমেসের কথা শেষ হতে না হতে দেখা গেল ফ্যারাও-এর অশ্বচালিত দ্বিচক্রযান। সঙ্গে অনেক রক্ষী। বুঝতে পারে ফ্যারাও এসে পৌঁছোলেন শেষ দর্শনের জন্য।

ফ্যারাও তাদের দেখতে পান অবতরণের সময়। কিন্তু না দেখার ভান করেন। চোখে সেই উদাস দৃষ্টি, যা প্রমাণ করে মানুষ হয়েও তিনি দেবতা। ওই দৃষ্টিতে আর ওই মুখে হর্ষ বিষাদ ক্রোধ আনন্দ কিছুই প্রতিভাত হয় না। ওঁর মাথায় উত্তর-দক্ষিণের মিশরের দ্বিমুকুট, ওঁর শ্মশ্রু ইত্যাদির মত ওঁর মুখও যেন একটি মুখোশ। ওরা এতে অভ্যস্ত। ওরাও এমন ভাব দেখায় যে উনি যেন ওদের পিতা নন। অন্যান্য প্রজাদের মত ফ্যারাওকে নির্বিকার অভিবাদন জানিয়ে প্রাসাদ অভিমুখে রওনা হয় তিন ভাই বোন।

ওরা আনন্দিত হয় ফ্যারাওকে স্বয়ং আসতে দেখে। এতেই প্রমাণিত হয় বৃদ্ধের জন্য মিশরবাসীর হৃদয়ের কত উঁচুতে আসন পাতা ছিল।

কত আনন্দ নিয়ে ওরা আজ প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে বের হয়েছিল। অথচ প্রাসাদের সুবিশাল প্রাঙ্গণে গিয়ে প্রবেশ করল যখন চিত্ত তখন বিমর্ষ। সূর্য-দেবের মত তারাও যেন অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করল। প্রাসাদের ঘরে ঘরে বাতি জ্বালাবার আয়োজন চলছে। পরদিন যখন সূর্যদেবের উদয় হবে, তখন সেই সূর্যদেবকে দেখার জন্য আবানার পুত্র অপেক্ষা করবে না আর। সে বলত সূর্যোদয় দেখা ছিল তার প্রতিদিনের নেশা। সূর্যদেব নতুন করে উদিত

প্রতিদিন। ফ্যারাও যেমন নতুন করে জন্ম নেন, তেমনি সেও নবোদিত সূর্যের কাছে নতুন ভাবে বেঁচে থাকার শিক্ষা নিত। নতুন উদ্যম, আশা আর আকাঙ্ক্ষায় মনটাকে ভরিয়ে নিত। কতবার সে বলেছে তাদের কাছে। বলেছে, সূর্যময় এই দেশে বা দেবতার কাছ থেকে আমরা অহরহ প্রেরণা পাই। লেখাপড়া শেখার মত, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় মত, অঙ্ক শিক্ষার মত এই প্রেরণা লাভের জন্য যে শিক্ষা সেটিও গ্রহণ করা বড় কঠিন। সবাই গ্রহণ করতে পারে না।

হতশেপসুতের বৃদ্ধ শিক্ষকও কখনো এমন প্রাঞ্জল ভাষায় সূর্যের এই মাহাত্ম্যের কথা বুঝিয়ে বলেন নি। আবানার পুত্র কথার ছলে গল্পের ছলে তাদের অনেক শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছে। তার কথাগুলো অত সহজ হত, কারণ সে কর্মময় জীবনের মধ্যে থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, কিতাবের মাধ্যমে নয়।

খবরটা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চবরোসের মুখেই প্রথম শুনল। শুনে বিস্মিত হলেও একটা চাপা আনন্দে মনটা ভরে উঠল। যেন না চাইতেই তপ্ত মরুভূমিতে বারি-বর্ষণ। সে বেশ কিছুদিন থেকে কায়মনোবাক্যে চেয়ে আসছিল হেকারনেহেহ্ যেন তার ছোট দুই ভাইয়ের শিক্ষক হন। শুধু তাঁর প্রতিপত্তির জন্য নয়, তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতারও নাকি তুলনা নেই। এমন একজন শিক্ষকের হাতে দুই ভাই পড়লে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যারাও হতে হলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, সেই যোগ্যতারও শিক্ষা পাবে। তাছাড়া গৃহশিক্ষক রূপে হেকারনেহেহ্ অত্যন্ত কড়া বলে শুনেছে সম্প্রতি। রাজকুমার বলে রেয়াত করেন না একটুও। শুনে ভাল লেগেছিল হতশেপসুতের। শিক্ষক হবেন শিক্ষকের মত। বিশেষ করে সেবার বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রের চাবুক খাওয়া দেখে প্রথমে চমকে উঠলেও, পরে ভেবে দেখেছে ওইটুকু যন্ত্রণার প্রয়োজন রয়েছে ছাত্রদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যই। তারা জানেও সে কথা। নইলে ছাত্ররা নিজেরাই সেদিন শিক্ষকের দেওয়া ওই শাস্তিকে ওভাবে সমর্থন করত না।

প্রাসাদের সরোবরের উত্তর দিকে যেখানে বিদেশ থেকে নিয়ে আসা কয়েকটি বৃক্ষ বড় হয়ে কিছুটা ছায়ার সৃষ্টি করেছে সেখানে একাই বসে ছিল হতশেপ-সুত। কনিষ্ঠদের সঙ্গে আনেনি। তারা দুজনাই ঘুমিয়ে রয়েছে।

সাধারণত তারা ঘুমোয় না। রাত্রে বোধহয় ভাল ঘুম হয় নি। হবে কি করে। একটা সিংহশাবককে যোগাড় করেছে কোথা থেকে। সারাদিন সেটিকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কখনো দুধ দিয়েছে, কখনো মাংসের টুকরো দিয়েছে। কোন কিছুই খায়নি সেই শাবকটি। শেষে অনাহারে থেকে নেতিয়ে পড়লে পশু-বিশারদ একজনকে ডেকে পাঠান হয়। সে শিখিয়ে দেয় কি করে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে হয়। তখন থেকে নবোদ্যমে তারা খাওয়াতে শুরু করে। ভাবে, সিংহশাবকের উদর যেন আকাশ দেবী নুত কিংবা আকাশের দেবতা নু-এর মত অনন্ত! সারারাত বোধহয় ওই কাণ্ড চলেছে। সকালে দেখা গেল সিংহের ছানাটি বেশ কাহিল। তার সারা গায়ের লোম দুধে সিক্ত এবং চট্‌চটে। তখন

তাকে আবার নিয়ে যাওয়া হয় সুস্থ করে তোলার জন্য। দুই ভাই তাই দুপুর হতে না হতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। হতশেপসুত তাই একা বসে রয়েছে।

হয়ত একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সহসা দেখে মুতনেফার্তের পুত্র এগিয়ে আসছে প্রাচীর সংলগ্ন সেই বৃদ্ধা পরিচারিকার আস্তানার দিক থেকে যে পরিচারিকা ফ্যারাও-এর ধাত্রী ছিল। শেষে রাজকুমারও ওর পরামর্শ নিতে গিয়েছিল নাকি? ওই বৃদ্ধাকে দাসদাসীরা বলে প্রাসাদবিদ্। বহুদিন ধরে প্রাসাদের ভেতরের নানান উত্থান পতন দেখে এসেছে। ওই উত্থান পতনের জন্য মিশরের ভাগ্যে সময় ছায়াপাত ঘটে যেতে পারে। তবে সাধারণত তেমন কিছু হয় না। কারণ ওটি মূলত প্রাসাদের ভেতরের প্রাণীদের সুখদুঃখ সংবলিত। বৃদ্ধা সবার পরামর্শদাতা। শেষে তারই পরামর্শ নিতে গিয়েছিল নাকি চবরোস।

হতশেপসুতের গা ঘেঁষে দাঁড়াতেই সে আঙুল তুলে বৃদ্ধার ঘরের দিকে দেখিয়ে বলে—ওর কাছে গিয়েছিলে নাকি।

—ওর কাছে? কেন?

—সবাই যায় তো। ভাল ভাল পরামর্শ দেয়।

—তাই নাকি? জানতাম না তো?

হতশেপসুত বিশ্বাস করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা। কারণ তার কণ্ঠস্বরে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। তাছাড়া প্রাসাদের সব কিছু জানার মত ঔৎসুক্য তার আছে বলে মনে হয় না। বুদ্ধির প্রখরতাও নেই।

—এদিকে এসেছিলে কেন?

রাজপুত্র বলে—তোমাকে দেখে। দেখলাম, একা একা আসছ। তুমি সাজসজ্জা কর না?

—হঠাৎ একথা?

—আরশিতে নিজেকে একবার দেখে নিও। দু একমাসের মধ্যে সুন্দর হয়ে উঠেছ।

—তাতে কি হয়েছে?

—না কিছু না। এমনিতে বললাম। আজ আমি মুক্ত। কাঁধের ওপর একটা বিরাট বোঝা চেপে ছিল এতদিন। অনেক কষ্টে ফ্যারাওকে বলে সেটা নামিয়েছি। অবিশ্যি আমার মা সাহায্য করেছে খুব।

—বোঝাটা কি?

—হেকারনেহেহ্।

রীতিমত চমকে ওঠে হতশেপসুত। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। তার আঁখিদ্বয়ে তীব্র কৌতূহল ফুটে ওঠে। এও কি সম্ভব?

—হেকারনেহেহ্? কি হয়েছে তাঁর।

—কিছুই হয়নি। আমাকে আর পড়াবে না।

—কেন?

এবারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলে—সে ভেবেছিল, নিজে

উঁচু পদে বহাল রয়েছে বলে আর ফ্যারাও-এর অনুগৃহীত বলে আমার ওপর দাপট ফলাবে। আমি কেন সহ্য করতে যাব ? আমি হলাম জ্যেষ্ঠ রাজকুমার।

তার কথায় মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও হতশেপসুতের আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। বলে—কি হয়েছিল ?

—আমি নাকি অমনোযোগী। একদিন আভাসে বলেছিল, আমার বুদ্ধিতে নাকি ঘাটতি আছে। সেদিন কথাটা এমনভাবে বলেছিল যে আমি বুঝেও বুঝে উঠতে পারিনি। যদি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারতাম তাহলে তখনি প্রতিবাদ জানাতাম।

—শিক্ষকের তেমন কথা বলার অধিকার আছে বোধহয়।

—তাই বলে ফ্যারাও-এর পুত্রকে ?

—সেটা ফ্যারাও নিজে সবচেয়ে ভাল বলতে পারবেন।

—সেকথা না হয় ছেড়ে দিলাম। তাই বলে সোজা অপমান করবে ?

—কি করেছেন তিনি ?

—কদিন আগে বলেছে, আমি নাকি এত অমনোযোগী যে দরকার হলে সাধারণ ছাত্রের মত আমার পিঠের কানকেও সজাগ করে তোলার প্রয়োজন হতে পারে।

হতশেপসুতের গাম্ভীর্য টুটে যায়। সে হেসে ফেলে।

—হাসছ ? এটা হাসির কথা হল ? কথাটার মানে জান ?

—জানব না কেন ? আমি নিজে দেখেছি।

—কি দেখেছ ?

—পিঠের কানকে কিভাবে সজাগ করতে হয়।

—কি দেখলে ?

—দেখলাম সপাং সপাং করে পিঠে চাবুক পড়ছে।

—ঠাট্টা করছ ?

এবারে হতশেপসুত গম্ভীর হয়ে বলে—না। কথাটা সত্যি। তুমি যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

—ফ্যারাওকে ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

—কিন্তু তাই বলে তাঁর সন্তানের পিঠের কানও ?

—মনে হয়, তিনি খুব একটা কিছু মনে করবেন না।

—আমি বিশ্বাস করি না।

হতশেপসুত লক্ষ্য করে তার সৎ ভাইয়ের মেজাজ প্রথমে যেমন প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল, এখন আর তেমন নেই। প্রথমে সে যখন এগিয়ে আসছিল তখন বোঝা গিয়েছিল তার সঙ্গে আলাপ করতে আসছে। এমন ভাবে সে প্রায়ই আসে। হতশেপসুতের ভাল না লাগলেও সে কিছু বলে না। সে জানে, একে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। অথচ এর ধারণা এর রানী হবে সে। হয়ত অসম্ভব কিছু ভাবে না, কিন্তু হতে দেবে না হতশেপসুত। কারণ ও যোগ্য ফ্যারাও

হতে পারে না। ওর চেয়ে উয়াচমেস অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তাছাড়া উয়াচমেসের সঙ্গে সে নিজেও মসনদে বসবে। এটাই তার কামনা, তার উচ্চাশা। এতে উয়াচমেসের কোন আপত্তি হবে না। কিন্তু চবরোসের হতে পারে। কারণ এ মিথ্যা অহমিকায় ভোগে। এখনি তো তার প্রমাণ মিলল।

কিন্তু এখন ওসব কথা ভেবে তার লাভ নেই। এখন আশু প্রয়োজন, হেকারনেহেহ্‌কে কিভাবে দুই ভাইয়ের শিক্ষকরূপে পাওয়া যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া।

সে প্রশ্ন করে—হেকারনেহেহ্‌ অসন্তুষ্ট হননি?

—মনে হল না। হেসে বললেন, তোমার উন্নতি হোক। আমি পারলাম না, এটা আমার ব্যর্থতা।

—আর কিছু বললেন?

—না।

হতশেপসুতের মন খারাপ হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে না হেকারনেহেহ্‌ অপমানিত বোধ করেছেন কিনা। তাহলে কখনই অন্য কোন রাজকুমারের ভার নেবেন না। সে মনস্থির করে ফেলে আজই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে। হতশেপসুত উঠে পড়ে।

—কি হল? কোথায় চললে?

—দরকার আছে।

—আমি এলাম গল্প করতে। আজ আমার যে উড়তে ইচ্ছে করছে।

—তাহলে আকাশের দিকে ডানা মেলে দাও। এখানে বসে থেকে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

হতশেপসুত ওর দিকে আর দৃক্‌পাত না করে দ্রুত চলে যায় প্রাসাদে।

মায়ের অনুমতি আদায় করে সেদিনই সে হেকারনেহেহ্‌ দিনান্তে কাজ শেষে প্রাসাদ পরিত্যাগের আগে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—তুমি?

—আপনার সঙ্গে কথা ছিল।

—আমার সঙ্গে? কেন?

—উয়াচমেস আর অমেনমেসের ভার আপনাকে নিতে হবে।

—আবার রাজকুমারের ভার? না না।

এবারে সে হেকারনেহেহ্‌-এর হাত চেপে ধরে বলে—আপনাকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি। হ্যাঁ। আমি আর আমার দুই ভাই।

—কি করে শ্রদ্ধা জাগল। তোমাদের বড় ভাই-এর কাছে শুনে?

—আমাকে যিনি পড়ান, তিনি বলেছেন আপনার সম্বন্ধে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আর আপনার কথা বলেছেন আবানা-পুত্র অহমেস, যার মৃত্যু হল সেদিন।

এবারে হেকারনেহেহ্‌ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

—আপনি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে চলুন।

—ফ্যারাও জানেন ? সম্রাজ্ঞী ?

—মা জানেন। ফ্যারাওকে আজই বলব।

—চল।

হতশেপসুত তাঁকে তাদের অধ্যয়নকক্ষে নিয়ে যায়। সেখান দুই ভাইকে নিয়ে আসে সে। তাদের বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দিকে চেয়ে হেকারনেহেহ্‌র মনে আশা জাগে। আগের রাতে সিংহশাবক নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সারাদিন নিদ্রিত থেকে তাদের দুজনাকে সজীব বলে মনে হচ্ছে।

হেকারনেহেহ্‌ তিনজনের দিকে একে একে দৃষ্টি বুলিয়ে নেন। তারপর বলেন—আমি কিছু কথা বলব। সেই সব কথা তুমি সম্রাজ্ঞীকে বলবে। ফ্যারাওকে আমি নিজেও বলতে পারতাম। কিন্তু আপাতত কিছুদিন তাঁর সময় খুব কম। নুবিয়ার দিকে তামার খনিতে গণ্ডগোল চলছে। তাই নিয়ে ব্যস্ত তিনি। তুমিই শোনো। আমি শুনেছি তুমি বুদ্ধিমতী। নিশ্চয় মাকে বলতে পারবে।

—পারব।

—আমি রাজকুমারদের অন্যান্য ছাত্রদের মত পড়াব। কখনো তারা মুহূর্তের জন্যও যেন না ভাবে প্রত্যেকে তারা ভবিষ্যতের এক একজন ফ্যারাও।

হতশেপসুত বুঝতে পারে কেন উনি একথা বললেন।

—ওরা কখনই সেকথা ভাববে না। কজন ফ্যারাও থাকেন দেশে ? একজনের বেশী নয়।

—ঠিক। তাই ওদের হৃদয় দিয়ে সব কিছু শিখতে হবে। লেখাপড়াকে মায়ের মত ভাবতে হবে, ভালবাসতে হবে। কারণ বিদ্যার চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

দুই রাজকুমার নতুন শিক্ষকের কথায় বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠে।

—জীবনে শিক্ষিত মানুষই অশিক্ষিতদের চেয়ে অনেক বেশী সুযোগ পায়, তাদের পরিচালনাও করে। লেখায় পারদর্শী হয়ে ওঠার অর্থই হল উন্নতির প্রথম সোপানে পা রাখা। দেশের সমস্ত বড় বড় কাজের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায় শিক্ষিতের সামনে। শরীর খাটিয়ে শ্রমসাধ্য কাজ করার দুঃসহ যন্ত্রণা তাদের ভোগ করতে হয় না। অশিক্ষিত আর দরিদ্র জনগণকে কেউ চেনে না। খ্যাতি তো দূরে থাক। তারা হল ভারবহনকারী গর্দভের মত। কিন্তু যার হস্তাক্ষর সুন্দর তার কাজ তো রাজকুমারদের মতই। তার লিখা কিতাব আর গুটিয়ে রাখা দীর্ঘ প্যাপাইরাস তার ঘর আনন্দে ভরিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে আনে অর্থ। যারা লেখক, যারা নকলনবিশ, জীবনে তারা খাদ্যাভাব কাকে বলে জানতে পারে না। তাদের যা যা চাহিদা, রাজভাণ্ডার থেকে অচিরে তো মিটিয়ে দেওয়া হয়। সুন্দর ভাবে লিখতে শেখার বিষয়ে যে খুব পরিশ্রমী আর পড়াশোনাতেও যে একটুও অবহেলা করে না সে ফ্যারাও পরিবারের না হয়েও প্রায় রাজকুমারের মর্যাদা পায়। ফ্যারাও-এর ত্রিশ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চতম সভায় তার স্থান হয়।

তাছাড়া বাইরের কোন দেশে রাষ্ট্রদূত হবার সুযোগ মেলে। খুব সম্মানের এই কাজ। তাই ছাত্র যদি একটুও অমনোযোগী হয়, একটুও অনাগ্রহী হয়ে ওঠে, তাহলে ভাগ্যদেবীর সব সহানভূতি থেকে সে বঞ্চিত হয়।

হতশেপসুত এবং তার দুই ভাই হেকারনেহেহ্-এর অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনে। তারা তাঁর ব্যক্তিত্বে ভালরকম প্রভাবিত হয়।

হেকারনেহেহ্ ওদের বলেন—তোমাদের এত সব কথা শুনতে খারাপ লাগছে না তো?

—না। বরং ভাল লাগছে। আপনি বলুন।

—সম্রাজ্ঞীকে বুঝিয়ে বলতে হবে কিন্তু। সব কথা বলা সম্ভব হবে না। তবে আমার মনোভাবের কথা নিশ্চয় বলতে পারবে।

—পারব।

—শিক্ষা অর্জনে ধনী দরিদ্র ভেদ নেই। নির্বোধ ও বুদ্ধিমানের জন্ম সব ঘরেই হয়। তাই শিক্ষা দান করতেও বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। ছাত্র যদি বেয়াড়া হয় তাহলে তাকে শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তোলার একই পদ্ধতি। সে কোন্ ঘরে জন্মেছে সেই অনুযায়ী পদ্ধতি পালটায়। সব ছাত্রকেই শায়েস্তা করা যায়। বন্য মানুষ এমনকি পশুকেও মানুষ শিক্ষা দিতে পারে। দক্ষিণের কয়েবেদের কথা বলতে আর গান গাইতে শেখান হয়। সিংহদের বশে আনা হয়। ঘোড়াদের উদ্দাম দৌড়কে কদমে ভাঙা হয়, বাজপাখিকে শিখিয়ে কত কাজে লাগান হয়। মানুষকে শিক্ষিত করা, যোগ্য করে তোলা অনেক বেশী সহজ। কারণ মানুষের মস্তিষ্ক যত খারাপই হোক পশু পক্ষী কীটপতঙ্গ সবার চেয়ে অনেক গুণ ভাল।

হেকারনেহেহ্ উঠে দাঁড়ান। বলেন—এবারে নিশ্চয় বুঝেছ যে আমি আমার ছাত্রদের নিজের মত করে শিক্ষা দেব। এ বিষয়ে কথা দেওয়া আমি পছন্দ করি না। সম্রাজ্ঞীকে বলবে সব কথা। আমি দুদিন পরে এসে তাঁর অভিমত জানব।

হেকারনেহেহ্ চলে যেতে অমেনমেস বলে ওঠে—দারুণ।

হতশেপসুত আর উয়াচমেস তার কথায় হেসে ওঠে একসঙ্গে। কারণ অমেনমেস তাদের মনের কথাই বলেছে।

হতশেপসুত বলে—আমারও ওঁর কাছে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। তবে সেটা সম্ভব নয়। আমি বরং মাঝে মাঝে এসে বসব। উনি যা পড়াবেন, শুনব।

—কিন্তু সব শুনে মা রাজী হবেন তো?

—হবেন। মাকে চিনিস না।

সম্রাজ্ঞী অহমেস একদিন আচম্বিতে দেখতে পেলেন যে তাঁর সৌন্দর্যে ভাটার টান শুরু হয়েছে। মুখের সামনে আরশি তুলে ধরেন প্রতিদিন অসংখ্যবার। কখনো চোখে পড়েনি এ জিনিস। পড়ল গতকাল। সাজঘরের বাইরে এসেছিলেন কোন কারণে—হাতে আরশিটা ধরাই ছিল। চলন্ত অবস্থায় দেওয়ালের

ওপরের গরাক্ষ থেকে এক টুকরো সতেজ ঝাঁঝালো আলো ঠিকরে এসে পড়ে তাঁর মুখে। মুখের কোমল ত্বক কুঁচকে ওঠে। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। ঔৎসুক্য জাগে সেই আলোর প্রতিভাসিত মুখখানা দেখে নিতে। সম্মুখে আবার আরশি তুলে ধরেই তিনি চমকে ওঠেন। হাত থেকে আরশি খসে ভূতলে পড়ে যায়। বাঁদী ছুটে এসে তাড়াতাড়ি সেটি তুলে নিয়ে সম্রাজ্ঞীর বিবর্ণ মুখের দিকে আতঙ্কিত হয়ে চেয়ে থাকে। সম্রাজ্ঞীর সর্বাঙ্গে যেন জমে বরফ হয়ে যায়। এ কি হয়েছে তাঁর চেহারা। এতদিন সাজঘরের স্বল্প আলোয় এভাবে কখনো নজরে পড়েনি। রাতের বাতিতেও চোখে পড়ার কথা নয়। কিন্তু এই যে যারা সব সময় চারপাশে ঘুরঘুর করছে আর তাঁর মন যোগাচ্ছে তাদের মধ্যে একজনও কি সাহসে ভয় করে সত্যি কথাটা বলতে পারল না? বললে তিনি বরং পুরস্কৃত করতেন।

বাঁদীর সামনে হাততালি নিতে আরও তিন চার জন পরিচারিকা ছুটে আসে আশপাশ থেকে।

সম্রাজ্ঞী তাদের সোজা প্রশ্ন করেন—আমাকে দেখতে কি খারাপ লাগে? বয়স বাড়ছে বলে মনে হয়? সত্যি বলবে।

এ কি প্রশ্ন সম্রাজ্ঞীর! এর কী জবাব দেবে তারা? রানীমা তো সুন্দরী। খারাপ লাগবে কেন? মুখে কত রকমের প্রলেপ। সব সময় তাঁর চারপাশ সুমিষ্ট সৌরভে ভরে থাকে। তাঁর কেশদাম নানান রকমের সুগন্ধি তৈল আর সুবাসে শক্ত করে রাখা আছে যাতে সেই কেশদাম চিরকাল কৃষ্ণবর্ণই থাকে। সম্রাজ্ঞীকে খারাপ লাগবে কেন?

রানী অহমেস একজন একজন করে ডেকে প্রশ্ন করতে থাকেন।

—এবারে তুমি বল।

—আপনি তো সামান্যা মানবী নন। আপনি দেবী। আপনার কখনো বয়স বাড়ে? আপনি চিরকাল একই রকম থাকবেন।

সন্তুষ্ট হতে পারেন না অহমেস। আর একজনকে বলেন—তুমি?

—আপনি মিশরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, একথা সবাই স্বীকার করবে।

—তুমি?

—আপনার রূপের বিচার করার স্পর্ধা আমার নেই। আপনি দেবী। সব কিছুর ঊর্ধ্বে।

রানী রীতিমত ক্রোধান্বিত হয়। শেষে সর্বকনিষ্ঠ মেয়েটিকে এগিয়ে আসতে বলেন। কারণ, সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বেশীদিন তাঁর হারেমে আনা হয়নি। দেখলে মনে হয় সে যেন বুদ্ধিমতী এবং লেখাপড়াও শিখেছে কিছুটা। তবে স্বীকার করতে চায় না। করলে এখানে স্থান হবে না বলে হয়তো। তার নিজের বিশেষ কোন রূপ নেই। তবে চেহারাটা মিষ্টি।

রানী তাকে কাছে ডেকে বলেন—এবারে তুমি বল তো।

মেয়েটির মুখ লাল হয়ে ওঠে। একটা দ্বিধা, একটা দ্বন্দ্ব জাগে তার মনে। তারপর সেই ভাব কাটিয়ে উঠে উত্তেজনামুক্ত হয়ে সে সহজ কণ্ঠে বলে—

আপনার রূপের তুলনা হয় না, একথা কারও অস্বীকার করার সাধ্য নেই। আপনার কন্যাও হয়ত আপনার মত রূপসী হতে পারবেন না। তবে মানুষ এবং দেবদেবী সবার মধ্যে বয়সের ছায়া পড়ে। এটাই নিয়ম।

অহমেস রেগে উঠে বলেন—অত কথা শুনতে চাই না। আমাকে দেখতে কি খারাপ ল্যগে ?

—কখনই নয়। আপনার যা বয়স, তাতে এটাই স্বাভাবিক রূপ।

—এ কথার অর্থ ?

—কোন কচি শিশুর মধ্যে যদি বয়সের ছাপ দেখা যায় সেটা ভাল দেখায় না। তেমনি আপনার এই বয়সে কিশোরীর রূপ মানবে না।

রানী পরিচারিকার কথার মর্মার্থ বুঝতে পারেন। অথচ তাকে কিছু বলতে পারেন না।

মেয়েটি সাহসী হয়ে উঠে বলে—আমি এক বাড়িতে দেখেছি রূপ নিয়ে মায়ের সঙ্গে মেয়ের বিবাদ।

—সে কি ! কোথায় দেখেছ ?

—আমার ভুল হয়ে গিয়েছে সম্রাজ্ঞী। অন্য পরিবারের কথা বলা ঠিক কি ?

—সম্রাজ্ঞীকেও নয় ?

—হ্যাঁ তাঁকে বলা যায়। তবে এই তিনজনের সামনে নয়।

রানীর ইঙ্গিতে তিনজন পরিচারিকা মুখ গোমড়া করে দূরে সরে যায়। তারা অবাক হয়ে নতুন মেয়েটির কাণ্ডকারখানা দেখে। মনে ভয় ডর বলে কিছু নেই। ফট্‌ফট্‌ করে কথা বলছে। যেন সেও কোন এক রাজকুমারী। শিগ্‌গিরই মরণ হবে তার। হারেম কাকে বলে এখনো তো জানে না।

মেয়েটি সম্রাজ্ঞীকে বলে—আপনার প্রধান অমাত্যর গৃহের কথা বলছিলাম। তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর মোটামুটি রূপ আছে। মেয়েও বেশ সুন্দরী। আপনি দুজনকেই দেখেছেন। মায়ের ভয়ংকর রূপ কমে যাচ্ছে আর মেয়ের রূপ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খুলছে। মেয়ের ওপর তাই হিংসা। মেয়েও মায়ের মনোভাব বুঝতে পারে। সে জানে, মাকে সে হারিয়ে দিচ্ছে। তাই রূপ নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ কথা শোনায় মাকে। মা রাগে চিৎকার করে ওঠেন। ভীষণ অশান্তি।

সম্রাজ্ঞী অহমেসের মুখে কথা ফোটে না। হতশেপসুতের কথা মনে হয় তাঁর। রূপ নিয়ে তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব কলহ ? ছি ছি।

তিনি মৃদু হেসে বলেন—ঠিক আছে। তোমার নাম কি ?

—নেসামুন।

—তোমাকে আমি আমার মেয়ের কাছে রাখব।

—তাঁর কাছে ?

—হ্যাঁ। কাল থেকে তুমি তার পরিচারিকা হবে। সে প্রকৃত রাজকুমারী। এই দেশে আমার পরেই তার স্থান। ভবিষ্যতে মিশরের ফ্যারাও যে হবে তাকে অবশ্যই আমার মেয়েকে বিবাহ করতে হবে। তোমার বয়স কম। তুমি ওর যত্ন নেবে।

—আপনি যা বলবেন তাই করব। আজ বুঝলাম সম্রাজ্ঞী কত মহৎ।

পরিচারিকার এই ছোট্ট কথাটি রানীর অন্তরে মিষ্টি ঝঙ্কার তোলে।

অন্যান্য পরিচারিকারা দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখে। রানী বেশ গুরুত্ব দিয়ে শুনছেন বলে মনে হচ্ছে ওর কথাগুলো। কথা শেষ হলে রানী তিনজনকে কাছে ডাকেন। তারপর তিনি আরশি হাতে নিয়ে সাজঘরে গিয়ে ঢুকতেই একজন বয়স্কা পরিচারিকা নেসামুনকে জিজ্ঞাসা করে—কি হল।

—কাল থেকে আমি আর সম্রাজ্ঞীর কাছে থাকব না। উনি সরিয়ে দিচ্ছেন।

পরিচারিকার অন্তরে খুশীর জোয়ার বয়ে যায়। সে বলে—ঠিক হয়েছে। বড় বেশী বাড় বেড়েছিলি। হল তো? যা এবার রাস্তায় রাস্তায় ঘোর গে নষ্টা মেয়েছেলের মত। অনেক সঙ্গী পাবি।

নেসামুন হেসে বলে—নষ্টা মেয়েরা কি শুধু রাস্তাতেই থাকে? সেই গল্প শোননি?

—কোন্ গল্প?

—এখন বলার সময় নেই।

—না, এখনি বল। রানী এখন আর বাইরে আসবেন না। তাছাড়া রানীর সঙ্গে ওরা দুজনা তো রয়েছে। তোকে ডেকে পাঠালে যাস।

—আমার জন্যে তোমার কষ্ট হচ্ছে না? একসঙ্গে কাজ করলাম কিছুদিন।

—মিথ্যে বলব না। তা একটু একটু হচ্ছে। তোর বয়সটা কম কিনা। তবে তোর বুদ্ধি আছে একথা মানতে হবে। নইলে রানীর সামনে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারতিস না। আমি হলে ভয়ে হাঁটু ভেঙে যেত। গল্পটা বল।

—গল্পটাই বড় হল? আজ যদি তোমাকে এভাবে সরিয়ে দিতেন রানী আমি কেঁদে ফেলতাম।

মনে মনে পরিচারিকা বলে—ঢং।

মুখে বলে—তোর মত তো কাঁচা বয়স আমার নয়। এমন কত দেখেছি। কথায় কথায় তাই চোখে জল আসে না। তোরও আমার মত বয়স হোক, হারেমের কত কেচ্ছা দেখবি, কত কি শুনবি। তখন দেখবি তোর চোখের জল কবে শুকিয়ে গিয়েছে জানতেই পারিস নি। চোখ দুটো মরুভূমির মত চেয়ে থাকবে শুধু। তবে তোর চেষ্টায় সেই সুযোগ আর হবে না।

—তাই বলে আমি নষ্টা মেয়েছেলে হয়ে যাব বলে অভিশাপ দেবে?

—অভিশাপ দিতে যাব কেন? অন্য উপায় নেই তোর। কাকে বিয়ে করবি? নীলনদের পলিমাটিতে যাদের পা দুটো পোঁতা থাকে সেই কৃষককে। পাথর কেটে কেটে যাদের হাতের চামড়া পুরু হতে হতে পাথর হয়ে গিয়েছে তাদের? পাবি না তাদের কাউকে।

—নষ্টা মেয়েছেলে হতে যাব না তাই বলে। নষ্টা মেয়েছেলে এই হারেমে কম আছে নাকি?

আতঙ্কে পরিচারিকা বলে ওঠে—চুপ চুপ। আমি তোর গল্প শুনতে চাই না।

—না শোন। আমি অনেকদিন আগের এই মিশরেরই এক নরপতির গল্প শোনাব। তিনি দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না।

বাধা দিয়ে পরিচারিকা বলে—যাক, আর বলতে হবে না। অমর রা-এর বংশধরেরা নিজেরাই দেবতা। তাঁরা কখনো দেবদেবীকে অবিশ্বাস করতে পারেন না। কি বলছিস তুই ?

—আমি ফ্যারাও বংশের কথা বলছি না। অন্য এক রাজার কথা বলছি। ফ্যারাওরা তখনো আসেননি। তারও অনেক অনেক বছর আগের কথা। সেই রাজা দেবদেবীর অনুগত ছিলেন না। তাই দেবদেবীরা যুক্তি করে তাঁর দৃষ্টি-শক্তি বিনষ্ট করে দেন।

—অন্ধ করে দেন ?

—হ্যাঁ।

—তারপর ?

—রাজা তখন বারবার মিনতি জানাতে থাকেন, তাঁর দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরিয়ে দেবার জন্য। তখন দেবতারা বলেন, "ঠিক আছে। তুমি যদি এমন কোন রমণীকে খুঁজে বের করতে পার যে তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত তাহলে দৃষ্টি ফিরে পাবে।" কথাটা শুনে রাজা নিশ্চিন্ত হল। তাঁর রানীরা রয়েছেন, তাঁর উপপত্নীরা রয়েছে, রয়েছে তাঁর কতশত ক্রীতদাসী যাদের তিনি কৃতার্থ করেছেন। এদের মধ্যে যে কোন একজনই তো যথেষ্ট। কিন্তু রাজার ভুল হয়েছিল। তাঁর প্রতি কেউ-ই বিশ্বস্ত নন। এরা কেউই নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসতে জানে না। শেখেনি সেভাবে। অন্যের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ হওয়ার মাধুর্য এদের অজানা। এরা যে কোন ভাবে নিজেদের ভোগলালসা চরিতার্থে মগ্ন। সেজন্য রাজা ছাড়া অন্য কেউ হলেও ক্ষতি নেই। তাই তিনি অন্ধই রয়ে গেলেন। রাজা তখন মিশরের প্রতিটি গৃহের রমণীদের একে একে প্রাসাদে নিয়ে এলেন। তাদের মধ্যে কেউ অন্তত তার স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ হবে। না। তবু তাঁর অন্ধত্ব ঘুচল না। ধনী দরিদ্র কৃষক মজুর, কারও ঘরের গৃহিণীর উপস্থিতিই তাঁর অন্ধত্ব ঘোচাতে পারল না। শেষে বিদেশ থেকে কিছু রমণীকে নিয়ে আসা হলে তিনি অভিশাপমুক্ত হলেন। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

—কি বলছিস তুই ? সত্যি ?

—দেখো, সাধারণ ভাবে আমাদের দেশের নারীরা খুবই স্নেহশীলা, স্বামী পুত্রকে ভালবাসে। মমতাও রয়েছে। কিন্তু তাদের বদনামও পৃথিবীবিখ্যাত। এটা আমার কথা নয়। গুটিয়ে রাখা সুদীর্ঘ প্যাপাইরাসে বহুদিন আগে থেকে লেখা রয়েছে। তাই আমি নষ্টা মেয়েছেলে হয়ে যাব না। আমার কথা বাদই দাও। তোমার নিজের কথা ভাব তো ? নিজের বুকে হাত রেখে নিজের মনকে প্রশ্ন কর।

পরিচারিকার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে ভাবে, এই অল্পবয়সী মেয়েটি যেন পরিচারিকা নয়, কোন দেবী। তার চোখের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভীত-ভাব ফুটে ওঠে।

সেই সময় সাজঘরের ভেতর থেকে একজন পরিচারিকা বাইরে এসে রেগে ওঠে—তোদের আক্কেলখানা কি ? রানী কখন থেকে তোদের খোঁজ করছেন।

ওরা তাড়াতাড়ি ভেতরে যায়। রানী অহমেস নেসামুনকে বলেন—তাহলে কালই তুমি রাজকুমারী হতশেপসুতের ওখানে যাচ্ছ। ওর দেখাশোনার ভার তোমার ওপর। মনে রেখো, সে ভবিষ্যতের সম্রাজ্ঞী।

নেসামুন ঘাড় হেলিয়ে আজ্ঞা পালনে সায় দেয়। সে যদি একবার বাকি তিনজনের চোখের দিকে দৃষ্টি ফেলত তাহলে দেখতে পেত, সেই তিনজোড়া চোখে যতটা না বিস্ময় তার চেয়েও সহস্রগুণ বেশী হিংসার জ্বালা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

হেকারনেহেহ্ একদিন দুই রাজপুত্রকে বললেন—আগামীকাল আমি তোমাদের শুধু গল্প শোনাব।

উয়াচমেস প্রায় চিৎকার করে উঠতে গিয়ে সামলে নেয়। তবু উৎসাহব্যঞ্জক স্বরে বলে—গল্প ? খুব ভাল লাগে শুনতে।

অমেনমেস গম্ভীর দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে চায়। মুখে কিছু বলে না।

হেকারনেহেহ্ তাকে প্রশ্ন করেন—তোমার ভাল লাগে না গল্প ?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি শুধু গল্প বলবেন না। তার মাধ্যমে কিছু শোনাতে চাইবেন।

—হ্যাঁ, সব গল্পের মধ্যেই শেখার কিছু আছে। তবে আগামীকাল যে গল্প বলব সেটি বিশেষভাবে শিক্ষামূলক।

সেই সময় হতশেপসুত আসে। উয়াচমেস বলে—কালকে আমরা গল্প শুনব শুধু।

হতশেপসুত একটু দ্বিধার সঙ্গে হেকারনেহেহ্‌কে বলে—আমাকে শুনতে অনুমতি দেবেন ?

—এতে অনুমতির কিছু নেই। কিন্তু তোমার নিজের পড়া রয়েছে।

—কালকে আমার ছুটির দিন।

—তবে তো অসুবিধা নেই। নিশ্চয় আসবে।

অমেনমেস বলে—কালকে উদ্যানের বড় গাছের নীচে বসলে কেমন হয় ?

হেকারনেহেহ্ বলেন—গাছের নীচে ?

—হ্যাঁ। আপনার অসুবিধা হবে ? ওখানে বসে আমরা আবানা-পুত্রের কাছে গল্প শুনতাম। ওখানে বসে আমি একা একা আরও অনেকের কাছে বসে গল্প শুনেছি।

—কাদের কাছে ?

—যারা প্রাসাদে কাজ করে, তাদের অনেকে অনেক উপাখ্যান জানে। তাদের কাছে।

হতশেপসুত বুঝতে পারে অমেনমেসের গল্প ভাণ্ডারের উৎস কোথায়। অথচ সে ভাইয়ের এই খবর রাখত না।

হেকারনেহেহ্ খুব সন্তুষ্ট হলেন না একথা শুনে। তিনি বলেন—শুনেছ, ভালই করেছ। তবে তারা কতটা নির্ভুলভাবে শিখিয়েছে জানি না। ভুল শেখার চেয়ে একেবারে না শেখা ভাল। কারণ সেই ভুল সংশোধিত হতে চায় না।

শিক্ষকের কথাটা অমেনমেসের মনে চিন্তার উদ্রেক করে। সে সিদ্ধান্তে আসে গল্পের মধ্যে শিক্ষণীয় বস্তুটিই প্রধান। গল্পের মধ্যেকার সামান্য বিচ্যুতি ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

হেকারনেহেহ্ বলেন—কাল তোমাদের বিস্তারিত ভাবে দেবতা ওসিরিসের কাহিনী বলব। বলতে গেলে, তাঁর কাহিনী, তাঁর সব কিছু আমাদের দেশের সভ্যতা সংস্কৃতির মূল। তাঁকেই অবলম্বন করে আমাদের দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি সব কিছু গড়ে উঠেছে। তাই দেশকে জানতে হলে ওসিরিসের কথা গভীর ভাবে জানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। কালকে তাহলে প্রাসাদের উদ্যানেই সেই কাহিনী শোনাব।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে হেকারনেহেহ্‌কে নিয়ে ওরা সরোবরের ধারে সেই বৃক্ষের নীচে এসে বসে।

হেকারনেহেহ্-এর গম্ভীর মুখেও তৃপ্তির হাসি ফোটে। তিনি বলেন—বেশ জায়গাটি তো?

অমেনমেস বলে—আপনি আগে আসেন নি?

—না। কোন কারণ ঘটেনি এখানে আসার। গল্প বলার উপযুক্ত জায়গাই বটে।

একবার চারদিকের সৌন্দর্য দেখে নেন তিনি। দূর থেকে দেখেছেন। ভেতরে কখনো আসেন নি। কারণ এটা হারেমের ঠিক অন্তর্গত না হলেও প্রাসাদের রমণীদের ভ্রমণের স্থান এটি। তবে ফ্যারাও কিংবা রাজকুমারদের এখানে আসতে কোন বাধা নেই।

চারদিকে দেখতে গিয়ে অদূরে একজন নারীর প্রতি দৃষ্টি আটকে যায় হেকারনেহেহ্‌র। উচ্চবংশজাত কেউ বলে মনে হয় না। বাঁদী কি? বাঁদী এমন স্বচ্ছন্দ এবং সপ্রতিভ হবে কি? হতশেপসুতকে জিজ্ঞাসা করেন তার সম্বন্ধে।

হতশেপসুত বলে—ও আমার পরিচারিকা। নেসামুন। লেখাপড়া জানে।

—ওখানে কেন?

—আমার কাছাকাছি থাকে। পাঠিয়ে দেব ভেতরে?

—না, দরকার নেই। তবে কারও কাছে যেন না আসে। তুমি বললে, ও লেখাপড়া জানে। বোধহয় শুনতে চায় আমার কথা। কিন্তু সেটা উচিত নয়। তাতে তোমার গুরুত্ব কমে যাবে। রাজকুমারদেরও।

—আমি বুঝতে পেরেছি।

—এবারে তোমাদের কাহিনীটা আগে শোনাব। তারপর সম্ভব হলে বিশদ-ভাবে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব।

দুই রাজকুমার আরও এগিয়ে এসে দুই গালে দুটি হাত রেখে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে শিক্ষকের মুখের দিকে।

—তোমরা জান গেব হলেন ধরিত্রীর দেবতা আর নুত হলেন আকাশের দেবী। এঁদের চার সন্তান। দুই পুত্রের নাম হল ওসিরিস আর সেথ। দুই কন্যার নাম হল আইসিস ও নেফথিস। ওসিরিসের সঙ্গে আইসিসের বিবাহ হয় আর সেথ হলেন নেফথিসের স্বামী। এটুকু মিশরবাসী সবাই জানে। ওসিরিসকে দেওয়া হল পৃথিবীর রাজ্যশাসনের ভার। পৃথিবীর মানুষের কাছে তিনি বিধাতার আশীর্বাদ রূপে দেখা দিলেন। কারণ তিনিই প্রথম পৃথিবীর মানুষকে ভূমি কর্ষণ করে কৃষিবিদ্যাকে শেখালেন। অরাজকতা দূর করে দেশে আইনের শৃঙ্খলা প্রবর্তন করলেন। তিনি তাঁর প্রজাদের নানারকম অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করলেন। তাদের ধরে ধরে সভ্য করে তুললেন।

কিন্তু সব কিছু ভালর পাশাপাশি খারাপও আত্মগোপন করে থাকে। ওসিরিসের ভাই সেথ-এর মধ্যে কু-এর প্রভাব বড় বেশী। সেই প্রভাব প্রবলতর হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ হল আইসিসকে স্ত্রী রূপে না পাওয়া। কারণ তিনি বরাবরই আইসিসকে বেশী ভালবেসেছেন। অথচ আইসিস ওসিরিস ছাড়া স্বামী রূপে কাউকে কল্পনাও করতে পারতেন না। তাই সেথ ধীরে ধীরে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। তিনি ষড়যন্ত্র শুরু করেন সহোদর ভ্রাতাকে হত্যার জন্য। সত্তরজন সহযোগীকে তিনি পাঠান এই হীনতম কাজ সংঘটিত করতে। সেই সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্যের রানীও সেথকে মদত দিলেন। কৌশলে সেথ ওসিরিসের দেহের সঠিক মাপ নিলেন এবং সেই মাপে একটি সুদৃশ্য এবং অপূর্ব কারুকার্যশোভিত আধার তৈরী করলেন। তারপর একটি ভোজসভার আয়োজন করে সেই সভার অনেকের সঙ্গে ভ্রাতা ওসিরিসকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। আইসিস যাতে তাঁর স্বামীর সঙ্গে আসতে না পারেন কৌশলে সেই ব্যবস্থাও করলেন।

ওসিরিস ভোজসভায় উপস্থিত হলে তাঁকে ঘটা করে অভ্যর্থনা জানান হল। তারপর একসময় ভোজ শেষ হলে সেথ সবাইকে ওই সুদৃশ্য আধারটি দেখালেন। সবাই এক বাক্যে সেটির ভূয়সী প্রশংসা করে। সেথ তখন ঘোষণা করলেন যার দেহের মাপের সঙ্গে সেটি একেবারে মিলে যাবে তাকে ওটি উপহার দেওয়া হবে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সেথ-এর সত্তরজন সহযোগীর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। সবাই সেটির মধ্যে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের দেহ আধারের চেয়ে অনেক বেশী খর্বকার। হতাশ হবার ভাণ করে তারা একে একে সরে দাঁড়ায়।

অবশেষে ওসিরিসিকে আহ্বান করা হয়। তিনি এসে আধারটির মধ্যে শুয়ে পড়লে দেখা যায় সেটি ঠিক তাঁর দেহের সমান। সঙ্গে সঙ্গে সেটির ডালা বন্ধ করে অসংখ্য পেরেক ঠুকে দেওয়া হয়। তারপর সেটি নিক্ষেপ করা হয় নীল নদীর জলে। সেখান থেকে ভাসতে ভাসতে সেটি সাগরে গিয়ে পড়ে।

গল্পের এই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে উদ্বেগাকুল উয়াচমেস বলে ওঠে—ওই আধারের মধ্যে ওসিরিস জীবিত ছিলেন?

হেকারনেহেহ্ ঘাড় নেড়ে বলেন—না। তিনি দেবতা ঠিকই। কিন্তু মানুষের

দেহের মধ্যে তাঁর দেবত্বের প্রকাশ ঘটেছিল। তাই তাঁর মৃত্যু হল। আমাদের অধিকাংশ দেবতাই অবতার।

—তাহলে? তারপর কি হল?

হেকারনেহেহ্ বলেন—দেবী আইসিস স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়েই ভীষণ শোকার্ত এবং বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু ধৈর্য হারালে তো চলবে না। তিনি জ্ঞান দেবতার উপদেশ অনুযায়ী নীলনদের বদ্বীপ অঞ্চলে জলাভূমিতে গিয়ে আত্মগোপন করার জন্য যাত্রা করলেন। সাতটি বৃশ্চিক তাঁর গমনের পথে রক্ষী হয়ে রইল। চলতে চলতে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আইসিস একদিন এক স্ত্রীলোকের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হন আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু গৃহকর্ত্রী দেবীর সঙ্গের সাত রক্ষীকে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। আইসিসের রাগ হল। বৃশ্চিকদের মধ্যে একজনের নাম হল টেফেন। সে তখন দরজায় নীচের ফাঁক দিয়ে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে গৃহকর্ত্রীর শিশুকে দংশন করল। শিশুর বেদনার্ত চিৎকারে আইসিসের ক্রোধ মুহূর্তে জল হয়ে গেল। তিনি তখন গিয়ে শিশুর গায়ে হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটি নবজীবন লাভ করল। তাই দেখে গৃহকর্ত্রী স্তম্ভিত হন।

স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব থেকেই আইসিস গর্ভবতী ছিলেন। এই জলাভূমি অঞ্চলে এসে তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। নাম রাখা হল তাঁর হোরাস। মিশরের এই নিম্নাঞ্চলের দেবীর নাম বুটো। তিনি হোরাসের তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন। যাতে শিশুটি সেথ-এর প্রতিহিংসার বলি না হয়। কিন্তু বুটোও হোরাসকে রক্ষা করতে পারলেন না। তাঁকেও দংশন করল আর এক বৃশ্চিক। আইসিস তাঁর সন্তানের গোপন আস্তানায় গিয়ে দেখেন শিশুটি মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তখন তিনি আকুল হয়ে সূর্যদেবতা রা-কে ডাকতে থাকেন পুত্রের জীবন ফিরিয়ে দেবার জন্য। রা তখন জ্ঞানের দেবতা থথকে পাঠালেন শিশুটির জীবন ফিরিয়ে দেবার জন্য। থথ এসে শিশুটিকে বাঁচিয়ে দিলেন।

হেকারনেহেহ্ একটু থেমে দুই রাজকুমার ও রাজকন্যা হতশেপসুতের দিকে তাকান। তাদের চোখে মুখে আগ্রহ ফেটে পড়ছে।

—মনে হচ্ছে তোমাদের ভালই লাগছে।

উয়াচমেস বলে—খুব।

—আচ্ছা বল তো। সূর্য দেবতা এত দেবতা থাকতে থথকে পাঠালেন কেন?

হতশেপসুত বলেন—তাঁরই তো সব চেয়ে বেশী জ্ঞান।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। তবে আরও ভালভাবে জানতে হবে তোমাদের। থথ তাঁর নিজের হাতে পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানের কথা বিয়াল্লিশটি বিশালাকার খণ্ডে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি খণ্ডে মিশরের সব আইন সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। তোমরা হয়ত জান না। আমাদের ফ্যারাও-এর সভাতেও আইনের কোন জটিলতা দেখা গেলে প্যাপাইরাসের পাকানো সেই আইন সভায় নিয়ে যাওয়া হয়। সভাগৃহের পাশে মহাফেজখানায় বিয়াল্লিশটি

খণ্ড পর পর সংরক্ষিত রয়েছে। থথকে অনেক সময় চন্দ্র দেবতা বলেও ডাকা হয়। তখন তাঁর মস্তকে অর্ধচন্দ্রাকার দুটি শিং শোভা পায়। তাঁর গুণের অবধি নেই। যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি একটি পুস্তক লিখেছেন। তিনি ইন্দ্রজাল আর সম্মোহনের দেবতাও। কেউ অসুস্থ হলে থথকেই মন্ত্রোচ্চারণের সাহায্যে ডাকা হয়। তিনি আসেন। তাই হোরাসকে ভাল করে তুলতে তাঁকে পাঠান হয়েছিল।

অমেনমেস বলে—তারপর কি হল ? ওসিরিসের ?

—বলছি। সব বলব আজকে।

তিন ভাইবোন ওদের ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে তন্ময় হয়ে হেকারনেহেহ্‌র কথা শোনে।

—হোরাস এরপর ওই জলাভূমিতেই বড় হতে থাকেন আর এদিকে তাঁর মা আইসিস স্বামীর শবদেহ সমেত সেই আধারটির সন্ধানে সারা পৃথিবী তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। এবারে তাঁর রক্ষক রূপে সঙ্গে রইলেন অনুবিস, যাঁর মুখ শেয়ালের মত।

—কেন ?

—তোমরা জান আমাদের অনেক দেবতার মুখই পশুপক্ষীদের মত। সেই মুখ অনেক ক্ষেত্রে সত্য, কখনো বা সেটি প্রতীক, কখনো মুখোশ। তবে এর গভীর অর্থ রয়েছে। তোমরা সব সময় বিশ্বাস রাখবে দেবদেবীর প্রতি। তাদের দেখতে যেমনই হোক না কেন। এই অনুবিসও কিন্তু ওসিবিসের পুত্র। তবে তাঁর অন্য ভগিনী নেফথিসের গর্ভে। তাই এই সন্তানকে বৈধ বলা যায় না।

অমেনমেস বলে ওঠে—কেন, বৈধ নয় কেন ?

হতশেপসুত একটু লজ্জিত হয়। সে মেয়েদের মধ্যে থেকে থেকে এ সবের অর্থ আগে থেকেই বোঝে। সে উয়াচমেসের মুখের দিকে অপাঙ্গে চায়। বুঝতে পারে সেও কথাটা ধরতে পারেনি। তারও ধারণা নেই জারজ সন্তান কাকে বলে।

হেকারনেহেহ্‌ বোধহয় বুঝতে পারলেন কথাটা এভাবে না বললেও চলত। তাই বলেন—একটু বড় হও। বুঝবে। শুধু জেনে রাখ অনুবিস ওসিরিসেরই সন্তান। তাঁর কথার উল্লেখ করলাম, কারণ পরে এই প্রসঙ্গে আসতে হতে পারে। এখন কাহিনীটা শেষ করি।

অমেনমেস বলে—তাই ভাল।

—ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে একদিন আইসিস তাঁর স্বামীর মৃতদেহের আধারের সন্ধান পেলেন। সমুদ্রের কেউ সেটিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল বিব্‌লসের বেলাভূমিতে। সেখানে যখন সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল তখন খুব দ্রুত একটি বৃক্ষ জন্ম নেয় সেখানে এবং শবাধারটিকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরে বেড়ে ওঠে। ফলে আধারটি বৃক্ষের কাণ্ডের মধ্যে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে সেই দেশের রাজা মালকান্দারের গাছটিকে দেখে খুব ভাল লেগেছিল। তিনি সেটিকে কেটে সেই আধারসমেত কাণ্ডটিকে তাঁর গৃহের

নীচের স্তম্ভ করে রাখলেন। আইসিস সমস্ত খবর নিয়ে রাজা মালকান্দারের রানী ইশতারের পরিচারিকা হয়ে সেখানে কাজ শুরু করলেন। কিছুদিন পরে ইশতারের কাছে আইসিস আত্মপরিচয় দিলেন এবং স্তম্ভটি দেখিয়ে বললেন, ওটির মধ্যে তাঁর স্বামীর শবাধার লুক্কায়িত রয়েছে। রানীকে অনুরোধ করলেন, ওটি নিয়ে যেন তিনি দেশে ফিরে যেতে পারেন। রানী আইসিসের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর রাজাকে সমস্ত ঘটনা বললেন। রাজাও তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে দেশে ফিরে যাবার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন।

আইসিস একটি বৃহৎ জলযানে স্বামীর শবাধার নিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশের মাটিতে পা রাখলেন। তারপর সেখানে এক নির্জন স্থানে ওসিরিসের মৃত্যুর এতদিন পরে এই প্রথমবার স্বামীর মৃতদেহের পাশে বসে আকুল হৃদয়ে কাঁদলেন। সেই কান্নায় মরুভূমি গলে জল হয়ে যায়। সব কান্নারই শেষ আছে। আইসিস একসময় থামলেন। শুধু কাঁদলে তো চলবেনা। স্বামীর দেহ নিয়ে অনেক কাজ বাকী পড়ে রয়েছে। সব কিছুই তাঁকে করতে হবে। তিনি অনুবিসকে ডেকে পাঠালেন। অনুবিস এসে তাঁকে বললেন—"তোমার পিতার দেহ মমি করে লুকিয়ে রাখ। মনে রেখ পৃথিবীতে তুমিই প্রথম মমি করতে চলেছ। সাবধান। মমি করে দেহটিকে লুকিয়ে রাখ। ওসিরিস আজ জীবিত নেই, কিন্তু তাঁর দেহের প্রতিও সমান আক্রোশ শত্রুপক্ষের।"

কিন্তু এত সাবধানতা সত্যেও ওসিরিসের দেহটিকে রক্ষা করা গেল না। তাঁর হত্যাকারী ভ্রাতা সেথ এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে শিকার করতে করতে ওই মমির আধার দেখে ফেলেন। ক্রোধে এবং প্রতিহিংসার জ্বালায় অস্থির হয়ে তিনি ভ্রাতার মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে দেশের সর্বত্র টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন। আইসিস তখন অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সেই টুকরোগুলো এক এক করে খুঁজতে থাকেন। যেখানেই যেটুকু পেলেন সেখানে তা সমাধিস্থ করলেন! মানুষ এখনো ওসিরিসের প্রতিটি সমাধি ক্ষেত্রকে তাদের মহান মঙ্গলকারীর পবিত্রস্থান রূপে শ্রদ্ধা করে। ওসিরিসের মেরুদণ্ড সমাহিত করা হয় বদ্বীপ অঞ্চলের বুসিরিস নামক স্থানে। অবদিস নগরে তার মস্তকটি সমাহিত করা হয়েছিল। যাই হোক অনেকে বলে, এরপর আইসিস তাঁর ভগিনী নেফথিসের সহায়তায় সমস্ত টুকরো সংগ্রহ করে একত্রিত করেন এবং তাঁদের ইন্দ্রজালের প্রভাবে ওসিরিস আবার জীবিত হয়ে ওঠেন। প্রতি বছর বীজ রোপণ করলে যেমন সেই বীজ থেকে অঙ্কুরের আকারে প্রাণ সঞ্চার ঘটে, এও তেমনি।

অমেনমেস জিজ্ঞাসা করে—সেথ-এর কি হল।

—সব বলছি। আর একজনের কথা তো ভুলেই গিয়েছে। ওসিরিস আর আইসিসের পুত্র হোরাস। এত সব ঘটনা যখন ঘটছে, তিনি তখন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছেন। তাঁকে শৈশবকালে সেথ খুঁজে পেলে তাঁর ভাগ্যও ওসিরিসের মত হত। কিন্তু গোপন স্থানের সন্ধান পাননি সেথ। এরপর হোরাস যখন যুবক হয়ে উঠলেন, তখন তিনি তাঁর গোপন স্থান পরিত্যাগ করলেন। মনে মনে সংকল্প করলেন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবেন। তুমুল যুদ্ধ হল উভয়ের মধ্যে।

সেথ একসময় সুযোগ পেয়ে হোরাসের একটি চোখ খুবলে তুলে নিলেন। বদলা নিলেন হোরাস। প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত পা খণ্ডিত করে দিলেন। অবশেষে থথ উভয়ের বিবাদ মিটিয়ে দিতে সেখানে অবতীর্ণ হলেন। তিনি তাঁর অসামান্য যাদুশক্তির প্রভাবে উভয়ের ক্ষত নিরাময় করে দিলেন। তবে সেথ হোরাসকে পৃথিবীর দেবতা গেব-এর সম্মুখে বিজয়ী বলে স্বীকার করে নিলেন। হোরাস পবিত্র অতেফ শিরোভূষণ মস্তকে ধারণ করলেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষ পৃথিবীর দেবতা গেব-এর মসনদে আরোহণ করলেন। এইভাবে হোরাস হলেন মানব জাতির অধীশ্বর। পিতার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করলেন তিনি। গেব প্রথমে ভেবেছিলেন মিশরকে দুই ভাগে ভাগ করে নীচের অংশ দেবেন হোরাসকে এবং ওপরের অংশ দেবেন সেথকে। কিন্তু তিনি সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করলেন না। হোরাসই হলেন মিশরের অবিসংবাদিত অধিপতি ? আর তাঁর পিতা ওসিরিস মিশরের মৃতদের অধীশ্বর হয়ে রইলেন। চিরন্তন কালের রাজা। আর অনুবিস ? তিনি মিশরের প্রতিটি মানুষের মৃত্যু হলে ওসিরিসের সাহায্যকারী হন। মমি প্রস্তুতে আইসিসকে সহায়তা করেন। মৃত্যুর পর তাঁর দেখা মিলবেই। তাই তাঁকেও মাঝে মাঝে মৃতদের রাজা বলে আখ্যায়িত করা হয়। ওসিরিস এবং পরবর্তীকালে আইসিস, হোরাস এবং অন্যান্য দেবদেবীরাও এক একটি তারকা হয়ে উদার উন্মুক্ত আকাশে জ্বলজ্বল করতে থাকেন এখনো।

হতশেপসুত, উয়াচমেস এবং অমেনমেস নীরব। তারা যেন অতীতকে তখনো স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। ওরা লক্ষ্য করেনি নেসামুন ধীরে ধীরে অনেকটা নিকটে চলে এসেছে। হেকারনেহেহ্‌র মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে। নেসামুন সেটি লক্ষ্য করে আবার দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। কাহিনীর কিছুটা অংশ হয়ত তার শ্রুতিগোচর হয়েছে, তাই মন অতৃপ্ত।

হেকারনেহেহ্‌ অবশেষে কাহিনী শেষ করেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে উদ্যানের চারদিক একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন। বলেন—গল্প করার আদর্শ জায়গা।

হতশেপসুত বলে—আবানা-পুত্রও এই কথা বলতেন।

—তিনি আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ বীর।

—হ্যাঁ।

হেকারনেহেহ্‌ বিদায় নিতেই বৃক্ষের অন্তরাল থেকে বের হয়ে আসে তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চবরোস। মুচকি হেসে বলে—কেমন লাগল গল্প শুনতে ?

উয়াচমেস বলে—চমৎকার।

—হ্যাঁ। আমারও প্রথম প্রথম মন্দ লাগেনি। তারপর যখন অঙ্ক নিয়ে বসবে তখন টের পাবে।

হতশেপসুত বলে—তুমি লুকিয়ে ছিলে কেন ?

—আমাকে দেখলে ক্ষেপে যাবে।

—তার মানে, তুমি ওঁকে ভয় পাও।

—আমি ? কখনো নয়। রাজকুমারদের মনে ভয় বলে কিছু থাকে না।

অমেনমেস হেসে ওঠে।

—হাসলে যে ?

—তোমার কথা শুনে হাসি পেল।

—অল্পবয়সে বেশী পেকে গিয়েছ।

হতশেপসুত নেসামুনকে ডাকে। তাকে আসতে দেখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্থান ত্যাগ করে। পরিচারিকার উপস্থিতি বোধহয় তার সম্মানে আঘাত হানল। কিংবা অন্য কিছু।

হারেমের কোন এক সুন্দরীর ব্যাধি হয়েছে। হকিম এসে নিদান দিয়েছে রোগটি অতিমাত্রায় সংক্রামক। হারেমের তত্ত্বাবধায়কের টনক নড়ে সঙ্গে সঙ্গে। হারেম থেকে কোন রমণীর পলায়নের ঘটনা একশোয় একবার হয়ত ঘটলেও ঘটতে পারে। তবু তা মানিয়ে নেওয়া যায়। কারণ সেই রমণীর পক্ষে মিশর ত্যাগ করে চলে যাবার সাধ্য থাকে না। কারও সাহায্যেও নয়। ফলে তাকে আবার ফিরে আসতে হয় প্রাসাদে কিংবা মরতে হয় তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে। কিন্তু ফ্যারাও-এর বিরুদ্ধাচরণ করে যারা তাদের তো মৃত্যুর পরবর্তী সেই সুন্দর স্থানে যাবার অধিকারই থাকে না। তাদের দেহ নিক্ষেপ করা হয় নীলনদের জলে। দেহ হয় কুমীরের ভক্ষ বস্তু। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বেঁচেও যায় ফ্যারাও-এর দয়ায়। তবে হারেমে আর স্থান হয় না। হয়ত তাদের দেখা যাবে অন্য কোন কঠিন কাজে। জীবনে আর কখনো সুখ ভোগের সুযোগ আসে না তাদের।

কিন্তু সংক্রামক ব্যাধি আরও মারাত্মক। ফ্যারাও-এর স্বাস্থ্য নির্ভর করে এর ওপর। হারেমের কারও সামান্যতম ব্যাধি হলেও তার সংস্পর্শে এসে ফ্যারাও-এর দেহ ব্যাধিদুষ্ট হতে পারে। তিনি না জেনে তারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারেন সেই সময়। হারেম সর্বদা থাকবে সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত স্থান। সেখানে এলে যাতে ফ্যারাও-এর মুখ পরিতৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। একটুকুও বিরক্তি যেন তিনি অনুভব না করেন। সেইদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। তত্ত্বাবধায়ক জানে হারেম থেকে কোন ব্যাধি যদি ফ্যারাও-এর শরীরে প্রবিষ্ট হয় তাহলে তার রক্ষা থাকবে না। ফ্যারাও দেবতা হলেও আধার-রূপে নিয়েছেন নরদেহ। এই দেহের বৃদ্ধি আছে, রোগ আছে, জরা আছে। আবার মৃত্যুও আছে। সেই মৃত্যু আসবে স্বাভাবিক ভাবে।

তত্ত্বাবধায়ক প্রাসাদের সমস্ত রক্ষীকে সাবধান করে দেয় তারপর হারেমের নারী রক্ষীদের প্রধানাকে তলব করে পাঠায়। সে এলে তাকে বিবরণ দিয়ে সত্বর ব্যাধিগ্রস্ত রমণীকে অপসারণের ব্যবস্থা করতে বলে।

নারী-রক্ষী প্রধানা চোখ কপালে তুলে বলে—খুবই খারাপ ব্যামো তাহলে ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় রাখা হবে ?

—প্রাসাদের বাইরে।

—কোথায় ?

—তোমাকে ভাবতে হবে না। সব ব্যবস্থা করা আছে। শুধু তুমি এই মুহূর্তে তাকে বের করে আন হারেম থেকে।

—আবার ফিরে আসবে তো ?

—ওই ব্যাধি একবার যার হয়েছে হারেমে ফিরে আসার মত সৌন্দর্য তার আর থাকে না।

—ইস্, বড় ভাল মেয়ে ছিল।

—ফ্যারাও পছন্দ করতেন বুঝি ?

—তা বলতে পারব না। তবে তার কাছে কয়েকবার গিয়েছেন ফ্যারাও। ওর কাছ থেকে চলে আসার সময় ফ্যারাও-এর মুখ দেখে মনে হয়েছে আনন্দই পেয়েছেন। দেহটাই শুধু তার সুন্দর ছিল না, কথাও মধুর। মন ভোলার কথা বলতে পারত। স্বপ্নের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারত।

—এত গুণ ?

—হ্যাঁ।

নারী-রক্ষী প্রধানা তত্ত্বাবধায়কের মুখ দেখে বুঝতে পারে গৃহে তার শান্তি নেই। সেখানে মিষ্টি কথা শুনতে পায় না। এরা সব অবস্থাপন্ন মানুষ। এদের ভূসম্পত্তি রয়েছে। আর ভূসম্পত্তির অধিকারিণী স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীরা। সুতরাং ধনী এবং স্বচ্ছল পরিবারে নারীর ভূমিকা প্রধান। তাদের তুষ্ট রাখতে প্রাণ হয়ে ওঠে ওষ্ঠাগত। সম্পত্তির ক্ষেত্রে ফ্যারাও থেকে শুরু করে সবাই তার স্ত্রীর ওপর একান্ত নির্ভরশীল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগীকে স্থানান্তরিত করা হয়ে যায়। কারণ ফ্যারাও যখন তখন হারেমে আসতে পারেন। দিন-রাত বলে কথা নেই। যখনই এক-ঘেঁয়ে লাগে চলে আসেন। এবং সেদিন এলেনও তাই। কারণ তখনই ঘোষিত হয় যে ফ্যারাও আসছেন। তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষী প্রধানা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। উভয়ের মুখে অপ্রস্তুতের হাসি ফুটে ওঠে। অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছে তারা। একটু বিলম্ব হলে রক্ষা থাকত না।

ফ্যারাও আসছেন, একথা রানী মুতনেফার্তকে তাঁর বাঁদী জানিয়ে দেয়। তেমনই কথা ছিল। মুতনেফার্ত ভুলেই গিয়েছেন ফ্যারাও শেষ কবে তাঁর কক্ষে এসেছিলেন। তখন হয়ত তাঁর পুত্র খুব ছোট ছিল। অথচ এককালে তিনি ছিলেন ফ্যারাও-সোহাগী। সেদিনের কথা স্মরণ করলে আজও আনন্দে হৃদয় প্লাবিত হয়। আদর করে কত মিষ্টি কথা শুনিয়েছেন। কত সব কথা দিয়েছেন। পুত্রের ভবিষ্যৎ বিষয়েও উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিয়েছেন। এখন এক এক সময় ভাবেন সে সব কি শুধু তাঁর দেহের জন্য ? এখন একই ছাদের নীচে থেকে, ফ্যারাও-এর রানী হয়ে, তাঁর পুত্রের জননী হয়েও তাঁর দেখা মেলা ভার। দেখা যে একেবারে হয় না তা নয়। দেখা হয় হেব-সেদ ভোজে কিংবা অন্য কোন ভোজ-সভায়। দেখা হয়ে যায় দেবালয় চত্বরে যেখানে ফ্যারাও দেবদর্শনে এবং পূজা

দিতে যান। অথবা হারেমের কোন সুবিশাল কক্ষে যেখানে নৃত্যগীতের আসর বসে। সেখানে নিমন্ত্রিতের মধ্যে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয় তাঁর। কিন্তু একান্তে সেভাবে কখনই দেখা হয় না যখন কোন সুখদুঃখের বা মনের কথা বলার সুযোগ হয়। তাঁর দেহের প্রতি টান ফ্যারাও-এর অনেক দিন মিটে গিয়েছে এ তো জানা কথা। বিগত-যৌবনার চেয়ে উদ্‌ভিন্ন যৌবনার প্রতি আকর্ষণ প্রবল হওয়া খুব স্বাভাবিক। তাঁর এতে বলার কিছু নেই। তাছাড়া এখন তাঁর নিজের চাহিদাও ততটা নেই। যেটুকু রয়েছে দমন করে রাখা যায়। আগে যেমন অস্বস্তি হত, ছটফট করতেন, কান্না পেত এখন আর তেমন হয় না। হলেও ফ্যারাও পরিবারের কুমারীরা চিরকাল যা করে এসেছে বিবাহের পরেও করে থাকে অনেক সময় সেই পথে পা কখনই বাড়াতেন না। সেটুকু মর্যাদাবোধ তাঁর রয়েছে।

ফ্যারাও হারেমের দিকে আসছেন একথা শুনে মুতনেফার্ত তাঁর কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন। দুই রানীর কক্ষও হারেমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তা নয়, এ হারেমে সুন্দরী ললনারা থাকে। নৃত্যগীত পটিয়সী রমণীরা থাকে শুধু, যারা ফ্যারাও-এর মনোরঞ্জনের জন্য নিযুক্ত। এই হারেমে রানীরা থাকলে তাঁদের মর্যাদা সঠিকভাবে রক্ষিত হয় না। তাই হারেম-সংলগ্ন হলেও তাঁদের কক্ষগুলি কিছুটা দূরত্বে অবস্থিত। বাইরে থেকে অবশ্য পৃথক অস্তিত্বের কথা বুঝবার উপায় নেই।

ফ্যারাও-এর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটু দেখা দিতে চান মুতনেফার্ত। তাঁর মুখখানাই হয়ত ভুলে যেতেন ফ্যারাও যদি না মাঝে মাঝে দেখা হত। সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ফ্যারাও একেবারে তাঁকে উপেক্ষা করে, না দেখার ভান করে কখনো হারেমে প্রবেশ করবেন না। সেই ধরনের মানুষ তিনি নন। তবে ব্যক্তিগতভাবে কোন কথা বলবেন কিনা অনুমান করা শক্ত। সবটা নির্ভর করছে তাঁর মেজাজের ওপর। মেজাজ ভাল থাকলে কথা বলবেন, হেসেই কথা বলবেন। তখন পুত্রের গৃহশিক্ষকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন। হেকারনেহেহ্‌কে ছাড়িয়ে দেবার পর পুত্রের জন্য আর কোন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়নি। অনেক দিন হয়ে গেল। ওদিকে অন্য দুই রাজকুমার এবং হতশেপসুত নিয়মিত পড়ে চলেছে। সবই শুনেছেন তিনি। অথচ তাঁর পুত্র অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা ঠিক নয়। ফ্যারাওকে নিশ্চয় কেউ একথা স্মরণ করিয়ে দেয়নি। কে আর দেবে ? কার এত গরজ। ও তো আর দেব-মহিষীর পুত্র নয়। তাঁর পুত্র-কন্যার কদর আলাদা। অথচ ফ্যারাও নিজে তাঁর চারপুত্রকে সমদৃষ্টিতে দেখেন এর প্রমাণ অনেক মিলেছে। তাই তাঁকে একবার স্মরণ করিয়ে দিলে নিশ্চয় ব্যবস্থা নেবেন।

মুতনেফার্ত দেখতে পান স্তম্ভশ্রেণীর পাশ দিয়ে ফ্যারাও দ্রুত এগিয়ে আসছেন। হারেমের রক্ষীরা তাঁর আগমনের অপেক্ষায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই দেখে তিনিও এগিয়ে যান হারেমের প্রবেশপথের কাছে। রক্ষীরা এই সময় তাঁকে সহসা দেখতে পেয়ে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। কি করবে ভেবে পায়

না। তিনি সামান্য একটু হাত উঁচিয়ে তাঁদের নিশ্চিন্ত করেন।

ফ্যারাও ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন প্রবেশ পথের সামনে।

—তুমি!

—আপনি আসছেন শুনে দাঁড়ালাম। শুধু শুধু বিরক্ত করলাম আপনাকে।

—ঠিক আছে।

—কথা ছিল।

—পরে।

—সুযোগ পাই না।

বিব্রত ফ্যারাও বলেন—বল।

—আমার কক্ষে যাবার সময় হবে?

—না, এখানে বল।

—বড় রাজকুমারের গৃহশিক্ষক নেই কোন।

—সে নিজেই অব্যাহতি চেয়ে নিয়েছে।

—হেকারনেহেহ্‌কে তার পছন্দ নয়।

একটু হেসে ফ্যারাও বলেন—কাকে তবে পছন্দ হবে তার?

—একটু কম কড়া, একটু নরম প্রকৃতির।

—তেমন কাউকে আনলে তোমার পুত্রের মঙ্গল হবে না। ওকে তোমার চেয়ে কেউ ভাল চেনে না।

—আমি বলছিলাম কি—

ফ্যারাও হঠাৎ হারেমের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন—পরশু আমাকে খবর দিও। কথা হবে।

মুতনেফার্তের মুখমণ্ডল গাঢ় রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। ফ্যারাও নিশ্চয় তাঁকে অপমান করার জন্য এভাবে চলে যাননি। কিন্তু হারেমের এই কর্মীরা সেই রকমই একটা কিছু ভেবে বসল নিশ্চয়। তারা ভাবল, ফ্যারাও তাঁর রানীর অনুরোধ রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। ওদের কানে সব কথা নিশ্চয় যায়নি। যেটুকু গিয়েছে তাতে এটুকু অন্তত বোঝা যায় ফ্যারাও তাঁর রানীর মর্যাদা রাখলেন না। ভুল হয়েছে। তাঁর কাছে দেখা করার অনুমতি চেয়ে নেওয়া উচিত ছিল অন্য পাঁচজনের মত।

মুতনেফার্ত এতক্ষণে লক্ষ্য করেন, দূরে নিজ কক্ষদ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁরই দিকে চেয়ে রয়েছেন সম্রাজ্ঞী অহমেস। চোখ পড়তে ইঙ্গিতে ডাকেন। মুতনেফার্ত একবার ভাবেন, যাবেন না। তিনিও ফ্যারাও-এর রানী। অহমেসের চেয়ে কম কিসে? তারপর ভাবলেন, রানী হলেও মনে মনে জানেন, অহমেসের সমকক্ষ জীবনেও হতে পারবেন না। কারণ ফ্যারাও থুথমস, অহমেসের দৌলতেই আজ মিশরের অধিপতি। অহমেস তাঁকে বিবাহ করতে স্বীকৃত না হলে এই সৌভাগ্য জীবনে তাঁর হত না।

মুতনেফার্ত সম্রাজ্ঞীর কক্ষের দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে যান।

নারীরক্ষীদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ করে মন্তব্য হয়, দুই রানী মিলে এবারে সলা-পরামর্শ করবেন। নিশ্চয় সম্রাজ্ঞীকেও উপেক্ষা করেছেন ফ্যারাও। তাই তিনি এখন দুজনারই শত্রু।

কয়েকজনের মুখে হাসির অস্পষ্ট রেখা ফুটে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে যায়। যে এসব কথা বলছে সে-ই হয়ত গিয়ে লাগিয়ে দেবে কাউকে যে রানীর দুর্গতি দেখে হাসাহাসি হচ্ছিল।

মুতনেফার্ত জীবনে এই দ্বিতীয়বার অহমেসের কক্ষে প্রবেশ করলেন। এই কক্ষের আভিজাত্য অন্যরকমের। বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত বহু দ্রব্যসামগ্রী এখানে রয়েছে যা মিশরের অন্য কোন গৃহে থাকা সম্ভব নয়। এমনকি ফ্যারাও-এর নিজস্ব কক্ষেও নেই। অথচ সেখানে গিয়ে অহমেসকেও রাত কাটাতে হয় মাঝে মাঝে। পরস্পরের দেহের প্রতি আকর্ষণের জন্য অবশ্যই নয়। প্রেমের জন্য তো নয়-ই। আর কেউ জানুক বা না জানুক মুতনেফার্ত অন্তত জানে সেখানে রাত কাটিয়ে সম্রাজ্ঞীকে প্রমাণ করতে হয় যে তাঁদের দাম্পত্যজীবন কত স্বাস্থ্যকর এবং কত মধুময়। এই প্রমাণ প্রভাতকালের অনুষ্ঠানের সময় চোখে পড়ে দুই পুরোহিতের, প্রধান অমাত্য এবং আরও কিছু রাজকর্মচারীর। আর সেই কথাই সারা দেশে প্রচারিত হয়।

অহমেসের কক্ষের দুর্লভ বস্তুনিচয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। কক্ষে প্রবেশ করতেই দরজার পাশে অসাধারণ সুন্দর এই রৌপ্যনির্মিত জলপাত্র রাখার উচ্চ আসন। কক্ষের হস্তীদন্তনির্মিত পালঙ্কের তুলনা নেই। তাতে অহমেসের নাম খোদিত রয়েছে। সেই শয্যার অদূরে একই উচ্চতায় রাখা আছে একটি স্বর্ণনির্মিত উচ্চ বেদী। যার ওপর রয়েছে কারুকার্যখোদিত আতর-দানি। অপর পার্শ্বে রয়েছে বিদেশ থেকে আনা মূল্যবান কাষ্ঠনির্মিত ক্ষুদ্র একটি চৌকি। তার ওপর একটি নীলবর্ণের চর্মাধারের মধ্যে রয়েছে এক মহার্ঘ বস্তু। মুতনেফার্ত অনুমান করতে পারেন দ্রব্যটি কি। অথচ সেটি দেখাতে বলতে সংকুচিত হন। তিনি জানেন এই আধারের মধ্যে রয়েছে হাত্তিতি থেকে উপহার রূপে প্রেরণ করা লৌহনির্মিত ছোরা। মিশরের ফ্যারাও একটি মাত্র লৌহনির্মিত দ্রব্যের জন্য হাত্তিতির নরপতিকে অনুরোধ করেননি। মিশর এ পর্যন্ত লৌহের ব্যবহার জানে না। অথচ ধাতুটি খুবই কার্যকরী এবং শক্ত। পূর্বদিকের দেশগুলিকে আক্রমণের সময় এই ধাতুর কথা জানা যায়। ওই সব দেশে লোহার বেশ প্রচলন শুরু হয়েছে। অথচ মিশর এখনো লোহা কিভাবে গলাতে হয় তাই জানে না। তাম্রকে পুরুষানুক্রমে দ্রবীভূত করা হচ্ছে যে উত্তাপে, দেখা গিয়েছে সেই উত্তাপে লোহা গলে না। তাই হাত্তিতির অধীশ্বরকে অনুরোধ করা হয়েছিল লৌহনির্মিত প্রচুর দ্রব্য পাঠাতে এবং লোহা গলানর কৃৎকৌশলও শিখিয়ে দিতে। হাত্তিতির অধিপতি অনুরোধ কর্ণপাত করেননি। শুধু সৌজন্য দেখাতে একটিমাত্র লৌহনির্মিত ছোরা প্রেরণ করেছেন। সবাই বলাবলি করে সেজন্য কখনই নয়, লোভ দেখাতে। ওতেই ওদের আনন্দ। একটু ভয়ও হয়ত আছে। কারণ মিশর লোহার ব্যবহার শিখে গেলে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

কিছুক্ষণ পূর্বে ফ্যারাও কর্তৃক কার্যত উপেক্ষিতা হবার কথা একেবারে বিস্মৃত হলেন মুতনেফার্ত। পরিবর্তে তীব্র কৌতূহল হল লোহার জিনিসটি দেখার।

তিনি বলেন—ওটি একবার দেখাবেন?

অহমেস মৃদু হেসে বলেন—কেন দেখাব না?

তিনি এগিয়ে গিয়ে সুদৃশ্য নীলবর্ণের চর্মনির্মিত খাপটি তুলে নেন। তার একদিকে সামান্য একটি হাতল বের হয়ে রয়েছে। সেটি ধীরে ধীরে টানতেই কোষ থেকে বের হয়ে আসে। মুতনেফার্ত সেটি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখেন।

—সোনা রুপার মত দেখতে নয়।

—না। এ জিনিস কাজে লাগে। দর্শনধারী হয় না। এ দিয়ে তীর তৈরী করলে কিংবা তলোয়ার বানালে যুদ্ধজয় অনিবার্য। উল্কা দেখেছ? আকাশ-দেবতা ছুঁড়ে দেন কখনো কখনো। আমাদের ধরিত্রীর বুকে ঠিক্‌রে পড়ে তার দু-এক টুকরো কদাচিৎ।

—শুনেছি।

—আমি দেখেছি। এই জিনিস দিয়ে তৈরী। দেবতাদের দেহ, তাঁদের অস্ত্র এই জিনিস দিয়ে তৈরী হয়।

—এর গায়ে এসব কি লেগে রয়েছে?

—অমন হয় জল লাগলে। মেজে নিতে হয়।

খুব একটা সন্তুষ্ট না হয়ে মুতনেফার্ত বলে—এর জন্যে এত হাহুতাশ।

—হ্যাঁ। আমরা যদি লোহার ব্যবহার জানতাম তাহলে আমাদের কৃষিকাজ আরও উন্নত হত। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আরও ভাল হত।

মুতনেফার্ত বুঝতে না পারলেও চুপ করে থাকে। কারণ কক্ষটিতে দর্শনীয় বস্তু আরও অনেক কিছু রয়েছে।

অহমেস হঠাৎ বলে—ফ্যারাওকে ওখান থেকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিলে বুঝি?

অপ্রস্তুত মুতনেফার্ত বলে ওঠে—না না। সেইসব দিন আর নেই। আমি কয়েকটি দরকারী কথা বলতে চেয়েছিলাম। দেখা পাই না। আপনি তো রাতে সোজা গিয়ে ওঁর শয়নকক্ষে ঢুকতে পারেন। আমার সেই অধিকার নেই।

—কেন নেই? তুমিও তো রানী।

—এটা কথার কথা। তবে অনেক আগে আপনি অভয় দিলে অন্তত দরকারী কথা বলার জন্য তাঁর কাছে যাওয়া অভ্যাস করতাম। নাহয় ভোর হবার আগেই চলে আসতাম। কারণ সেখানে আমি ধরা পড়লে ফ্যারাও-এর খ্যাতি বাড়ত না।

সম্রাজ্ঞী বলেন—আমাদের চেহারার জৌলুষ আর নেই। তোমারও দেখছি আমার মতই অবস্থা। একদিন আরশিতে দিনের আলোর মধ্যে নিজের মুখ দেখে নিজেই চমকে উঠেছিলাম। আজ তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি সেদিন

আমি ভুল দেখিনি। অনেকদিন অন্ধ হয়ে ছিলাম নিজের রূপ সম্বন্ধে।

—আপনি তো এখনো যথেষ্ট সুন্দরী।

—যতই সুন্দরী হই। বয়সের ছাপ পড়েছে। ফ্যারাও সজীব সতেজ অল্পবয়সীদের সংস্পর্শে আসতে চান। আমাদের কাছে নন। একটা উদাহরণ দেখবে?

—উদাহরণ?

—হ্যাঁ, একজন ক্রীতদাসীকে নিয়ে আসব হারেম থেকে। সামান্যা ক্রীতদাসী। অল্প বয়স। তার রূপের সঙ্গে আমার রূপ মিলিয়ে দেখাব।

—ক্রীতদাসী যত রূপসীই হোক, আপনার ধারে কাছে আসবে না। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার স্পর্ধা না থাকলেও আপনার রূপের কিছুটা কাছাকাছি ছিল আমার রূপ।

—সে সব অতীত দিনের কথা। ভুলে যাও ওসব কথা। আসল বাস্তবকে জানতে শেখ। আমি জেনেছি। তোমারও চোখ খুলে দেব আজ।

বাইরে বোধহয় বালির ঝড় উঠেছে। কারণ ওপরের গবাক্ষপথে আলোর তেজ সহসা অনেকটা কমে গেল।

অহমেস একজন পরিচারিকাকে হাততালি দিয়ে ডাকেন। সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে।

সম্রাজ্ঞী তাকে বলেন—হারেমের রক্ষী-প্রধানাকে ডেকে দাও।

সে চলে যেতে মুতনেফার্ত বলে—ওকে ডেকে পাঠালেন কেন?

—ক্রীতদাসীটিকে ডেকে পাঠাব।

—কি করে বুঝবেন সে রূপসী হবে?

—তুমি তো জানই হারেমে কুৎসিত কেউ থাকে না। তাছাড়া আমি নাম করে ডাকব।

মুতনেফার্ত বলেন—আপনি ওদের চেনেন?

একটু হেসে অহমেস বলে—না চিনলে চলবে কি করে? ফ্যারাও যত বড়ই হোন, অনেক কিছু আমাকেই দেখতে হয়। আমার মেয়ে হতশেপসুতকে তো দেখছ তুমি। যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে সে হবে ফ্যারাও। তাই বলে কি হতশেপসুতের অধিকার চলে যাবে? তার অধিকার চিরকালের। আমি হারেমের অনেককেই চিনি। চিনতে হয়।

—ঠিক কথাই বলেছেন।

নারী প্রহরীদের প্রধানা অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সামনে এসে অভিবাদন জানায়।

অহমেস বলেন—হারেমে তেতা নামে যে ক্রীতদাসী আছে, তাকে ডেকে দাও তো।

সে চলে যায় তাড়াতাড়ি। মুতনেফার্ত ঘরের আসবাবপত্রের দিকে দৃষ্টি ফেরান। একটি হেলান দিয়ে বসার আসন দেখে তিনি আকৃষ্ট হন। এটিও হাতির দাঁতের তৈরী, তার ওপর সোনার কাজ করা। মনোমুগ্ধকর সেই কাজ।

—এটি কোথাকার ?

—এটা এখানকারই। বিদেশী হিকসোসদের মিশরের যে রাজা প্রথম তাড়াতে শুরু করলেন এদেশ থেকে তাঁর নাম কামেস। এই কামেসের বোন আর রানী ছিলেন যিনি তাঁকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। হিকসোসদের সঙ্গে পরপর কয়েকটি যুদ্ধ জয় করে তিনি রানীকে ভালবেসে এটি তৈরী করে দিয়েছিলেন। রানী খুব সৌখিন ছিলেন তো।

—আপনার মত ?

—তা বলতে পার। কিন্তু দুঃখ এই যে সৌখিনতা মৃত্যু আর বয়সকে ঠেকাতে পারে না। তবে হ্যাঁ সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটা মরীচিকার সৃষ্টি করতে পারে কিছুকাল।

—আপনি বললেন কামেস রানীকে খুব ভালবাসতেন।

—বাসতেন বৈকি।

—আপনার বিশ্বাস হয় ?

—না হবার কারণ আছে কি ?

—অতীতকে আমরা সুন্দরভাবে দেখতে ভালবাসি সম্রাজ্ঞী। দেখবেন নিজের ভগিনীকেও তিনি হয়ত আর আগের মত দেখতেন না। রূপে যখন ভাটা পড়েছিল।

অহমেস এ কথার উত্তর দিতে পারেন না।

একটু পরে রক্ষী-প্রধানা এসে মাথা নীচু করে দাঁড়ায়।

—কি হল ?

—হারেমে আসার পর আজ ফ্যারাও তেতাকে অনুগ্রহ করেছেন। কয়েক বছর আগে নীলনদ ভ্রমণের সময় তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আজ এতদিন পরে বিস্মৃত পেরেছিলেন।

—ঠিক আছে। অন্য কাউকে নিয়ে এস। কমবয়সী।

সে চলে গেলে অহমেস দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে ধরে বলেন—দেখলে ?

ঠোঁট উল্টে মুতনেফার্ত বলেন—কি আর দেখব ?

—এবারে কাকে আনে দেখি। বুঝলে তো ? রূপের অবশিষ্টাংশ নিয়ে মনে মনে গর্ব করার অর্থ নেই। আসল হল বয়স।

একটু পরে রক্ষী আর একজনকে সঙ্গে করে এনে কক্ষের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে আসে।

—আনলে না ?

—এনেছি। আপনি তো শুধু ক্রীতদাসীই আনতে বলেছিলেন দেবী ?

—হ্যাঁ। অল্পবয়সী।

—এরও বয়স অল্প। তবে কিছুদিন আগে এর মাথায় একটু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল। এখন ভাল।

—নিয়ে এস।

মেয়েটিকে সামনে নিয়ে আসা হলে দুই রানী নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে

চেয়ে থাকেন। অহমেস মনে মনে ভাবেন, তেতার চেয়েও এ সুন্দরী। কী সুন্দর দেহের গড়ন, ছন্দময় ভঙ্গি। প্রকৃত রূপবতী। দীর্ঘাঙ্গী। চোখ মুখ সব কিছু নিখুঁত।

—তোমার নাম কি ?

—আতেস।

—ফ্যারাও তোমাকে ডাকেন না ?

—অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে সে বলে—না।

—কেন। তুমি তো অসামান্যা সুন্দরী।

—আমি ছোটখাটো নই, আমি মিষ্টি কথা বলতে পারি না।

দুই রানী বিস্মিত হল রীতিমত। অহমেস বলেন—কে বলল এ কথা ?

—সবাই বলাবলি করে।

—কিন্তু তুমি তো খুবই রূপবতী।

—জানি।

—জান, এ কথা ?

—হ্যাঁ। তবু আমাকে—

প্রধানা রক্ষী বুঝতে পারে আতেস বেফাঁস কথা বলে ফেলতে পারে। এখনো হয়ত সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। সে তাড়াতাড়ি সম্রাজ্ঞীকে বলে—আপনি আজ্ঞা করলে আমি একে নিয়ে যেতে পারি।

তার চোখের ভীত চাহনি দেখে অহমেস বুঝতে পারেন সব। তিনি বলেন —নিয়ে যাও। পরে একদিন এর সঙ্গে কথা বলব সময় পেলে।

আতেসকে নিয়ে গেলে তিনি মুতনেফার্তকে বলেন—দেখলে তো ? ওরও পাত্তা নেই। ওর পাশে আমাকে কেমন দেখতে লাগছিল তোমার সঙ্গে তুলনা করেই বুঝতে পারছি। তুমিও নিশ্চয় পেরেছ। তাই ফ্যারাও-এর সঙ্গে যতটুকু কাজের দরকার জোর করে আদায় করে নিও। মন ভোলাতে চেষ্টা কর না।

মুতনেফার্ত অবাক হয়ে চেয়ে থাকে অহমেসের দিকে।

কিছুদিন থেকে কনিষ্ঠতম রাজপুত্র অমেনমেস নিজের মধ্যে একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করতে থাকে। অনেক কিছু যেন সে বুঝে ফেলছে যা তার বোঝা উচিত নয়। এই ভাবান্তরের সৃষ্টি হয় একদিন হতশেপসুতকে লুকিয়ে দুই ভাই মিলে একটি বিদ্যালয়ে গিয়ে বসার পর থেকে। তারা জানত হতশেপসুত তার শিক্ষককে নিয়ে অনেকদিন আগে একদিন গিয়েছিল আর এক বিদ্যালয়ে। এক বছর বা দুই বছর আগে। তার পর থেকেই তাদের দুজনার মনে ইচ্ছা জাগে তারাও গিয়ে দেখে আসবে একদিন অন্যান্য ছাত্ররা কিভাবে পড়াশোনা করে। কিন্তু সঙ্গে যাবে কে ? এখন একটু বড় হয়েছে। অমেনমেস ঠিক করে তার পরিচারক পিমাইকে সঙ্গে নেবে। তারা নিজেরাও যেতে পারে। কিন্তু পিমাই সঙ্গে থাকলে ভাল হয়। কারণ সে-ও দেবদেবীর অনেক আখ্যান জানে। যদি কিছু ভুল জেনে থাকে শুধরে নিতে পারবে। বিদ্যালয়ে কখনই ভুল শিক্ষা

দেওয়া হয় না।

পিমাইকে কথাটা বলতে সে কৃতার্থ হয়ে যায়। এতবড় সম্মান তার কল্পনার বাইরে ছিল। তাছাড়া বিদ্যালয়ের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ানর কথা সে ভাবতেও পারে না। খুব কোমল কণ্ঠে সে শুধোয়—আমি ভেতরে যাবার অনুমতি পাব তো?

—কেন পাবে না? তুমি আমাদের রক্ষী হয়ে সঙ্গে যাবে। অস্ত্র নিয়ে যেও।

পিমাই ঘাড় কাত করে।

উয়াচমেস কিন্তু পিমাইকে সঙ্গে নিতে আগ্রহী নয়। তবে ছোট ভাই কথাটা উত্থাপন করে ফেলেছে বলে তাকে নিরাশ করতে পারে না।

হতশেপসুত যেখানে গিয়েছিল ওরা দুজনা সেখানে গেল না। অন্য একটি বিদ্যালয়ে গেল। সূর্য তখন সবে উঠছে। ছাত্ররা বিদ্যালয় কক্ষে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। তাদের অনেকের চোখে মুখের ঘুমের রেশ তখনো কাটেনি। অমেনমেসের মজা লাগে। সে উয়াচমেসকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে সেকথা। ওরা দুজনা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। অনেকেই ওদের দেখেছে। কিন্তু কেউ কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি। ভেবেছে কোন নতুন ছাত্র হবে বুঝি।

ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ভেবেছিল ভেতর থেকে শিক্ষকের কণ্ঠস্বর ভেসে আসবে। কিন্তু শোনা গেল না। ভেতরটা শান্ত, নীরব।

উয়াচমেস বলে—পড়াশোনা হবে না?

—বুঝতে পারছি না।

—পড়াশোনা না হলে শিক্ষকের কাছে গিয়ে অনুমতি চাইব কি করে ভেতরে ঢোকার? গিয়ে লাভই বা কি?

—তাই তো। পিমাইকে দেখতে বলব ভেতরটা?

—কি দেখবে?

—গিয়ে দেখবে ভেতরে কি হচ্ছে। এতগুলো ছাত্র চুপ করে গেল কেন?

—দেখুক।

পিমাই চলে যায়। একটু উঁকি দিয়ে দেখে ফিরে এসে বলে—ওরা সবাই ঝুঁকে বসে কি সব লিখছে। সবার সামনে গোল করে প্যাপাইরাস গোটানো রয়েছে।

উয়াচমেস বলে—নিশ্চয় অঙ্কন শিখছে। লাভ হল না কিছু। অন্য বিদ্যালয়ে যেতে হবে।

পিমাইকে শিক্ষক দেখতে পেয়েছিলেন। দেখে বিরক্ত হয়ে বাইরে উঠে আসেন ওকে ধমক দেবা জন্য। কিন্তু সেখানে দুই রাজপুত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হন। তিনি নিজে একজন সভাসদ। রাজকুমারদের না চেনার কোন কারণ নেই।

তিনি বলেন—তোমরা এত সকালে? এখানে কেন?

উয়াচমেস বলে—আপনার কাছে এসেছিলাম।

—আমাকে ডাকলে না কেন?

—আমরা ভেবেছিলাম আপনার বিদ্যালয় কক্ষে বসে পুরাণ আর ধর্ম বিষয়ে কিছু শুনব। কিন্তু আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে না পেয়ে একে পাঠিয়েছিলাম দেখতে। মনে হয় ছাত্রদের আজ অঙ্কন বিদ্যা কিংবা গণিত শেখার দিন, তাই ফিরে যাচ্ছিলাম।

—তাই কখনো হয়? কষ্ট করে এসেছ এতদূর কাহিনী শুনতে। তোমরা ভেতরে এস। ওরা না হয় দুপুরে খাবার পরে লেখার কাজ করবে। এখন কাহিনী শোনাব। চল ভেতরে চল।

পিমাই ইতস্তত করছে দেখে শিক্ষক বলেন—এই লোকটি কে?

অমেনমেস বলে—আমার পরিচারক। রক্ষী হয়ে সঙ্গে এসেছে। একে ভেতরে দাঁড়াতে দেবেন?

—আসুক।

পিমাই-এর মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় সে আনন্দে অভিভূত।

ওরা ভেতরে যায়। দেখতে পায় সেখানে অন্তত ত্রিশজন ছাত্র বসেছে।

তাদের ঢুকতে দেখে ছাত্রেরা কৌতূহলী হয়ে উঠলেও তাদের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই নিজেদের কাজে মন দেয়।

শিক্ষক তাঁর আসনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন—তোমরা এখন তোমাদের হস্তাক্ষর লেখা বন্ধ রাখ। হস্তাক্ষর আর বিশুদ্ধ বানান শিক্ষা দেব দ্বিপ্রহরের আহারের পরে। এখন আমাদের দেশের ফ্যারাও আর দেবদেবী সম্বন্ধে সংক্ষেপে তোমাদের কিছু বলব। তোমরা তো দেখলে, পেছনে দুজনা এসে তোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ওরা দুজনা মহামান্য ফ্যারাও-এর পুত্র।

কথা শুনেই সবাই একসঙ্গে পেছনে ফেরে। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। একটু দেখেই ঘুরিয়ে নেয়। রাজকুমারদ্বয় ওদের মধ্যে মুখচেনা কয়েকজনকে দেখতে পায়। তাদের সঙ্গে অবশ্য কখনো কথা বলার সুযোগ হয়নি। আরও শৈশবে সাধারণ ছেলেদের মত প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে বের হয়ে আসত যেসব দিনে। খেজুর গাছের নীচে বসে বসে বালি স্তূপীকৃত করত তখন এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত তাদের খেলার সঙ্গী হত। এখন এরা অনেক বড় হয়ে উঠেছে তাদেরই মত। এখন আর যেমন তেমন ভাবে বাইরে আসতে পারে না তারাও। কারও নিষেধ নেই অবশ্য। তবু তারা তিন ভাই বোন মিলে গল্প গুজবে খেলাধুলায় সময় কাটিয়ে দেয় বিশাল প্রাসাদের যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়ে। আর যুদ্ধবিদ্যা কিংবা অস্ত্রবিদ্যা শিখতে অথবা শিকারে গেলে সঙ্গে থাকে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা। এই বয়সী ছাত্রদের সঙ্গে এখন আর মেলামেশার সুযোগ পাওয়া যায় না। প্রাসাদের উদ্যানে তিনজনে ঘুরে বেড়াবার সময় হতশেপসুত মাঝে মাঝে গুনগুন করে গানও গেয়ে উঠত। উয়াচমেস একদিন রসিকতা করে বলে ফেলেছিল যে গান গাইতে গাইতে একদিন হতশেপসুত নেচে উঠবে। সেই দিন থেকে গাওয়া বন্ধ করেছে। উয়াচমেসের শত অনুরোধ সত্ত্বেও তার মুখ দিয়ে গুনগুন শব্দ বের হয় না। অনুতপ্ত উয়াচমেসের সামনে তো নয়ই। সে জানে কিছুদিন পরে আবার তাকে অনুরোধ করলে হতশেপসুত না গেয়ে থাকতে পারে না। কারণ সে বয়সে

ছোট হলেও তাকে অন্য চোখে দেখে। তার অবাধ্য হতে পারে না।

শিক্ষক কিছুক্ষণ রাজকুমারদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন—আমি আজ কোন গল্প কাহিনী তোমাদের শোনাব না। কতকগুলো প্রয়োজনীয় বিষয়ে সবাইকে বলব, যাতে তোমাদের জ্ঞানভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

উয়াচমেস বলে—বেশ তো। তাই বলুন।

—তোমরা জান, আমাদের এই দেশ চির গ্রীষ্মের দেশ। কিন্তু তোমরা হয়ত জান না এমন অনেক দেশ রয়েছে যেখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়। তোমাদের হয়ত এখানে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হবে না। কিন্তু এটা সত্যি। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। গাছপালায় ভর্তি। সে দেশের মানুষেরা মরুভূমি দেখেনি।

ছাত্রদের মধ্যে একজন বলে ওঠে—তাই কখনো হয় ?

উয়াচমেস বলে—হয়। আপনার পুত্র অহমেস বলেছিলেন আমাদের। একজন পরিব্রাজকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল।

আবানার পুত্রকে অনেকেই দেখেছে ছাত্রদের মধ্যে। তাই রাজকুমারের কথা অবিশ্বাস করতে পারে না। কারণ আবানার পুত্রের প্রতি সবার অগাধ বিশ্বাস। তিনি সবার শ্রদ্ধেয়।

শিক্ষক সন্তুষ্ট হয়ে বলেন—তেমনি এমন দেশও আছে, যেখানে তুষার পড়ে। ঠাণ্ডা—খুব ঠাণ্ডা। সে দেশের অধিবাসীরা পশুর চামড়ার পোশাক পরে থাকে।

এবারে রাজকুমারদ্বয়ের মুখেও বিস্ময় ফুটে ওঠে।

শিক্ষক বলেন—এটাও সমান সত্যি। আমাদের এই দেশে অনেক পর্যটক আসেন। তাঁদের মুখে শোনা এ কথা। কিন্তু আমাদের দেশ গরমের দেশ। কারণ এই দেশের দেবতা হলেন রা। এখানে বাতাস শুকনো। এখানকার আলো অসাধারণ উজ্জ্বল। রা-এর কল্যাণে সূর্যের আলো তাঁর রাজকীয় প্রভাব বিস্তার করে রেখেছেন। সেই আলোর হর্ষিত রূপে কদাচিৎ ছায়াপাত ঘটে। তাই আমাদের বালির নীচে প্রোথিত কোন দ্রব্য নষ্ট হয় না। এখানকার মনুষ্যদেহও তার চিরন্তন আবাসে নিশ্চিন্তে বসবাস করে। পার্থিব জীবন পরিত্যাগের পরও ফ্যারাওরা এবং সম্মনীয় ব্যক্তিরাই সেখানে সুখী জীবন যাপন করেন। সেখানে তাঁদের জন্য রেখে আসা ভোগ্য দ্রব্য ভোগ করেন। সেই চিরন্তন আলয়ে তাঁদের ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত থাকে।

শিক্ষক একটু দম নিয়ে বলেন—আসলে বলতে গেলে ফ্যারাও নিজেই তো দেবতা রা। যে ফ্যারাও যখন জীবিত থাকেন তিনিই রা-এর প্রত্যক্ষ প্রতীক। ফ্যারাও থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিই আমাদের দৃষ্টিশক্তি দেয়। তিনি নীচের আর ওপরের—উভয় মিশরকে সূর্যের চেয়েও বেশী আলোকিত করেন। জলপূর্ণ নীলনদের চেয়েও ফ্যারাও উভয় মিশরকে অনেক বেশী শস্যশ্যামলা করে তোলেন। তিনিই কা—আত্মা। তিনিই খনেমু যিনি মনুষ্যদেহের আকার দেন কর্দম থেকে। তিনিই দেবী বাস্ত যিনি মিশরকে রক্ষা করেন। তিনিই আবার যারা দুষ্ট তাদের দমনের জন্য সেই ভয়ংকর সিংহীদেবী সেখমেত।

তোমরা কখনো তাঁকে অমান্য না করে সর্বদা তাঁর অনুগত থাকবে। তাঁর অনুগতরা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। আর যারা তাঁকে অস্বীকার করে তাদের জন্য শেষ আশ্রয়স্থলরূপে একটি সমাধিস্থলও জোটে না।

শিক্ষক তাঁর বক্তৃতায় বিরতি ঘটিয়ে রাজকুমারদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন—আমি কাহিনী শোনাচ্ছি না কোন। আমি ছাত্রদের কিছু ধারণা দেবার চেষ্টা করছি। তোমরা এসব জান হয়ত, তাই রসহীন বলে মনে হতে পারে।

এবারে অমেনমেস বলে ওঠে—না না, আপনি বলুন। খুব ভাল লাগছে। গল্প কাহিনীর মতই আকর্ষণীয়। জ্ঞানের কথা মাত্রেই আকর্ষণীয়।

শিক্ষক মনে মনে ভাবেন, এই রাজকুমারের বয়স এখানকার ছাত্রদের সমানই হবে। কিন্তু কথা বলছে পরিণত বুদ্ধির মানুষের মত। ফ্যারাও-এর পুত্র বলেই বোধহয় এটা সম্ভব। উভয় রাজকুমারের মধ্যে বয়সে ছোট হলেও হয়ত এই রাজকুমারই ভবিষ্যতের ফ্যারাও হবে। তাই রা-এর সমস্ত ক্ষমতা সুপ্ত রয়েছে এর মধ্যে।

—তোমরা একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমাদের দেবদেবীরা তিনজনে মিলে এক একটি গোষ্ঠী করে থাকতে ভালবাসেন। তাই এ দেশের সব জায়গায় দেখতে পারে একটি মূল মন্দিরের পাশাপাশি দুটি অন্য মন্দির। যেমন দেখবে ওসিরিসের সঙ্গে আইসিস এবং তাঁদের পুত্র হোরাস। এই থীবস্-এ তো দেখতেই পাও অমন রা-এর সঙ্গে মুত এবং খেনসুকে। নীচের দিকে মেমফিসে দেখবে আদি দেবতা পটেহ-এর সঙ্গে সেখমেত এবং নেফেরতেস। রা অতামকেও কেউ কেউ আকাশের দেবতা বলে বিশ্বাস করে। যার যেমন বিশ্বাস। ইনি নিজেই নিজের সৃষ্টিকর্তা। দেহের এক একটি নাম এঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটির সৃষ্টি হয়। আদি সমুদ্র নুন থেকে এঁর উৎপত্তি। ইনি আটটি দেহের খণ্ডের সৃষ্টি করেন। এই আটটি খণ্ড থেকে চার জোড়া দেবদেবীর সৃষ্টি হয়। দুইজন পুরুষ এবং দুইজন নারী। এঁরা হলেন বাতাসের দেবতা শু এবং আর্দ্রতার দেবতা তেফ্নুত; পৃথিবীর দেবতা গেব এবং আকাশের দেবী নুত। এ ছাড়া ওসিরিস ও আইসিস এবং সেথ এবং নেফথিসকেও ইনি সৃষ্টি করেন বলে অনেকের বিশ্বাস। কারও কারও ধারণা রা আতাস জীব সৃষ্টির জীবাণুর প্রবর্তন করেন। এরপর সৃষ্টি হয় বাতাস এবং আর্দ্রতা। তারপর পৃথিবী ও আকাশ। আর তারপরই দেখা যায় এক ধরনের জীব যার আকার মানুষের মত।

পিমাই খুব আস্তে আস্তে অমেনমেসকে বলে—আমি কিন্তু অন্যরকম শুনেছিলাম।

শিক্ষক পিমাইকে কথা বলতে দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন—ওকে ভেতরে ঢুকতে অনুমতি দিয়েছি কথা বলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে নয়।

অমেনমেস বলে—ও বলছিল সৃষ্টির অন্যরকম এক কাহিনীও ও শুনেছে।

শিক্ষকের মুখে বিস্ময়। পিমাই-এর দিকে একটু চেয়ে থেকে তিনি বলেন—হ্যাঁ। অন্য রকম কাহিনীও রয়েছে। সেখানে রা অতাসের মত আদি দেবতা

হলেন থথ। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে থথ নামোচ্চারণ করে করে কিছু দেব-দেবীর সৃষ্টি করেন। এই দেবদেবীরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে একটি ডিম্বের জন্ম দেন। এই ডিম ফুটেই সূর্যের উৎপত্তি। এই দেবদেবীরা ছিলেন চারটি পুরুষ ব্যাঙ এবং চারটি স্ত্রী সাপ। থথ-এর দেহ মানুষের মত কিন্তু মুণ্ড হল বক্রচঞ্চু সারস পাখির মত। তিনি একাধারে ঈশ্বরের উজির এবং তাঁর কলমচি। তিনি বৎসরের ঋতুগুলি এবং চন্দ্রতারকাদের নির্ধারক করেন। তিনিই অঙ্কনশিল্প, সংখ্যাতত্ত্ব, হিসাব, ভাষাতত্ত্ব, আইন ও সর্বোপরি ইন্দ্রজালের আবিষ্কর্তা। তিনি বিবাহ করেন স্বর্গের পুস্তক ভাণ্ডারের ভারপ্রাপ্ত দেবী সেশাতকে। এই সেশাতই স্বর্গের প্রতিটি বৃক্ষের পত্রে পত্রে প্রতিটি মানুষের জীবনের হিসাব-নিকাশ লিখে রেখেছেন।

শিক্ষকের এই কাহিনী শেষ হতেই পিমাইকে মাথা দোলাতে দেখা যায়। বোঝা যায় সে এই কাহিনীর কথাই আগে শুনেছে।

কিন্তু তার মাথা দোলানো বন্ধ হবার আগেই শিক্ষক বলেন—আর একটি কাহিনীও চলিত আছে। এই কাহিনী নীচের অর্থাৎ উত্তরের রাজধানী মেমফিস-কেন্দ্রিক। এই কাহিনীতে আদি দেবতা হলেন পটহ। তিনি দেবতা অতামের চেয়েও পুরোনো। তিনি অগাধ সমুদ্র নুন-এর সমসাময়িক। এই অতলান্ত জলরাশি থেকেই অতামের উত্থান। পটহ তাঁর অফুরন্ত মানসিক বলে এবং চেষ্টায় রা অতামকেও সৃষ্টি করেছিলেন। এই বিশ্বজগতের অন্তরাত্মা এবং চিত্তই হচ্ছেন পটহ। তিনি স্বয়ম্ভু। অন্যান্য দেবদেবী তাঁরই ইচ্ছায় এবং তাঁরই বুদ্ধিদীপ্তিতে সৃষ্ট। তাঁকে বলা হয় দেবদেবীর আদি পিতা। তাঁরা সবাই তাঁর কর্ণ থেকে নির্গত হয়েছেন। আর এই মানব জাতি? তারা তাঁর মুখবিবর থেকে নির্গত হয়েছে। দেবতা পটহ মমির রূপ নিয়ে থাকেন। হাতে তাঁর রাজদণ্ড যা শক্তি জীবন ও স্থায়িত্বের প্রতীক। মৃত্যুর পরবর্তী পৃথিবীতে তাঁকে বলা হয় পটহ-সেকের-আসর। এই নামে তাঁকে দেখা যায় হাঁটু ভেঙে উপুড় হয়ে বসা একটি ক্ষুদ্র শিশুরূপে যাঁর দুই হাত দুই কোমরে। কখনো তাঁকে কুমীরের পিঠের ওপর দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যায়। সেখানে তাঁর এক-পাশে আইসিস এবং অন্যদিকে নেফথিস। তাঁর পশ্চাতে মনুষ্য-মুখী শ্যেন পক্ষি। দেবতা হোরাস তাঁর স্নদপিণ্ড, জ্ঞানের দেবতা থথ হলেন তাঁর জিহ্বা।

কথা শেষ করেন শিক্ষক। তিনি প্রথমে রাজকুমারদ্বয়ের মুখের দিকে তাকান এবং তারপরে ছাত্রদের মুখের দিকে। তিনি বুঝতে পারেন তারা সবাই মনো-যোগী। কিন্তু তাদের কারও মুখের ভাবে গল্প শোনার আগ্রহ বা উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু একজন ছাড়া। সে হল অমেনমেস।

তাই তাকে বলেন—আমি তো আগেই বলেছিলাম, গল্প বলব না আজ। কিন্তু তথ্য জানাব। তাই তোমাদের ভাল লাগেনি।

অমেনমেস বাধা দিয়ে বলে—আমার যথেষ্ট ভাল লেগেছে। সব বুঝতে পেরেছি।

উয়াচমেস কনিষ্ঠ ভ্রাতার এই কথায় অবাক না হয়ে পারেনা। কারণ

শিক্ষকের কথাগুলো শোনার সময় মনে থাকলেও এখন অনেককিছু তেমন মনে নেই।

সে কোমরকমে বলে—আমার ধারণা স্পষ্ট হল, এইটুকু মাত্র বলতে পারি।

অমেনমেস বলে—ঠিক বলেছ। এটাও দরকার। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারি না। এইসবের মধ্যে আসল তথ্য কোনটি।

শিক্ষক বলেন—এটা নির্ভর করে নিজের নিজের বিশ্বাসের ওপর। তোমরা জান এক এক সময়ে এক এক যুগে দেবতা এক এক রূপ ধারণ করেন। যুগের উপযোগী হয়ে আসতে হয় তাঁদের। তোমরা লক্ষ্য করবে সব কাহিনীর মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়েছে। মানুষ তো পৃথিবীর সৃষ্টির সময় জন্মগ্রহণ করেনি। দেবতারা অনুগ্রহ করে যখন যেটুকু সৌভাগ্যবান মানুষদের বলেছেন আমরা ততটুকুই জানি। তাই প্রভেদ থাকা স্বাভাবিক।

অমেনমেস বলে—আমরা ভবিষ্যতে কখনো আপনার কাছে বিদ্যার্জনে আসতে চাইলে অনুমতি দেবেন?

—নিশ্চয়। তোমাদের যখন ইচ্ছা চলে আসবে।

—আজকের সবটুকুই আমার মনে আছে।

বাইরে এসে পিমাই অমেনমেসকে জিজ্ঞাসা করে—প্রভু, আপনার সবটুকু মনে আছে?

—হ্যাঁ। কেন এ তো সহজ।

উয়াচমেস নীরবতা ভঙ্গ করে বলে—একটুও ভুলে যাসনি?

—না।

উয়াচমেস ভাই-এর মুখের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চায়। এই মুখ এক একবার এক এক দেবতার মত প্রতিভাত হতে থাকে তার কাছে। বুঝতে পারে যে সে এত বিস্মিত হয়েছে যে ভুল দেখছে।

ভীত হয়ে সে ভাই-এর হাত সজোরে চেপে ধরে ডেকে ওঠে—অমেনমেস।

—কি হল?

—তুই ঠিক আছিস তো?

—হ্যাঁ। কেন? কি হয়েছে?

—না, এমনি।

পিমাইকে খুব বিষণ্ণ দেখায়। উয়াচমেসের মত সেও বুঝতে পারে যে তার প্রভুর মধ্যে একটা কিছুর পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। সে হঠাৎ দেখতে পায় অমেনমেসের মাথার ওপর একটি অতি উজ্জ্বল গোলাকার চাকতি। সেই চাকতি থেকে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। সে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখে সব স্বাভাবিক।

কদিন পরে হতশেপসুতও অমেনমেসের ভাবান্তর লক্ষ্য করে। সে তার হাত ধরে বলে—একটু আমার সঙ্গে আসবি?

—কোথায়?

—চল্, প্রাসাদের ওপরে যেখান থেকে নগরীর অনেকখানি দেখা যায়।

যেখান থেকে দূরে বহুদূরে দিগন্তের দিকে দৃষ্টি পড়ে। শুধু বালি আর বালি। মাঝে মাঝে এক একটা গাছ নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে। পশ্চিমের দিকের উপত্যকার আভাস মেলে যেখান থেকে, সেই উপত্যকা যেখানে সবাইকে একদিন যেতে হবে অনন্ত বিশ্রামের জন্য। যেখানে ওসিরিসের দেখা মেলে। দেখা মেলে অনুবিসের। সবার কা যেখানে বিচরণশীল। আবার পূর্বদিকে দৃষ্টি ফেললে পুন্ত-এর রাস্তার হদিস মিলবে। ওই রাস্তা ধরে কত শত বছর ধরে আমাদের দেশের কত লোক সমুদ্রপথে গিয়েছে, কিন্তু পুন্ত দেশে কেউ গিয়েছে বলে শোনা যায় না। সেই দেশ রূপকথার দেশের মতই রয়ে গিয়েছে। উত্তর দিকে চাইলে দেখা যাবে নুবিয়া যাবার পথ। ওই নুবিয়ায় বহু বছর ধরে আমাদের শ্রমিকেরা তাম্রখনি থেকে তামা উত্তোলন করে। সেই তামা গলিয়ে চলেছে আমাদেরই ব্যবহারের নানা সামগ্রী তৈরীর জন্য। আরও ওদিকে কুশ দেশ যেখানে আমাদের পিতা ফ্যারাও হয়েই একজনকে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন কুশের রাজপুরুষ হিসাবে, ওই দেশকে সুষ্ঠু প্রশাসনের আওতায় আনার জন্য। ওদেশে রয়েছে সোনার খনি। পিতা বুঝেছিলেন এই দীর্ঘ দেশকে সুশাসনে রাখতে হলে দুই ভাগে ভাগ করার প্রয়োজন। প্রতিটি ভাগের জন্য এক একজন উজিরের পদ সৃষ্টি করেছিলেন।

অমেনমেস তার অতি পরিচিত ভগিনীর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে ছিল। এ যেন হতশেপসুত নয়। অন্য কেউ। এর চাহনিতে এতখানি স্বপ্ন মাখানো সে আগে কখনো দেখেনি। কথা বলছে যেন নিজের সঙ্গে। পাশের ভাই-এর কথা বিস্মৃত হয়েছে।

হতশেপসুত সম্বিত ফিরে পায় একটু পরে। ভাই-এর হাত চেপে ধরে বলে —যাবি না?

—যাব।

—আমি বকবক করছিলাম বলে তোর নিশ্চয় খারাপ লাগছিল।

—খারাপ লাগবে কেন? দেশের কথা শুনতে আমার সব সময় ভাল লাগে।

—তাহলে তুই আগের মত আমাদের সঙ্গে থাকিস না কেন? আপন মনে ঘুরে বেড়াস। কী যেন ভাবিস সব সময়। কী ভাবিস এত?

—ভাবনার কি শেষ আছে?

—সর্বনাশ, এই বয়সেই এত? যদি কখনো ফ্যারাও হোস তাহলে তো ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যাবি।

—ফ্যারাও হতে হলে তোমাকে বিয়ে করা ছাড়া গতি নেই। সেটা যদিও উয়াচমেস পাকা করে রেখেছে। কিন্তু—

কথাটা বলতে বলতে অমেনমেস হঠাৎ থেমে গেল। তার চোখমুখ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তাতে অপরিসীম বেদনার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়।

হতশেপসুত বলে—থামলি কেন? উয়াচমেসের সঙ্গে বিয়ে হলে কি হয়েছে? অমন করছিস কেন? মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবি। তোর মন খারাপ। ফ্যারাও

হতে পারবি না বলে কষ্ট হচ্ছে ?

—না না, ওসব কষ্ট নয়। তাছাড়া আমি তো ফ্যারাও হতে চাই না। আর উয়াচমেস ফ্যারাও হতে পারলে আমি তোমার মতই আনন্দিত হতাম।

—চল্ ওপরে চল্।

ওরা দুজনা ওপরে উঠে যায়, যেখানে উঠে ফ্যারাও নিজেও অনেক সময় তার রাজধানীর দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নেন। ওরা ভাই বোনেও দৃষ্টি ফেলল চতুর্দিকে। তখন বেলা পড়ে আসছিল। তাই পশ্চিমের দিকে যতটা রঙিন পূর্বের দিক-চক্রবাল ততটাই ধূসর। হতশেপসুত পুন্ত নুবিয়ার যে সব স্বপ্ন দেখছিল ওপরে উঠে স্বচক্ষে তার কিছুই অনুমান করা যায় না। তবে স্বপ্ন দেখায় কোন বাধা নেই। অমেনমেস স্বপ্ন দেখে ওদের সবার চেয়ে বেশী। কিন্তু সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতে এক একসময় ভবিষ্যতের এমন কিছু দেখে ফেলে যা সত্যে পরিণত হয়, যা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তাই স্বপ্ন দেখতেও তার নিদারুণ ভয়। তবু কোন এক অজানা শক্তি যেন জোর করে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎটা বর্তমানের মত চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরে। সে তখন না দেখে পারে না। তার এক এক সময় মনে হয়, দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে আমুদে যিনি সেই মীন দেবতার এই কাণ্ড। এই দেবতা রাস্তার পথিকদের ওপর নজর রাখেন। কোপটাস বন্দর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। সারা পথটা নানান্ আনন্দের খোরাক জুটিয়ে তাদের স্ফূর্তিতে রাখেন। কোপটাস থেকে নাকি সেই স্বপ্নের দেশ পুন্তে যাওয়া যায়, যেখানে বাস করেন এক বিশালদেহী রানী।

হয়ত মীন দেবতাই অমেনমেসের এই দশার মূলে। কিংবা হতে পারে খেনসু দেবতার প্রভাবে এমন হয়েছে। খেনসুই প্রকৃত চন্দ্রদেবতা, থথ দেবতার আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও। অনেকে বলে চন্দ্রের প্রভাবে মানুষের মন এবং মাথার মধ্যে এমন সব বিপরীত কাণ্ড এর জন্য ঘটতে দেখা যায়। যিনিই এ সমস্ত করুন না কেন অমেনমেসের মন মাঝে মাঝে বিষাদভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আর সেই বিষণ্ণতা তার মুখের ওপরে ভেসে ওঠে। নইলে আজকাল সবার কাছে ধরা পড়ে যায় কেন ? আজ যে হতশেপসুত তাকে এই নির্জন প্রাসাদশীর্ষে নিয়ে এসেছে, এ নিশ্চয় তারই ফল।

ওপরে একটি কোণে নিয়ে গিয়ে ভাইকে পাশে বসিয়ে তাকে বলে এবারে বল্।

—কি বলব ?

—তুই আমার আগের ভাই অমেনমেস যেন নোস। একেবারে বদলে গিয়েছিস। কেন ? কি হয়েছে তোর ? কী দুঃখ তোর মনে ? আমি জানি আমাদের কথা শোনার সময় আর ধৈর্য মায়ের নেই। কিন্তু আমি তো রয়েছি। আমাকে খুলে বলতে পারিস। সব দুঃখ এভাবে চেপে রাখতে নেই। বল্।

অমেনমেস দুহাত দিয়ে মাথার দুপাশটা চেপে ধরে নীচের দিকে মুখ করে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তারপর সহসা সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে —না না, আমি কিছুতেই বলতে পারব না। তুমি জানতে চেও না।

হতশেপসুতের উদ্বেগাকুল দৃষ্টি অমেনমেসের মুখের ওপর আটকে যায়। ভাই-এর অস্থিরতা দেখে তার শ্বাস রোধ হয়ে আসতে চায়। বুক ঘন ঘন ওঠা নামা করে। অকস্মাৎ তার মনে হয় অমেনমেস নিশ্চয় ভবিষ্যতের কোন ঘোর অমঙ্গলের কথা জানতে পেরেছে, যেমন পেরেছিল আবানা-পুত্র অহমেসের মৃত্যুর কথা। এই জন্যই তার এই কাতরতা, এই অসহনীয় যন্ত্রণা।

ভাইকে নিজের কাছে দুহাতে টেনে নিয়ে সে বলে—হয়ত তুই কোন ভীষণ বিপদের সঙ্কেত পেয়েছিস, হয়ত সেই বিপদ আমাদের পরিবারে বিপর্যয় ঘটাবে। আমরা তাতে খুবই আঘাত পাব। তবু—

অমেনমেস মুখ তুলে বোনের মুখের দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে বলে—তবু? তবু কি?

—তবু যদি বলিস একটা প্রতিকারের পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

অমেনমেস দুঃখের হাসি হাসে। সেই হাসি কান্নার মত শোনায়। সে বলে—যা অবশ্যম্ভাবী তার কোন প্রতিকার হয় না।

—হবে না কেন? আমরা দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাব। কাটা গলা যদি জোড়া লাগে, তাহলে দেবতার কৃপায় সবই সম্ভব।

—ফ্যারাও-এর পিতা আমেনহোটেপকে আগের মত এনে মসনদে বসিয়ে দিতে পার? ফ্যারাওকে তরুণ করে দিতে পার?

অধৈর্য হতশেপসুত বলে—কিন্তু এসব তো ঘটে গিয়েছে।

—আমি যা দেখি তাও ঘটে গিয়েছে। আমি শুধু আগে থাকতে দেখতে পাই। তোমাদের কাছে যা ভবিষ্যৎ, আমার কাছে সেটা অতীত।

—তাহলে আমরা জানতে পারব না। একটু চেষ্টাও করতে পারব না? দেবদেবীর কাছে প্রার্থনাও জানাতে পারব না? সবটুকু কষ্ট মনের মধ্যে পুষে রেখে তুই দিনরাত ছটফট করবি, আর আমি এসব দেখেও তোকে সামান্য একটু সাহায্যও করতে পারব না? তোর মনকে এতটুকু হালকা করে দিতে পারব না? দরদ দেখাতে পারব না?

—উপায় নেই।

সূর্য আরও নীচে নেমে গিয়েছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দণ্ডায়মান খর্জুর বৃক্ষের প্রলম্বিত ছায়াগুলো ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হতে হতে এখন সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে। পশ্চিমের অন্তহীন মরুঅঞ্চল থেকে রাত্রির আগমনের বার্তা নিয়ে যে সমীরণ ধেয়ে আসছে তাতে শৈত্যের স্পর্শ।

হতশেপসুত বুঝতে পারে ছোট ভাইকে অনুরোধ করে কোন লাভ নেই। বরং তার এই ভবিষ্যৎ-দর্শনকে হেয় করে, উপেক্ষা করে, নিজের প্রতি তার অখণ্ড আস্থার ওপর আঘাত হানতে হবে। তাতে যদি কাজ হয়।

সে হেসে বলে—তুই নিজেকে বিরাট কিছু একটা ভাবছিস। তাই না? আসলে তুই তেমন কিছু নোস। কবে একবার তোর একটা কথা দৈবাৎ মিলে গিয়েছিল। তুই ভাবছিস সবই বুঝি তেমনিভাবে মিলে যাবে। আমার ধারণা তোর মনে অহঙ্কার জন্মেছে। এই অহঙ্কারে সুখের বদলে রয়েছে যন্ত্রণা। হয়ত

সেই যন্ত্রণাই এক ধরনের সুখ তোর কাছে।

ভগিনীর কথার মর্মার্থ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী অমেনমেসের বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে হতশেপসুতের মুখের দিকে দীর্ঘক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর অশ্রুসজল কণ্ঠে তার হাত দুটো চেপে ধরে বলে—না না, অহংকার নয়। সুখও নয়। শুধু যন্ত্রণা। বিশ্বাস কর, শুধু যন্ত্রণা। একা একা আর সইতে পারি না এক এক সময়।

—সেইজন্যই তো বলছি, আমাকে যন্ত্রণার ভাগ দে। তাতে তুই কিছুটা নিষ্কৃতি পাবি।

—বলতাম। কিন্তু তাতে আমার যন্ত্রণা একটু কমলেও তুমি যতখানি আঘাত পাবে সেটা সহ্য করা তোমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

—ভুলে যাসনে আমি হতশেপসুত। মিশরে হতশেপসুত খুব বেশী জন্মায় নি। ভবিষ্যতেও জন্মাবে না। তুই যতবড় ভবিষ্যদ্বক্তাই হোস, আমি হলাম মিশরের পরবর্তী সম্রাজ্ঞী এবং ফ্যারাও। এটা অবধারিত। কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

—আর যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে?

—সেও থাকবে। যুগ্মভাবে। আমি সাধারণ মেয়ের মত নই। আমি জানি আমার অসামান্য রূপ রয়েছে। তবু রূপচর্চা করি না। ভালো লাগে না। নারী হয়ে জন্মেছি বলে যেটুকু আপসোস রয়েছে, ফ্যারাও হয়ে সেটুকু ঘুচিয়ে দেব। অথচ আমি আমার মোহিনীশক্তি দিয়ে যে কোন পুরুষকে ক্রীতদাস করে নিতে পারি।

নিজের ভগিনীকে অমেনমেস ভালভাবে চেনে। কিন্তু সে যে তার নারীত্বের জন্য মনঃক্ষুণ্ণ এ কথা জানা ছিল না। তাই ভাবে, তাহলে বোধহয় একে সবকিছু বলা যেতে পারে। এ সম্ভবত তেমনভাবে ভেঙে পড়বে না।

সে তখন বলে—একটা কথা তোমাকে বলে দিতে পারি। উয়াচমেসকে বিবাহ করার তোমার যত আগ্রহই থাকুক না কেন, সেই ইচ্ছা জীবনে কখনো ফলবতী হবে না।

হতশেপসুতের হৃদয়ে প্রবল ঝাঁকি লাগে। চটে ওঠে মনে মনে। অমেনমেস বয়স অনুযায়ী একটু বেশী পেকে গিয়েছে।

সে বলে—বেশ তো, ওর সঙ্গে না হলে তুই তো আছিস। ও তোর চেয়ে বড় বলে একটা পুরুষালী ভাব ফুটে উঠছে, যা মনকে দোলা দেয়। তুই এখনো ঠিক তেমন না হলেও বুদ্ধি তোর আরও বেশী এ কথা মানতেই হবে। আর তোর এইসব বাতিক আমি সামলে নেব। পরিপূর্ণ যৌবনে তুই-ও কম আকর্ষণীয় হবি না।

অমেনমেস বলে—সেই ইচ্ছাও অপূর্ণ থাকবে তোমার।

হতশেপসুত অমেনমেসের কথার মধ্যে একাধারে দৃঢ়তা আর বিষণ্ণতা ফুটে উঠতে দেখে বলে—কি বলছিস তুই? কেন হবে না?

—দুই সহোদর ভাই-এর একজনের সঙ্গেও তোমার বিবাহ হবে না। হবে

ওই রানী মুতনেফার্তের পুত্র, আমাদের বড় ভাই-এর সঙ্গে।

হতশেপসুত হেসে ওঠে। তারপর রেগে গিয়ে বলে—অনেক হয়েছে। আর বলতে হবে না। তোরা দুজনা থাকতে ফ্যারাও ওর সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন না। বলা আছে তাঁকে। আমি ওকে কিছুতেই বিয়ে করব না।

অমেনমেস একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে ভগিনীর পাশ থেকে উঠে দাঁড়ায়। সূর্য একটু আগে ডুবে গিয়েছে। অন্ধকার নেমে আসছে। একটিমাত্র তারা জ্বলজ্বল করছে পশ্চিম আকাশে। একটু পরে একটা একটা করে সমস্ত আকাশের চাদরে তারা ফুটে উঠতে থাকবে। শেষে একেবারে ছেয়ে যাবে। তারকাময় হয়ে উঠবে আকাশ।

অমেনমেস গুটি গুটি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে হতশেপসুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে তার হাত চেপে ধরে।

—কোথায় যাচ্ছিস ?'

—নীচে।

—না। পিমাই তোর সর্বনাশ করছে। ওকে ওর দেশে পাঠিয়ে দেব।

অমেনমেস চমকে ওঠে। পিমাইকে সে খুব পছন্দ করে। সে কখনো এইসব বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে না। একদিনই শুধু বলেছিল নিজের ভাই সম্বন্ধে। তারপর এই বিষয় ওঠাতে চাইলেও সে এড়িয়ে যায়। ওকে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে শাস্তি দেবার কোন অর্থ হয় না। সেখানে গিয়ে কৃষিকাজ করতে পারবে না—শ্রমিকের মত খাটতেও পারবে না। একটু পড়তে জানে, লিখতে পারে। পরিশ্রমের কাজ জানে না। তবে হস্তাক্ষর ভাল নয় বলে নকলনবিশী করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে মরে যাবে দেশে পাঠিয়ে দিলে।

তাই ব্যাকুল কণ্ঠে ভগিনীকে বলে—না না, ওকে পাঠিয়ে দিও না। ও মরে যাবে। কোন দোষ তো ও করেনি।

—তোর মাথা খেয়েছে।

—না।

—তবে বল্ মুতনেফার্তের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কেন ?

—আমাদের দুজনার সঙ্গে হবে না বলে।

—কেন হবে না ? তোরা ফ্যারাও হবি না ?

—না।

—বিশ্বাস করি না।

অমেনমেস এদিক ওদিক চায়। ভগিনীর মসৃণ হাতে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। তার হাত দুটি তুলে নেয় নিজের হাতে।

হতশেপসুত তার রকমসকম দেখে অবাক হয়। সে বলে—ওতে আমি ভুলছি না। বলতে হবে।

অমেনমেস তার হাত ছেড়ে দিয়ে নীচে নামার সিঁড়ির দিকে ছুটে যেতে যেতে বলে—আমরা দুজনা তখন আর থাকব না।

হতশেপসুতের চোখে বিভীষিকা ফুটে ওঠে। সে যদিও নিষ্পলক দৃষ্টিতে

সোপানশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। তার চোখের সমনেটা ঢেকে যায় গাঢ়তম অন্ধকারে এবং সেই অন্ধকারের মধ্যে অনুবিসের মুখ নৃত্য করতে থাকে।

সবরকম উৎসবই যথাযথভাবে পালিত হয়ে চলেছে থুথমসের রাজত্বে। ভোজেরও আয়োজন করা হয় অনেক সময়। এই ভোজের আয়োজন উচ্চশ্রেণীর রাজকর্মচারীরাও করে নিজ নিজ আলয়ে। তবে সব ভোজের সেরা ভোজপর্ব অনেকদিন হয়নি। সেটি হল হেব-সেদ ভোজ। ইতিমধ্যে রাজকুমারীর অঙ্গে যৌবনের ঢল নামতে শুরু করেছে। অমেনমেসের না হলেও উয়াচমেসের কোমরের স্থূলতা কমে সেই স্থূলতা ওপর দিকে উঠে বক্ষস্থল প্রশস্ত করতে শুরু করেছে। তারুণ্যের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে তাদের উভয়ের দেহের নানা স্থানে সঙ্গোপনে। ভগিনীর মুখশ্রী যেমন কোমল ও নম্র হচ্ছে, উয়াচমেসের মুখমণ্ডলে তেমনি রুক্ষতা আর উদারতা প্রকাশ পাচ্ছে। অমেনমেসও বড় হয়েছে। তার মধ্যে যেটুকু চাপল্য এতদিন তবু দেখা যেত তাও একেবারে হ্রাস পেয়েছে। সে অনেক বেশী গম্ভীর, সে অনেক বেশী জ্ঞানবান। তার সঙ্গে কথা বলতে শিক্ষক হেকাবনেহেহ্-এর মনেও সম্ভ্রম জাগে আজকাল। কারণ এই ছাত্রটি যে আর পাঁচজনের মত সাধারণ নয় শিক্ষকতা গ্রহণের কিছুদিন পর থেকেই একথা তিনি উপলব্ধি করতে থাকেন। এখন যেন তিনি নিজেই কোন কোন ক্ষেত্রে হীনমন্যতায় ভোগেন, অনুভব করেন যে বিষয়েই তিনি শিক্ষা দেন অমেনমেসের তা অজানা নয়। শুধু তাঁকে শ্রদ্ধা করে বলেই মনোযোগের সঙ্গে সবই শুনে যায়। হতশেপসুত আর উয়াচমেসও তাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা রীতিমত যত্নের সঙ্গে শোনে। তারা পাঁচ বছর আগেও অমেনমেসকে দেখেছে বেশ চঞ্চল, শিশুসুলভ চাপল্যে তখনো অনেকসময় হেসে উঠত। তারপর একদিন আবানার পুত্রের মৃত্যুর কথা না দেখে সহসা বলে ফেলল। সেদিন থেকেই তার চাপল্যে ভাটার টান শুরু হয়ে গেল। মাঝে মাঝেই সে অনেক তথ্যসমৃদ্ধ কথা বলতে আরম্ভ করল। তবু ওরা প্রথম প্রথম গুরুত্ব দেয়নি ওকে। কিন্তু এখন আর না দিয়ে পারে না।

হতশেপসুত অমেনমেসের সেই ভবিষ্যদ্বাণীয় কথা মাঝে মাঝে ভাবে। তার সাহসের অভাব নেই। ফ্যারাও এবং তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অমাত্যবর্গ এবং রাজকর্মচারীবৃন্দ সবাই জানে হতশেপসুতের সাহসের কথা। একথাও তারা জানে যে সাহসের সঙ্গে বুদ্ধিরও সংমিশ্রণ ঘটেছে ওর মধ্যে। তবু তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কয়েক বছর আগে সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রাসাদশীর্ষে যে কথা উচ্চারণ করে নীচে নেমে এসেছিল, সেকথা ভাবলে এখনো বুক কাঁপে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে তার বিবাহ হবে একথা এখনো ভাবতে পারে না। উয়াচমেস কী সুন্দর হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিও তার তীক্ষ্ণ। সেইসঙ্গে সে বীর। অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। মৃগয়ায় গিয়ে অসম সাহসিকতার পরিচয় দেয়। একথা সবাই জেনে গিয়েছে। তার সঙ্গে তুলনা করলে মুতনেফার্তের পুত্রকে অত্যন্ত ম্রিয়মান ও বিবর্ণ বলে মনে হয়।

যদিও সে এখন রীতিমত যুবক।

তাই তার এক এক সময় মনে হয়, অমেনমেসকে জিজ্ঞাসা করবে, সেই কথা কি এখনো সত্যি বলে মনে করে সে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয় না। যদি রূঢ়ভাবে শুনিয়ে দেয় যে যা বলেছে সেটা ঘটে গিয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। কোন প্রতিকার নেই।

তবু দিন কেটে যায়। মাস কেটে যায়। বছরও কেটেছে ইতিমধ্যে। তবে সেই আহত মনে সময় তার বিস্মরণের আর অবিশ্বাসের প্রলেপ বুলিয়ে দেওয়ায় এখন আর কথাগুলো তীব্রভাবে মনকে নাড়া দিতে পারে না। মাঝে মাঝে ববং এসব কথা ভুলেই যায় সে। নইলে এত আনন্দ এত স্ফূর্তি করতে পারত না। কিন্তু উয়াচমেসের পাশে বসলে, তার গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে কার দেহের উত্তাপ বেশী সেটা পরখ করার সময় তার মনটা মাঝে মাঝে অবশ হয়ে যায়। উয়াচমেসেব দেহের উত্তাপ সব সময়েই বেশী। কিন্তু সত্যিই যদি তেমন কিছু ঘটে যায় তাহলে এত উষ্ণ দেহ ওসিরিসের নিথর দেহের মত শীতল হয়ে যাবে। তবে মনের এই অবস্থা কয়েক মুহূর্তের জন্য হয় হতশেপসুতের। পরক্ষণেই সব ভুলে যায়। উয়াচমেসের সান্নিধ্য ভুলিয়ে দেয়।

হেব-সেদ ভোজের মত অতি বৃহৎ এক অনুষ্ঠানের সমর একথা মনে রাখা সম্ভব নয়। আর এই অনুষ্ঠান হচ্ছে বলতে গেলে তারই উদ্যোগে। কারণ সে-ই পিতাকে মনে করিয়ে দিয়েছে এই অনুষ্ঠানটি তাঁর রাজত্বকালে খুব কম হচ্ছে। শেষ কবে হয়েছে হতশেপসুতের নিজেরই স্পষ্ট মনে নেই। অথচ ফ্যারাও ইচ্ছে করলে যে কোন সময়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেন। যত বেশী করবেন ততই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে, প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। আনন্দ আর আস্থায় ভরে উঠবে প্রজাদের বুক। উচ্চবর্গের কর্মচারীবর্গ উৎসাহিত হয়ে উঠবে।

অনেক বছব পূর্বে মেমফিসে যখন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হত, তখন দেশের পূর্বদিকে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে যে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল সেই প্রাচীরকে ভোজপর্ব উপলক্ষ্যে প্রদক্ষিণ করতেন তৎকালীন মিশরের অধিপতিরা। হতশেপসুত জানে সেকথা। সেই প্রাচীর থীবস-এ নেই। তাই একবার নাকি সেই প্রাচীরের আদলে একটি ছোটখাটো প্রাচীর প্রতীকরূপে নির্মাণ করে সেটি প্রদক্ষিণ করা হয়েছিল। সেই নিয়মই এখনো অব্যাহত রয়েছে।

এই ভোজপর্ব অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল ফ্যারাও-এর মাহাত্ম্য, তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ পরমায়ু নিশ্চিত করা। এতে ফ্যারাও-এর পুনর্জন্ম হয় এবং তিনি নতুন করে জীবন শুরু করেন। এই পুণ্যদিবসে দেবতারা ফ্যারাওকে বলেন—অমাবস্যার পরদিন থেকে অতি সূক্ষ্মভাবে ধীরে ধীরে চাঁদের যেমন উদয় হয়, তেমনি তুমিও আবার নতুন করে জীবন শুরু কর। তারপর দিনে দিনে চাঁদের কলার মত তোমারও কলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, এগিয়ে যাও ষোলকলার পরিপূর্ণতার দিকে। হেব-সেদ ভোজপর্বেই এর শুভ সূচনা হোক।

এইদিনে ফ্যারাও তাঁর দেহ পুরাকালের মত একটিমাত্র বস্ত্রে জড়িয়ে রাখেন। সেই বস্ত্র পরিধান করে তিনি নীরবে দেবতা ওসিরিসের জন্ম ও মৃত্যুর অভিনয় একের পর এক করে যান। তারপর মৃত্যু ঘটার পর ওসিরিসের যেমন পুনরুত্থান হয়েছিল তেমনি অভিনয়-রত ফ্যারাও-ও মৃত্যু থেকে বেঁচে ওঠেন আদিম শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে। এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে ওসিরিস-স্তম্ভ নির্মাণ করে ঋজুভাবে সেটি স্থাপন করা। এই স্তম্ভ হচ্ছে সেই বৃক্ষের প্রতীক যে বৃক্ষ পুরাকালে বিব্লসের বেলাভূমিতে ওসিরিসের শবাধারকে ঘিরে বেড়ে উঠে তাকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেছিল।

অবশেষে প্রথম থুথমসের রাজত্বকালে আর একবার হেব-সেদ অনুষ্ঠানের দিন এসে গেল। রাজপ্রাসাদের সেই বিশেষ বিশাল কক্ষটি সজ্জিত করা হল। বিচিত্র সব মূল্যবান আসন শোভা পেতে থাকে এই কক্ষে। কক্ষের একদিকে সুন্দর সুন্দর মদিরার অসংখ্য পাত্র শোভা পাচ্ছে। অতিথিবর্গ কক্ষে প্রবেশ করলেই সেইদিকে দৃষ্টি পড়বে এবং তারা লোভাতুর হয়ে উঠবে। অন্যদিকে একটি বহুমূল্য সুদৃশ্য পর্দার আড়ালে সজ্জিত রয়েছে থরে থরে রাজকীয় খাদ্যসামগ্রী।

হতশেপসুত তার দুই ভাইকে নিয়ে সবকিছু দেখাশোনা করে। সে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে মুচকি হেসে সরে যায়। সে ভেবেছিল এইদিনে বোধহয় তাকে যুবরাজ রূপে ঘোষণা করবেন ফ্যারাও। তেমন কথা শুনেছিল তার নিজের মায়ের মুখে। দুদিন আগে মুতনেফার্ত নিজে তাকে ডেকে বলেছিলেন যে এখনো ফ্যারাও মনস্থির করে উঠতে পারেন-নি। তবে শীঘ্রই ঘোষণা করবেন। তাই সে নিরুৎসাহিত। হতশেপসুত আর তার সহোদর দুই ভাই-এর অতি উৎসাহ দেখে তার মুখের সেই নিষ্ঠুর রেখাটা মাঝে মাঝে ভেসে উঠতে থাকে। সে ভাবে এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র নেই তো? ফ্যারাও কি তাকে শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত করবেন? উয়াচমেসের সঙ্গে হতশেপসুত যেভাবে মেলামেশা করে তা খুবই ঘনিষ্ঠ পর্যায়ের। এতে তার মনে ঈর্ষার উদয় হয়। নিজেও সে এভাবে মিশতে চেয়েছে। কিন্তু হতশেপসুত অত্যন্ত ভদ্রভাবে এড়িয়ে গিয়েছে। ওদের দুজনার মেলামেশার একটা বাড়তি আকর্ষণ রয়েছে বোঝা যায়। যৌবনের আকর্ষণ। মেয়েটার দিকে একবার চাইলে দৃষ্টি ফেরান যায় না। এত রূপও থাকতে পারে। কতদিন কতবার কতভাবে সে একলা নির্জনে ওর কাছে আসতে চেয়েছে। নিজের সাহস আর বিক্রমের কথা বলে ওর মন ভোলাতে চেষ্টা করেছে। পারেনি। অত্যন্ত আলগোছে হতশেপসুত সরে গিয়েছে। আজকাল নিজের রূপ আর যৌবন সম্বন্ধে সে রীতিমত সচেতন। আগের মত আর নেই। অথচ এই রূপের সবটুকু যেন মেলে ধরতে চায় উয়াচমেসের চোখের সামনে, তার হৃদয়ের সামনে। উয়াচমেসও বেশ সুদর্শন হয়ে উঠেছে। ওরা দুজনা মিলে ষড়যন্ত্র করতেই পারে। আর তেমন ষড়যন্ত্র করলে সম্রাজ্ঞীর তো কোন আপত্তি থাকতেই পারে না। ফ্যারাও সম্ভবত বিশেষ কিছু বলবেন না। সম্রাজ্ঞী অহমেস বরং বেশী করে সহযোগিতা করবেন।

কারণ ওরা দুজনা তাঁরই গর্ভজাত।

অতিথিবৃন্দের সমাবেশের আগেই ফ্যারাও-এর নিজস্ব পরিচারকবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে মোতায়েন হয়ে গেল। তেমনি প্রাসাদের পরিচারিকাদেরও নিজের নিজের স্থানে বহাল করা হল। তাদের এক একজনের জন্য এক এক ধরনের কাজ। কেউ আতরদানি থেকে আতর বর্ষণ করবে অতিথিবৃন্দের মস্তকে, তাদের গাত্রে। কেউ মাখিয়ে দেবে সুগন্ধি মলম। পরিচারিকাবৃন্দ কেশবিন্যাস অনুযায়ী মলম এবং আতর লাগিয়ে দেবে। এইজাতীয় ভোজে অনেক সময় মহিলারা একান্ত-ভাবে পাশের কক্ষে সরে গিয়ে নতুন করে পরস্পরের বেশভূষা এবং কেশবিন্যাস করে দেয়। এইদিনে তারা নতুন হার পরে। তারা পুষ্প বিনিময় করে পরস্পরের মধ্যে। এই পুষ্প বেশীর ভাগ সময়ে নীলপদ্ম। নীলপদ্মের কদর মিশরে সর্বাধিক।

কক্ষের এক প্রান্তে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে অপেক্ষারত বাদকবৃন্দ। হারেমের গায়িকা ও নৃত্যপটিয়সীরাও সেখানে সমুপস্থিত। হেব-সেদ ভোজপর্বের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। মান্যগণ্য অতিথিবৃন্দ নির্দিষ্ট সময়ে আসতে শুরু করে। তাদের সর্বাঙ্গ সুগন্ধে ভরিয়ে দেওয়া হয়। আকাশ বাতাস মন মাতানো সৌরভে ভর-পুর হয়ে ওঠে। মহিলাগণ নানান সাজে সজ্জিত হয়ে আসে। তাদের প্রসাধনের পারিপাট্য মন কেড়ে নেয়। তাদের হাসি আর চাপল্যে প্রাসাদের ভেতরের আঙিনা মুখর হয়ে ওঠে।

সেই সময় ঘোষণা করা হয় ফ্যারাও প্রথম থুথমসের আগমনবার্তা। সব হাসি সব উচ্ছ্বাস, সব কথাবার্তা এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়। অখণ্ড নীরবতা নেমে আসে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। এই প্রাঙ্গণের একপাশে একটি প্রাচীর নির্মিত রয়েছে মেমফিসের সেই পুরাকালের প্রাচীরের মত। ফ্যারাও একটি দীর্ঘ এবং অতি মোলায়েম বস্ত্রে নিজের দেহটিকে জড়িয়ে নিয়েছেন। সেইকালে এখনকার মত বৈচিত্র্যময় পোশাক আবিষ্কৃত হয়নি। তাই ফ্যারাওকে এই সহজ সাজে সাজতে হয়।

ফ্যারাও থুথমসের মুখে সুমিষ্ট হাসি। এই হাসি দেখে কর্মচারীবৃন্দের চিত্ত স্বভাবতই ভয়শূন্য হয়। এই হাসি ফ্যারাও-এর মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখলে অগণিত প্রজাদের মনে ভরসা জাগে। থুথমস প্রাচীর প্রদক্ষিণের পর ওসিরিসের ভূমিকায় যথাযথভাবে একে একে সমস্ত অভিনয় করে যায়। অন্যান্য কুশীলবরাও নিজ নিজ ভূমিকায় প্রশংসনীয়ভাবে অভিনয় করে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে স্তম্ভিত করে দেয়। তাদের মনের গভীর বিশ্বাস আরও দৃঢ়মূল হয়।

ফ্যারাও এরপর বিশাল কক্ষে প্রবেশ করে রানী অহমেসকে পাশে নিয়ে সুদৃশ্য স্বর্ণ রৌপ্যখচিত হস্তীদন্তের আসনে গিয়ে উপবেশন করতেই বাদকেরা বাজনা বাজাতে শুরু করে। বীণা ঝঙ্কৃত হয়। নর্তকীবৃন্দের পায়ের নূপুরও চঞ্চল হয়ে বাজতে আরম্ভ করে ঝনক ঝনক। তারা এগিয়ে আসে কক্ষের কেন্দ্র-স্থলে। দিনের আলো থাকতে থাকতেই কক্ষের হাজার চিরাগ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

এখন শুধু আনন্দ আর আনন্দ। বাঁধভাঙা আনন্দে গা ভাসিয়ে দেওয়া। কারণ আজকের এই আনন্দে ফ্যারাও-এর সামনে কেতাদুরস্ত হয়ে চলার প্রয়োজন নেই। সবাই আজ মুক্ত, সবাই স্বাধীন। তাই সবই বাঁধন-হারা হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে সুরার পাত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে থাকে সুন্দরী ললনাগণ। তাদের চোখের আর ঠোঁটের ভাঁজে সুরাপানে উদ্বুদ্ধ করার ইঙ্গিত। সেই ইঙ্গিতে অতি সহজেই ধরা দেয় সবাই। সজ্জিত মহিলাদের মধ্যেও সুরা বিতরণ করা হয়। প্রতিটি নারীর সামনে এসে সুরার পাত্র ধরে পরিচারিকা-বৃন্দ সুমিষ্ট হেসে বলে—"পান করুন। এই সুরা খুবই উত্তেজক। ওসিরিসের প্রিয় ছিল এই সুরা।" নারীদের মধ্যে কয়েকজন একান্তভাবে ফিসফিস করে বলে ওঠে—"আমি উন্মত্ত হয়ে উঠতে খুব ভালবাসি। আমি সব ভুলে আনন্দের সমুদ্রে ডুবে যেতে চাই।" পরিচারিকা আরও একটু বেশী ঢেলে দিয়ে বলে, "আপনি যথার্থই বলেছেন। এই তো সুযোগ। জীবনে ক'দিনই বা এ সুযোগ আসে।"

সময় গড়িয়ে চলে। রাত বাড়তে থাকে। দিবাভাগের উষ্ণতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে পেতে এক সময় শীতলতার স্পর্শ লাগতে থাকে আবহাওয়ায়। প্রাঙ্গণ সংলগ্ন বিশাল কক্ষের নারী পুরুষ সবার চোখের দৃষ্টির তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে আসে। তারা আকণ্ঠ পান করে সব কিছু রঙিন দেখতে থাকে। ওদিকে নর্তকীরা নাচতে থাকে, সঙ্গীতশিল্পীরা গাইতে থাকে সুমিষ্ট বীণার সঙ্গে। কিন্তু অতিথিবৃন্দের সেই নাচ দেখার অবস্থা নেই। গান শোনার ফুরসৎ নেই। তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। যদি তারা মদিরার পাত্র থেকে কিছুক্ষণের জন্য তাদের ওষ্ঠ সরিয়ে নিয়ে সঙ্গীতের কথাগুলোর প্রতি কান পাতত, তাহলে গানের মধ্যে এই কথাগুলো শুনতে পেত ঃ

এই আনন্দের দিনটি উদযাপন কর।
তোমার নামারন্ধ্রে লাগিয়ে নাও সুমিষ্ট
সুগন্ধি তেল। পদ্মের পাপড়ি হোক
তোমার অঙ্গের ভূষণ। আর তোমার
ভগিনী, যিনি তোমার হৃদয়েশ্বরী হয়ে
তোমারই পার্শ্বদেশ অলঙ্কৃত করছেন
তাঁর বক্ষও শোভিত হোক ওই
একই পুষ্পে। সঙ্গীত ও সুরেলা
বাদ্য বেজে উঠুক তোমার সামনে।
তোমার মনকে কর চিন্তামুক্ত
করে রাখো প্রফুল্ল ততদিন পর্যন্ত
যতদিন না সেই বিশেষ দিনটি
আগত হয়, যখন আমরা সবাই
এগিয়ে যাই পরম দেশটির দিকে
যে দেশে নিঃসাড় নিস্তব্ধতা বিরাজমান।

কেউ শোনে না এই গানের ভাষা। শুনতে চায় না। মাথা ঘামাতে চায় না অত। তবু তারা ওই গানের ভাব ও ভাষাকে অর্থবহ করে তুলছে। তারা সত্যিই ভুলে গিয়েছে ইহজগতের সমস্ত শংকা, সমস্ত দুখে কষ্ট ব্যথা বেদনার কথা। নৃতপটিয়সীদের তোড়ার শব্দ অজ্ঞাতে তাদের মধ্যে আনন্দের ছন্দ সৃষ্টি করে সেই আনন্দকে আরও বাঁধন-হারা করে তুলছে।

কেউ না শুনুক কনিষ্ঠতম রাজপুত্র অমেনমেস কান পেতে থাকে। সে সঙ্গীতের কথাগুলো শোনে। ভাবে আজ ফ্যারাও ও তাঁর পরিবার পরিজন এবং এত বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে তাহলে তাকেই সবচেয়ে বেশী আনন্দ করতে হয়। কারণ পশ্চিমের সেই অজানা দেশ, যে দেশ স্তব্ধতাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, সেই দেশে যাবার আর তেমন দেরি নেই তার। তবু সে আনন্দ করতে পারছে না। হয়ত পারত যদি সে পরিপূর্ণ যুবক হত। কিন্তু এখনো কৈশোরের শেষ সীমায় আটকে রয়েছে তার বয়স। উয়াচমেস অবশ্য এখন যুবক। কিন্তু তারও সময় হয়ে আসছে। তাকে যদি এখন গিয়ে সব কথা খুলে বলে আনন্দে গা ভাসাতে বলা হয়, তাহলে সে পারবে না। সে বিষণ্ন ও ভয়ার্ত হয়ে উঠবে। নিজের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ জেনে আনন্দ করা যায় না। এরা সবাই আনন্দ করছে, কারণ এরা কেউ জানে না কবে এদের শেষের সেইদিন আসবে। সবাই অন্তরের মধ্যে একটা আশা জাগিয়ে রাখে যে সে দীর্ঘজীবী হবে।

শুধু তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুতনেফার্তের পুত্র নিশ্চিন্ত আনন্দে মাততে পারে না আজ। তার ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত হলেও শুধু অমেনমেস জানে তারই ভাগ্যে ফ্যারাও-এর পদটি ঝুলছে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জানে না তার ভবিষ্যতের কথা। এখন তাকে গিয়ে বললেও বিশ্বাস করবে না। ভাববে, ঠাট্টা করা হচ্ছে। ভাববে, হেয় করা হচ্ছে তাকে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাকে দেখে মনে হচ্ছে এতসব মানুষের মধ্যে একমাত্র সেই অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এক পা বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবার মুখে হাসি। ওর মুখ গম্ভীর। সবার চোখে সরলতা, ওর দৃষ্টি কুটিল। বেচারা নিজের জ্বালায় মরছে। ভাবছে, মসনদ হাতছাড়া হয়ে যাবে। কারণ হতশেপসুত তার প্রতি প্রসন্ন নয়।

নৃত্য আরও উদ্দাম হয়ে উঠেছে। অতিথিবৃন্দের অধিকাংশই এখানে ওখানে বসে পড়েছে। তাদের পা টলছে। কথা কমে এসেছে। হতশেপসুত আর উয়াচমেস পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সব দেখছে। হতশেপসুতের মিষ্টি ব্যবহার আর বিগলিত ভাব দেখে তো বুঝবার উপায় নেই আজ যে তার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য-বোধ কতটা প্রখর।

গায়কেরা গাইতে থাকে ঃ

মস্তকে লেপন কর সেই বিশেষ বৃক্ষের আঠালো রস,
নিজেকে সজ্জিত কর বহুমূল্য রত্নে।
বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি সেই অতি সুগন্ধি
প্রলেপ দিয়ে নিজের দেহ চর্চিত কর।
সাধ্যাতীত দ্রব্য দ্বারা নিজেকে সুন্দর

করে ভূষিত কর। আনন্দোজ্জ্বল মুখে
এই উৎসব পালন কর। কেউ তার
দ্রব্যসম্ভার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না।
কেউ আর কখনো ফিরে আসে না
যে একবার চলে গিয়েছে সেই দেশে।

সুরের সঙ্গে ঝংকৃত হতে থাকে যে কথাগুলি তার অর্থ যতই গূঢ় হোক না কেন, কেউ কর্ণপাত করে না। সেই কথা আর সেই সুর, নূপুরের সেই ছন্দ আর তাল, আনন্দের পরিবেশকে আরও গাঢ় করে তুলছে মাত্র। কেউ না শুনলেও শুধু একজন শুনছে। সবার মধ্যে সেও আছে, কিন্তু সবার চেয়ে আলাদা। মনে মনে অমেনমেস একেবারে নিঃসঙ্গ। জানে তার দিন ঘনিয়ে আসছে। তবু কেউ যখন তার মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলে সে সুমিষ্ট হাসি হেসে সেই দৃষ্টির জবাব দিচ্ছে। এই জগত আর সেই জগতের মধ্যে প্রভেদ কিছু দেখে না সে। সেখানেও সে সুখেই থাকবে। আরও বেশী সুখ। আরও বেশী আনন্দ। তারপর কোনদিন হয়ত দেবতা অমন রা-এর সঙ্গে মিশে যাবে।

হেব-সেদ ভোজপর্বের বাইরের এবং ভেতরের সব অনুষ্ঠান একে একে সাঙ্গ হয়। ফ্যারাও এবং সম্রাজ্ঞীর মনে পরিপূর্ণতার আনন্দ। আনন্দিত সবাই। অতিথিবর্গ অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও একে একে প্রাসাদভবন পরিক্রমা করে চলে যায়। দেহকে তারা এখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় বটে, কিন্তু এই অনুষ্ঠানের সুখস্মৃতি বহুদিন ধরে তাদের মনে বাসা বেঁধে থাকবে। নৃত্যগীতের সুর গুঞ্জরিত হতে থাকবে আরও কয়েক পক্ষকাল।

হতশেপসুত আনন্দস্রোতে নিজেকে যতটা ভাসিয়ে দিতে পারবে ভেবেছিল ততটা পারেনি। উয়াচমেস আর সে তাদের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে করে গেলেও তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আচার আচরণে অস্বস্তিবোধ করেছে। রাজকুমার হয়েও সে নিজেকে ফ্যারাও-পুত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়নি। অথচ আজকের দিনটিতে ছিল শ্রেষ্ঠ সুযোগ। তার মনোভাব দেখে মনে হচ্ছিল এই প্রাসাদের সে যেন কেউ নয়। এমনিতেই সে চাপা এবং কথাবার্তায় প্রমাণ মেলে সে বেশ কুটিল স্বভাবের। তবু আজকের দিনটি একটি ব্যতিক্রম। এইদিনে নিজেকে ছোট দুঃখ, ছোট কষ্ট আর দুর্ভাবনার ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়াই নিয়ম।

আর একজন হল তাদের ছোট ভাই অমেনমেস। তাকে বাইরে থেকে দেখতে বেশ স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। সবার সঙ্গে হেসেছে, কথা বলেছে। তবু হতশেপসুতের দৃষ্টি এড়ায়নি তার একাকীত্ব। বারেবারে এসে তার হাত ধরেছে। কাঁধে হাত রেখেছে। সেও ভগিনীর কাঁধে রাখা হাতে চাপ দিয়েছে, হাসি ফুটিয়েছে মুখে। তবু বীণার কোন একটি তার যেন ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। হদিস না পেলেও অনুভব করেছিল হতশেপসুত। সবাই চলে গেলে সে তাই পিতামাতা, এমনকি উয়াচমেসের কাছে না গিয়ে অমেনমেসের হাত ধরে তাকে নিয়ে তারই কক্ষে প্রবেশ করে।

অমেনমেস প্রশ্ন করে—আমার সঙ্গে এলে যে?

—কি হয়েছে তোর ?

ম্লান হেসে অমেনমেস উত্তর দেয়—কি আবার হবে ? কিছু হয়নি তো ?

—আমি জানি কিছু একটা হয়েছে।

অমেনমেস চুপ করে যায়।

—সেই প্রাসাদশীর্ষে যা বলেছিলি এখনো তা সত্যি বলে ভাবিস ?

অমেনমেস জবাব দেয় না।

হতশেপসুত জানে ইচ্ছা না হলে ছোট ভাই-এর মনের কথা জানা অসম্ভব। হয়ত সেদিনের সেই অবাস্তব কল্পনার সঙ্গে আরও কোন নতুন কল্পনার সংযোজন ঘটেছে ইতিমধ্যে। তাই তার চিন্তা দূর করার প্রয়াসে সে বলে—একটা গল্প বলবি ? তোর গল্প অনেকদিন শুনিনি।

—এত রাতে। শুতে যাবে না ?

—না। তুই কেমন একা একা ছিলি। আমার ভাল লাগছিল না।

অমেনমেস কোন উত্তর দেয় না।

—বল্ একটা গল্প। একটা খুব ভাল গল্প।

—সত্যিই যদি শুনতে চাও বলতে পারি।

—সত্যিই শুনতে চাই।

—তোমাকে সবাই খোঁজ করতে পারে।

হতশেপসুত উয়াচমেসকে বলে এসেছে যে সে এখানে থাকবে।

সে বলে—কেউ আমায় খোঁজ করবে না। গল্পটা শুনেই চলে যাব।

—শোন তবে। খুব সাধারণ গল্প কিন্তু। রাজকুমারের কথা।

—বল।

—বহুদিন আগে এক রাজা ছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাই দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা করলেন একটি পুত্রের জন্য। তাঁরাও তুষ্ট হয়ে বর দিলেন রাজার একটি পুত্রসন্তান হোক। রাজা রাত্রে রানীর সঙ্গে শুলেন এবং রানী অন্তঃসত্ত্বা হলেন। তারপর যথাসময়ে নির্দিষ্ট মাসে রানী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। এরপর দেবী হথোর এলেন শিশুর ভাগ্য নির্ধারণ করতে। হথোর দেবীকে নিশ্চয় তুমি জান।

হতশেপসুত একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে—জানি। তোর মুখেই শুনেছিলাম। তবে তুই আর একবার একটু স্পষ্ট করে বলে দে।

—হথোর হলেন নুত-এর পর্যায়ের। আকাশ। হোরাসের আশ্রয়স্থল। কারণ তাঁর মা দেবী আইসিস যখন স্বামীর শবাধারের খোঁজে নানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন তাঁর ছেলে হোরাস বুটোর তত্ত্বাবধানে থাকলেও হথোর তাঁকে দুধ দিয়ে মানুষ করেছেন। তুমি তো জানই তাঁর মুখ গাভীর মত। দুটো শিং রয়েছে। দুই শিং-এর মাঝখানে গোলাকার দ্রব্য। আইসিস আর নুত-এর অনেক গুণাবলী রয়েছে তাঁর মধ্যে। তিনি সৌন্দর্য ভালবাসা আর আনন্দের দেবী। তিনি পৃথিবীর মঙ্গল করেন একথা তোমার অজানা থাকতে পারে না।

—না। অনেকদিন আগে তোর মুখেই শুনেছিলাম। সেদিন আবানা-

পুত্রের মৃত্যু হয়। তবে এবারে ভাল করে জেনে নিলাম। কিন্তু হথোর এসে রাজপুত্রের ভাগ্য সম্বন্ধে কি বললেন ?

—ভাল বললেন না। বললেন, রাজপুত্রের মৃত্যু হবে কুমীর, সাপ বা কুকুরের দ্বারা। রাজপুত্রের কাছেপিঠে যারা ছিল তারা শুনল একথা। তারা রাজাকে সেকথা জানাতে তিনি মর্মাহত হলেন। তারপর তিনি এক পর্বতশীর্ষে একটি দুর্গ নির্মাণ করলেন। সেখানে অনেক দাসদাসী নিযুক্ত করলেন। প্রাসাদের যাবতীয় ভাল ভাল দ্রব্য সেখানে পাঠালেন। তারপর শিশুকে সেখানে রেখে আদেশ দিলেন, তাকে কখনো যেন দুর্গের বাইরে না আনা হয়।

এরপর শিশু একটু একটু করে বড় হতে থাকে। সে একটু দীর্ঘকায় হতে একদিন দুর্গের শিখরে উঠল। সেখান থেকে দেখতে পেল একটি বড়জাতের কুকুর একজন মানুষের পেছনে পেছনে ছুটছে। রাজপুত্র তার পরিচারককে প্রশ্ন করে—"ওই লোকটির পেছনে যে জন্তুটা ছুটছে ওটা কি ?" পরিচারক বলে—"ওটা কুকুর।" রাজকুমার বলে—"আমি একটা চাই ওই জিনিস।" পরিচারক তখন রাজার কাছে গিয়ে রাজকুমারের বায়নার কথা বলল। রাজা তাকে তখন একটা কুকুরের বাচ্চা এনে দিতে বললেন। সে তাই করল।

এরপর অনেকদিন কেটে গেল। রাজকুমার আরও বড় হয়ে উঠল। সে জানতে পারল কেন তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এই দুর্গের মধ্যে রাখা হয়েছে। সে রাজার কাজে বার্তা পাঠাল—আমাকে শুধু শুধু কেন এখানে আটকে রেখেছেন। আপনি জানেন আমার ভাগ্যে ওই তিনটির একটি ফলবেই। আমি আমার ইচ্ছামত চলি আর না চলি বিধাতা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই।

তখন রাজার ইচ্ছানুযায়ী রাজকুমারকে নানা রকমের অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করা হল। তাকে নিয়ে যাওয়া হল রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে। একটি অশ্ব দেওয়া হল ভাল দেখে। তারপর একজন বয়োজ্যেষ্ঠ পরিচারক দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে পূর্ব দিগন্তের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলে—তাহলে আপনি ওদিক পানে চলে যান। আপনি আজ সম্পূর্ণ মুক্ত—বন্ধনহীন।

রাজপুত্রের একমাত্র সঙ্গী তার কুকুর। সেটি বড় হয়েছে অনেক। রাজপুত্র অত্যন্ত আনন্দচিত্তে পর্বতের পর পর্বত অতিক্রম করতে থাকে। কুকুরটিও তার অশ্বকে অনুসরণ করে। পাহাড়ের যত খেলা সে আয়ত্ত করে ফেলে। পর্বত আরোহণও। তারপর একদিন ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হয় নাহারান্না দেশের রাজার সামনে। এখন এই নাহারান্না দেশের রাজার একটি মাত্র কন্যা ছিল। তিনি সেই কন্যার জন্য একটি গৃহনির্মাণ করলেন যার জানলাটি মাটি থেকে অনেক উঁচুতে। তারপর তিনি সব রাজ্যের রাজপুত্রদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন—"যে ওই দেওয়াল বেয়ে জানলার কাছে পৌঁছতে পারবে তার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দেব।" রাজকন্যা অপরূপ সুন্দরী। সুতরাং রাজপুত্রদের চেষ্টা শুরু হল। কিন্তু প্রায় অসম্ভব এই প্রয়াস কারও দ্বারা সফল হল না। সেই সময় এই রাজকুমারকে অন্যান্য রাজপুত্রদের চোখে পড়ল। তারা তার সুন্দর চেহারা দেখে আগ্রহভরে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"তুমি

কোথা থেকে আসছ ? রাজকুমার অসত্য উত্তর দেয়। বলে—"আমি মিশরের এক রাজ কর্মচারীর পুত্র। আমার মায়ের মৃত্যু হলে বাবা আবার বিয়ে করেন। আমার সৎ মা আমাকে ঘৃণা করেন। তাই পালিয়ে এসেছি।" কথাটা শুনে কুমাররা সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে।

রাজকুমার তাদের কাছ থেকে জানতে পারল কি জন্যে তারা সবাই নাহারান্নার রাজধানীতে এসে মিলিত হয়েছে। শুনে তার মনেও রাজকুমারীকে লাভ করার ইচ্ছা জাগল। তারপর কুমারেরা প্রতিদিনের মত সেই দিনও রাজকুমারীর জানলার নীচে গিয়ে জড়ো হল। আরে এই সদ্য আগত কুমার দূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। সেই সময় সে লক্ষ্য করে জানলায় দাঁড়িয়ে রাজকন্যা তারই দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে অন্যান্যদের সঙ্গে রাজকুমারও গিয়ে দাঁড়াল জানলার নীচে। সে সামান্য চেষ্টাতেই রাজকুমারীর জানলার নীচে পৌঁছে যায়। রাজকুমারীর মুখ উৎসাহ ও উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠে। সে দু'বাহু বাড়িয়ে কুমারকে চেপে ধরে তাঁকে চুম্বন করে।

অন্যান্য কুমারেরা তখন রাজাকে আনন্দ দেবার জন্য তাঁর কাছে সুসংবাদ বয়ে নিয়ে যায়। বলে—"এতদিনে একজন রাজকন্যার জানলায় গিয়ে পৌঁছেচে।" রাজা তখন প্রশ্ন করেন—"কোন রাজ্যের রাজপুত্র সে ?" ওরা বলে—"সে রাজপুত্র নয়। মিশরের এক রাজকর্মচারীর পুত্র। সৎ মায়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে এসেছে।"

শুনে নাহারান্নার রাজা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। বললেন—"আমি মিশরের উদ্বাস্তুর হাতে আমার কন্যাকে সমর্পণ করতে পারি না। সে তার নিজের দেশে ফিরে যাক।" কুমারেরা তখন রাজার আদেশ গিয়ে শোনাল রাজকুমারকে। কিন্তু নাহারান্নার রাজকন্যা মিশরের কুমারকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে—"না। রা-হবর্মাচিসের নামে শপথ করে বলছি, একে যদি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাহলে আমি আমরণ খাদ্য পানীয় কিছুই গ্রহণ করব না।" অন্যান্য কুমারেরা তখন রাজকন্যার প্রতিক্রিয়ার কথা রাজাকে গিয়ে জানাল। রাজা তখন রাজকুমারকে হত্যা করার জন্য ঘাতক পাঠালেন। রাজকুমারী দৃঢ়ভাবে বলে—"আজ যদি একে হত্যা করা হয়, তাহলে হে সূর্যদেবতা, তার আগে আমিই মৃত্যু বরণ করব। একে ছাড়া আমি একদণ্ডও বাঁচব না।"

রাজা একথা শুনে স্তম্ভিত হলেন। তিনি এমন ভালবাসার কথা কখনো শোনেন নি। তিনি অনন্যোপায় হয়ে কন্যাকে রাজপুত্রের হস্তে সমর্পণ করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে চুম্বন করলেন, আলিঙ্গন করলেন এবং শেষে একই প্রশ্ন করেন—"তুমি কে ?" রাজকুমারের সেই একই উত্তর। রাজা তাকে অনেক ভূসম্পত্তি ও গো-সম্পদ দান করলেন। অনেক পরিচারক দিলেন যাতে কন্যা সুখে থাকে।

কিছুদিন আনন্দে কাটিয়ে রাজকুমার তার ভাগ্যের কথা রাজকন্যাকে বলে। শুনে রাজকন্যা ভীত হয়। বলে—"সাপ বা কুমীর তো নেই এখানে। তুমি

তোমার কুকুরটাকে মেরে ফেল। রাজকুমার বলে—"ওকে আমি এতটুকু বয়স থেকে বড় করে তুলেছি। ওকে মেরে ফেলা অসম্ভব। আমার আপদে-বিপদে, আমার সুখে-দুঃখে ও আমার সঙ্গী।"

রাজকুমারী আতঙ্কিত হয়ে বলে—"তাহলে ?"

অমেনমেস এখানে থামে। ভগিনীর মুখের দিকে চেয়ে হাসে।

হতশেপসুত বলে—তারপর ?

—তার পরেরটুকু কল্পনা করে নাও। প্যাপাইরাসের বাকী অংশ ছিঁড়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত কি হল জানা যায় নি।

হতাশ হতশেপসুত বলে ওঠে—তাই কখনো হয় ? গল্পের একটা শেষ থাকবে তো ?

—কি হলে ভাল হত বলে তোমার মনে হয় ? অনেক বয়সে দুজনার মৃত্যু হলে ?

—নিশ্চয়।

—তা হয় না। তাহলে পৃথিবীতে বৈচিত্র্য থাকবে কি করে ? সবাই একঘেঁয়ে হয়ে যাবে।

—তবে কি রাজকুমারের মৃত্যু হল ?

—হতেই হবে। হথোরের ভাগ্যনির্ণয় কখনো মিথ্যা হতে পারে না। প্যাপাইরাসের ওই অংশ ছিঁড়ে গেলেও পরিণতি অন্য রকম হতে পারে না।

—কি ভাবে মরল রাজকুমার। কুমীরের হাতে ?

—না। একটা জিনিস লক্ষ্য করনি, রাজকুমার কোন্ বয়সে মারা যাবে হথোর দেবী সে কথা বলেন নি।

হতশেপসুত আগ্রহভরে বলে ওঠে—হ্যাঁ, তাই তো ?

—আমার কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস স্পষ্ট করে হথোর দেবী না বললেও অকাল-মৃত্যুর ইঙ্গিত দিয়েছেন। মনে হয় কুকুরটা একদিন হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। রাজকুমারী কিছু খাইয়ে তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। সেই বিষে কুকুরটা না মরে পাগল হয়ে গেল। তারপর রাজকন্যার চোখের সামনে প্রভুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অত বড় কুকুরটা।

ব্যথায় যন্ত্রণায় হতশেপসুতের মুখ থমথমে হয়ে ওঠে। সে নিজের কক্ষে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। দু'পা এগিয়ে থেমে যায়। ঘুরে অমেনমেসের পাশে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে—এত গল্প থাকতে এই গল্প করলে কেন আজ !

—বলতে চাইছিলাম ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারে না। তুমি হয়ত আমি একদিন সন্ধ্যায় কি বলেছিলাম সেকথা ভুলে গিয়েছ। কিন্তু ভুললেও যা অনিবার্য তা কখনো মিথ্যা হয় না।

হতশেপসুতের বুকের ভেতরে কেঁপে ওঠে।

অমেনমেস খুব ধীরে ধীরে রজনীর নিস্তব্ধতা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেই-ভাবে বলে—আর তিন চার বছর পরে অন্য এক হেব-সেদ অনুষ্ঠানের দিন ফ্যারাও তোমাকে আর মুতনেফার্তের ছেলেকে একসঙ্গে তাঁর সহ-শাসক বলে

ঘোষণা করবেন।

—কেন, উয়াচমেস তো আছে।

অমেনমেস কোন কথা বলে না। মাথা নীচু করে থাকে।

হতশেপসুত তার মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে পারে না। ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করে। সদ্য সমাপ্ত হেব-সেদ অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত ভাবে ফ্যারাও-এর পক্ষে নিশ্চয় শুভ হবে। কিন্তু তার নিজের জীবনের পক্ষে এর কোন মঙ্গলজনক প্রভাব পড়বে বলে মনে হচ্ছে না। বরং অশুভের সংকেত পাচ্ছে সে।

উয়াচমেস বলতে গেলে একটু অভিমান বশেই একলা একটি অশ্বশকট নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। হেব-সেদ ভোজের পর থেকে ছোট ভাই অমেনমেস নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। শিক্ষক হেকারনেহেহ্‌র সঙ্গেও মাঝে মাঝে দেখা হয় না অমেনমেসের। হয়ত অনেক কিছু বেশী জানে সে। তাই বলে অমন একজন মাননীয় ব্যক্তির কাছে না আসার অর্থ পরোক্ষে তাঁকে অসম্মান করা। আর অমেনমেসের দেখাদেখি হতশেপসুতও আজকাল কেমন হয়ে গিয়েছে। ছোট ভাই-এর পেছনে পেছনে বেশীর ভাগ সময় ঘুরে বেড়ায়। যেন তার চোখের আড়াল হলেই অমেনমেস অদৃশ্য হয়ে যাবে। এইসব বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না উয়াচমেসের। সে বলে দেবে হতশেপসুতকে যে তাকে আর বিয়ে করবে না। ফ্যারাও সে হতে চায় না। ফ্যারাও হবার জন্য যে ভীষণ ভাবে লালায়িত সেই বড় ভাইকেই যেন বিয়ে করে? আগে বয়স কম ছিল, অনেক কিছু বুঝতে অসুবিধা হত তার। কিন্তু এখন বুঝতে পারে। হেব-সেদ পর্বের পর থেকে বড় ভাই মনমরা। ভেবেছিল অতিথি অভ্যাগতদের সামনে ফ্যারাও বুঝি তাকে সহ-শাসক বলে ঘোষণা করবেন। এই গোপন কথাটা এখনো গোপনীয় থাকলেও সবাই জেনে গিয়েছে। মুতনেফার্তের কোন এক পরিচারিকা মাতা-পুত্রের মধ্যে কথোপকথন শুনে এই ক্ষতিটুকু করে ফেলেছে। ক্ষতি আর কি? শুধু একটুখানি কৌতুকের সৃষ্টি। উয়াচমেস জানে, ফ্যারাও-পরিবারের বেফাঁশ কিছু প্রকাশ হয়ে পড়লে রেশটা একটা মজাদার আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তা নিয়ে যে আলোচনার সূত্রপাত হয় তার ঢেউ ধীরে ধীরে প্রাসাদ পেরিয়ে প্রথমে রাজপথ, তারপর বালুকাময় প্রান্তর ডিঙিয়ে নীলনদের পলিমাটি সমৃদ্ধ শস্যক্ষেত্রের রোদে-পোড়া চকচকে দেহ-ওলা পরিশ্রমী মানুষদেরও আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। তাদের তখন কী ধারণা হয় সাধারণ মনুষ্যস্তরের অনেক ওপরে প্রাসাদবাসী ফ্যারাও-পরিবার সম্বন্ধে সেকথা জানতে ইচ্ছা হয় উয়াচমেসের। সেই ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন একমাত্র হেকারনেহেহ্‌। হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই পারেন। পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের যাবতীয় ধর্মীয় ও জ্ঞানের নিবৃত্তি তাঁর কাছে বসলে হয়ত হবে না। কিন্তু অনেক কিছুই তিনি জানেন, যা প্রায় কেউই জানে না। আজকাল কোনদিন অমেনমেস, কোনদিন হতশেপসুত অনুপস্থিত থাকে মাঝে মাঝে। হতশেপসুতের নিজের শিক্ষক অসুস্থ ও অশক্ত হয়ে পড়ায় যে নিয়মিত হেকারনেহেহ্‌র কাছে শিক্ষা নিতে শুরু

করেছিল। কিন্তু ভোজপর্বের পরে সবকিছু অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। হেব-সেদ তো মঙ্গল ডেকে আনে বলে শুনেছে সে। তবে কেন এমন হল।

অনেকটা দূরে চলে এসেছে উয়াচমেস। স্থানটি বেশ নির্জন। সূর্য অনেকটা হেলে পড়েছে পশ্চিমের দিকে। সেইদিকে আনমনা চেয়ে থাকে উয়াচমেস। মনে তার অনেক প্রশ্ন জমেছে। সেই প্রশ্নে ভারী হয়ে রয়েছে তার মন। এক সময় সে দেখে একটি কালো মূর্তির উদয় হয় প্রান্তরের প্রান্তদেশে। মূর্তিটির পশ্চাতে সূর্য। তার আকৃতি দেখে মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু সবটাই যেন মসিলিপ্ত। যদি সূর্যের আলো তার সামনে পড়ত তাহলে তাকে পরিষ্কার দেখা যেত না। মূর্তিটা মানুষেরই। হাত আর পা রয়েছে। চলার ভঙ্গিও আছে। আরও এগিয়ে এলে স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে সূর্য সামনে থাকলে তার পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই দেখা যেত দূরত্ব আর একটু কমলে। লোকটি একেবারে সামনে আসার আগে পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারা যাবে না। পারা না গেলেও ক্ষতি নেই। কত লোক যাতায়াত করছে। এখান থেকে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া জলপথে প্রতিদিন এখনো পুবের দিকে সমুদ্রে যায় কত মানুষ। রূপকথার দেশ, সেই স্থূলকায়া রানীর দেশ ওই দিকেই। সাধারণত আরও একটু উত্তর-দিকের নগরী কোপটাস থেকে পুবের অন্য দেশও মানুষ যাতায়াত করে। কারণ কোপটাসের দেবতা মীন হলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিপতি। তিনি যাত্রীদের যাত্রাপথ সুরক্ষিত রাখেন। তাছাড়া তাদের দেহমন যাতে আনন্দে থাকে সেদিকেও তাঁর সবিশেষ নজর। কিন্তু পশ্চিমের পথ সাধারণত শেষ যাত্রার পথ। ওইদিকের দীর্ঘ নিস্তব্ধ উপত্যকা ফ্যারাও পরিবারের ব্যক্তিদের শেষ আশ্রয়স্থল। ওটি হল মৃত রাজাদের উপত্যকা। ওখানে শখ করে বা আনন্দ স্ফূর্তি করতে কেউ যায় না। এ লোকটি ওদিক থেকে আসছে কেন? কারণ নিশ্চয় রয়েছে একটা। চলার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খুবই পরিশ্রান্ত।

উয়াচমেস অপেক্ষা করে। মূর্তিটি এগিয়ে আসতে থাকে। আরও এগিয়ে এসে লোকটি একটু থেমে যায়। মনে হয় তাকেই দেখছে। অশ্বশকটের পাশে তাকে দেখে একটু যেন হতচকিত বলে মনে হল। অন্য পথে পা বাড়াবার ক্ষীণ একটু প্রয়াসও যেন দেখা গেল তার মধ্যে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করল। বোধহয় বুঝতে পারল, এভাবে এড়িয়ে যেতে সে পারবে না। খুব দৃষ্টিকটু হবে। তাছাড়া শকট নিয়ে তাড়া করে তাকে ধরে ফেলা সহজ হবে। অর্থাৎ লোকটি নিশ্চয় তার পরিচিত। তাকে চিনতে পেরেছে ওদিক থেকে আসছে বলে।

হ্যাঁ, লোকটা পিমাই। অমেনমেসের ব্যক্তিগত পরিচারক। ওদিকে কোথায় গিয়েছিল সে? কেনই বা ওকে একা একা ছেড়ে দেওয়া হল?

পিমাই সম্মুখে এসে আনত হয়ে তাকে অভিবাদন জানায়।

—কোথায় গিয়েছিলে?

আঙুল দিয়ে পশ্চিমের উপত্যকার দিকে দেখিয়ে দেয় সে।

—কেন?

—রাজকুমার অমেনমেস পাঠিয়েছিলেন।

—কেন পাঠিয়েছিল ?

—দুটো পছন্দমত জায়গা ঠিক করে রেখে আসতে।

বিস্ময় ফুটে ওঠে উয়াচমেসের চোখে মুখে আর কণ্ঠস্বরে—দুটো জায়গা বেছে রাখতে ? মৃত্যুর পরের ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কাদের জন্য ?

—জানি না রাজকুমার। তিনি তো সব কথা খুলে বলেন না। জিজ্ঞাসাও করতে পারি না।

—জায়গা দুটো নির্বাচন করেছ ?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে। যাও।

পিমাই উয়াচমেসের বুকের মধ্যে ঝড় তুলে দিয়ে বিদায় নেয়। অমেনমেসের আচার-আচরণ দিনদিনই বেশী ধোঁয়াটে হয়ে উঠছে। খুবই রহস্যজনক। সে কি এখন থেকেই তার সমাধিস্থল নির্মাণের ব্যবস্থা করতে চায় ? অনেক ফ্যারাও, অনেক নাগরিক এমন করে বটে। সমাধিসৌধ দর্শনীয় করে তুলতে অনেক সময়ও লোকবলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অমেনমেস এসব করতে যাবে কেন ? সে তো সবে তার কৈশোর অতিক্রম করতে চলেছে। অত শ্রমিকই বা সে পাবে কোথায় ফ্যারাওকে না বললে ? তাছাড়া দুটো সমাধিস্থলের অপরটি কার ? জিজ্ঞাসা করতে হবে তাকে।

ধীরে ধীরে প্রাসাদের দিকে ফিরতে থাকে উয়াচমেস। যেতে যেতে মনে হল হেকারনেহেহ্-এর গৃহে গেলে মন্দ হয় না। তিনি একটু অপ্রস্তুত হবেন ঠিকই। কিন্তু তাঁকে একান্তে পাওয়া যাবে। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এখন তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে লাভ হবে না। যেতেও চাইবেন না।

হেকারনেহেহ্ তাকে দেখে অবাক হন। অনেকদিন পরে তাঁর গৃহে এসেছে রাজকুমার। তাছাড়া এই অবেলায় কখনো আসেনি সে। সাধারণত সকালের দিকেই দেখাসাক্ষাৎ করার নিয়ম। কারণ সন্ধ্যায় অধিকাংশ মানুষই সারাদিনের পর ভারী খাদ্য গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন বাড়িতে অতিথি এলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তবে রাজকুমার বলে কথা। তাছাড়া হেকারনেহেহ্-এর দেশীয় প্রথায় শুধু সন্ধ্যাবেলায় খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস বিশেষ নেই। জীবনে দেশের নানা প্রান্তে, কখনো বিদেশেও তাঁকে যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা শাসনকার্য পরিচালনার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। যার ফলে কোন বাঁধাধরা নিয়মের বশীভূত হননি তিনি।

রাজকুমার হেকারনেহেহ্-এর অবস্থা দেখে হতাশ হন। তিনি চোখের অসুখে আক্রান্ত হয়েছেন। এই অসুখটিতে এত বেশী অভ্যস্ত এদেশের মানুষ যে রক্তবর্ণ চক্ষু দেখলে কেউ চমকে ওঠে না। সহানুভূতি দেখাতে গিয়েও মুচকি হেসে ফেলে। তারপর বলে—ধরেছে ?

শিক্ষকের অবস্থা দেখে উয়াচমেস হাসতে পারে না। হাসতে পারে না তাঁর যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে চেয়ে। দরদীকণ্ঠে শিক্ষককে বলে—খুবই কষ্ট হচ্ছে দেখছি। আমি প্রাসাদে গিয়ে হকিমকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শিক্ষক হাত তুলে তাকে নিবৃত্ত করতে বলেন—কোন প্রয়োজন নেই। আমি চিকিৎসককে দেখিয়েছি। কয়েকটা মলম দিয়েছেন। ঠিক হয়ে যাবে। যেটুকু ভোগার ভুগতে হবে। উপায় নেই।

—আমি তাহলে আজ যাই।

—না। বস। কেন এসেছিলে?

—মনের মধ্যে তো অহরহ অনেক প্রশ্নই জাগে। ভাবলাম আপনার কাছে একান্তে বসে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নেব।

—বেশ তো। বল।

—না। এভাবে হয় না। আপনি আগে ভাল হয়ে উঠুন।

—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বিশেষ কোন জরুরী প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তুমি আমার কাছে এসেছ।

—না, তেমন কিছু নয়। তেমন গুরুত্বও নেই সেই প্রশ্নের। আমি ভাবছিলাম প্রাসাদের ভিতরের কিংবা হারেমের অনেক ঘটনার কথা অনভিপ্রেত ছিদ্রপথে বেরিয়ে আসে বাইরে। কৃষকদের কানে সেইসব ঘটনার কথা আরও পল্লবিত হয়ে পৌঁছোয়। তাদের প্রতিক্রিয়া কিরকম হয় এতে?

হেকারনেহেহ্ একটু চুপ করে থেকে বলেন—তোমার কি ধারণা?

উয়াচমেস গম্ভীর হয়ে বলে—আমার মনে হয় প্রাসাদের অধিবাসী, এমনকি ফ্যারাও-এর প্রতিও তাদের শ্রদ্ধা হ্রাস পায়। ভাবে, তাহলে সাধারণ একটা গৃহের সঙ্গে প্রাসাদের পার্থক্য কোথায়? সেখানেও ঈর্ষা, দ্বেষ, নীচতা সবই আছে।

—তোমার ধারণা ভুল।

—ভুল?

—হ্যাঁ। এইসব ঘটনা তাদের আশ্বস্ত করে। তাদের মন ফ্যারাও-এর প্রতি আরও সহানুভূতিশীল করে তোলে। ফ্যারাও একাধারে মানুষ এবং দেবতা। মানুষের রূপ নিয়ে তিনি প্রজাপালন করেন। মনুষ্যদেহধারী বলে তাঁর আশা-আনন্দ দুঃখকষ্ট সবই রয়েছে মানুষের মত। ওসিরিস দেবতা ছিলেন। অথচ তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আমাদের দেবদেবী ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নন। অতি নিকটের আপনজন তাঁরা। সুখেদুঃখে আমাদের পাশাপাশি রয়েছেন সর্বদা ফ্যারাও-এর মত। তাই প্রজারা প্রাসাদের কোন ঘটনায় বিরূপ হয় না। তবে অনেকক্ষেত্রে মজা পায়, কৌতুকবোধ করে।

—আশ্চর্য।

—আশ্চর্যের কিছু নেই। আমাদের পুরাণে কি বলে? পুরাণে বলে, যখন পৃথিবীতে কিছুই ছিল না তখন গভীর কালো সমুদ্র থেকে সূর্য দেবতা রা-এর উত্থান হয়। উঠেই তিনি সসাগরা ধরিত্রীর শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এই

কাজ বিনা বাধায় সম্পন্ন হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চলে তবে শেষ পর্যন্ত দেবতা রা-ই জয়যুক্ত হন। আর বিদ্রোহীদের চমুনু নগরীর চত্বরে তাঁর সামনে হাজির করা হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। রা নিশ্চিন্তে মানুষ ও দেবতাদের অধিপতি হয়ে শান্তিতে রাজত্ব করতে থাকেন। যতদিন তিনি শক্তিশালী ছিলেন, কেউ তাঁর রাজত্ব আক্রমণ করতে সাহসী হয়নি। কিন্তু তাঁর যৌবন অক্ষয় নয়। যত বয়স বাড়ে তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে আসে, তাঁর অস্থিসমূহ রৌপ্যে পরিবর্তিত হয়, তাঁর কেশরাশি হয় খাঁটি নীলকান্তমণি, তারপর সচরাচর যা অন্যত্র ঘটে থাকে তাই ঘটল। তাঁর বার্ধক্যের সুযোগ নিয়ে চারদিকে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠল। আর এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিলেন কে ?

—কে ?

হেকারনেহেহ্ হেসে বলেন—দেবী আইসিস।

—সত্যি ?

চোখ আরও লাল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও তিনি একটু হেসে বলেন—হ্যাঁ। কারণ তিনি সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত দেবতা ও আত্মাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানবতী ও বুদ্ধিমতী। স্বর্গ ও ধরিত্রী সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য ছিল তাঁর নখদর্পণে। এমনকি রা সম্বন্ধে তিনি সব কিছুই জানতেন, শুধু একটি বিষয় ছাড়া। এই বিষয়ে জ্ঞানের অভাবই তাঁর সাফল্যের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল। সেটি হল রা দেবতার গুপ্ত নাম। কিন্তু সেসব হল আলাদা কাহিনী। আমি তোমাকে বলতে চাইছি যে আমাদের আদি দেবতাই বার্ধক্য ও মনুষ্যসুলভ দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নন। সুতরাং ফ্যারাও-ও নন।

সেই সময় হেকারনেহেহ্-এর একটি শিশু পৌত্রী তার এক হাতে একটি খেলনা কুমীর এবং অন্য হাতে হাত-পা নড়াচড়া করে এমন একটি পুতুল নিয়ে এসে তার কোলঘেঁষে দাঁড়াতে চেষ্টা করতেই তিনি দূরে সরে গিয়ে যতটা সম্ভব মিষ্টি হেসে কোমলকণ্ঠে বলে—এখন কাছে এসো না। খুব ছোঁয়াচে রোগ। তোমার হলে কষ্ট পাবে।

উয়াচমেস বুঝতে পারে এভাবে বৃদ্ধকে কষ্ট দেওয়া অনুচিত হয়েছে।

সে বলে—আমি আজ চলি। আইসিস আর রা-এর কাহিনী শোনার কৌতূহল দমন করা যদিও খুব কঠিন। অন্যদিন শুনব।

হেকারনেহেহ্ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে রাজকুমারকে বিদায় জানান।

প্রাসাদের ভেতরে ফ্যারাও-এর বিরুদ্ধে ছোটখাটো একটি ষড়যন্ত্রের হদিস মিলল। এই ষড়যন্ত্রের উৎপত্তিস্থল হারেম হলেও সৌভাগ্যবশত সম্রাজ্ঞী অহমেস বা মুতনেফার্ত এতে জড়িত নন। তাঁদের থাকার কথাও না। কারণ ফ্যারাও-এর বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করা। একজন অতি সুন্দরী নর্তকী, দুজন স্বাস্থ্যবতী এবং লাবণ্যময়ী আশ্রিতা, যাদের উচ্চাশা সীমা ছাড়িয়ে যেতে চাইছিল তারাই এই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করে। মিশরের রাজনীতি,

এখানকার পারিবারিক নিয়মকানুন কোন কিছু সম্বন্ধে তাদের ধারণা নেই। তবু তারা নির্বোধের মত অন্যের উস্কানিতে এই কাজ করে বসল। সেই উস্কানিদাতার সৈন্যবাহিনীর ওপর বেশ কিছুটা প্রভাব আছে বলতে হবে। নইলে একদল সৈন্য হঠাৎ প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে পড়ল কি ভাবে? ওদিকে প্রজাদের মধ্যেও ফ্যারাও সম্বন্ধে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছিল কিছুদিন ধরে—এই খবরও পাওয়া গেল।

সুন্দরীরা আর এক কাণ্ডও করেছে। ফ্যারাও-এর পুস্তক ভাণ্ডার থেকে যাদুবিদ্যার একটি প্যাপাইরাসের কিতাব চুরি করিয়ে আনে। তারপর সেই পুস্তক দেখে একজনকে দিয়ে অনেকগুলো মোমের পুতুল বানিয়ে এনেছে। মন্ত্রপূত সেই পুতুলগুলি দ্বারা ফ্যারাও-এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে এবং তাঁকে রোগগ্রস্ত করে তোলাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

কিন্তু এতই কম বোঝে তারা যে কয়েকদিনের মধ্যে তাদের সব উদ্যম ধরা পড়ে গেল। সম্রাজ্ঞী অহমেস এবং রানী মুতনেফার্ত তাঁদের চোখের সামনে এতসব ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও ঘুণাক্ষরেও কিছু বুঝতে পারেননি ভেবে রীতিমত লজ্জাবোধ করতে থাকেন। ওই রূপবতী নর্তকীটি এতে জড়িত জেনে উভয়েই আনন্দিত হন। কারণ একজন সামান্য নর্তকীর অত রূপ তাঁদের সহ্য হত না। তাঁদেরই চোখ ধাঁধিয়ে যেত ওই রূপ দেখে। ফ্যারাও তার কক্ষে অধিকাংশ দিনই অতিবাহিত করতে শুরু করেছিলো ইদানীং। তাতেই সে আস্কারা পায়, লঘুগুরু জ্ঞান হারায়। তাই যে বৃক্ষে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই বৃক্ষের গোড়াতেই কুঠারাঘাত করছিল।

হয়ত এই অপরিণত ষড়যন্ত্রও ফলবতী হত, যদি না একজন ক্রীতদাসীর অন্তরে হিংসার আগুন প্রজ্জ্বলিত হত। সে হল তেতা। নীলনদের বুকে নৌযানের ভেতরে এবং প্রাসাদেও বেশ কয়েকবার ফ্যারাও-এর শয্যাসঙ্গিনী হয়ে সে নিজেকে কৃতার্থ মনে করত। কিন্তু তারপর সে অন্যান্য ক্রীতদাসীদের মত বিস্মৃতির অতলে ডুবে যায়। যেমন ডুবে গিয়েছে তার পরিচিত আতেস। কিন্তু তবু সে বুক বেঁধে অপেক্ষা করছিল সুদিন ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। মনে মনে সে দেবী হথোরের কাছে নিত্য প্রার্থনা জানাচ্ছিল। তিনি আনন্দ দেন, তিনি সৌন্দর্য দান করেন। তিনি মঙ্গলদায়িকা। তার অপরিসীম ধৈর্য পরীক্ষা ফলবতী হয়। আবার সে ফ্যারাও-এর চোখে পড়ে যায়। সেদিন ছিল দ্বিপ্রহর। অনেক সুন্দরীর মধ্যে তার চোখের দৃষ্টির সঙ্গে ফ্যারাও-এর দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যায়। সেই সময় হথোর দেবীকে কায়মনোবাক্যে ডেকে চলেছিল সে। দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছিল ধরিত্রী-মাতা মুত-এর কাতরতা। ফ্যারাও নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার পিঠে হাত রেখে বলেন—চল।

কক্ষে প্রবেশ করে তার চিবুক তুলে ধরে মৃদু হেসে বলেন—মনে হয়, তুমি আমার পূর্বজন্মের পরিচিতা। তোমার ওই দৃষ্টি যেন আমার খুব চেনা। আগে দেখেছি।

তেতার কান্নায় ভেঙে পড়তে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তার আশঙ্কা সেভাবে কাঁদলে

ফ্যারাও বিরক্ত হবেন। তিনি কক্ষ ত্যাগ করে কাউকে না পেয়ে হয়ত আতেসকে নেবেন। আতেসের সৌন্দর্যের চটক আছে। তাই তেতা সংযত হয়। ভাবে, ফ্যারাও-এর দোষ কি। তিনি নিত্য নূতন সঙ্গিনীর সঙ্গলাভ করেন। এক এক-দিন এক এক রূপসীর রূপ সুধা পান করেন। কবে কোন নারীকে কয়েকদিনের জন্য ধন্য করেছিলেন একথা মনে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবু মনের মধ্যে এতসব যুক্তি খাড়া করেও নয়নদ্বয়কে শুষ্ক রাখতে পারে না। তার এই সজল চোখ দেখে ফ্যারাও কিন্তু বিক্ষুব্ধ হয়ে যান। চিরকাল শুষ্ক চোখের নারীকে দেখে তিনি অভ্যস্ত। তার ওপর তেতার কথায় বরাবরই একটা ঝঙ্কার রয়েছে। ফ্যারাও অতিমাত্রায় প্রীত ও তৃপ্ত হন। ফলে আরও পরপর দুদিন তাকে স্মরণ করেন। এতে আতেসের পাগলামি সামান্য বৃদ্ধি পেলেও আর কেউ তেমন পাত্তা দেয়নি। কারণ ফ্যারাও-চরিত্র অন্য সবার জানা। বৈচিত্র্যের খোঁজে তিনি নানা ধরনের নারী-সঙ্গ উপভোগ করে থাকেন। কেউ-ই তাঁর মনে স্থায়ী ভাবে রেখাপাত করে না। এমনও দেখা গিয়েছে সারাদিন যাকে নিয়ে মেতে থাকলেন, সন্ধ্যায় তাকেই পাঠিয়ে দিলেন রাজধানী থেকে অনেক দূরে কোন শ্রমসাধ্য কাজে। কিংবা কখনো কখনো তার জীবনহানিও ঘটে সামান্য ত্রুটিতে।

কিন্তু তেতা অতশত জানে না, বোঝে না। সে মনে মনে ফ্যারাওকে ভালবাসে। মন সঁপে দিয়েছে তাঁকে। তাঁর কোন অনিষ্টের কথা সে কল্পনা করতে পারে না। তাই ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়েই সেকথা বলে দেয় প্রধানা মহিলা প্রহরীকে।

যে অসামান্যা রূপময়ী নর্তকী এই ষড়যন্ত্রের প্রত্যক্ষ নায়িকা, তার নাম তাউ। ক্রীতদাসী নয় বলে তার খুব গর্ব। নর্তকী বলে ফ্যারাও-এর ভাণ্ডার থেকে সে পায় প্রসাধন সামগ্রী, পায় পোশাক পরিচ্ছদ। ক্রীতদাসীদের সে হেয় চোখে দেখে। তার সঙ্গে আরও দুই শ্বেতবর্ণা যুবতী ছিল যাদের আনা হয়েছিল নীচের মিশর থেকে—মেমফিস ছাড়িয়ে আরও উত্তরে সমুদ্রের তট থেকে। তাদের পিতারা নাকি সাগরপারের পুরুষ। ভাসতে ভাসতে এসেছিল তারা। সুদীর্ঘ সুদর্শন চেহারা ছিল তাদের, শ্বেতবর্ণ গায়ের রঙ। মায়েরা তাদের ভাষা না জেনেও রূপে মজে গিয়েছিল। তাদেরই সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে দুজনা কোন-রকমে চলে এসেছে এই হারেমে। ওদের মুখে হারেমের সবাই শুনেছে তাদের পিতার কথা। পিতাদের তারা দেখেছে, তবে বেশীদিনের জন্য নয়। একদিন কাউকে কিছু না বলে অদৃশ্য হয়েছিল ভিন্‌দেশী পুরুষেরা। বোধহয় ফিরে গিয়েছিল নিজেদের দেশে, নিজেদের আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে।

এই দুই যুবতীর আত্মাভিমান ছিল প্রচণ্ড। তাদের ধারণা কোন দেবলোক থেকে আগত দেবতাদের দ্বারা তাদের মায়েদের গর্ভসঞ্চার হয়েছিল। সুতরাং তারা সাধারণ নয়। ভাগ্যদোষে এসে পড়েছে হারেমে। এক অতৃপ্তি বাসনা বাসা বেঁধেছিল তাদের মনের মধ্যে। সামান্য সুযোগেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল, বোধহয় তারা আশা করেছিল ফ্যারাও-এর চোখেও দেখতে পারে প্রেম-ভিখারীর কাতরতা। কিন্তু দেখতে পায় নি। হয়ত পেত যদি তারা অতটা দীর্ঘাঙ্গী না

হত। হয়ত তারা পেত, যদি উষ্ণ অঞ্চলের নারীদের মত আবেগময়ী হত তারা।

যাই হোক এতসব কথা অজানাই থেকে যেত, যদি না তেতা প্রধানা রক্ষীর কাছে প্রকাশ করে দিত। রক্ষী সঙ্গে সঙ্গে হারেমের অধিকর্তার কাছে এই ভয়াবহ বার্তা পৌঁছে দেয়। অধিকর্তা প্রথমে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। ফ্যারাও-এর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের কথা এদেশে কল্পনাতীত। ছোটখাটো অন্য ধরনের ষড়যন্ত্র বা রাজনীতি হারেমে ঘটে থাকে কদাচিৎ। তার জন্য অনেক সময় ফ্যারাও-এর মহিষীদেরও জবাবদিহি করতে হয়। বিচারসভা বসে। বিচারক নিজে আসে হারেমে, সঙ্গে দুজন সাহায্যকারীকে নিয়ে, যারা ফ্যারাও-এর অতিরিক্ত বিশ্বাসভাজন। তাদের সম্মুখে বিচারক মহিষীদের প্রশ্ন করে সত্য নিরূপণের জন্য। কিন্তু স্বয়ং ফ্যারাও-এর বিরুদ্ধে এই ধরনের ষড়যন্ত্রের কথা ভাবা যায় না। হিকসোসরা এদেশ থেকে বিদায় নেবার পর এটাই বোধহয় প্রথম। হিকসোসরা এদেশে বহু বছর ছিল। তাদের আগে যাঁরা শাসনকর্তা ছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে এই মুহূর্তে বিশেষ কিছু জানার উপায় নেই। প্রাসাদের পাঠাগার ঘেঁটে বের করতে হবে। স্তূপীকৃত প্যাপাইরাসের মধ্যে শুধু যে আইন বিষয়ক আর যাদু বিষয়ক কিতাব রয়েছে তাই নয়, সেখানে অনেক কিছুই রয়েছে। সেগুলোর একটি একটি করে উন্মোচিত করলে অতীতের বহু চমকপ্রদ রহস্যের উদ্ঘাটন হতে পারে। কিন্তু ষড়যন্ত্রের কথা শুনে হারেমের অধিকর্তার অত কিছু ভাবার সময় ছিল না। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান আর সাহসী হওয়া সত্ত্বেও বুকের ভেতরে একটু কাঁপুনি অনুভব করল। খবর জেনেই তেতাকে ডেকে নিয়ে সবটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনে নিয়েছিল। শুনেই বুঝল শুধুমাত্র কয়েকজন নারী দ্বারা এত বড় কাণ্ড কিছুতেই ঘটতে পারে না। পেছনে কোন পুরুষের বুদ্ধি আছে। নারীরা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী হলেও হারেমের নারীদের পক্ষে বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং সাধারণত অন্য ষড়যন্ত্রগুলি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের কথা শুনে বোঝা গেল অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবার জন্য এটি পরিকল্পিত হয়নি। হলে, যাদুবিদ্যার কিতাব অপহরণ করা কখনো সম্ভব হত না, সেনাদের একটি দল ঢুকে পড়তে পারত না। আর এই দুই ঘটনাও সম্ভব হয়েছিল তেতার কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহের পরেও। এত দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিল ওরা। তবে এক্ষেত্রে তেতাই রক্ষাকর্ত্রী বলতে হবে। কারণ তার কাছ থেকে জেনে নিয়ে অধিকর্তা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিল যে অমাত্য বা সেনাপতিকে এ সংবাদ জানান নিরাপদ হবে না। কারণ তাদের মধ্যে কেউ উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পারে। তাই কখনো যা করেনি সে, তাই করে বসল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফ্যারাও যখন তাঁর বিশ্রামালয়ে সুরাপানে রত সেই সময় দ্বার-রক্ষীদের পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে সেখানে প্রবেশ করে অভিবাদন জানায়।

—একি! তুমি এখানে? কে আদেশ দিয়েছে?

ফ্যারাও-এর কুঞ্চিত ললাট আর মুখের রেখায় ঘোরতম বিরক্তির প্রকাশ পেলেও অধিকর্তা ভীত হল না। কারণ সে জানে তার জীবন ফ্যারাও-এর জীবনের তুলনায় অতি তুচ্ছ। তাই ফ্যারাওকে রক্ষা করতে তার প্রাণ যদি তাঁরই

হাতে যায় তাতে ক্ষতি নেই।

সে বলে—হারেমে ভীষণ ষড়যন্ত্রের হদিশ মিলেছে। মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদ আক্রান্ত হবে। অমাত্য বা সেনাপতিকে জানাইনি। জানি না তাঁরাও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কিনা। তাই আপনার কাছে সোজা এসে ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছি।

ফ্যারাও সুরাপাত্র সরিয়ে রেখে বলেন—ঠিক করেছ। এখনই নেবকাকে ডেকে দাও। সে কোথায় থাকে নিশ্চয় জান।

—হ্যাঁ ফ্যারাও।

সে দ্রুত চলে যায়।

নেবকা অত্যন্ত কুশলী সেনানায়ক। তার অধীনে বেশ কিছু সৈন্য রয়েছে যারা প্রাসাদের পাশে স্থায়ী একটি শিবিরে অবস্থান করে। নেবকা ফ্যারাও-এর বিশ্বাসভাজনদের মধ্যে অন্যতম। ফ্যারাও-এর জন্য প্রাণ দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা সে করবে না। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রাসাদে উপস্থিত হয়েও সে বিদ্রোহী সৈন্যদের পূর্বে পৌঁছোতে পারেনি। তবু খুব বেশী কোন ক্ষতি করে উঠতে পারেনি বিদ্রোহীরা। শুধু পাঠাগারটা যদি ভস্মীভূত হত তাহলে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারত। সবচেয়ে বড় কথা তারা যদি পরিকল্পিতভাবে আসত তাহলে সহজেই ফ্যারাও এবং তাঁর পরিবারের লোকজনদের সবাইকে অথবা তাঁদের অধিকাংশকে বধ করতে পারত। কিন্তু পরিকল্পনায় তারা ততটা সিদ্ধহস্ত ছিল না। তারা জানত না ফ্যারাও কোথায় রয়েছেন। তাই প্রথমেই ফ্যারাও-এর ওপর আঘাত হানতে পারেনি। প্রাসাদের কোথায় কি রয়েছে এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিল তারা। তাই ভাঙচুর আর দাপাদাপি করে বেড়ালো শুধু। অল্পক্ষণের জন্য প্রাসাদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করার পরই নেবকার সৈন্যদলের প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হল তারা। তবে তাদের দলনেতা সুযোগ পেয়ে পালিয়ে যাওয়ায় সেই মুহূর্তে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল। সমস্ত প্রাসাদের ভেতরে তুমুল যুদ্ধ ঘটেছিল কিছুক্ষণের জন্য। তাই সম্রাজ্ঞী এবং মুতনেফার্ত লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছিলেন না। হারেমের এলাকার মধ্যে থেকে এতবড় ঘটনার কোন সংকেতই তারা পান নি। তেতার কথা শুনলেন তাঁরা। শুনল সবাই। তাকে সম্রাজ্ঞীর কক্ষে আনা হল। হতশেপসুত দেখল তাকে, উয়াচমেস আর অমেনমেসও দেখল। দেখল তাদের বড় ভাই। সবাই দেখল সেই অসামান্যা রূপসী নর্তকীকেও। দেখল দেবতার ঔরসে জাত বলে গর্বিনী সেই দুই নারীকে। সত্যিই যেন শ্বেতপাথর দিয়ে গড়া দুই প্রতিমা যেন। কিন্তু এদের শ্বেত শুভ্র সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হল না কেউ। ঘৃণা উপচে পড়তে লাগল সবার চোখে মুখে। ফ্যারাওকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার কল্পনা যারা করে মৃত্যুর পরপারে সেই সুন্দর দেশে যাবার সব পথ তাদের চিরতরে রুদ্ধ। কোন্ শাস্তি হবে তাদের কেউ জানে না। তাদের দলপতিকে খুঁজে পাওয়া যায় নি তখনো।

বেশীদিন পালিয়ে থাকতে পারে নি সেই দলপতি। দিকে দিকে চর পাঠানো হয়েছিল তার সন্ধানে। চতুর্থ দিনে থীবস-এর অনেক পূর্বে প্রায় সমুদ্রের

কাছাকাছি একটি গ্রামের পরিত্যক্ত কুটিরে ধরা পড়ল সে। রজ্জুবন্ধ অবস্থায় তাকে সারা পথ হাঁটিয়ে আনা হল রাজধানীতে। সবাই দেখল তাকে। দেখানো হল সম্রাজ্ঞী ও রানীকে, দেখানো হল রাজপুত্রদের এবং রাজকন্যাকে। বন্দী তরুণের মুখ তাদের অদেখা নয় আদৌ। প্রাসাদেও তাকে এক আধবার দেখা গিয়েছে। সেনাবিভাগের মোটামুটি ভাল পদেই কাজ করত সে।

কিন্তু তার এই দুর্মতির কারণ কি। ঠাহর করতে পারে না কেউ। এমনকি অমাত্য, সেনাপতি এবং সভাসদগণ, সবাই ধাঁধায় পড়ে যায়। তখন নগর-রক্ষীদের প্রধান একটু মুচকি হেসে বলে—ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমার একজন লোক রয়েছে, তার হাতে ছেড়ে দিলে একদিনের মধ্যেই সব কথা বেরিয়ে পড়বে।

প্রধান অমাত্য প্রশ্ন করে—কে সে? অত্যাচার চালিয়ে সবার মুখ থেকে কথা বের করা যায় না। এমন অনেক লোক রয়েছে পৃথিবীতে যারা মুখে কুলুপ এঁটে থেকে মৃত্যুবরণ করে।

নগর-রক্ষক বলে—আমি যার কথা বলছি তার হাতে পড়লে সবাই মুখ খোলে।

—নাম কি তার?

—না বললেই কি নয়?

—কেন? অসুবিধা রয়েছে?

—তা কিছুটা রয়েছে বৈকি। সে অপ্রস্তুত হবে। রাস্তাঘাটে সবাই তার দিকে অন্য দৃষ্টিতে চাইবে। কারণ সে দেখতে অতি সাধারণ।

সম্রাজ্ঞী অহমেস একটু অন্তরাল থেকে সবকিছু শুনছিলেন। তিনি আদেশ পাঠান, সেনাপতি, প্রধান অমাত্য এবং রাজপুত্র ও কন্যা ব্যতীত সবাই স্থান ত্যাগ করুক। তারপর নগর-রক্ষক লোকটির নাম বলুক।

সবাই চলে গেলে নগর-রক্ষক বলে—নাম তার চা-এ-মোপেট।

—চা-এ-মোপেট!

নামটা সবার মুখ থেকেই অস্ফুট স্বরে বের হয়ে আসে। এমনকি হতশেপ-সুতের মুখ থেকেও। কারণ লোকটি খুবই পরিচিত। সে প্রাসাদের শকটগুলির একটির সামান্য চালক। সে অত্যন্ত খর্বকায়। তার মুখ বিবর্ণ, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং দেখলে মনে হয় ভীত স্বভাবের।

নগর-রক্ষক বলে—হ্যাঁ অদ্ভুত বৈপরীত্য তার চেহারা কথাবার্তা আর স্বভাবের মধ্যে। তাকে চালকরূপে প্রাসাদে নিযুক্ত করেছি ফ্যারাও পরিবারের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য। ষড়যন্ত্র যদি হারেমের ভেতরে না হত, তাহলে অজানা থাকত না। তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া খুব কঠিন।

উয়াচমেস বলে—সেইজন্যেই আমরা বাইরে গেলে সে গাড়ি নিয়ে আসে। বুঝেছি। আমাদের খুব রাগ হত।

নগর-রক্ষক বলে—ওর গতি অত্যন্ত ক্ষিপ্র। ও অস্ত্রধারণে অসাধারণ পারদর্শী। আর ওর সবচেয়ে বড় গুণ হল ফ্যারাও ও তাঁর পরিবারের প্রতি

নিশ্ছিদ্র বিশ্বস্ততা।

প্রধান অমাত্য বলে—সবই বুঝলাম। কিন্তু পেটের কথা বের করবে কি ভাবে?

—সেটা ওর নিজের ব্যাপার। আমিও জানি না। ওর একেবারে নিজস্ব কোন পদ্ধতি আছে। তবে শুনেছি, একবার সে মারধর না করেই কথা বের করে নিয়েছে।

—কেমন করে?

—লোকটাকে শুধু কাতুকুতু দিয়ে। হাসাতে হাসাতে পেটের খিল ধরিয়ে দিয়েছিল। শেষে সব কবুল করে।

ছোট রাজকুমার অমেনমেস বহুদিন পরে হেসে ওঠে।

হতশেপসুত বিস্মিত হয়। ওর মুখে হাসি এখন দুর্লভ। তাই প্রশ্ন করে —তোকে কে আবার কাতুকুতু দিল।

সবাই হেসে ফেলে।

ফ্যারাওকে সব বলার পরে তিনি সভাসদগণের সঙ্গে আলোচনা করেন। তারপরে চা-এ-মোপেটের হাতেই তুলে দেওয়া হয় সেই বিদ্রোহী দলপতিকে এবং দুদিনের মধ্যেই রহস্যের উদ্ঘাটন হয়। লোকটি হিকসোস বংশোদ্ভূত। মা তার মিশরীয় রমণী হলেও পিতা হিকসোস। শৈশব থেকেই পিতা তার মনে মিশরীয়দের প্রতি বিরূপতার সৃষ্টি করে দেয়। সেই সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজও বপন করে দেয়। পরাজিত হিকসোসদের হয়ে প্রতিশোধ নিতে হবে। তাকে হতে হবে হিকসোস বংশীয় রাজা। ফিরিয়ে আনতে হবে বিজয়ীর সম্মান আর অতীত গৌরব।

এত বছর পরে যেন হিকসোসদের প্রতীক্ষার উদয় হল আবার। সবার টনক নড়ল। ফ্যারাও আদেশ দিলেন যার মধ্যে হিকসোস রক্তের এতটুকু হদিস মিলবে তাকে সৈন্যবাহিনীতে বা রাজকার্যে রাখা চলবে না। তার একমাত্র স্থান নুবিয়ার তাম্রখনি।

সেই লোকটি এবং অতি সুন্দরী নর্তকী তাউ ও সেই শ্বেতশুভ্র নারীদ্বয়কে একদিন নিয়ে যাওয়া হল মরুপ্রান্তরে। পদব্রজে তারা চলতে লাগল। সঙ্গে উষ্ট্রপৃষ্ঠে রাজকর্মীরা। প্রখর সূর্যতাপে অপরাধীদের পায়ে ফোস্কা পড়ল, তৃষ্ণায় তাদের কণ্ঠ শুষ্ক হল। রাজকর্মচারীরা নিজেদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে থাকে, কিন্তু তাদের একফোঁটা জলও দিল না। তাদের হাঁটিয়ে নিয়ে চলল দূরে--আরও দূরে। সেই যাত্রাই তাদের শেষ যাত্রা। কারণ ওভাবে অনন্তকাল চলা যায় না। তারা একস্থানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তখন উটের পিঠের কর্মচারীরা তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। ফিরে আসার সময় অপরাধীদের মধ্যে ব্যাকুলতা প্রকাশেরও সামর্থ্য ছিল না। সেইভাবেই তারা পড়ে রইল। মরুঝঞ্ঝা সেই দেহগুলির ওপর দিনের পর দিন পড়তে পড়তে বালির আস্তরণ বিছিয়ে দিতে লাগল।

হতশেপসুত জানে, সে মিশরের ফ্যারাও হবেই। অমন রা যেমন সত্য, ওসিরিস আর আইসিস যেমন সত্য, থথ আর অনুবিস যেমন সত্য তেমনি মিশরের মসনদে বসাও অবধারিত তার ভাগ্যে। সে শুধু জানে না তার স্বামী কে হবে। তার নির্বাচিত স্বামী হল উয়াচমেস। তবে অমেনমেস তার মনে দ্বিধার উদ্রেক করেছে। তার কথা যেমন সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যায় না, তেমনি একেবারে বাজে কথা বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। অমেনমেস তার দুর্বার উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্রোতে বাধার সৃষ্টি করেছে। তাই বলে তার ওপর রাগ হয় না। কারণ সে তার ভগিনীকে যথেষ্ট ভালবাসে। কিন্তু পত্নীরূপে কখনই নয়। কারণ তার দৃঢ় ধারণা সে ফ্যারাও হবার জন্য ততদিন পৃথিবীর বুকে রইবে না। নইলে পত্নীরূপেও তাকে বরণ করতে কোন দ্বিধা থাকত না একথা হতশেপসুত মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। তার দুই ভাই দুই দিক দিয়ে অতুলনীয়। একজন সৌন্দর্য আর বীরত্বে তুলনাহীন, অন্যজন এই বয়সেই যেন সাক্ষাৎ থথ। পৃথিবীর আর পৃথিবীর বাইরের কোন কিছুই তার অজানা রয়েছে বলে মনে হয় না। যদি এই দুজনকে স্বামীরূপে একসঙ্গে পেত সে তাহলে পৃথিবীর বুকে হতে পারত সে সফলতম ফ্যারাও। মিশরের খ্যাতি আর শক্তি, তার শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ত পূর্বদিকে এবং সমুদ্রের সীমা ছাড়িয়ে উত্তরদিকে বহুদূরে। পুন্তদেশ অতিক্রম করে আরও অনেক দূরে পূর্বের সেই অদ্ভুত দেশ যেখানে খুব কমই যাওয়া যায়—যেখান থেকে আসে সুগন্ধি ধূপ, আসে সৌরভযুক্ত কাষ্ঠ। সেই দেশ থেকেই আনা হয়েছিল চিতাবাঘ আর মুরগী—এদেশের মানুষ যা দেখে স্তম্ভিত হয়েছিল। যারা গিয়েছিল তারা বলেছিল ওদেশের উচ্চমানের শিক্ষা আর সংস্কৃতির কথা, ওদেশের অসাধারণ সাহিত্যের কথা। ফ্যারাও বিশ্বাস করেননি। এও কখনো হতে পারে! ফ্যারাও যা বিশ্বাস করেননি, কোন মিশরীয়ই তা বিশ্বাস করতে পারে না। কারণ ফ্যারাও হলেন মনুষ্যরূপী দেবতা। তাঁর অজানা কিছু থাকতে পারে না ধরিত্রীর বুকে। ফ্যারাও জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেখানে কোন পিরামিড দেখা গিয়েছিল কিনা। ভ্রমণকারীরা ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল, দেখা যায়নি। কিন্তু তারা অন্য অনেক কিছু দেখেছে যা এদেশের মানুষের ধারণার বাইরে। ফ্যারাও থামিয়ে দিয়েছিলেন তাদের। শুনতে চাননি তাদের কথা। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণকারীদের ওপর আদেশ জারি করে দেওয়া হল, তারা যেন কল্পনাপ্রসূত উদ্ভট সব কথা বলে মিশরবাসীর মনে সংশয়ের সৃষ্টি না করে। তাই তারা বলতে পারেনি ওদেশের অসাধারণ সৌন্দর্যযুক্ত বিরাট পক্ষি দেখেছে, যার নাম ময়ূর। তারা দারু-নির্মিত অপার্থিব সব মনোরম প্রাসাদ দেখেছে। এত কাঠের অস্তিত্ব এদেশে কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলার উপায় নেই। ফ্যারাও-এর হুকুম। কোনরকমে কেউ জানতে পারলে মৃত্যুর পর অন্য জগতে স্থান হবে না। যেতে হবে মরুসিংহের পাকস্থলীতে কিংবা কুমীরের মুখগহ্বরে।

হতশেপসুত জানে, পৃথিবীতে যত অদ্ভুত দেশই থাকুক না কেন মিশরের স্থান সবার ঊর্ধ্বে। এ দেশের সঙ্গে অন্য কোন দেশের তুলনা হয় না। তবু এই

দেশেরও দুর্দিন আসে। দুর্দিন আসে যখন ফ্যারাও-এর দেবত্ব সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে। সন্দেহের উদ্রেক হয়। তখন তার ফলও ভোগ করতে হয়। মিশরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন দুবার হয়েছে। বহুযুগ পূর্বে একবার হয়েছিল। আর একবার হয়েছিল হিকসোসদের আক্রমণের পরে। তাদের মত অধার্মিক অনাচারী জাতিও দীর্ঘ দুএক শতাব্দী ধরে মিশরের পবিত্র বুকের ওপর দাপিয়ে গেল।

তবু মিশর মিশরই। এখানকার অধিপতি পৃথিবীর অধিপতি। একসময় এখানকার অধিপতি ছিলেন স্বয়ং দেবতা। হোরাসই শেষ প্রত্যক্ষ দেবতা যিনি ছিলেন ফ্যারাও। তারপর থেকে তাঁর অংশ নিয়ে রাজত্ব করে যাচ্ছে মনুষ্যরূপী ফ্যারাও। হতশেপসুতের ধারণা দেবতার অংশ আর পরিপূর্ণ দেবতার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। কোন সীমারেখা নেই। তবে সে তার বৃদ্ধ গুহাশিক্ষক এবং হেকারনেহেহ্‌র কাছে থেকে শিক্ষালাভের ফলে একথা বুঝতে শিখেছে যে হিকসোসদের পূর্বে ফ্যারাওরা যেমন গজদন্ত-মিনারে বাস করার মত সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকতেন এখন আর তেমন নেই। এখন তাঁরা নেমে এসেছেন বালুকারাশির ওপর বিচরণশীল এবং নদীর পলির মধ্যে প্রোথিতপদ সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি। কারণ হিকসোসদের বিরুদ্ধে শতাব্দী-ব্যাপী সংগ্রামের সময় তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে সাধারণ মানুষও তাদের জন্মভূমিকে কম ভালবাসে না। ফ্যারাওদের তুলনায় তাদের বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, অর্থবল এবং গরিমা অকিঞ্চিৎকর হলেও দেশপ্রেমে তারা এতটুকুও কম নয়। তারা বাড়তি অর্থের প্রত্যাশা করে না, যশের কাঙাল নয়, তারা প্রতিপত্তি আর ক্ষমতার ধার ধারে না। তারা চায় শুধু নিজের জন্মভূমিতে দেবতাদের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে শান্তিতে ও স্বাধীনভাবে বাঁচতে। তাদের আজও এই বিশ্বাস অটুট যে ফ্যারাও যেমনই হোক না কেন, তিনি দেব-তুল্য। দেশের মানুষের ক্ষতি তিনি কখনই করবেন না, তাদের চিরাচরিত দিন-যাপনের, ধর্মাচরণের স্বাধীনতায় তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না—যেটা হিকসোসরা করে এসেছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। তাই ফ্যারাও-এর বংশধরদের পাশাপাশি কাঁধ মিলিয়ে তারা হিকসোসদের বিরুদ্ধে সমানে যুঝেছে। যার প্রার্থিত ফল হল শত্রুদের চিরবিদায়।

এহেন দেশবাসীকে আর পূর্বের মত সম্ভ্রমতার দূরত্ব বজায় রেখে ভীতির দেওয়াল তুলে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায়নি। তারা অনেক কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে ফ্যারাও-এর। বেশ কিছু অধিকারও তারা লাভ করেছে সম্পূর্ণ স্বতঃ-স্ফূর্ত ভাবে, যে সব অধিকারের কথা তারা এককালে কল্পনাতে আনতে সাহস পেত না। আগে পিরামিড বা উচ্চমানের সমাধিস্থল বা মস্তব শুধু ফ্যারাওদের জন্যই নির্মিত হত। এখন কিছু কিছু রাজকর্মচারী, এমনকি সাধারণ মানুষের মধ্যে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিও নিজের পরবর্তীকালের বাসস্থানরূপে নির্মাণ করে সমাধিসৌধ। পূর্বে একথা ভাবতে পারত না কেউ। তাদের পরকাল বলে কিছু ছিল না। কুমীর, শৃগাল, সিংহ ইত্যাদি নানা রকমের মাংসাশী জন্তু জানোয়ারের

খাদ্যরূপে তাদের দেহ বিনষ্ট হত। তাই সেই সময়ে হিংস্র জানোয়ারের প্রতীকী দেবতাদের অস্তিত্ব তাদের কাছে ছিল ভীতিপ্রদ। কিন্তু এখন তারা আর অতটা আতঙ্কিত নয়। এখন তারা দেবতাদের আর সাক্ষাৎ জন্তুজানোয়াররূপে ভাবে না। তাদের মন থেকে বর্বর হিকসোসদের আনা অপসংস্কৃতির ঘোরতর ছায়া অপসৃত হয়েছে। তারা বুঝতে শিখেছে দেবতাদের প্রতীক চিহ্ন। যেমনই হোক তাঁরা পৃথিবীর কেউ নন। অথচ তাঁরা সত্য। তারা যেমন শাস্তি দেন, তেমনি সুখ দেন, আনন্দ দেন।

একটি বিষয়ে হতশেপসুত সুনিশ্চিত যে তার পিতা তাকে একবছরের মধ্যে সহশাসকরূপে ঘোষণা করবেন। ফ্যারাও হারেমে যাবার পথে কিংবা উদ্যয়ন অতিক্রম করার সময় যদি কখনো তাকে দেখতে পান তাহলে তার কাছে এগিয়ে আসবেনই। তারপর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলবেন—আর বেশী দেরি নেই। জানি তুমি ঠিক পারবে।

হতশেপসুতের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে প্রতিবার। কিন্তু একবারও সে প্রশ্ন করতে পারে না যে অপরজন কে। সে তার নিজের ক্ষমতালাভের কথাই শুধু সর্বদা ভাবে। উয়াচমেস বা অমেনমেস তার যতই প্রিয় হোক ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে তাদের আনতে চায় না। সে কল্পনা করেছে উয়াচমেস হয়ত তার স্বামীরূপে ফ্যারাও হল এবং পুরুষের সহজাত কতকগুলো ক্ষমতার প্রভাবে সে সৈন্যবাহিনী এবং দেশবাসীর আস্থাভাজন এবং চোখের মণি হয়ে উঠল। হতশেপসুত আড়ালে পড়ে গেল। তাহলে কি হবে? ভাবতে গেলে হতশেপসুতের মাথা গরম হয়ে ওঠে। নিজের মুখ সেই সময় দেখতে পায় না, তাই। দেখতে পেলে উদীয়মান সূর্যের মত রক্তাঘূর্ণ নিজের মুখের দিকে চেয়ে নিজেই বিস্মিত হয়ে যেত। সেই মুখের চাপা ক্রোধ আর কেউ বুঝতে পারুক আর না পারুক, নিজের বুঝতে ভুল হত না। কারণ এই ক্রোধ উয়াচমেসের প্রতি, যে তার সহোদর ভাই এবং তার প্রিয়তম। আজকাল তার প্রেমাস্পদও বটে। সে গভীরভাবে ভেবে দেখেছে, কোন অবস্থাতেই উয়াচমেসকে সে হত্যা করতে পারবে না। নিজের অধিকার বজায় রাখতে সব রকম চেষ্টাই সে করবে, কিন্তু হত্যা কখনই নয়। উয়াচমেস এই পৃথিবীতে থাকবে না, অথচ সে থাকবে একথা কল্পনা করতেও ভয় পায়। তার চেয়ে বরং ওকেই এগিয়ে যেতে দেবে সবার সামনে। সে-ও ফ্যারাও থাকবে আর ওকে সৎ পরামর্শ দেবে। তখন তার চেষ্টা হবে দেশ যাতে ব্যবসা বাণিজ্যে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে সেটা লক্ষ্য রাখা।

কিন্তু তার দুই ভাই-এর কেউই সেরকম নয়। তারা তাদের ভগিনীর আকাঙ্ক্ষার কথা ভালভাবে জানে। ভগিনী যাতে ফ্যারাও-এর সম্মান থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে সব সময় লক্ষ্য রাখবে।

তবে তার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্রটির জন্য মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি থাকে। সেই যে হেব-সেদ ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। তারপর থেকেই চবরোস নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে রেখেছে অন্য দুই ভাই-এর সংস্পর্শ থেকে। তার মুখের রেখাগুলির মধ্যে একটা বিশ্রী মনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে যার ব্যাখ্যা

করা যায় না, অথচ অনুভব করা যায়। অন্তত নিজে নারী হয়ে হতশেপসুত অনায়াসেই তা বুঝতে পারে। কিন্তু ভাইদের সঙ্গে সংস্রব না থাকলে কি হবে, তাকে দেখতে পেলেই সে গুটিগুটি তার দিকে এগিয়ে আসে। একদিন তো তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেছিল—তুমি কি সুন্দর।

হতশেপসুত হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হেসে উঠে বলেছিল—নতুন দেখছ নাকি?

—না। কিন্তু আজ তোমার রূপ আমার মনকে টলিয়ে দিয়েছে।

—বাজে কথা। তুমি বরাবরই জান আমি সুন্দরী। আগেও অন্যভাবে বলেছ, তাছাড়া সবাই বলাবলি করে। এমনকি হারেমের সেরা রূপসীরাও।

—হতে পারে। কিন্তু তোমাকে আমি একান্তভাবে পেতে চাই। একেবারে নিজের মত করে।

—ও, এই কথাই মিশরের যে কোন বয়সের যে কোন পেশার, যে কোন পুরুষকে জিজ্ঞাসা কর, তারাও এই একই কথা বলবে। একই আকাঙ্ক্ষা তাদের। তবে তাদের সেই দুঃসাহস নেই। কারণ আমার মধ্যে দেবতার অংশ রয়েছে। আর কারও মধ্যে নেই। এমনকি তোমার মধ্যেও নেই।

—আমি ফ্যারাও-এর ঔরসজাত পুত্র।

—হতে পার। কিন্তু নিজে ফ্যারাও না হলে তোমাকে কেউ দেবতা বলবে না। অথচ আমার সঙ্গে যারই বিবাহ হোক, সে ফ্যারাও হবে। ফলে সে হবে দেবতা। আমার পিতাও মায়ের সঙ্গে বিবাহের পরেই শুধু দেবত্ব পেয়েছেন।

মরিয়া হয়ে বড় ভাই সহসা তাকে হাত ধরে কাছে টেনে নেয়। তারপর বুকের মধ্যে পিষে ফেলে বলে—আমি তোমাকে চাই।

হতশেপসুত যতটা পারে নিজের শরীরকে পাথরের মত শক্ত করে ফেলে। সে এক ঝলক ওপরের দিকে চেয়ে কামান্ধ পুরুষের ছলছলে দৃষ্টি দেখতে পায়। তারপর হাঁটু দিয়ে এবং দু'হাত দিয়ে এক ধাক্কায় একটু দূরে সরিয়ে দেয়। ক্রোধে তার নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে ওঠে। তার সর্বাঙ্গ যদি দৃষ্টিগোচর হত তাহলে সর্বাঙ্গই রঙীন দেখা যেত। তার চোখ দিয়ে অগ্নি বর্ষিত হতে থাকে।

—দূর হও আমার সামনে থেকে নির্লজ্জ কাপুরুষ।

—প্রেমিকেরা কাপুরুষও নয়, সাহসীও নয়। তারা শুধু প্রেমিক।

—হ্যাঁ, যদি তারা বিদ্বান হয়, বীর হয়, তাহলে একথা মানা যায়। তুমি দুটোর কোনটাই নও। তোমার বিদ্যার বহর আমার জানা আছে। হেকারনেহহ্‌র মত শিক্ষককে পেয়েও তাঁর মর্যাদা দিতে পারনি। কারণ তোমার মস্তিষ্ক তাঁর শিক্ষা গ্রহণের মত পরিণত নয়। সবচেয়ে বড় কথা হল তুমি আদৌ প্রেমিক নও। তোমার লোভ হল মসনদের ওপর।

—এটা তোমার স্পর্ধা।

—হ্যাঁ, মানতে রাজী ছিলাম একথা। কিন্তু আজ তুমি যে স্পর্ধা দেখালে তার পরেও একথা বলা তোমার সাজে না। তাছাড়া শিকারে তোমার সাহসিকতার আর পরাক্রমের কথা আমার অজানা নয়।

—কে বলেছে? তোমার সেই আদরের দুটি ভাই?

—না। তারা তোমার সঙ্গে কখনো শিকারে যায়নি। তারা নৌকাভ্রমণেও তোমার সঙ্গে যায়নি। তবু ফ্যারাও-এর পুত্রদের দুর্বলতার কথা কারও অজানা থাকে না। যেমন থাকে না তাদের গৌরবের কথা। যত নিভৃতেই তা ঘটুক না কেন। তুমি কি ভেবেছ তোমার আজকের এই দুষ্কর্মের কথা কারও অজানা থাকবে? কেউ না কেউ নিশ্চয় দেখেছে। কেউ না দেখলে, কোন দেবতা দেখবেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখে একটা তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে। সে যাবার সময় বলে—আমি সব কয়টি দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাব তাঁরা যেন তোমাকে আমার সারা জীবনের শয্যাসঙ্গিনী করেন। তাহলে আমার ফ্যারাও হতে বাধা থাকবে না।

হতশেপসুত সেকথা শুনে জ্বলতে থাকে। মনে হতে থাকে নিজের ক্রোধের আগুনে নিজেই পুড়ে মরবে সে।

হেকারনেহেহ্ অনেকদিন ধরে চোখের অসুখে ভুগছিলেন। এই অসুখ মিশরে প্রতি ঘরেই হয় হামেশা। প্রখর ও স্বচ্ছ সূর্যতাপ এর মুখ্য কারণ। তার সঙ্গে দৃষ্টিবিভ্রমকারী বালুকাময় প্রান্তরের চোখ-ঝলসান প্রভাব রয়েছে বলে মনে করে অনেক চিকিৎসক। তবু অসুখটি এত সাধারণ যে কারও যদি চোখ ভাল থাকে তাহলে পথে-ঘাটে যে কেউ তাকে কৌতুক করে প্রশ্ন করতে পারে—"কবে ভাল হলেন?" অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয় অসুখ তার ছিলই, সম্প্রতি নিরাময় হয়েছে।

কিন্তু হেকারনেহেহ্‌র বেলায় দুটি কারণে অসুখটি নিরাময় হল না। প্রথমত, বৃদ্ধ বয়সে যে কোন রোগই সারতে দেরি হয়। তার ওপর একটু চিকিৎসা বিভ্রাটও ঘটে গিয়েছে তাঁর বেলায়। অথচ তিনি ফ্যারাও-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের অধীনে ছিলেন বরাবর। তবু ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়ে থাকে। মানুষ আর যাই হোক থথ নয়। থথ বলতে গেলে একাধারে সব। তিনি বিদ্যার দেবতা, তিনি পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানের দেবতা। স্বহস্তে সেই জ্ঞানভাণ্ডার লিপিবদ্ধ করে মনুষ্যজাতিকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেছেন, তাদের অশেষ উপকারের জন্য। তিনি চিকিৎসক। আর চিকিৎসাশাস্ত্রের গূঢ়ার্থই হল যাদুবিদ্যা। তিনি যাদুবিদ্যায় পারদর্শী। তিনি ঈশ্বরের লিপিকার এবং তাঁর দূত। তাঁর দ্বারাই সময়ের নিরূপণ হয়। গণিতশাস্ত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা তিনি। আবার তাঁকে চন্দ্রের দেবতারূপেও বন্দনা করা হয়। তিনিই একসময়ে হোরাসকে ফ্যারাও-এর পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। আবার তিনি অনুবিসের নিকটে দাঁড়িয়ে থেকে মৃত ব্যক্তির হৃদপিণ্ড ওজন করা দেখেন। দেখে টুকে রাখেন ব্যক্তিটির হৃদয় কলুষমুক্ত কিনা।

সুতরাং ফ্যারাও-এর চিকিৎসকের ভুলভ্রান্তি হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এই ভুল এক মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনল। হেকারনেহেহ্ জন্মের মত অন্ধ হয়ে গেলেন।

অমেনমেস একদিন দ্বিপ্রহরে হতশেপসুতের কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

খবর পেয়ে ছুটে এসে হতশেপসুত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা জানায়। ইদানীং এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। ছোটভাই আজকাল সব বিষয়ে নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত। দেখলে মনে হয় মন তার প্রশান্ত। সেখানে নীলনদের উচ্ছলতা নেই।

হতশেপসুত আগ্রহভরে প্রশ্ন করে—আমার কাছে হঠাৎ ?

অমেনমেস বিষাদের হাসি হেসে বলে—একজনকে দেখতে যাবে ?

—কাকে ?

—হেকারনেহেহ্‌কে।

—তাঁকে ? হঠাৎ ?

—তুমি তো জানই কয়েক বছর ধরে তিনি অন্ধ।

—জানি। খুবই দুঃখের।

—কষ্ট হয় না তোমার ?

—হয় বৈকি। অত বড় জ্ঞানী ব্যক্তি।

—আর কিছু নয় ?

—আমার আর কি করার আছে বল্‌। তাঁর অর্থাভাব নেই।

—অর্থই কি সব ? তাঁর এখন অনেক কিছুর অভাব।

—কিসের ?

—আমাদের দেশে বৃদ্ধদের আমরা সম্মান দেখাই। তবু বৃদ্ধরা নিজেদের নিঃসঙ্গ বলে ভাবে।

—ওটা বিধাতার বিধি।

—হ্যাঁ, কিন্তু মানুষ হয়ে আমরা চেষ্টা করলে সেই একাকীত্ব কিছুটা ঘোচাতে পারি।

—সেটা বৃদ্ধদের পরিবারের লোকেরা বুঝবে।

—একশোবার। কিন্তু হেকারনেহেহ্‌ শুধু তাঁর পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি মিশরের জন্য জীবন সমর্পণ করেছিলেন।

—তুই বড় বেশী ভাবিস। এইজন্য তোর মনের দুঃখ ঘোচে না।

—খুব সত্যি কথা। কিন্তু সেজন্য আজ আমি আমিই। অন্ধ হয়ে যাবার পর থেকে হেকারনেহেহ্‌ নিজেকে বড় বেশী অবহেলিত বলে ভাবতে শুরু করেছেন।

—কে বলেছে তোকে একথা ? তোর সেই পেয়ারের নফর পিমাই ?

—না। শুধু শুধু সব সময় তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমি নিজেই বুঝতে পারি।

—হ্যাঁ। তোর উদ্ভট কল্পনার শেষ নেই। তোর জন্যে বহুদিন থেকে আমার মনটাও অস্বস্তিতে ভরে রয়েছে। আমার সেই আনন্দই যেন পাই না। তুই নিজে অশান্তিতে ভুগিস, অন্যেরও শান্তি নষ্ট করিস।

মৃদু হেসে অমেনমেস বলে—ভয় নেই। কিছুদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

অসন্তুষ্ট হতশেপসুত বলে—এটা নিশ্চয় সেই অশুভ ইঙ্গিত।

অমেনমেস বলে—ওসব কথা থাক। আমি যেজন্যে এসেছি। হেকারনেহ্-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাই তাঁকে শেষ দেখা দেখতে যাব আজ। তুমি ইচ্ছে করলে যেতে পার।

—শেষ দেখা মানে? তিনি কি মৃত্যুপথযাত্রী?

—এমনিতে ঠিকই আছেন। কিন্তু আমার ধারণা দুদিনের মধ্যে মৃত্যু হবে। শুধু মনে অসীম শক্তি রয়েছে বলে আত্মহত্যা করেননি। বলতে গেলে তিনি পরিবারের পরিত্যক্ত আবর্জনার মত।

—এত কথা কে বলল তোকে?

বিরক্ত অমেনমেস তীক্ষ্ণ স্বরে বলে ওঠে—পিমাই নয়। তুমি কি তাঁকে দেখতে যাবে আজ?

তার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতায় হতশেপসুত চমকে ওঠে। ছোট ভাই-এর মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলে—যাব।

—প্রস্তুত থেকো। তোমার উপকারই হবে। অবহেলিত হলেও তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়নি। তাঁর পাশে গিয়ে বসলে অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের দুয়ার খোলা দেখতে পাওয়া যায়। তবু মানুষ বোঝে না। বুঝতে চায় না।

—এই অবস্থায় উনি আমাদের কি শিক্ষা দেবেন?

—কেন? আইসিস রা-এর গুপ্তনামের কথা কিভাবে তাঁর কাছ থেকে বের করে নিয়েছিলেন আজও তুমি জান না। জান কি?

এতক্ষণে হতশেপসুত আগ্রহী হয়ে ওঠে। সে বলে—না তো?

—তাই শুনব আজ। এটাই হবে ওঁর শেষ শিক্ষাদান। ইচ্ছা করলে উয়াচ-মেসও যেতে পারে। তুমি বলে দেখতে পার।

—নিশ্চয় বলব। কিন্তু শেষ শিক্ষাদান কেন? দুদিন পরে সত্যিই মৃত্যু হবে তার।

মিষ্টি হেসে অমেনমেস বলে—হ্যাঁ।

—তুই হাসছিস?

—হ্যাঁ। হাসব না কেন? দুই দেশ। এদেশ আর ওদেশ। তাই বলে বিদেশ নয়। ওদেশে কত আনন্দ, কত সুখ। আমিও আজকে বলে আসব তাঁকে শিগ্‌গির তাঁর কাছে যাব।

—তোর এই উদ্ভট কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না।

—বেশ, আর বলব না।

—ওদেশ থেকে যদি কেউ ফিরে আসত, তাহলে না হয় কথা ছিল।

—ফেরে।

—ফেরে? দেখেছিস তেমন কাউকে?

—দেখলেই বা চিনব কেমন করে?

—আবার রহস্য শুরু হল। কেউ ফেরে না আমি জানি। যে যায় সে আবার যদি জন্মাত বেশ হত।

—জন্মায়।

হতশেপসুত এবারে রীতিমত রাগান্বিত হয়ে ওঠে। তার সহজ-সরল জীবন, সেই জীবনের উচ্চাশা, ফ্যারাও হবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, সব কিছুই এই ভাইটির সংস্পর্শে এলে উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। একে যেমন ভালবাসে সে, তেমনি ভয় পায় এর কথাবার্তাকে।

অমেনমেস তার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মনোভাব বোধহয় বুঝতে পারে। সে বলে —আগে আইসিসের সেই কাহিনী জেনে নিই। তারপর পুনর্জন্মের কথাটা তুমি জেনে নিও মনে করে।

—আচ্ছা।

সেদিন অপরাহ্নে তারা তিন ভাই বোন মিলে হেকারনেহেহ্-এর গৃহের সামনে অশ্বচালিত শকট থেকে অবতরণ করেই বুঝতে পারে অট্টালিকা এবং তার চারপাশের সব কিছুর মধ্যে যত্নআত্তির অভাব দেখা দিয়েছে। পূর্বের মত সযত্ন নজর নেই যেন আর গৃহটির পরিবেশ রক্ষায়। যদিও হেকারনেহহের একমাত্র পুত্র ফ্যারাও-এর কর্মচারী, তবুও তার মধ্যে পিতার প্রতিভা, গুণ ও জ্ঞানের সমাবেশ আদৌ ঘটেনি। সে অন্য সব সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে একজন, যে আনুগত্যের সঙ্গে তার কর্তব্য পালন করে যায় মাত্র। নিজের কোন বিশেষ গুণ দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে না।

পুত্র গৃহে ছিল না। এগিয়ে এল পুত্রবধূ, পৌত্রী এবং পরিচারক-পরিচারিকারা। তারা ফ্যারাও-এর পুত্রকন্যাদের শকট থেকে নামতে দেখে বিস্মিত। এগিয়ে আসে দ্রুত। অভ্যর্থনা জানায়।

—আমাদের কী সৌভাগ্য।

হতশেপসুত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করতে করতে বলে—সৌভাগ্য আমাদের।

ওরা এ কথার উত্তর দিতে সাহসী হয় না।

উয়াচমেস জানত হেকারনেহেহ্ কোন্ কক্ষে বসেন এবং বিশ্রাম করেন। সে তাড়াতাড়ি সেই কক্ষে গিয়ে দেখে কেউ নেই। দাসদাসীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। তারা বুঝতে পারে না কি করবে। পুত্রবধূও সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গের ভাবভঙ্গি দেখে বিচলিত। ওরা দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চায়।

পুত্রবধূ তাদের বলে—আপনারা অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন। আমাকে আদেশ করুন, কি করতে হবে। আমি আপনাদের আদেশ পালন করে কৃতার্থ হব।

একথা শুনে হতশেপসুত ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে পুত্রবধূর দিকে চেয়ে বলে—এটা আমাদের অতি সম্মানীয় শিক্ষক হেকারনেহেহ্-এর গৃহ নয়?

—হ্যাঁ। অবশ্যই।

—আমরা তাঁর কাছে এসেছি। তাঁকে তো দেখছি না!

একজন ভৃত্য তখন তাদের একটি সুদীর্ঘ অলিন্দ দিয়ে নিয়ে যায় একেবারে পেছনের একটি কক্ষে। সেখানে শয্যায় পার্শ্ববর্তী একটি উচ্চাসনে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন হেকারনেহেহ্। তাঁর চেহারা দেখে তিনজনই স্তম্ভিত হয়ে যায়।

সেই সবল দেহ একেবারে বিশুষ্ক। চক্ষুদ্বয় নিমীলিত। স্পষ্ট বোঝা যায় অক্ষিগোলক বলতে কিছু নেই দুই চোখে। নিমীলিত নেত্রের পল্লবদ্বয় কোটরের ভেতরে ঢুকে রয়েছে। দৃঢ়ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষটির এহেন পরিণতিতে তিনজনই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের মনের ভেতরটা আর্দ্র হয়ে ওঠে।

—কে ?

পদশব্দ শুনতে পেয়েছেন বৃদ্ধ। চক্ষু হারিয়ে বোধহয় শ্রবণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ তারা বলতে গেলে নিঃশব্দেই প্রবেশ করেছিল।

ভৃত্য কিভাবে তাদের পরিচয় দেবে বুঝে উঠতে পারে না। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—উত্তর দেবে না বুঝি। কি আর করব।

হতশেপসুত তখন বলে—আমরা।

—কে ? এত পরিচিত স্বর। কে কথা বললে ?

কথা আটকে যায় হতশেপসুতের। কোনরকমে বলে—আমি।

—এবারে বুঝেছি। কতদিন পরে তুমি এলে আমার কাছে। এ যে বিশ্বাস করা যায় না।

হেকারনেহেহ্ কি করবেন ভেবে পান না। তিনি রীতিমত উত্তেজিত শুষ্ক মুখমণ্ডলের শিরা-উপশিরাতেও যেন রক্ত চলাচলের সূত্রপাত হয়।

ওরা তিনজনে ছুটে গিয়ে বৃদ্ধকে ধরে। অমেনমেস বলে—আপনি শান্ত হবে বসুন। নইলে পড়ে যাবেন।

—ও। তোমরা সবাই এসেছ। কী আনন্দ হচ্ছে আজ আমার। মনে হচ্ছে হয়ে আগের দিনগুলো ফিরে এসেছে।

উয়াচমেস বলে—আপনার চোখে প্রথম যখন অসুখ হয় আমি এসেছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে এমন হবে ভাবতে পারিনি।

—কারও দোষ নেই। অদৃষ্ট।

—কিন্তু আপনি এই কোণের ঘরে কেন ? আমি তো আপনাকে সামনে খুঁজছিলাম।

বৃদ্ধ এবারে একটু চুপ করে থেকে বলেন—আমি সামনে থাকলে ওদের অসুবিধা। ছেলের কাছে কত লোক আসে নানা কাজে। শুধু শুধু সামনের ঘরটা আটকে রাখলে কাজের অসুবিধা হয়।

হতশেপসুত বলে—কিন্তু এই অট্টালিকা আপনার। আপনার পরিচয়েই আপনার পুত্রের পরিচয়। এ বাড়িতে সম্মানীয় কেউ এলে আপনার সঙ্গেই দেখা করতে আসবে যতদিন আপনি জীবিত থাকবেন। আজও আমরা আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।

—জানি। জানি। সব জানি।

হতশেপসুত বলে—আমিও সব জানি।

—তুমি ! কি জান ?

—আপনি অন্ধ বলে আপনাকে এখানে এনে রাখা হয়েছে। আপনি অব—

হেলিত। তাই আপনার মনে অশান্তি। আপনার স্বাস্থ্য সেজন্যে ভেঙে পড়েছে। আপনার মত এত জ্ঞানবান ব্যক্তির পুত্র ভুলে গিয়েছে মিশরে পিতামাতার স্থান সবার ওপরে। এ শিক্ষা আপনার কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। আমি এর একটা বিহিত করব।

বুদ্ধ তাঁর স্কন্ধে রক্ষিত হতশেপসুতের হাত চেপে ধরে বলেন—জানি, তুমি সব পার। প্রভূত ক্ষমতার অধিকারিণী হতে চলেছ তুমি। এখনো তোমার কথার গুরুত্ব তোমার পিতার কাছে সবচেয়ে বেশী। তবু তোমার শিক্ষক হয়ে আমি অনুরোধ করছি ওকে ক্ষমা করে দিও। ওর বিচার আসল সময়ে তো হবেই।

হতশেপসুত বুদ্ধের হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একটু চাপ দিয়ে বলে—আপনার অনুরোধই আমার কাছে আদেশ। কিন্তু আমি চাই আপনাকে যেন আপনার নিজের কক্ষে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়।

শেষের কথাটি পরিচারকের দিকে চেয়ে বলে হতশেপসুত। পরিচালক ঘাড় হেলায়।

বুদ্ধ বলেন—আমি ওদের বলে দেব। কিন্তু ওসব কথা থাক। হঠাৎ তোমাদের আমার কথা মনে পড়ল কেন? আমি তো ভেবেছিলাম, বিস্মৃতির অতলে আমি তলিয়ে গিয়েছি।

হতশেপসুত বলে—সত্যি কথাই বলেছেন। আপনার কথা হামেশা মনে হলেও এখানে আসব একথা কখনো ভাবিনি। এর জন্য অমেনমেসকে আমি ধন্যবাদ দেব। সে আমাদের নিয়ে এসেছে। সে আমাদের এতই অকৃতজ্ঞ ভেবেছে যে একটা লোভ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। নইলে বুঝি আমরা আসতাম না।

বুদ্ধ হেসে বলেন—লোভ? কিসের লোভ?

—একটা কাহিনী শোনার লোভ।

—কোন্ কাহিনী?

—আইসিস কিভাবে রা-এর গুপ্তনাম তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলেন সেই কাহিনী।

বুদ্ধ এবারে খল্‌খল্ করে হেসে ওঠেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য সেই হাসি বড়ই করুণ শোনায়।

তিনি বলেন—বেশ তো? তোমরা বস। আমি শোনাব। বসার জায়গা আছে তো?

শশব্যস্ত পরিচারক ছুটে অন্য কক্ষে চলে যায়। তারপর অন্যদের সহায়তায় উপবেশনের আসন নিয়ে আসে। বুদ্ধ বুঝতে পারেন সব। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলেন না।

তিনি প্রশ্ন করেন—এখন দিনের কোন সময় চলছে?

হতশেপসুত বলে—একটু পরে সন্ধ্যা হবে।

—জানি না বাতির ব্যবস্থা আছে কিনা। আমার তো কিছুই লাগে না।

—আপনি ব্যস্ত হবেন না। সব ব্যবস্থা হবে। আপনি বরং শুরু করুন।

হেকারনেহেহ্ উঠে শয্যায় গিয়ে বসেন। তারপর দুহাত দিয়ে হাতড়ে তাঁর শয্যাসংলগ্ন মাথা রাখার জায়গাটি খুঁজে বের করে একটু হেসে বলেন—বসে থাকতে থাকতে কষ্ট হলে আমাকে একটু জিরিয়ে নেবার অনুমতি দিও। এটা ধৃষ্টতা আমি জানি। কিন্তু আজকাল একটানা বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারি না।

অমেনমেস বলে—আপনি বরং শুয়ে শুয়ে বলুন।

—না। আমার অস্বস্তি হবে।

হেকারনেহেহ্ আরাম করে বসে কাহিনী শোনান ঃ

পৃথিবীর সেই আদিম যুগে সূর্যদেবতা রা নুন দেবতার গাঢ় অন্ধকারময় অনন্ত সমুদ্রের বুক থেকে উত্থিত হয়েই পৃথিবীর শাসনভার হাতে তুলে নিলেন। কিন্তু এর জন্য তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তাদের চমুনু নগরীর প্রান্তরে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। এর পর থেকে বা সমস্ত মনুষ্যকুল এবং দেবতাদের রাজা হয়ে শান্তিতে রাজত্ব করতে লাগলেন। যতদিন তিনি তাঁর ক্ষমতাকে নিজের মুঠোর মধ্যে রাখলেন কেউ মাথা উঁচু করতে পারেনি ততদিন। কিন্তু দেবতা হলেও কারও যৌবন চিরস্থায়ী হয় না। রা-এরও হল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জড়াগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

আর বার্ধক্যে সাধারণ মানুষের ভাগ্যে যা হয়, রা-এর বেলাতেও তাই হল। দেবতাই হোক আর মানুষই হোক বার্ধক্যে কপালে দুর্ভোগ সবারই থাকে। সেকথা ইতিমধ্যে তোমরাও নিশ্চয় বুঝে ফেলেছ। তোমাদের সবারই বুদ্ধি আছে।

হেকারনেহেহ্-এর কথায় সবাই মস্তক অবনত করে। তিনি তাদের নীরব দেখে আবার বলতে থাকেন ঃ

রা-এর অধীনস্থ দেবদেবী, এমনকি মনুষ্যজাতিও বিদ্রোহী হয়ে উঠল এই সুযোগে। বিশেষ করে জ্ঞানবতী আইসিস, যিনি মানুষ, দেবতা ও আত্মাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী তিনি নিজের আধিপত্য বিস্তারের জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একমাত্র তিনিই রা-এর মত স্বর্গ ও মর্ত্যের সবকিছু জানেন। কিন্তু একটিমাত্র জিনিস ছিল তাঁর অজ্ঞাত। তিনি জানতেন না সেটির কথা। তাঁর এই অজ্ঞতাই তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তিনি রা-এর গুপ্ত নামটির কথা জানতেন না। কারণ অসংখ্য নামের অধিকারী রা তাঁর এই বিশেষ নামটির কথা সতত সযত্নে গোপন রাখেন। কারণ এই গোপন নামটিকে ভিত্তি করেই তাঁর যত শক্তি, যত ক্ষমতা। এই নামই রা-কে যোগায় যাদুকরী মহাশক্তি। যাকেই এই নাম দেওয়া হোক না কেন, এর প্রভাবে সে হয়ে উঠবে অমিতশক্তির অধিকারী।

আইসিস কতভাবে গুপ্ত নামটি উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হলেন। শেষে চাতুরীমিশ্রিত একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন তিনি।

রা-এর বার্ধক্য তাঁর মুখের মধ্যে নড়ে উঠল। তিনি বাধ্য হলেন ধরিত্রীর

বুকে সেটি থুথুর মত নিক্ষেপ করতে। সেটি মাটির ওপর গিয়ে পড়ল। আইসিস সেটি তুলে নিয়ে তার সঙ্গে কিছুটা মাটি মিশিয়ে কুম্ভকারের মত হাত দিয়ে এদিক ওদিক চাপ দিয়ে তীক্ষ্ণ ফলার মত একটি কীট তৈরী করলেন। তিনি সেটিকে জীবন্ত করে নিজের কাছে না রেখে আবার রাস্তার ওপর গড়িয়ে দিলেন। এই রাস্তা দিয়েই তো দেবাপতি রা ওপরের আর নীচের দেশে বিবরণ করেন।

তারপর একদিন রা তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্যে ভূষিত হয়ে দেবতাদের সমভিব্যাহারে দেশ পরিভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হলেন। চলতে চলতে পথের যেখানে আইসিস-সৃষ্ট কীটটি পড়ে ছিল সেখানে পা রাখতেই সেটি তাঁকে দংশন করল। স্বর্গীয় দেবতা তাঁর মুখ ব্যাদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বর স্বর্গে প্রতিধ্বনিত হল। সমগ্র দেবকুল চিৎকার করে উঠল—কি হল! কি হল!

তারপর দেবতারা বললেন—দেখ দেখ ওঁর মুখ দিয়ে বাক্য নিঃসৃত হচ্ছে না। চোয়ালের হাড় ঠক্‌ঠক্‌ করে শব্দ করছে। ওঁর সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। দেখ দেখ সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ছে। ঠিক যেমন প্রথম বর্ষার উন্মত্ততায় নীলনদের জল দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

মহৎ এবং বিরাট দেবতা রা এরপর একটু সুস্থির হলেন। তিনি তখন অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন—তোমরা, আমার দেহ থেকে যাদের উৎপত্তি, যাদের আমি আকার দিয়েছি—তারা সবাই আমার কাছে এস। কারও হিংসা আমাকে জর্জরিত করেছে। আমাকে দুর্দশাগ্রস্ত করার জন্য আক্রমণ করেছে। আমি জানি এ কথা, কিন্তু আমার নয়নদ্বয় সেটি দেখতে পাচ্ছে না। আমার দুই হাত এর জন্য দায়ী নয়। আমি বুঝতে পারছি না কে এই ঘৃণ্য কাজ করল। এর চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক কিছু হতে পারে আমি কল্পনা করতে পারি না।

আমি একজন রাজকুমার। অপর এক রাজপুত্রের সন্তান আমি। আমি এক দেবতার স্বর্গীয় বংশধর। আমি এক মহান দেবতার মহান সন্তান। আমার পিতাই আমার নামকরণ করেছিলেন। আমার অনেক নাম, আমার অনেক আকৃতি। আমার আকৃতি বিভিন্ন দেবতার মধ্যে দৃশ্যমান। আমার পিতা এবং আমার মাতা আমাকে আমার নাম বলে দিয়েছিলেন। এই নাম আমার হৃদয়ের মধ্যে সংস্থাপিত রয়েছে আমার জন্মাবধি যাতে কোন যাদুকর আমার বিরুদ্ধে কোন অবস্থাতেই যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করতে না পারে।

আমি আমার নিজের সৃষ্ট জগত দেখতে পরিভ্রমণে বের হয়েছিলাম। যে দুইটি দেশ আমি সৃষ্টি করেছি সেই দেশ দুইটির ওপর দিয়ে আমি পদব্রজে যাত্রা করেছিলাম। ঠিক তখন একটা কিছু আমাকে দংশন করল। জানি না সেটি কি। সেটি অগ্নি নয়, জলও নয়। আমার বক্ষপিঞ্জর ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আমার সর্বশরীর কম্পমান। মনে হচ্ছে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

হেকারনেহেহ্‌ কথা বলতে বলতে অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। তিনি বার-

ার শরীরটাকে এলিয়ে দিতে গিয়ে রাজকন্যা আর রাজপুত্রদের উপস্থিতির কথা ভেবে আবার সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করছিলেন। অমেনমেসের সহসা মনে হল, তার সামনে উপবিষ্ট রয়েছেন সাক্ষাৎ রা। পোকার কামড়ে যন্ত্রণায় ছটফট্ করছেন তিনি। সে তাঁর কাঁধে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বলে—আপনি অনেকক্ষণ বসে থেকেছেন। এবারে আরাম করে একটু শুয়ে নিন। আমরা আপনার পাশে বসে শুনব এই অপূর্ব কাহিনী।

—শোয়া কি ঠিক হবে ? তোমরা রয়েছ।

সবাই বলে ওঠে—শুলেই আপনি আরও ভালভাবে বলতে পারবেন।

এই অবস্থাতেও হেকারনেহেহ্ একটু সংকোচবোধ করেন যেন শুতে। কারণ ছাত্রদের বরাবর তিনি নিয়মানুবর্তী তার শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। তাঁর শিক্ষা-দানে কোন ফাঁক ছিল না। তবু আজ শুতে হল।

তিনি বলতে থাকেন ঃ

রা তখন সবাইকে বললেন—আমার কাছে স্বর্গের শিশুদের এনে দাও। তারা সরল সহজ। তারা বিজ্ঞের মত কথা বলে। তাদের ক্ষমতা স্বর্গকে স্পর্শ করতে পারে।

তখন স্বর্গীয় শিশুদের রা-এর সামনে এসে উপস্থিত করা হল। দেখা গেল, রা-এর বেদনায় তারা সবাই দুঃখে কাতর। এতক্ষণে সেখানে এলেন জ্ঞানবতী আইসিস। তার মুখবিবর জীবনদায়িনী বায়ুতে পরিপূর্ণ। তাঁর প্রভাবে রা-এর যাতনার উপশম হয়। তাঁর সুমিষ্ট কথায় মৃতেরাও পুনর্জীবন লাভ করে। আইসিস অতিমাত্রায় ব্যস্ত হবার ভান করে দরদ দেখিয়ে বলে ওঠেন—আপনার এ কি হয়েছে স্বর্গীয় পিতা ? এই দেখুন একটা কীট আপনার এই দশা করেছে। আপনারই এক সন্তান আপনার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং তাকে এক অত্যাশ্চর্য যাদুর প্রভাবে পরাস্ত হতেই হবে। আমি এমন ব্যবস্থা দেব যাতে সে আপনার কিরণ দর্শন করা মাত্র পরাভূত হয়।

দেবাধিপ তখন আইসিসকে আবার বলেন—আমি আমার দ্বারা সৃষ্ট দেশ দুইটি দেখতে বের হয়েছিলাম। পথে কোন কীট আমাকে দংশন করে। তাকে আমি দেখতে পাইনি। সেটি আগুনও নয় জলও নয়। অথচ তারপর থেকে আমি জলের চেয়েও শীতল হয়ে পড়েছি, আগুনের চেয়েও উত্তপ্ত। আমার প্রতিটি অঙ্গ থেকে অবিরাম ধারায় ঘর্ম নির্গত হচ্ছে। আমি কাঁপছি। আমার দৃষ্টিশক্তি অস্বচ্ছ হয়ে পড়েছে। আমি আমার আকাশকে দেখতে পাচ্ছি না। আমার গণ্ড বেয়ে গ্রীষ্মকালের মত নিরবধি বারি ঝরে পড়ছে।

তখন দেবী আইসিস অনুচ্চ অথচ সুমিষ্ট স্বরে বলেন—হে স্বর্গীয় পিতা, আপনি আমাকে আপনার প্রকৃত নামটি বলে দিন। কারণ প্রত্যেকেরই তো নিজস্ব একটা নাম থাকে।

দেবতা রা তখন বললেন—আমিই সে, যে স্বর্গ সৃষ্টি করেছে, যে সৃষ্টি করেছে মর্ত্য। আমিই এইসব উত্তুঙ্গ পর্বতরাজির সৃষ্টিকর্তা। আমি জীব-জগতের স্রষ্টা। আমি অগাধ জলরাশি সৃষ্টি করেছি। বড় বড় নদ-নদীও আমার

দ্বারা সৃষ্ট। আমিই সর্বত্র ঈশ্বরের আত্মা প্রতিষ্ঠা করেছি। আমিই সে যে আঁখি মেললে আলোয় উৎপত্তি হয় আর আঁখি নিমীলিত করলে ঘোর তমসা নেমে আসে। নীলনদের বারিরাশি আমারই আদেশে বয়ে চলে। কিন্তু কোন দেবতা আমার প্রকৃত নাম জানে না। আমিই দিবস এবং তার প্রহরগুলির সৃষ্টিকর্তা। আমি বৎসরের সৃষ্টি করেছি এবং সেইসঙ্গে এনে দিয়েছি বন্যা। অগ্নির উৎপত্তি হয়েছে আমারই শক্তিতে। আমি প্রভাতের চেপার আর মধ্যাহ্নের রা। আবার দিনের শেষে আমি অতমু।

কিন্তু বিষক্রিয়া বন্ধ হল না এবং মহান দেবতার শরীর একটু একটু করে আরও নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

দেবাধিপতির অবস্থা দেখে আইসিস তাঁকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলেন—আপনি আমাকে যেসব নামের কথা বললেন, সেসব আপনার প্রকৃত নাম নয়। আমাকে আপনার আসল নামটি বলে দিন, তাহলে আপনার বিষ সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাবে। কারণ আসল নামে সবাই যাকে ডাকে, শুধু সে-ই জীবিত থাকে।

বিষ তীব্রভাবে জ্বলতে থাকে রা-এর সর্বদেহে। যেন আগুন জ্বলছে। তিনি আর সহ্য করতে পারেন না। তিনি দেবী আইসিসকে তাঁর নাম প্রকাশ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে যাদুবলে তাঁর সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হয়। সুস্থ হলেন তিনি। স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন।

কিন্তু তবু বৃদ্ধ সূর্যদেবতা যেন তাঁর পুরেনো শক্তি, তেজ আর প্রতিপত্তি ঠিক ফিরে পেলেন না। এমন কি মানবজাতি পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করল। তখন রা বাধ্য হয়ে তার প্রতিবিধানে ব্যাপৃত হলেন। তিনি তাঁর অনুগতদের বললেন—ডেকে আনো আমার চক্ষুদেবী হথোরকে। ডাক শু আর তেফনুতকে। গেব আর মুতকেও ডাক। ডেকে আন আমার দেবলোকের মাতা-পিতাকে যাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন, যখন আমি গভীর সমুদ্রে অন্তর্লীন ছিলাম। আদিতম সমুদ্রের দেবতা নুনকেও আহ্বান করে আন। তাঁকে তাঁর অনুচর-বৃন্দদের সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বল। তাঁকে খুব চুপিচুপি আসতে বলতে হবে। কারণ মনুষ্যজাতি টের পেলে পালিয়ে যাবে। তাঁরা সবাই আমার এই বিশাল প্রাসাদে আসুন এবং এসে আমাকে পরামর্শ দিন।

তখন তাঁরা সবাই একে একে এসে উপস্থিত হলেন। এসে দেবতা রা-এর দুই পার্শ্বে আভূমি নত হয়ে মুখমণ্ডল দ্বারা ভূমি স্পর্শ করলেন। তখন রা দেবলোকের পিতাকে তাঁর অভিলাষের কথা বললেন। কারণ পিতাই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে এবং তিনিই সৃষ্টি করেছেন জ্ঞানকে।

সেই সময় অমেনমেস লক্ষ্য করে হেকারনেহেহ্ এই অপূর্ব কাহিনী শোনাতে শোনাতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য তাঁর বক্ষপিঞ্জর প্রবলভাবে ওঠানামা করছে। মনে হয় বুঝি এখনি হৃদ্‌পিণ্ড ছিটকে বাইরে বের হয়ে এসে সব স্তব্ধ করে দেবে।

উয়াচমেস ব্যস্ত হয়ে পরিচারককে বলে—একপাত্র পানীয় নিয়ে এস। শিগগির।

পরিচারক ছুটে চলে যায়। একটু পরেই সে অপর এক নফরকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তার হাতে পানীয়।

হতশেপসুত সেই পানীয় নিজে তার সম্মানীয় শিক্ষাদাতার মুখের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু হেকারনেহেহ্ যে অন্ধ একথা ভুলে যায় মুহূর্তের জন্য। খেয়াল হয় তার, যখন ওষ্ঠপ্রান্তে পানীয়ের পাত্র নিয়ে গেলে তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকেন।

—আপনার জন্য পানীয় এনেছি। এই যে ঠোঁটের কাছে। পান করুন।

এই সমবেদনা আর শ্রদ্ধার স্পর্শ পেয়ে অক্ষিগোলকহীন স্থানটি থেকেও অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কি করে পড়ল? বুঝতে পারে না হতশেপসুত। কারণ তার ধারণা ছিল অশ্রুর উৎপত্তিস্থল হল নয়ন। নয়নহীন ব্যক্তির অশ্রু আসে কোথা থেকে?

হেকারনেহেহ্ একটু পান করে পাত্রটি সরিয়ে নিতে ইঙ্গিত করে বলেন—গলাটা বোধহয় শুকিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের বিব্রত করলাম।

—না। বরং আপনি অসুস্থ জেনেও, এভাবে আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমাদের উচিত হয়নি। গর্হিত কাজ করে ফেলেছি।

হেকাকনেহেহ্-এর কণ্ঠে অতীতের দৃঢ়তা। তিনি বলেন—না, একটুও অন্যায় করনি। তোমাদের দাবী রয়েছে আমার কাছ থেকে জেনে নেবার।

অমেনমেস বলে—ঠিক বলেছেন। কিন্তু আজ আপনার বিশ্রাম দরকার। আমরা বরং—

—না। আমি আজই কাহিনী শেষ করব। এইটিই আমার শেষ কর্তব্য। এটি এমন এক কর্তব্য, যা অন্য জগতের দিকে যাবার সময় আমার মন এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে থাকবে। শিক্ষাদান যে কত সুখময় তোমরা জান না।

উয়াচমেস বলে—বেশ, আপনি বলুন। কিন্তু তার আগে চিকিৎসক এসে আপনাকে একবার দেখে যাক।

—প্রয়োজন নেই। তোমরা চুপ করে শোন। অযথা সময় নষ্ট করার সময় নেই আমার। তেমন মনে করলে প্রাসাদে ফিরে গিয়ে চিকিৎসক পাঠিয়ে দিও।

তিনি কাহিনীর সূত্র ধরে বলেন ঃ

তখন রা নুনকে বলেন—হে দেবাদিদেব নুন, আপনার থেকেই আমার উৎপত্তি। আর বাকী আপনারা যাঁরা রয়েছেন সবাই অন্যসব দেবতার আদি পুরুষ। আপনারা দেখুন, যে মানবজাতির সৃষ্টি আমার চক্ষু থেকে তারাই আজ আমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আপনারা বলুন, ওদের বিরুদ্ধে আপনারা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। কারণ আপনাদের বক্তব্য শোনার পরই আমি সিদ্ধান্ত নেব যে ওদের বিনাশ করব কি না।

তখন দেবাদিদেব নুন বলেন—হে আমার পুত্র রা, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তুমি তাঁর চেয়েও মহৎ। তুমি তোমার সিংহাসনে পূর্বের মতই আসীন থাক। কারণ যারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্তে মত্ত, তুমি একবার যদি তাদের

ওপর নেত্রপাত কর তাহলে তাদের চিত্তে তোমার প্রতি নিদারুণ ত্রাসের সঞ্চার হবে।

তখন রা বলেন—ওই দেখুন, ওরা সবাই কিরকম পর্বতের দিকে ধেয়ে চলেছে সেখানকার কন্দরে আশ্রয় গ্রহণের জন্য। কারণ তাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে।

তখন সকল দেবতা তাঁকে বলেন—আপনার নয়নদ্বয় থেকে অগ্নিবর্ষণ করুন, যাতে ঘৃণ্য চক্রান্তকারীরা নিমেষে বিধ্বংস হয়ে যায়। হথোর দেবী মর্ত্যে নেমে যান। তিনি পর্বতে গিয়ে ওদের বশীভূত করুন।

রা তখন বলেন—তবে তুমি যাও হথোর। শান্ত চিত্তে যাও।

দেবী হথোর তখন বলেন—মনুষ্যজাতিকে বশীভূত করা আমার পক্ষে ভালই হবে।

রা তখন তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন—না না, আমিই তাদের বশীভূত করে বিনষ্ট করব।

হেকারনেহেহ্ এই সময় একটু থেমে বলেন—দেবতা রা-এর এই শেষ উক্তি আমাদের দেশের ঈশ্বরতত্ত্বের বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রা দেবীকে বলেছিলেন, মনুষ্যকুলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে। সেইজন্য দেবী হথোর সেইদিন থেকে একটি দ্বিতীয় নামে পরিচিতা হলেন। সেই বাড়তি নামটি হল সেখমেত। এই সেখমেত দেবী আমাদের সিংহমুখী দেবীরূপে খুবই পরিচিত। হথোর কত শান্ত কত সুন্দর। অথচ এই রূপ ধারণ করলে তিনি অত্যন্ত রাগী এবং রক্তের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে ভালবাসেন।

তাই নিশাকালে হথোর সেখমেতের রূপ ধরে ধরিত্রীর বুকে নেমে আসেন এবং পাপীদের ধ্বংস করতে শুরু করেন। এমনকি যারা নদী বেয়ে ওপরে পর্বতের দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হল তারাও পরিত্রাণ পেল না। দেবী এত প্রচণ্ড-ভাবে ক্রোধান্বিত হলেন যে সমগ্র চেনেনসুতান নগরীতে রক্তের স্রোত বইতে থাকে। রা সব দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। মানবজাতির কিছুটা অংশ অন্তত বাঁচাতে হবে।

তিনি তখন আদেশ করলেন—আমার কাছে দ্রুতগামী দূত এনে দাও। আমি যাতে তাদের দেহের ছায়ায় মত পাঠাতে পারি।

এইরকম দূতদের রা-এর সামনে হাজির করা হলে তিনি বলেন—শীঘ্র নীচের ওই দ্বীপে যাও। দেখতে পাচ্ছ? ওখান থেকে আমার জন্যে প্রচুর পরিমাণে ডাডা ফল নিয়ে এস।

তারা অসংখ্য ডাডা ফল এনে দিলে তিনি সেগুলো হেলিওপোলিসে দেবতা সেকতেত-এর কাছে পাঠালেন গুঁড়ো করে দেবার জন্য। যখন ক্রীতদাসরা যব পিষে সুরা প্রস্তুতের জন্য তৈরী হচ্ছিল তখন ডাডা ফলের চূর্ণ আর মনুষ্য-রক্ত সুরা পাত্রের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হল। এইভাবে সাত হাজার পাত্র অনুগ্র সুরা প্রস্তুত করা হল।

তারপর উপর ও নীচ উভয় মিশরের একচ্ছত্রাধিপতি দেবতা রা অন্যান্য

দেবতা সমভিব্যাহারে যখন সুরা পরিদর্শনে এলেন তখন নিশাবসান হতে চলেছে। প্রত্যুষের অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল হথোর দেবী উপরের দিকে পলায়মান মানুষদের হত্যা করে চলেছেন।

দেবতা রা বললেন—আমি মনুষ্যজাতিকে ওর হাত থেকে রক্ষা করব।

তিনি আরও বলেন—যেখানে হথোর মানুষ হত্যা করছে সেখানে এই সুরা নিয়ে চলে যাও।

তারপর সূর্য ওঠার প্রাক্কালে এই সুরাপাত্রের সুরা ঢেলে দেওয়া হল। সুরার স্রোত শস্যক্ষেত্র প্লাবিত করল। তারপর দেবী হথোর প্রভাতে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন সমস্ত ক্ষেত্র প্লাবিত আর সেই সুরার ভেতরে আরশির মধ্যেকার মত তার নিজের সুন্দর মুখখানি প্রস্ফুটিত পদ্মের মত প্রতিবিম্বিত। তিনি তখন সেই সুরা পান করলেন এবং তৃপ্ত হলেন। পানোন্মত্ত অবস্থায় তিনি ঘোরাফেরা করলেন। কিন্তু নেশার ঘোরে মনুষ্যজাতিকে আর চিনতে পারলেন না।

এইভাবে দেবতা রা মনুষ্যজাতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু এই বিষয়ে তিনি তৃপ্তি পেলেন না। হৃদয় তাঁর ব্যথিত ও পরিশ্রান্ত বলে মনে হল। তিনি তখন স্বর্গে বিশ্রাম নিতে চললেন। তিনি জ্ঞানের দেবতা থথকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করলেন। পৃথিবী পরিত্যাগের পূর্বে তিনি ধরিত্রী দেবতা গেবকে ডাকলেন এবং তাঁকে সর্প ও কীটপতঙ্গ বিষয়ে সাবধান করে দিলেন। কারণ তিনি নিজে ভুক্তভোগী।

এতক্ষণে হেকারনেহেহ্ থামলেন। এবারে নিজে থেকে পানীয় চাইলেন। সেটুকু পান করে বললেন—এখন কি সন্ধ্যা হয়েছে?

হতশেপসুতরা পরস্পরের দিকে চাইল। কারণ তখন অনেক রাত হয়েছে।

অমেনমেস বলে—সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে।

ব্যস্ত হেকারনেহেহ্ বলে ওঠেন—এতক্ষণ বলনি তো? এত রাত অবধি তোমাদের থাকা উচিত হয়নি।

—আমাদের দেহরক্ষী রয়েছে।

বৃদ্ধ কিছুটা নিশ্চিন্ত হন। এবারে তাঁকে সত্যই পরিশ্রান্ত বলে মনে হয়। তিনি বলেন—যেটুকু শুনলে তারপরই শুরু ওসিরিসের কাহিনী। সেই কাহিনী তোমাদের অজানা নয়। আরও অজস্র সব কাহিনী রয়েছে। আমাদের মিশর দেশ যেমন মহান, তার দেবদেবীও তেমনি মহান। তাঁদের সংখ্যা অগণিত। আমি তো তোমাদের এ জীবনে সব কথা বলে যেতে পারলাম না।

একটু পরে অমেনমেস বলে—আজ আমরা তাহলে আসি।

—হ্যাঁ এস। ভাল থাকলে আর একদিন নাহয় বলব।

বাইরে এসে অমেনমেস বলে—পরে আর আসা হবে না।

উয়াচমেস বলে—কেন?

—সুযোগ হবে না। দুদিনের মধ্যেই উনি চলে যাবেন।

—আবার আরম্ভ হল।

এ কথার উত্তর দেয় না অমেনমেস।

হতশেপসুত বলে—পুনর্জন্মের কথা শোনা হল না।

অমেনমেস বলে—সে আর বেশী কি? আমি বলে দেব।

—তুই সত্যি জানিস?

—জানি মোটামুটি। সেটা কোন কাহিনী নয়।

—তাহলে প্রাসাদে ফিরতে ফিরতেই শুনে নিতে পারি।

—হ্যাঁ, পার বৈকি।

—বল্ তবে।

শকটে চেপে অমেনমেস বলে—মৃত্যুর পরেও যে মানুষের অস্তিত্ব থাকে একথা মিশরের প্রতিটি নরনারী বিশ্বাস করে। তোমরাও কর নিশ্চয়।

উয়াচমেস একটু নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে—এটা নতুন কথা নয়।

—কিন্তু মৃত্যুর পরে তারা কোথায় কিভাবে থাকে, সেই ধারণা আছে তোমাদের?

হতশেপসুত আর উয়াচমেস এবারে উত্তর দিতে পারে না।

অমেনমেস তখন বলে—সব মিশরীয়দের মধ্যেই এই দ্বন্দ্ব। কেউ ভাবে, মৃত্যুর পরে মানুষ গাছের ডালে পাখিদের মধ্যে গিয়ে বসে। আবার কারও কারও বিশ্বাস সে এই পৃথিবীতেই থেকে যায়, যেখানে তার দেহের অস্থিগুলো শায়িত থাকে। পুরাকালে আমাদের দেশের একশ্রেণীর মানুষ বিশ্বাস করত মৃত্যুর পরে মানুষ তার ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণ করতে পারে। কখনো সারস-পাখি, কখনো বা জলের ওপর প্রস্ফুটিত পদ্মের রূপ নেয়। আমাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করে মৃত্যুর পরে মানুষ চলে যায় দুয়াত-এ—আলোর রাজ্যে। এই দুয়াতেই বাস করেন দেবদেবীরা। তাঁরা এই সুখী মৃত ব্যক্তিকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করেন অত্যাশ্চর্য সব স্থানে। কৃষকেরা বিশ্বাস করে মৃত ব্যক্তিরা চলে যায় সেই দেশের কৃষিক্ষেত্রে যেখানে থথের গাছ হয় অনেক দীর্ঘ। তার উৎপাদন হয় অনেক বেশী। সেখানে গিয়ে কৃষকেরা কৃষিক্ষেত্র কর্ষণ করে, বীজ বপন করে। তারপর সারাদিন পরে সন্ধ্যায় পরিশ্রান্ত দেহখানা টেনে নিয়ে গিয়ে বসে ডুমুর গাছের নীচে। সেখানে ঘুঁটি দিয়ে ড্রাফ্‌ট্ খেলে।

অমেনমেস তার ভ্রাতাভগিনীর মুখের দিকে চাইতে গিয়ে দেখে বাইরের অন্ধকার শকটের ভেতরটা গ্রাস করেছে। দুজনার কারও মুখ তেমন দেখা যায় না। সে তখন বলে—কিন্তু একটা কথা কেউ কখনো বলেনি। মৃত্যুর পরে মানুষের ব্যক্তিত্ব একত্রিত হয় কি করে? ব্যক্তিত্বের তো অন্তত তিনটি ভাগ রয়েছে। যেমন দেহ, আত্মা, ভূত, তার মূর্তি আর তার প্রতিভা। এই প্রতিভাকেই বলা হয় কা। হ্যাঁ কা। এই কা-ই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি স্বাধীন পারলৌকিক সত্তা। এটি মানবদেহের অভ্যন্তরে থাকে। আর এই উপস্থিতিই মানুষকে নিরাপত্তা দেয়। এর প্রভাবে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ ঘটে। মানুষের পবিত্রতা, তার নির্মল আনন্দ সবকিছুই মানবদেহে কা-এর উপস্থিতির ফলে। কোন মানুষ এমনকি কোন দেবতাকেও তাঁর কা-এর অস্তিত্ব

ছাড়া কল্পনা করা যায় না। মানুষের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কা-ও বেড়ে ওঠে। শিশুর কা দেখতে ঠিক শিশুর মত। তার মাথার দুপাশে শিশুদের মতই দুই গুচ্ছ কেশ ঝুলে থাকে।

মৃত্যুর পরেও মানুষের কা প্রতিনিধিত্ব করে তার এই পৃথিবীতে। সে তখন অন্যভাবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। সেইজন্যই মৃতদেহকে সযত্নে রক্ষা করতে হয়, যাতে তার কা ইচ্ছামত দেহে প্রবেশ করতে পারে।

অমেনমেসের কথা শুনে ভাই বোন দুজনাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। এত গম্ভীর-ভাবে এমন জটিল বিষয়ে সে কখনো কিছু বলেনি আগে। কিন্তু উয়াচমেস কিছুক্ষণ পরে ভাই-এর কথা আর বুঝতে পারে না সহজভাবে। সে হাই তুলতে শুরু করে অন্ধকারের মধ্যে। হতশেপসুতের আগ্রহ কিন্তু অটুট।

সে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলে—কা-এর কথা তো শুনলাম। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে যে শোনা হচ্ছে না।

—হ্যাঁ, এইবারে বলব। কা-এর কথা বললে সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু কা-এর মত বা-এর কথাও একটু বলার প্রয়োজন আছে।

—বা ?

—হ্যাঁ বা। মানুষের আত্মা। তবে সাধারণত মৃতদেহকে ঘিরে বাইরে বাইরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এই বা-কে দেখতে একটি সাধারণ পাখির মত। কিন্তু তার মুখ মানুষের মত। মমির বক্ষলগ্ন করে রাখা হয় একে সমাধিস্থলে। সেখানে সে পক্ষবিস্তার করে মৃতদেহের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়।

—জানতাম না তো।

—আমিও কয়েকদিন আগে জেনেছি।

—কে বলল ?

—পরে বলব। এবারে পুনর্জন্মের কথা শোন।

উয়াচমেস শকটের গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শকট ধীরে ধীরে চলছে প্রাসাদের দিকে একটু ঘোরাপথে। হুতশেপসুতের নির্দেশে।

হতশেপসুত নিদ্রিত ভ্রাতার গা স্পর্শ করে হেসে বলে—সারাদিন কত কি করে। যুদ্ধবিদ্যা শেখে, শিকারে যায়, সাঁতার কাটে। একদণ্ডও চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

অমেনমেস একটু হেসে বলে—এত চঞ্চলতা, এত কিছু—সবই এক লহমায় স্তব্ধ হয়ে যায় মানুষের।

—ছি ছি অমেনমেস, এভাবে বলতে নেই। তুই একটা ঘোরের মধ্যে আছিস। আমি ফ্যারাওকে বলব তোর চিকিৎসা করাতে।

—আর দু'মাস পরে বলো। আমি বাধা দেব না। এই দুই মাস আমাকে নিজের মত থাকতে দাও। শোন, অনেক মনীষী বিশ্বাস করেন যে মানুষের মৃত্যু হলেও তার আত্মা অবিনশ্বর। যখন মানুষের দেহ বিনষ্ট হয়ে যায় তখন তার আত্মা অন্য কোন জীবজন্তুর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করবে। তারপর সে এক এক করে নানা প্রাণীর মধ্যে দিয়ে ঘুরতে থাকে। সেই প্রাণী ভূমিতে বিচরণশীল

হতে পারে কিংবা হতে পারে জলচর। আবার যে সব পাখি আকাশে উড়তে পারে তাদের মধ্যেও গিয়ে ঢুকতে পারে। এইভাবে দীর্ঘদিন দেহ পাল্টাতে পাল্টাতে শেষে এক সময়ে সে কোন সদ্যজাত মনুষ্যশিশুর দেহের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আর এই বিবর্তনের সময় হল তিন সহস্র বৎসর। কারও মৃত্যু হলে আবার মনুষ্য জন্ম ফিরে পেতে তার লাগবে তিন হাজার বৎসর।

হতশেপসুত হতাশ হয়ে বলে—তাহলে ?

—তাহলে কি ?

—এই যে এত সমাধিস্থল, শান্তিতে থাকার এত আয়োজন, দেবলোকে যাবার এত প্রলোভন—এসব কি মিথ্যা ?

—কে বলল মিথ্যা ? আমাদের দেশে যুগে যুগে নানা মনীষী জন্ম নিয়েছেন। তাঁদের নানা মত। তাই বলে আমাদের বিশ্বাস তো ভঙ্গুর নয়। তাছাড়া পুনর্জন্ম যদি সত্যিই কেউ চায় তাকে হয়ত তিন হাজার বৎসরই অপেক্ষা করতে হবে।

উয়াচমেস কি যেন বলে ওঠে।

অমেনমেস জিজ্ঞাসা করবে—কি বললে ?

উয়াচমেস জবাব দেয় না।

হতশেপসুত অন্ধকারে হাসতে হাসতে অমেনমেসের গা টিপে বলে—ঘুমের মধ্যে বকছে। কবে দেখব, ঘুমের মধ্যে যুদ্ধ করছে। তাহলে ভবিষ্যতে ওর কাছে শোয়া যাবে না।

অমেনমেসের হৃদয় বেদনার্ত হয়ে ওঠে। তবে এবারে সে নীরব থাকে। পৃথিবীতে সুখ আছে দুঃখ আছে। দুঃখই বোধহয় বেশী। তবু তার মধ্যে মানুষ জীবনটাকে উপভোগ করে। তবে ব্যক্তিগতভাবে সে সুখ-দুঃখের অতীত।

হতশেপসুত বলে—এখন বল্ এত জ্ঞান তোর হল কোথা থেকে। কোথায় শিখলি ?

—তার আগে কথা দাও কারও অনিষ্ট করবে না।

হতশেপসুত একটু চুপ করে থেকে বলে—বেশ। কথা দিলাম।

অমেনমেস বলে—আসলে কোন কারণেই হোক কেউ সামান্য কিছু বললে আমি অনেকখানি জেনে ফেলি। কেন এমন হয় জানি না। হঠাৎ কোন একদিন এর সূত্রপাত। কিন্তু ঠিক কবে থেকে সেকথা স্পষ্ট মনে নেই। আমি যেন সব স্পষ্ট দেখতে পাই। দিনের আলোর মধ্যে উটের সারি যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনি। তবে সবকিছুর জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়। আর সেই সাহায্য পেয়েছি পিমাই-এর কাছ থেকে। সে দেবক্রমে বেশ কিছু গুণীজনের সান্নিধ্যে এসেছিল এককালে। তাঁদের মুখে সে অনেক কিছু জেনেছে। মাথাটা পিমাই-এর খুব পরিষ্কার। কিন্তু লেখাপড়া করতে পারেনি। তুমি তোমার আমলে অতি সহজেই তাকে একটি উচ্চপদে বসাতে পারবে। আমি তোমাকে শুধু বলে রাখি, ওকে তাড়িয়ে দিও না। বরং ওকে তুমি কাজে লাগিও। উপকার হবে। ও বিশ্বস্ত, কুকুরের মত বিশ্বস্ত।

এক একটা সময় আসে যখন ফ্যারাও প্রথম থুথমসের কিছু ভাল লাগে না। পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চান তিনি। নারীর রূপও তখন তাঁকে টানে না। সঙ্গীতের সুরের মূর্ছনা বিরক্তিকর বলে মনে হতে থাকে। মরুভূমিতে মৃগয়ায় যাত্রার মধ্যে কোন উত্তেজনা খুঁজে পান না। তাঁর তখন মনে হয়, যদি সুদূর অতীতে চলে যেতে পারতেন, যদি সেই সময় জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে কত অতুলনীয় কীর্তি স্থাপন করতে পারতেন। যদি তিনি নৃপতি জোসের হয়ে জন্মাতেন, তাহলে প্রথম পিরামিড স্থাপনের গরিমায় গৌরবান্বিত হতে পারতেন। নিদেনপক্ষে হিকসোসদের বিতাড়ন করে কামেসের মত প্রসিদ্ধিও লাভ করতে পারতেন। এত বয়স হল এখনো পূর্ষন্ত নুবিয়া অভিযান এবং একবার মাত্র পূর্ব দেশে যাওয়া ছাড়া জীবনে বিশেষ আর কি করলো। পিরামিড নির্মাণ এখন কল্পনা করা যায় না। অত শ্রমিককে একসঙ্গে পাওয়া অসম্ভব। পিরামিডের যুগ বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছে। কারণ তাহলে নির্মম অত্যাচার চালাতে হয় শ্রমিকদের ওপর। কৃষকদের বঞ্চিত করতে হয় তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে। হিকসোসদের বিতাড়ন করার পর সেটা অসম্ভব। তিনি বুঝতে পারেন না দেশবাসীরা তাঁকে কোন্ চোখে দেখে। তবে তাদের ব্যবহার বা কথাবার্তায় বোঝা যায় তাদের কাছে তাঁর সম্মান অটুটই রয়েছে। তবু খেদ থেকে যায়। সক্কারার সেই ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া পিরামিড মিশরের মতই অক্ষয় অবিনশ্বর। সেই সঙ্গে নৃপতি জোসার। তিনি এবং তাঁর শিল্পীরা ওই সৃষ্টির মধ্যে যেন মিশরের অন্তরাত্মার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। মিশরের প্রকৃতি, তার ঋতু, তার মানুষের কল্পনা সবকিছুরই বহিঃপ্রকাশ যেন ওই সৃষ্টি। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর প্রকাশ। একদিকে খাড়া পর্বতচূড়া অন্যদিকে দিগন্তের সঙ্গে সমান্তরাল পাললিক শিলাময় অঞ্চল, একদিক সুবিস্তীর্ণ ধূধূ মরুভূমি, অন্যদিকে নীলনদ তীরবর্তী পলিময় উর্বরক্ষেত্র, একদিকে জ্বালাময় চোখ-ঝলসান সুতীব্র সূর্যরশ্মি, অপরদিকে তারই দ্বারা সৃষ্ট গভীর শান্ত বৃক্ষছায়া, একদিকে শুষ্কতা, অন্যদিকে হঠাৎ ধেয়ে আসা নীলনদের বন্যা—সব কিছুর মধ্যেই একটা স্পষ্টতা, একটা ঋজুতা পরিদৃশ্যমান। কোথাও কোন রহস্য লুকিয়ে নেই, নেই কোন অহেতুক নম্রতা। পিরামিড যেন সব কিছুরই প্রতীক। থুথমস একথা ভেবে নিজেই বিস্মিত হন। কতবার তিনি তাই পিরামিডগুলি পরিদর্শন করেছেন। প্রিয় কন্যা হতশেপসুতকেও বলেছেন, ওই-গুলির মধ্যেই নিহিত রয়েছে মিশরের প্রাণ, তার সংস্কৃতি, তার সব কিছু। সে যেন এই পিরামিডগুলির ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানার চেষ্টা করে। হতশেপসুত আগ্রহের সঙ্গে সম্মত হয়েছে।

থুথমস জানেন, প্রকৃত মিশরীয়দের মত তিনিও স্থায়ীত্বের পক্ষপাতী। ক্ষয়িষ্ণু কোন কিছুর প্রতি তাঁর আকর্ষণ নেই। কোন মিশরবাসীরও নেই। তাই যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষ এমন কিছু সৃষ্টির স্বপ্ন দেখে আসছে যা হবে চিরন্তন। তারা যদি পাথরের মূর্তি নির্মাণ করে, কোন মন্দির কোন সমাধিস্থল

তারা তৈরী করে তাহলে তা এমনভাবে করার চেষ্টা করে যা থাকবে অপরিবর্তনীয়, আকাশেব তারার মত চিরস্থায়ী। তাই তারা জীবনকে করতে চায় অব্যয়।

জোসের একদিন দেশের মানুষের অন্তরের বাণী শুনতে পেয়েছিলেন। নিজের মনের আকুলতার সঙ্গে তার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। তাই স্বপ্ন দেখতে দেখতে একদিন স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন। তারই ফলে ওই পিরামিড।

আবানা-পুত্র অহমেসের কয়েকটি মন্তব্য মাঝে মাঝে উঁকি দেয় থুথমসের মনে। মানুষটা ছিল বিরাট। সে বীর যোদ্ধা ছিল। সে ছিল দেশপ্রেমিক। তার মৃত্যু পরিণত বয়সে হলেও মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। কারণ অনেকেই খবর রাখত না যে আবানা-পুত্র যথেষ্ট পড়াশোনা করত। প্রাসাদের পাঠাগারে সবার অগোচরে বসে সে অনেক কিতাব ঘাঁটাঘাঁটি করত।

একদিন থুথমস পাঠাগার থেকে তাকে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখে হেসে প্রশ্ন করেছিলেন—অনেক তো বয়স হল। সারা জীবনটা শুধু নিজের ঘাম আর রক্ত ঝরিয়ে কাটিয়ে দিলেন। এবারে একটু বিশ্রাম নিন। আমি কিছু ক্রীতদাস দেব আপনাকে।

—না প্রভু। অনুগ্রহ করে ক্রীতদাস দেবেন না। তাহলে আমি অলস হয়ে পড়ব।

এই কথাগুলোর মধ্যে ঝরে পড়েছিল আকুল এবং কিছুটা ভীতিও।

—বেশ। কিন্তু এই বয়সে এত কি পড়াশোনা করছেন?

হেসে সে উত্তর দিয়েছিল—মরুভূমির বালুকারাশির মত অফুরন্ত এ ভাণ্ডার। শেষ নেই। তবে আমি যা পড়ি, দুদিন পড়েই ভুলে যাই। বৃদ্ হয়েছি ফলে সবকিছু মনে থাকে না। তবু একটি জিনিস সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি।

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। থুথমস বলেন—চলুন, ওই কোণা শীতল রয়েছে। একটা ডুমুর গাছের ছায়া পড়েছে ওখানে। হাওয়াও বইছে পাতাগুলো নড়ছে। চলুন ওখানে গিয়ে আপনার আবিষ্কারের কথা শুনি।

অহমেস তখন বলেন—আমি মোটামুটি জেনে সিদ্ধান্তে এসেছি যে আমাদের সভ্যতা যতই প্রাচীন, যতই মহান হোক না কেন, আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চিরকাল ভঙ্গুর।

—ভঙ্গুর! আমাদের এত সৈন্য, এত যুদ্ধ করেছি আমরা, তবু একথা আপনার মনে হল কেন?

—আমি যা উপলব্ধি করেছি, আপনাকে বললে কিছু মনে করবেন কি?

—না কখনো না। আপনার সব কিছু বলার অধিকার আছে। আপনা দেশপ্রেম প্রশ্নাতীত।

—শুধু আপনাকেই তাই কথাটা জানিয়ে দিতে চাই। আপনাদে অনুগ্রহে যুদ্ধের জন্য বারবার বাইরে গিয়ে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়ে

তারই ফলে এই সিদ্ধান্তে এসেছি।

—বলুন।

—প্রথমেই বলে রাখি আমাদের ওপরের দিকের তাম্রখনিতে নিরবচ্ছিন্ন কাজ হয়ে চলেছে। কত শ্রমিক পরিশ্রম করছে সেখানে। আমাদের এই যে গগনচুম্বী পিরামিডগুলি গর্বিত মস্তকে দাঁড়িয়ে রয়েছে এইসব কীর্তি প্রতিষ্ঠাকেও অনেক ঘাম ঝরাতে হয়েছে, অনেক প্রাণও বলি দিতে হয়েছে। কিন্তু আপনি নিশ্চয় মানবেন যে নুবিয়ার খনির অধিকাংশই হল ক্রীতদাস এবং আরও ওপর দিকের কৃষ্ণকায় মানুষের দল। পিরামডেও ক্রীতদাসরাই ছিল মুখ্য।

থুথমস গম্ভীর হয়ে মাথা হেলিয়ে বলেন—সে কথা সত্য।

—আমাদের দেশের মানুষেরা নিশ্চয় কৃষিকাজ করে, শস্য ফলায়। কিন্তু হাপি দেবতার আনুকূল্যে প্রধানত পলিমাটির দাক্ষিণ্যে তাদের কৃষিকাজ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। আমি দেখেছি পুবের দেশে কী অমানুষিক পরিশ্রম করে ওদেশের মানুষেরা ফসল ফলায়। পাথুরে জমিকে বীজ বপনের উপযুক্ত করে তুলতে তারা দিনের পর দিন ভূমি কর্ষণ করে। সেই কর্ষণে যে নিদারুণ পরিশ্রম আমাদের কৃষকেরা তা কল্পনাও করতে পারবে না। ফলে তারা ওদের মত পরিশ্রমী নয়। আমাদের সাধারণ মানুষও বেশীমাত্রায় আরামপ্রিয়। এর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের অনেকবার ভুগতে হয়েছে।

—এতদিন পরে আপনি এসব কথা বুঝতে পারলেন ?

—হ্যাঁ প্রভু। সত্যিই তাই। আগে এগুলোকে স্বাভাবিক বলে ভাবতাম। মনে হত, মানুষে এর চেয়ে বেশী পরিশ্রমী হতে পারে না। চোখ খুলল, যখন বারবার দেশের বাইরে যেতে হল। আর জ্ঞান হল, যখন কিতাবগুলো পড়লাম। এর জন্য কিন্তু আমাদের দেশবাসী একটুও দায়ী নয়।

কৌতূহলী ফ্যারাও প্রশ্ন করেন—কি রকম ?

—আমাদের দেশের নীচে সমুদ্র। সমুদ্রের ওপরের দেশ থেকে এসে এ দেশ আক্রমণ করা সহজসাধ্য নয়। তাই আমরা সেদিক থেকে নিরাপদ। আমাদের ওপরে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে নুবিয়ার পরে যেসব দেশ রয়েছে তারা মোটেই সঙ্ঘবদ্ধ নয়। বলতে গেলে স্থায়ীভাবে বসবাসও করে না কোন জাতি। এক-কথায় তারা ভাসমান জাতি। তাই ওদিক থেকেও আমাদের বিপদের সম্ভাবনা নেই। আমাদের পশ্চিমে মরু অঞ্চল। সেই দুস্তর মরু পার হয়ে আসা বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব। আমাদের পূর্বেও মরু। এখানে বেদুইনদের বাস। ওরা ব্যাপকভাবে মিশর আক্রমণ করার কথা কল্পনাও করেনি কোনদিন। তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি ওরা। মাঝে মাঝে শুধু দল বেঁধে এসে চড়াও হয়ে লুটপাট করে চম্পট দেয়। তাই ওরা আমাদের দেশের পক্ষে কখনো বিপদের কারণ হতে পারে না। তারও পরে কিছু দেশ রয়েছে। তারা বেশ শক্তিশালী। আমাদের যেটুকু বিপদের আশঙ্কা, পুব দিক থেকে। ওদের সৈন্যবাহিনী রয়েছে। মনে হয় বেশ শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী। তাছাড়া ওরা লৌহের ব্যবহার জানে, আমরা আজও যা জানি না। তবে এতটা পথ অতিক্রম করে আসা বেশ কষ্টসাধ্য। তবু

তারা পরাক্রমশালী। তাই যতবার সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ হয়েছে মিশরের ওপর, আমরা পরাজিত হয়েছি। এই বাস্তবকে আমি অস্বীকার করতে পারি না প্রভু। ওইসব দেশকে অন্ধকারের দেশ বলে চোখ বুঁজে থাকা মনে হয় মারাত্মক ভুল হবে। অন্ধকার থেকেই বিপদের সূত্রপাত বেশী হয়। সেই অন্ধকারের আর এক অর্থ অন্ধত্ব বা অজ্ঞতা।

অহমেস তার বক্তব্য শেষ করার পর বহুক্ষণ একইভাবে বসেছিলেন থুথমস। তারপর মুখ তুলে আবানা-পুত্রের দিকে চেয়ে বলেছিলেন—আপনার উপলব্ধি যথার্থ। আমাদের দেশবাসীর স্বভাব তাড়াতাড়ি পালটান সম্ভব হবে না। কিন্তু একটা শক্তিশালী সেনাদল গড়ে তুলতে ক্ষতি কি? সত্যই তো, হিকসোসরা চলে গিয়েছে বলে আবার যে তারা কিংবা অন্যেরা আক্রমণ করবে না এমন কোন কথা নেই। দেশবাসী যতই আয়েসী হোক, তারা যে দেশকে ভালবাসে হিকসোসদের বিরুদ্ধে তাদের একযোগে উত্থানই তার প্রমাণ। তাই বড় সৈন্যদল থাকলে কাজে লাগবে।

অহমেসের চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে। সে বলে—আপনি যথার্থ বলেছেন। আপনি দেবতা। তাই কত স্বচ্ছ আপনার দৃষ্টি। আপনি হোরাস, তাই সাধারণ মানুষের চেয়ে কত উঁচুতে।

এরপর থেকেই থুথমস সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার কাজে মন দেন। কিন্তু দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। সেদিকেও নজর দিতে হচ্ছে। তাছাড়া নীলনদেরও মতিগতি মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। তার রাজত্বকালে এ পর্যন্ত দু'বার বন্যা হয়েছে, দু'বার খরা। এতে সবকিছু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কৃষকেরা হাপি দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে বটে। কিন্তু তাদের মধ্যে সবাই তো আর সমান শ্রদ্ধান্বিত নয় দেবতার প্রতি। অনেক অল্পবয়সী তরুণ বেপরোয়া কোন কাজ কিংবা দেবতার মনে রোষ জাগাবার মত কিছু করে ফেলে। তখনি আসে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর সেই প্রলয়ঙ্কর বন্যা। দু'কূল প্লাবিত করে বহু দূর পর্যন্ত হুহু করে ছোটে সেই জলরাশি সবকিছু গ্রাস করতে করতে।

থুথমসের মনের মধ্যে অতীতের অনেক ঘটনার কথাই একবার ভেসে ওঠে, আবার তলিয়ে যায়। কোনটাই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। কারণ মন তাঁর স্থির নেই, কিছুই ভাল লাগছে না। যখনই এমন হয়, তিনি চলে যান হারেমে সুন্দরী ললনাদের মধ্যে। সেখানে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চান। অনেক সময় ফেলেনও। কিন্তু আজ নারী সংস্পর্শের কথাও মনের মধ্যে এতটুকুও আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারছে না। তিনি এই বয়সেই বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন? দেবতার অংশ তাঁর মধ্যে সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও তিনি কি এত তাড়াতাড়ি অক্ষম হয়ে পড়লেন? বিশ্বাস হয় না। তবে দেবতারাও তো বৃদ্ধ হন—একথা সবাই জানে। তবে আজকের এই নারীসঙ্গলিপ্সায় অনাগ্রহের অন্য কোন কারণ রয়েছে। সেই কারণ যে কি, তিনি নিজেই বুঝে উঠতে পারছেন না। বুঝলে তো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত এতক্ষণে।

প্রাসাদের ভেতরের উদ্যানের দিকে দৃষ্টি ফেলেন তিনি। অতি মনোরম

উদ্যান। একে এভাবে রাখা খুবই পরিশ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। ফ্যারাও ব্যতীত মিশরের মাত্র কতিপয় অত্যন্ত বিত্তশালী ব্যক্তি এভাবে উদ্যানের পরিচর্যা করতে পারে। কারণ এখানকার প্রকৃতি সব কিছুকেই পুড়িয়ে খাক করে দিতে চায়। নীলনদের জলরাশি এর পূর্ণ শ্যামলিমা রক্ষার্থে সক্ষম নয়। তাই এই রাজকীয় উদ্যান অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন। যৌবনের শুরু থেকেই এই উদ্যানের নানান প্রান্তে নানান বৃক্ষের অন্তরালে তাঁর প্রেমের পাঠ শুরু হয়। সেই সব নারীরা আজ কোথায়? জানেন না তিনি। অনেকে হয়ত ইহলোকে নেই। বেশ কয়েকজন নিশ্চয় বিগত-যৌবনা হয়ে হারেম থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। দু'একজন হয়ত প্রাসাদেই রয়ে গিয়েছে অন্য কোন তুচ্ছ কাজে নিযুক্ত থেকে। চিনতে পারেন না তিনি। চেনার চেষ্টাও করেন না—সম্ভবও নয়। তবে কিছু কিছু নারীর চোখে চোখ পড়তে একটা ঝিলিক দেখতে পান—শুষ্ক ওষ্ঠের কোণে মৃদু হাসির ছোঁয়া উঁকি দেয়। চিনি চিনি মনে হয়। কল্পনায় যদি ওই শুষ্ক ওষ্ঠকে যুবতীর পরিপূর্ণ ওষ্ঠরূপে ভাবতে পারতেন, তাহলে হয়ত সেই নারীকে চিনতে পারতেন। কিন্তু অত সব কষ্টসাধ্য কল্পনার প্রয়োজন নেই তাঁর। কারণ জীবনে নারীর অভাব ঘটেনি—ঘটবেও না কখনো। তাই অতীতের সুখস্মৃতি নিয়ে রোমন্থন করে সময়ের অপব্যয় করার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া ফ্যারাও-এর জীবন ব্যস্ততায় পূর্ণ। সেই প্রভাতে নিদ্রাত্থনের পর থেকে ব্যস্ততার শুরু। ফ্যারাও-এর জীবন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নয়। এই জীবন মিশরের ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফ্যারাও-এর জীবন ধর্মের জীবন—দেবতার জীবন।

মন খারাপের কারণের হদিশ করতে না পেরে ক্লান্ত চোখে উদ্যানের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সহসা তিনি দেখতে পান প্রিয় কন্যা হতশেপসুত উয়াচমেসের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বিষণ্ণতার মূলে পৌঁছে যান। বুঝতে পারেন, কেন এত মন-মরা হয়ে রয়েছেন। হতশেপসুত তার ভ্রাতা উয়াচমেসকে তার জীবনসঙ্গী রূপে পেতে চায়। অথচ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রয়েছে। সে তরুণ। হয়ত উয়াচমেসের মত তার বুদ্ধি, স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য নেই। তবু সে সবার চেয়ে বড়। তার গর্ভধারিণীর যোগ্যতা হতশেপসুতের মাতা অহমেসের মত নয় একথা ঠিক। কারণ মুতনেফার্ত নিজে রাজকন্যা নন। তাই তাঁর শুদ্ধতা অতটা নেই। তবু হতশেপসুত যদি তাঁর পুত্রকে বিবাহ করে তাহলে কোন ক্ষতি নেই। তাছাড়া তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁরই ঔরসজাত এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। কারণ সেই সময়ে মুতনেফার্তের রূপের আকর্ষণ তাঁর কাছে ছিল দুর্নিবার। রূপচর্চায় বাতিকগ্রস্ত প্রধানা মহিষীকে তাই বিচিত্র ধরনের প্রসাধন সামগ্রী এনে দিয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখতেন, যাতে মুতনেফার্তের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব অহমেসের নজরে না পড়ে। তবু হয়ত পড়ত। কিন্তু অহমেস তখনো দেহে এবং মনে পরিপূর্ণা নারী হয়ে ওঠেনি বোধহয়। যে কোন কারণেই হোক ফ্যারাও-এর প্রতি তাঁর অনুরাগ বা দেহের আকর্ষণ তেমন জন্মায়নি। যদি জন্মাত, তাহলে তিনিই হতেন প্রথম সন্তানের

জননী। তাছাড়া তাঁর বরাবরের সন্দেহ প্রধানা মহিষীর তাঁর প্রতি কোনদিনই তেমন আকর্ষণ নেই। মুতনেফার্তের দেহমন আগ্রহে যেভাবে আকুলিত হত, অহমেসের মধ্যে তেমন আগ্রহ কোনদিনও দেখেননি। ভাবতে সংকোচ হয়, পার্শ্বে শায়িতা সম্রাজ্ঞীকে তাঁর অনেক সময় মমি বলে মনে হত।

বিষণ্ণতার প্রকৃত কারণ হল তাঁর গোপন ইচ্ছা আর কন্যার প্রকাশ্য অভীপ্সার মধ্যে বিরোধ। তিনি জানেন, কন্যার জয় অবশ্যম্ভাবী। তাই তাঁর দুঃখ। হারেমে যাবার পথে অনেক সময় মুতনেফার্তকে না দেখার ভান করলেও সেইসব রজনীর কথা মনে পড়ে যখন বক্ষলগ্না নারীকে তিনি কতবার কথা দিয়েছেন, তার গর্ভে পুত্র জন্মালে সে হবে ভবিষ্যতের ফ্যারাও। তিনি জানেন, আজ এতদিন পরে সেই কথা না রাখলে মুতনেফার্ত তাঁকে কিছুই শোনাতে আসবেন না। মনের মধ্যে শত দুঃখ চেপে রাখলেও মুখ ফুটে কিছু বলবেন না। তবু কোথায় যেন কাঁটার মত বেঁধে। শত হলেও তিনি হোরাসের প্রতিনিধি। ওসিরিস আইসিস থথ থেকে শুরু করে সমস্ত দেবদেবী তাঁর ক্রিয়াকলাপের প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রয়েছেন। কত ছোট হয়ে যাবেন তিনি। তাই একটা অসহায়তা তাঁকে ঘিরে রয়েছে। একটা নির্মম সিদ্ধান্তে আসতে বিচলিত বোধ করছেন, যা জীবনে আর কখনো কোন অবস্থাতেও হয়নি। আজ যদি তাঁর মনে দ্বিধা না থাকত তাহলে গত হেব-সেদ ভোজের সময়ই তিনি হতশেপসুতের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম ঘোষণা করে দিতেন। কিন্তু পারেননি। অথচ সেদিন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এমনটি আশা করেছিলেন।

মনে মনে অহরহ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন তাই ফ্যারাও থুথমস। শধুমাত্র একটা যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করছেন যে জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগ্যতার দিক দিয়ে অতটা উচ্চমানের নয়। তার বুদ্ধির স্বল্পতা রয়েছে, পড়াশোনায় অমনোযোগী ছিল। তার বীরত্বের প্রকাশ কখনো ঘটেছে বলে মনে পড়ে না—যদিও মুখে তার লম্বা-চওড়া কথার অন্ত নেই।

কিন্তু এইসব যুক্তি তেমন খাটে না।

আজকের এই বিষণ্ণতা আগামীকাল প্রভাতে আর থাকবে না একথা এতক্ষণে বুঝতে পারেন থুথমস। আসলে নিজের বংশধরদের কথা ভাবতে বসলে নিজেকে বৃদ্ধ বলে মনে হয়। যৌবন চলে যেতে যেতে এখনো যে বেশ কিছুটা অবশিষ্ট রয়েছে সেকথা তাঁর মনে থাকে না।

মাথাটা একবার সজোরে ঝাঁকিয়ে নিয়ে দুই হাতে তালি দিয়ে এক লাফে ফ্যারাও উঠে দাঁড়ান আসন থেকে। আশেপাশের প্রহরীবৃন্দ সচকিতে ফিরে তাকায় তাঁদের প্রভুর দিকে। তিনি দৃকপাত করেন না। হারেমের দিকে এগিয়ে চলেন। পুত্রকন্যাদের জন্য মাত্রাতিরিক্ত ভেবে জীবনটাকে বিস্বাদ করে ফেলে লাভ নেই। তাদের মঙ্গল হয় সেই চেষ্টা করে যাবেন। বাকীটা অমন রা-এর ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

পিমাই এসে কনিষ্ঠ রাজপুত্র অমেনমেসের কক্ষে প্রবেশ করে। তখন সন্ধ্যা

হয়ে গিয়েছে। ভগিনী হতশেপসুত এবং ভ্রাতা উয়াচমেস তখনো সম্রাজ্ঞী অহমেসের কক্ষে। তিনি তাদের দুজনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। দ্বিপ্রহরে হেকারনেহের-এর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তারা মুহ্যমান হয়ে পড়ে। এক পক্ষকালের মধ্যে এমন ঘটতে পারে এ আশঙ্কা তাদের ছিল। বিশেষ করে অমেনমেস তাদের প্রস্তুত থাকতেই বলেছিল। তবু পৃথিবীতে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যাকে মেনে নিতে কষ্ট হয়। হেকারনেহের মৃত্যু সেই ধরনের ঘটনা। সেদিন অমেনমেসের সাবধান বাণী শুনেও তারা মনকে প্রবোধ দিয়েছিল যে অন্ধ হয়ে গেলেও তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং আরও কিছুদিন বেঁচে থাকবেন। কিন্তু তা হল না। দেবতাদের সেই ইচ্ছা ছিল না। তাঁরা অনেক সময় প্রিয় ব্যক্তিদের সরিয়ে নিয়ে যান এই জগত থেকে। নীলনদের অববাহিকা বরাবর তার গতিপথ ধরে সমান্তরালভাবে যে নীচের জগত রয়েছে এই জগত সেই জগত নয়। সেখানে স্থান পায় নিম্নমানের ব্যক্তিরা যাদের হৃদয় নির্মল নয়। কিন্তু হেকারনেহের-এর জগত ভিন্ন। তাঁর জন্য তিনি নিজেই অক্ষয় সমাধিস্থল নির্মাণ করে রেখেছেন। সত্তর দিন পরে সেইখানে তাঁর চিরন্তন স্থান হবে। ইতিমধ্যে নানান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নানান সুগন্ধি দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁর দেহকে সমাধি মন্দিরের উপযুক্ত করে তোলা হবে।

তাঁর মৃত্যুতে অমেনমেসের কিন্তু আদৌ দুঃখ হয়নি। ভগিনী ও উয়াচমেসের চোখে জল দেখে জিজ্ঞাসা করেছেন—কাঁদছ কেন? উনি তো সুখেই থাকবেন। তোমরা যখন যাবে ওখানে ওঁকে তখন দেখতে পাবে। এখানে এত কষ্ট পাচ্ছিলেন। ভালই হল তো।

অমেনমেসের কথায় তারা সান্ত্বনা পায়নি। তাদের অবস্থার কথা জেনে স্বয়ং সম্রাজ্ঞী বহুদিন পরে নিজের কক্ষে তাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে অমেনমেসও গিয়েছিল প্রথমে। কিন্তু মায়ের ওই মামুলি সান্ত্বনা বাক্য বিশেষ ফলবতী হয়েছে বলে মনে হয়নি তার। তবে মাতৃসান্নিধ্যের স্বতন্ত্র স্বাদ রয়েছে একটা। কাছে গিয়ে দুদণ্ড বসলেও আনন্দ হয়, তাই ওরা বসে ছিল? অমেনমেস কিন্তু তা পারেনি। সে জানে, আজ যেমন হেকারনেহের জন্য, একদিন পরে তার জন্যও কাঁদতে হবে এদের। সেবারে নিজেরাই ছুটে আসবে মায়ের কাছে। মায়ের আহ্বানের জন্য প্রতীক্ষা করবে না।

অমেনমেস উঠে দাঁড়াতে মা প্রশ্ন করেছিলেন—উঠছ যে?

—আমার ঘরে যাব। আমাকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজন নেই। দুঃখ হয়নি আমার।

মায়ের মুখে রীতিমত বিস্ময় ফুটে ওঠে। পুত্রের এই ধরনের কথায় তিনি মর্মাহত। তবে সম্রাজ্ঞীর শালীনতাবোধ তাঁকে সংযত রাখে। তিনি বলেন—তুমি সবে তরুণ হয়েছ। বুঝবার মত পরিণত হয়নি তোমার মন।

হতশেপসুত বলে ওঠে—ও আমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী বুঝতে পারে মা।

—হ্যাঁ। সেইরকমই তো শুনেছিলাম। অনেকে অনেক রকম কথা বলে ওর

সম্বন্ধে। কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা জানি না।

—সব সত্যি।

এবারে কনিষ্ঠ পুত্রের দিকে চেয়ে তিনি বলেন—সব জেনেশুনেও উঠছ কেন তবে?

—জানি বলেই তো দুঃখ হয়নি মা। তাছাড়া মৃত্যুকে যদি দুঃখ বলে মান, তাহলে পৃথিবীতে কি দুঃখের শেষ আছে? একদিন পরেই তো আবার কাঁদতে হবে। সেই কান্না আরও মর্মান্তিক।

সম্রাজ্ঞী পুত্রের এই উক্তিকে কথার কথা বলে ধরে নিলেও, হতশেপসুতের বুকে ধাক্কা লাগে। সে বলে—তুই একথা বললি কেন?

অমেনমেস এবারে বলে—আমি আমার ঘরে চললাম। কাল ভোরবেলা এক জায়গায় যেতে হবে।

হতশেপসুত তার হাত ধরে টেনে রেখে বলে—আগে বল্, একথা বললি কেন?

সম্রাজ্ঞী কন্যার ওপর বিরক্ত হয়ে বলেন—ওকে ছেড়ে দাও।

—তুমি জান না মা, ও যা বলে সব ফলে যায়।

মায়ের মুখে হাসি ফোটে। বলেন—বেশ তো, একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক্।

হতশেপসুত কিছু বলার আগেই ভগিনীর আলগা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অমেনমেস কক্ষ ত্যাগ করে।

পিমাই অমেনমেসের কক্ষে প্রবেশ করে দেখে সে একটি উচ্চ আসনে বসে সম্মুখে রক্ষিত একটি মূর্তির দিকে চেয়ে রয়েছে। মূর্তিটি মিশ্র ধাতু দ্বারা নির্মিত। দেহটি মানুষের মত, অথচ মাথাটি বাজপাখির। মস্তকে তাঁর শোভা পাচ্ছে উচ্চ ও নিম্ন উভয় মিশরের যুগ্ম মুকুট। পিমাই জানে ওটি দেবতা হোরাসের মূর্তি যিনি তাঁর পিতা ওসিরিসের হত্যার যোগ্য প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তাঁর খুল্লতাতের ওপর। মূর্তিটি অমেনমেসের খুব প্রিয়।

পিমাই অপেক্ষা করে। অনেকক্ষণ পরে অমেনমেস একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসে। সেই সময় পিমাই-এর দিকে দৃষ্টি পড়ে।

—কতক্ষণ?

পিমাই সে কথার উত্তর না দিয়ে বলে—কাল প্রত্যুষেই তাহলে?

—হ্যাঁ। দুটি অশ্বের ব্যবস্থা করেছ?

—করেছি। তবে তারা বলছিল, মরুভূমির ভেতরে যখন যাবেন, তখন উট নিয়ে যাওয়াই ভাল।

—ওইভাবে দুলতে দুলতে? পাগল নাকি?

পিমাই হেসে বলে—আমি জানি। বুঝিয়ে বললাম ওদের। তখন দুটি অশ্ব বেছে নিতে বলল।

—ভাল তো?

—হ্যাঁ প্রভু। রঙও চমৎকার। একটা সাদা আর একটা পাটকিলে রঙের।

—আমার পাটকিলেই পছন্দ। তুমি সাদাটা নিও।

—আমি ভোর হতে না হতে আপনাকে ডেকে দেব।

অমেনমেসকে রাতের খাবারের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে। তবে আজ নৈশভোজের পরই শুয়ে পড়বে। একটা কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল উত্তর পশ্চিমের মরু অঞ্চলে একটা অতি পুরাতন সমাধির সন্ধান মিলেছে। সেই সমাধিসৌধের ভেতরে সামান্য কয়েকটি দ্রব্য ব্যতীত আর কিছুই নেই। অথচ এমন কখনো হতে পারে না। প্রথমত মিশরে সমাধিসৌধ নির্মাণের জন্য সুন্দর সমস্ত স্থান রয়েছে। সেইসব স্থানকে অবজ্ঞা করে কোন নৃপতির সাধ হয়েছিল সুদূর মরু অঞ্চলে বিস্মৃতির আড়ালে চিরকাল নির্বাসিত থাকার? তিনি কি জীবনে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন, যার জন্য মনুষ্য বিবর্জিত স্থানে স্থায়ী শান্তির সন্ধান করতে চেয়েছিলেন? বলা কঠিন। কিন্তু এর চেয়েও মর্মান্তিক হল, সেখানেও তিনি স্থায়ী শান্তি পাননি। সেখানে সামান্য কয়েকটি আসবাব-পত্র ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাঁর দেহ হয়ত বিনষ্ট হয়েছে। তেমন হলে তাঁর রা কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে কে জানে? তাঁর রা-এরই বা কি গতি হল? তস্করেরা তাঁর সমাধিস্থল লুণ্ঠন করেছে বহুবছর পূর্বে। সেইসব তস্করেরা শাস্তি পেয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ সমাধিক্ষেত্রে চৌর্যবৃত্তির জন্য দেশের কঠোরতম এবং ভয়ংকরতম শাস্তি প্রাপ্য অপরাধীর।

কথাটা সত্য নিশ্চয়। নইলে এভাবে এমন অদ্ভুত কাহিনী রটবে কেন? রটনা করে লাভই বা কি? সেই থেকে অমেনমেসের মন উতলা। তার মন নিভৃতে কেঁদে চলেছে হতভাগ্য সেই নৃপতির জন্য। স্থির থাকতে না পেরে পিমাই বলেছিল তার উদ্দেশ্যের কথা। মনে মনে ভেবেছিল মৃত্যু যদি আসে তাহলে আধো আলোকিত কক্ষের মধ্যে তাকে বরণ না করে, রা-এর চক্ষুর সামনে মহৎ উদ্দেশ্যে বরণ করা অনেক শ্রেয়।

পিমাই কিন্তু মরুভূমির অভ্যন্তরে যাবার কথা শুনে প্রথমে কুমারকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিল। গেলে সৈন্যদল এবং রসদ নিয়ে যাওয়াই ভাল। নইলে পথ হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাছাড়ে রয়েছে বেদুইন দস্যুদের ভয়।

পিমাই যে সাবধানতার কথা বলল, অমেনমেসের তা অজানা নয়। সবকিছু জেনেশুনেই সে সমাধিস্থলটি আবিষ্কারের সংকল্প নিয়েছে একথা স্পষ্ট করে পিমাইকে বলেছিল। এর পরে সে আর বাধাদানের চেষ্টা করেনি।

সে বলেছিল—আমি আপনার নফর। সুখে দুঃখে বিপদে আপদে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে আপনার সেবা করে যাওয়াই আমার ব্রত। আমি তাতেই নিজেকে উৎসর্গ করেছি।

ফ্যারাও কিংবা পরিবারের যে কেউ অথবা রাজকর্মচারীদের কোন একজনের যদি ঘুণাক্ষরেও জানা থাকত অমেনমেসের উদ্দেশ্যের কথা তাহলে তার যাওয়া হত না। কিন্তু যে কয়জন জানে তারা ভেবেছে শখ করে রাজকুমার কাছেপিঠে একটু ঘুরবে মাত্র। তাই গুরুত্ব দেয়নি কেউ।

প্রত্যূষে ঠিক সময়েই পিমাই অমেনমেসকে জাগিয়ে দেয়। সঙ্গে করে সে

সারাদিনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য ও পানীয় নিয়ে নেয়। বলা যায় না, যদি রাতের আগে ফিরতে না পারে। মরুভূমির অভ্যন্তরে মোটামুটিভাবে তারা অনেকবার গিয়েছে। তাই দিগ্‌ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম।

অমেনমেস একবার ভেবেছিল যাত্রার আগে অন্তত ভাই ও বোনের সঙ্গে দেখা করে যাবে। কিন্তু তাদের ঘুম ভাঙাতে হবে বলে, শেষ পর্যন্ত দেখা করেনি।

পাটকিলে রঙের ঘোড়ায় চলতে চলতে অমেনমেস বলে—বেশ সুন্দর। এটাতে আমি আগেও চড়েছি। নাম মনে নেই। ও কিন্তু আমাকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে।

পিমাই রাজকুমারের সন্তোষে আনন্দিত হয়।

রাজপথে তখনো লোকচলাচল শুরু হয়নি। ছাত্ররা তাদের মায়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যাবে আরও অনেক পরে। রাতের শীতলতা পুরোমাত্রায় রয়েছে। সূর্যদেবতা দিগন্তে উঁকিও দেননি। আরও কিছুটা সময় দিচ্ছেন ধরিত্রীকে স্বস্তিতে থাকতে।

—এই সময়ে প্রতিদিন বেড়াতে এলে কেমন হয় পিমাই!

—খুব ভাল হয়। আসবেন আগামী কাল থেকে?

অমেনমেস হেসে ফেলে। বলে—আগামী কাল থেকে? সেই কাল আর আসবে ভাবছ?

—একথা বলছেন কেন?

—এমনিতে। তোমার নিজের ভাই-এর কথা মনে নেই?

পিমাই-এর মুখমণ্ডল রক্তশূন্য হয়ে যায়। সে বলে—হ্যাঁ মনে আছে। কিন্তু আজ হঠাৎ তার কথা উঠছে কেন প্রভু?

—এমনি বললাম। তোমার দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না?

—খুব হয়। কিন্তু আর যাওয়া হবে না, তাও জানি।

এবারে অমেনমেসের অবাক হবার পালা। সে বলে—ফিরে যাবে না, কি করে জানলে?

—সেই ভাই-ই বলেছিল। সে বলেছিল, থীবস-এ একবারে এলে আর কোনদিন ফিরে যাব না। এখানেই আমার মৃত্যু হবে। অকালমৃত্যু। তবু এসেছি। অনুবিস বোধহয় টেনে এনেছেন।

এবারে অমেনমেস গম্ভীর হয়ে যায়।

হতভাগ্য নৃপতির সমাধিস্থল সম্বন্ধে যেমন শুনেছিল অমেনমেস সেই অনুযায়ী এগিয়ে চলে। অশ্ব দুটি সূর্যের আলো প্রখর হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত বেশ তরতাজা ছিল। তাদের গতিও ভালই ছিল। কিন্তু বেলা বাড়তেই তাদের মধ্যে একটু একটু করে ক্লান্তির লক্ষণ ফুটে উঠতে থাকে।

পিমাই হঠাৎ বলে ওঠে—মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে।

—কিসের ভুল?

—আমরা নিজেদের তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করেছি, অশ্বদুটির কথা ভাবিনি।

—করেছ কি ? এদিকে মরূদ্যান আছে তো ?

—ঠিক জানি না। বোধহয় নেই। আমার মনে হয় ফিরে যাওয়া ভাল আজকের মত। এ পথে আগে কখনো আসিনি।

—আমিও না। তাই এদিকে সমাধি রয়েছে জেনে বিশ্বাস করেছি। কিন্তু যেদিকে তৃষ্ণা মেটাবার ব্যবস্থা নেই সেদিকে সমাধি তৈরি হবে কি করে ? ক্রীতদাসরা কাজের অবসরে জল পান করবে কোথায় ? দিনের পর দিন মাসের পর মাস তাদের থাকতে হয়েছে সৌধ নির্মাণের জন্য। সৌধ থাকলে মরূদ্যানও নিশ্চয় আছে।

পিমাই-এর মুখে দুশ্চিন্তা ফুটে ওঠে। রাজকুমারের পরিচারক সে। তাঁর ভালমন্দের জন্য সে সম্পূর্ণ দায়ী। সে বলে—সৌধ নাও থাকতে পারে। ফিরে চলুন রাজকুমার।

—আর একটু এগিয়ে দেখি। হয়ত মরূদ্যান পাওয়া যাবে।

—কিন্তু এরা খুব ক্লান্ত।

—হ্যাঁ।

পিমাই কিছু বলতে পারে না। তারপর হঠাৎ এক সময় বলে ওঠে—আমি বুঝতে পেরেছি রাজকুমার।

—কি বুঝেছ ?

—আমরা খুব খারাপ দিকে এসেছি। এদিকে এক ফোঁটা জলও পাওয়া যাবে না। শিগ্‌গির ফিরে চলুন।

—কি করে বুঝলে ?

পিমাই আঙুল তুলে দূরে দেখায়। চক্‌চক্‌ করছে কিছু।

—ওগুলো কি ?

—কঙ্কাল। অপরাধীদের ফ্যারাও-এর রক্ষীবাহিনী এদিকে এনে ছেড়ে দিয়ে যায়। আরও এগোলে এমন আরও দেখতে পাওয়া যাবে। আমার মনে হয়, কোন অপরাধী এখান থেকে যে কোন ভাবে হোক ফিরে গিয়ে রটিয়ে দিয়েছে সমাধিসৌধের গল্প। তারপর পালিয়ে গিয়েছে রাজধানী ছেড়ে। সে কৌতুক করেছে।

—কিন্তু রক্ষীরা অনেকে জানে। তারা বুঝতে পারত।

—হয়ত তারা শোনেনি। কিংবা ভেবেছে, তাদের মত সবাই জানে যে এটা রসিকতা।

অমেনমেস চিন্তিত হয়। উভয় অশ্বই ছট্‌ফট্‌ করছে। শেষে বলে—চলো ফিরে যাই।

উভয়ে অশ্বদুটিকে ঘুরিয়ে প্রস্তুত হতেই দেখতে পায় দূর থেকে একদল অশ্বারোহী তাদের দিকে ছুটে আসছে। বুঝতে পারা যায় ওরা বেদুইন দস্যু ছাড়া আর কেউ নয়। কারণ এই মরুভূমিতে অশ্বপৃষ্ঠে অন্য কারও পক্ষে আসা সম্ভব নেই। আর আসতে পারে শুধু ফ্যারাও-এর সৈন্যরা। কিন্তু তাদের এখানে আসার কোন কারণ ঘটেনি। আর এলেও ওভাবে আসবে না।

—পিমাই ছুটে চল। পালাও।

কথাটা বলেই পেছন দিকে না চেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় অমেনমেস। তার বাহনটি পশু হলেও বোধহয় বুঝতে পারে মনিবের বিপদ আসন্ন। নইলে ওভাবে প্রাণপণে ছুটতে পারত না। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। বালির একটি উঁচু ঢিবির আড়ালে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় সেটার উপরে উঠতেই অশ্বটি তাকে নিয়ে পড়ে গেল। তারপর গড়াতে গড়াতে নীচে সমতল জায়গায় এসে থামল।

অমেনমেস অতি কষ্টে ঘোড়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে। পিপাসায় অতিমাত্রায় কাতর সে। তারই মধ্যে দেখতে পায় তার পাটকিলে রঙের বাহকটি বড় বড় চোখে তারই দিকে চেয়ে রয়েছে। মুখ নড়ছে তার। জল পান করার ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় এতে। এক ফোঁটা জল যদি পেত তাহলে হয়ত এখনও বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু এতটুকুও জল সে পাবে না। শুধু সে নয়, তার মনিবও পাবে না। সে আর কিছুক্ষণ ওইভাবে চেয়ে থেকে কয়েকবার কেঁপে উঠল। তারপর স্থির হয়ে যাবার আগে তার চার পা নড়ে উঠল। পশুরাও হয়ত মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে কোন অবাস্তব অথচ সুন্দর স্বপ্ন দেখে। হয়ত সে দেখছে। অতি সন্নিকটে ছায়া সুশীতল এক মরূদ্যান। সেখানে জলাশয়ের জল চিকচিক করছে। সেইদিকে সে ছুটে চলেছে। তাই চলার শেষ অভিব্যক্তি তার চার পায়ে। কিন্তু তাও শান্ত হয়ে গেল এর পরে। পুনর্জন্মের পক্ষে তিন হাজার বৎসরের সুদীর্ঘ বিবর্তনকালে এই অশ্বদেহটি থেকে কার আত্মা আজ নিষ্কৃতি পেল জানবার উপায় নেই। হয়ত এটাই শেষ জন্ম। এরপর কোন মানবশিশুর দেহে গিয়ে প্রবেশ করবে। সেই দেহ ঘিরে কা এবং বা আবার সক্রিয় হয়ে উঠবে।

এবারে এই তাপদগ্ধ দিগন্তবিস্তৃত বালুকাসমুদ্রে তার পদযাত্রা শুরু হবে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে এসেছে। বেশীক্ষণ চলার অবস্থা নেই অমেনমেসের। একথা সে ভালভাবে জানে। তবে ক্ষীণ ভরসা রয়েছে যে পিমাই-এর কাছে তৃষ্ণার বারি রয়েছে এখনো। দস্যুদের আক্রমণে সে যে কোনদিকে ছিটকে গিয়েছে কে জানে। দস্যুরাই বা এখন কোথায়? তাদের মূল লক্ষ্য ছিল অস্ত্র। তবে সেটিকে হস্তগত করতে হলে অশ্বারোহীকে হত্যা করতেই হয়। পিমাই অক্ষত দেহে আছে কিনা জানা নেই। এই মুহূর্তে কোনরকমে একবার ঢিবির ওপরে উঠতে হবে। দস্যুদের আক্রমণের আশঙ্কা থাকলেও উঠতে হবে। নইলে এভাবে নিশ্চেষ্ট থেকে প্রাণে-বাঁচা যাবে না। বুকের ভেতরে ব্যথা অনুভব করছিল। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

অতি কষ্টে সে ঢিবির ওপরে উঠতে থাকে। দুহাত দিয়ে সামনের বালি আঁকড়ে ধরে উঠতে চেষ্টা করে চলে, নিঃশ্বাস অনেক দ্রুত। গলার ভেতরে আরও শুষ্ক। অনেক কষ্ট করেও সেই গলা ভিজিয়ে নিতে পারে না, দেহের ভেতরের সমস্ত জলীয় পদার্থকে একত্রিত করার চেষ্টা করেও।

এইভাবে সে ওপরে উঠে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ হাঁপাতে থাকে। তারপর মাথা উঁচু করে। চোখ একটু ঝাপসা। আগের স্বচ্ছতা নেই দৃষ্টিতে। তবু দেখতে পায় দস্যুদলের চিহ্নমাত্র নেই। পিমাই-ও নেই। অমেনমেস এতক্ষণে

বুঝতে পারে, তার ধারণা ছিল একেবারে নির্ভুল। আজই তার জীবনের শেষ দিন। পিমাই অদৃশ্য হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণার বারিও উধাও। হয়ত তাকে অশ্বসমেত ধরে নিয়ে গিয়েছে দস্যুরা। কিংবা সে-ও পথ হারিয়েছে। তবে অশ্বটি খোয়া না গেলে কিছুক্ষণ সে বেঁচে থাকতে পারে।

এই মৃত্যুর জন্যই অমেনমেস এতদিন প্রতীক্ষা করছিল। তবে কেন মন এতটা উতলা হয়ে পড়ল? তবে কেন হতশেপসুত আর উয়াচমেসের মুখ ভেসে উঠল তার চোখের সামনে? এমনকি শৈশবের স্মৃতি থেকে এক টুকরো ছবি কি করে সে দেখতে পেল এতদিন পরে? তার মা, মিশরের সম্রাজ্ঞী, তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করছেন।

শরীর আরও অবসন্ন হয়ে আসে। সে ভাবে, মৃত্যুটা নগরীর কোথাও হলে ভাল হত। তার দেহই খুঁজে পাবে না কেউ। এখানেই পড়ে থেকে থেকে বিনষ্ট হবে। কান্না পায় অমেনমেসের। কিন্তু চোখে জল আসে না। চোখ জ্বালা করে ভীষণ। সাধ করে সে পিমাইকে পাঠিয়ে তার আর উয়াচমেসের সমাধিস্থল নির্বাচন করে আসতে বলেছিল। সেই স্থান পিমাই ছাড়া কেউ জানে বলে মনে হয় না। জানলেও লাভ হবে না তার। অনন্তসুখ তার ভাগ্যে নেই। ওই জগতের সেই সুশীতল বৃক্ষছায়ায় গিয়ে সে পৌঁছতে পারবে না। সে থথ আর অনুবিসের কাছে প্রার্থনা জানায় যে কোনভাবে যেন তার দেহটি উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়। তাহলে তাঁরা দুজনে তার হৃদপিণ্ড ওজন করে দেখতে পারবেন সেটি কলুষমুক্ত কিনা। সে প্রার্থনা জানায় ওসিরিস আর আইসিসের কাছে, প্রার্থনা জানায় হোরাস হথোর এবং অসংখ্য দেবদেবীর কাছে।

সহসা তার চোখের দৃষ্টি একটু স্বচ্ছ হয়। সে দেখতে পায় দূরে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে। কী ওটা? দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর উঁচু থেকে অতি সন্তর্পণে টলতে টলতে নীচের দিকে নামে। টলতে টলতে চলতে থাকে দূরে পড়ে থাকা পদার্থের দিকে। সেটির একাংশ চক্‌চক্‌ করছে। চলতে চলতে কয়েকবার পড়ে যায় সে। বুকের যন্ত্রণা তীব্র হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে সময় ঘনিয়ে এসেছে। তবু অসীম মনের জোরে সে এগিয়ে চলে।

একেবারে কাছে গিয়ে দেখে ওটি কোন জড় পদার্থ নয়। ওটি হল পিমাই-এর প্রাণহীন ক্ষতবিক্ষত দেহ। সে আত্মসমর্পণ না করে যুদ্ধ করেছিল দস্যুদের সঙ্গে। দস্যুরা তার কাছে রাজকুমারের যা কিছু ছিল সব নিয়ে গিয়েছে। নিয়ে গিয়েছে তার শ্বেতবর্ণের অশ্বটিকেও। কিন্তু যে জিনিসটি চক্‌চক্‌ করছিল দূর থেকে, সেটি নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে। সেটি দুটি জলপাত্রের একটি। পিমাই-এর জন্য দুঃখবোধ করার অনুভূতি তার নেই। সে তৃষ্ণা নিবারণের অত্যুগ্র বাসনায় পাত্রটি তুলে নেয় বুকের মধ্যে। কিছুটা জল রয়েছে তাতে। সে জানে না, তারই জন্য পিমাই সেটি রক্ষা করে গিয়েছে। পড়ে যেতে যেতেও পাত্রটি দস্যুদের চোখের আড়ালে রাখার জন্য ওটির ওপর পড়ে গিয়েছে। পরে একসময় মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে গিয়ে সরে গিয়েছে ওটির ওপর থেকে।

কয়েক ঢোক জল পান করে অমেনমেস। পান করতে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব

করে। গলা চিরে যায়। তবু সাময়িকভাবে তৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটে। পিমাইকে ছেড়ে পাত্রটি বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে সে চলতে থাকে। কিন্তু কোনদিকে যাবে? পশ্চিমের দিকে এসেছিল তারা। তাদের নগরী পূর্বদিকে। কিন্তু সে যে অনেক দূরে। সূর্যের অবস্থান দেখে রাজধানীর দিকটা সে আন্দাজ করতে পারে। সেই দিকেই অগ্রসর হতে থাকে। তার এখন একমাত্র চিন্তা তার দেহটা যেন খুঁজে পায় ফ্যারাও-এর লোকেরা। সে যেন আশ্রয় পায় সমাধিসৌধে। সে যেন দেবদেবীদের পৃষ্ঠপোষকতা পায়।

অনেক চেষ্টা করেও সে শেষ পর্যন্ত তৃষ্ণার জলটুকু বাঁচাতে পারল না। শেষ কিছু বাষ্প হয়ে যেতে যেতে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ল এক সময়ে তার ঠোঁটের ফাঁকে।

আরও কিছুটা দূর হেঁটে সে পড়ে গেল। তখন তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। হাতড়ে হাতড়ে আরও কয়েক হাত চলল হামা দিয়ে। একটা নরম কিছুতে হাত পড়ল তার। সেটি বালির ভেতর থেকে বাইরে বের হয়ে আছে। সে বুঝতে পারে এটি কোন হতভাগ্যের হাত। আশান্বিত হয়ে ওঠে অমেনমেস। পিমাই-এর মত তার কাছেও বোধহয় কোন জলপাত্র রয়েছে। সে হাত ধরে ধরে দেহটির মাথার কাছে পৌঁছে যায়। দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছে। সে মরিয়া হয়ে বালি পরিষ্কার করে চোখের দৃষ্টিকে যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ করে। নিজের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে দেখেও সে মৃতদেহের মুখের দিকে চেয়ে আঁতকে ওঠে। নারীর মুখ। হারেমে ফ্যারাও-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল যে সুন্দরী, এ মুখ তার। বিকৃত হলেও চিনতে পারে সে। ভোলেনি, তার নাম ছিল তাউ। বাষ্পহীন শুষ্ক মরুভূমিতে বালির আস্তরণ তাকে এতদিনেও একেবারে বিকৃত হতে দেয়নি।

কোনরকমে নিজেকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে কয়েক হাত যাবার চেষ্টা করতেই তার জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়। সে চেতনা হারায়। কোন স্বপ্ন দেখে না সে। কোন কল্পনা করার অবকাশ মেলে না তার। দেবদেবীর মুখও সম্মুখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। অমেনমেস তাউ-এর পাশে পড়ে থাকে।

থীবস-এর প্রাসাদপুরী স্তব্ধ। সবাই হতবাক্। হতশেপসুতের অশ্রুর বোধহয় অবধি নেই। সে সমানে কেঁদে চলেছে। তবু তার বুকের ভেতরের বেদনার উপশম হয় না। উয়াচমেস কেমন নীরব হয়ে গিয়েছে। মুখে তার কোন কথা নেই। ফ্যারাও থুথমস দেবতার অংশ হলেও বিষণ্ণ। সম্রাজ্ঞী অহমেস মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছেন যে তার কনিষ্ঠ পুত্র ছিল ভবিষ্যদ্‌বক্তা—ভবিষ্যদ্রষ্টাও বটে। তার অভাব এতদিনে তিনি বুঝতে পারেন। তার শৈশবের কথা চোখে ভেসে ওঠে। তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে রাখার স্মৃতিতে ভেতরটা টন্‌টন্ করে ওঠে। বুক শূন্য হয়ে যায়।

রাজকুমার অমেনমেসের মৃতদেহ উদ্ধার করে আনা হয়েছে। ফ্যারাও-এর কঠোর আদেশে দলে দলে অনুসন্ধানকারীরা বের হয়ে পড়েছিল মরুর দিকে।

রাজকুমার কোনদিকে রওনা হয়েছিল রাজধানীর মাত্র একজন দেখেছিল সেই অতি প্রত্যুষে। তার কাছ থেকে জেনে নিয়ে উদ্ধারকারীর দল ধাবিত হয়েছিল। তারা পিমাই-এর দেহও খুঁজে পেয়েছিল। অন্য যে সমস্ত বহুদিন পূর্বের দেহ পড়েছিল, সেগুলির অধিকাংশই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর কিছু কিছু দেহ বালির ঝড়ের দৌলতে আধ হাত এক হাত বালির নীচে প্রোথিত ছিল। সেই দেহগুলি মিশরের অতি উষ্ণ ও শুষ্ক হাওয়ায় বিনষ্ট না হয়ে প্রায় অক্ষতই ছিল অমেনমেসের দেখা সেই চক্রান্তকারী সুন্দরীর মত। কিন্তু কত অপরাধীদের দেহই তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই দিকে। তারা পড়েই থাকবে আবহমানকাল। কারও দেহ থেকে ধীরে ধীরে মাংস খসে যাবে, কঙ্কাল হয়ে পড়বে। কেউ বিশুষ্ক অবস্থায় বালুকার মধ্যে সমাধিস্থ হয়ে রইবে। কিন্তু পিমাই-এর দেহ ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। কারণ, সবাই বিশ্বাস করেছে পিমাই-এর কুপরামর্শেই কনিষ্ঠ রাজকুমার প্ররোচিত হয়েছিল। সুতরাং পিমাই-এর স্থান কখনই সেই আনন্দময় অন্য দেশে হতে পারে না। তার দেহ অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে নীলনদের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কুমীরের ভক্ষ্য বস্তুরূপে।

রানী মুতনেফার্ত সম্রাজ্ঞীর কক্ষে গিয়ে তাঁকে আন্তরিক সমবেদনা জানান। মুতনেফার্তের পুত্র জ্যেষ্ঠ রাজকুমার হতশেপসুতকে প্রাসাদের এক কোণে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে গিয়ে বলে—আমি খুব দুঃখিত। ছেলেটা ভাল ছিল।

হতশেপসুত তার কথার ধরনে একটু অবাক হয়ে তার চোখের দিকে দৃষ্টি ফেলে। সেই দৃষ্টি বোধহয় সইতে পারে না তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করে। সে ভয় পায়, হতশেপসুত বোধহয় তার মনের গহনে আনন্দের ঝিকিমিকি তার চোখের তারায় ফুটে উঠতে দেখেছে। দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি হতশেপসুতের অহেতুক অতিমাত্রায় ভালবাসা তাকে বরাবর ঈর্ষান্বিত করেছে। ওরা দুজনা না থাকলে হতশেপসুত তার একার সম্পত্তি হত। কিংবা অন্যভাবে বলা যেতে পারে, সে হত হতশেপসুতের সাম্রাজ্য আর সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী। কিন্তু ওদের জন্য তা হয়নি। অমেনমেসের বেঘোরে প্রাণ গেলেও উয়াচমেস তো রয়েছে। অমেনমেস তবু কিছুটা ছোট ছিল। কিন্তু উয়াচমেস বেশ বড় হয়ে উঠেছে। হতশেপসুত তাকে শুধু মনপ্রাণ দিয়ে নয়, যৌবন দিয়েও ভালবাসে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভালবাসার যোগ্যতম ব্যক্তিই বটে সে। অমন সুন্দর দেহ আর অমন দুর্জয় সাহস সাধারণত চোখে পড়ে না। কিন্তু প্রকাশ্যে সেকথা তো বলা যায় না।

কালের প্রবাহকে কোন ঘটনাই প্রতিহত করতে পারে না। কালের গতি অবিচ্ছিন্ন —চিরপ্রবহমান। মাঝে মাঝে দুএকটি ঘটনা সেই প্রবাহে কিছু বাড়তি আলোড়নের সৃষ্টি করে। কিন্তু সেই আলোড়নও ক্ষণস্থায়ী। নিমেষে মিলিয়ে যায়।

অমেনমেসের মৃত্যুর ঘটনাও তেমনি। মিশরের অধিবাসীদের মধ্যে প্রবল ভাবে নাড়া দিল। প্রাসাদের জীবনটা দমবন্ধ অবস্থায় রইল কয়েকদিন। কিন্তু

রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় অনন্তকাল তিষ্ঠানো যায় না। কারণ তার অর্থই হল মৃত্যু। অথচ জীবনটা মৃত্যু নয়। তাই স্বাভাবিকতা ফিরে এল। কয়েকজনের মনের মধ্যে কম অথবা বেশী ক্ষতের সৃষ্টি করল হয়ত। সেই ক্ষতের চিহ্ন কিছু দিনের মধ্যেই মিলিয়ে যাবে কারও কারও। আবার কয়েকজনের মধ্যে স্থায়ীভাবে রইবে। কিন্তু কে তার খবর রাখতে চায়? পৃথিবীতে কোন কিছুর গতিকে তো রুদ্ধ করে রাখা যায় না। মরুঝড় একেবারে স্তব্ধ হয় না। বাতাস চিরকাল থেমে থাকে না। নীলনদের স্রোত রুদ্ধ সরোবরের মত হয়ে যায় না। ফুল ফোটা চলতে থাকে। পাখির কুজন, পশুর ডাক, তাদের চলাফেরা বংশবৃদ্ধি সবই চলতে থাকে।

পুরাণে কোথাও বলেছে অমন রা-এর প্রতিদিনই মৃত্যু হয় দিনের শেষে। আবার প্রভাতে নবজীবন লাভ করে পুনরায় উদিত হন। অমেনমেস এতক্ষণ তেমনি আর এক জীবন লাভ করে সেই সুবিশাল ছায়া সুশীতল বৃক্ষের নীচে পৌঁছে গিয়েছে। তাকে অভ্যর্থনা করেছেন দেবী। সে এখন আনন্দময় জীবন যাপন করছে। তার ইচ্ছামত নির্ধারিত স্থানেই তার সমাধিসৌধ গড়ে দেওয়া হয়েছে। পিমাই যত খারাপ হোক দুটি সমাধিস্থল নির্বাচন করে চিহ্ন রেখে এসেছিল। সেই চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। সেই চিহ্নের কথা সে বলে রেখেছিল অনুবিসের মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে। এ কথা আর কেউ জানত না। পুরোহিত কত লোকের কত গোপন কথা জানেন। সেই সব কথার কতটুকুই বা প্রকাশ পায় প্রয়োজন না হলে। অমেনমেসের মৃতদেহ রাজধানীতে আনয়ন করা হলে তিনি এসে স্বয়ং ফ্যারাওকে বলেন যে তিনি রাজপুত্রের সমাধিস্থলের খবর রাখেন। পিমাই তাঁকে বলেছিল, সে বিশেষ চিহ্ন করে রেখে এসেছে। ওখানে গেলেই খুঁজে পাওয়া যাবে। কথাটা শুনে ফ্যারাও একটু বিচলিত বোধ করেছিলেন যেন। কারণ পিমাই-এর দেহ তার কত আগেই কুমীরের উদরে স্থান পেয়েছে। অথচ এদের উদরে যাবার কথা সেইসব হীন মনোবৃত্তির তস্করদের দেহ, যারা পিরামিড আর মস্তবের ভেতরে অতি যত্নে শায়িত শবদেহের সঙ্গে রক্ষিত বহুমূল্যবান রত্নরাজি এবং দ্রব্যসামগ্রী সিঁধ কেটে লুণ্ঠন করে। পিমাই তো তার বিপরীত কাজই করেছিল। পৃথিবীতে যত অপরাধ আছে তার মধ্যে জঘন্যতম হল মৃত ব্যক্তির শান্তির আলয়ে হামলা করা। মিশরে এর চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই। তবে একটা পার্থক্য রয়েছে। তাদের মত পিমাইকে জীবন্ত অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয়নি কুমীরের মুখে। কিন্তু নিঃসন্দেহে তার দেহের অমর্যাদা করা হয়েছে। তাকে সুযোগ দেওয়া হয়নি ওপারের সেই সুন্দর দেশটিতে যাবার। কেউ জানল না, কেউ দেখল না রাজপুত্রকে সে কত ভাবে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিল মরু অভিযানে যাওয়া থেকে। রাজপুত্রকে দস্যুদের হাত থেকে বাঁচাতে সে নিজে তাদের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল পলায়নের অছিলায়। নইলে তাকে ধরতে পারত না ওরা। ওরকম নৃশংসভাবে হত্যাও করতে পারত না। কারণ তারই সঙ্গে ছিল তৃষ্ণার জলাধার। রাজপুত্রের কাছে জল ছিল না। সে সহজেই ধরা পড়ত, এবং পিমাই-এর মত নিহত হত।

তবে তার অশ্বটি বেঁচে থাকত, যেমন পিমাই-এর অশ্ব বেদুইনদের সমৃদ্ধ করেছে।

অমেনমেসের শোচনীয় মৃত্যুতে হতশেপসুতের মন ভেঙে গেলেও সে তার অত্যাশ্চর্য মনোবলের প্রভাবে নিজেকে খুব তাড়াতাড়ি সামলে নেয়। তাকে তো ভুললে চলবে না ভবিষ্যতের মিশরের ভার তাকেই বহন করতে হবে। কত ঝড় ঝাপটা, কত শোক, কত দুঃখ তার জীবনে আসতে পারে। সেজন্য দীর্ঘদিন মুহ্যমান হয়ে থাকে তার শোভা পায় না। সে থেমে থাকলে, সমগ্র মিশর দেশ থেমে থাকবে। সব কিছুতে তাকে অবিচল থাকতে হবে।

তবু নিজেকে এভাবে প্রস্তুত করা সত্ত্বেও, নিজের মনকে দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার মধ্যেও একটা শঙ্কা সর্বদা তার পিছু পিছু অনুসরণ করে বেড়ায়। সেই শঙ্কাটি হল অমেনমেসের অপর আর এক ভবিষ্যদ্‌বাণী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গেই তার বিবাহ হবে। কারণ উয়াচমেসের পরমায়ুও পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী।

মন আকুল হয়ে ওঠে তার। দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। সে ছুটে যায় উয়াচমেসের প্রকোষ্ঠে। এখনো নিশ্চয় সে প্রাসাদের বাইরে যায়নি। অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষায় সময় এখনো হয়নি। তার প্রকোষ্ঠে তাকে না মিললেও প্রাসাদের পাঠাগারে তাকে পাওয়া যাবে। সেখানে সে হস্তলিপি শিক্ষা করে একজন দক্ষ নকলনবিশের কাছে। তার হস্তলিপি অত্যন্ত উচ্চমানের। ফ্যারাও থুথমস তার হস্তলিপি দেখে একদিন আনন্দিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর সমাধিতে তিনি উয়াচমেসকে দিয়ে লিখিয়ে নেবেন। তাঁর সমাধিসৌধ এখন সমাপ্তির পথে। মসনদে বসেই তিনি সেটি নির্মাণের আয়োজন করেছিলেন। অমেনমেসের সমাধির চেয়ে বেশ কিছুটা দূরে সেটি। অমেনমেসের সৌধনির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তার শবদেহ সেখানে যথাসময়ে একটি প্রস্তরনির্মিত কক্ষ তৈরি করে রাখা আছে। কক্ষটি ঘিরে আসল সৌধ নির্মিত হচ্ছে। এমন অকাল-মৃত্যু যে তার হবে একথা সে ছাড়া আর কে-ই বা কল্পনা করেছিল। এমন আশঙ্কা কেউ করে না। তাহলে তো আগাম অনেক সমাধিস্থলই নির্মাণ করে রাখতে হয়। ফ্যারাও, তাঁর রানী এবং অতি উচ্চপদের রাজকর্মচারীরা আগে-ভাগে স্ব স্ব সমাধির নির্মাণ কাজ শুরু করলেও, অমেনমেসের মত এই অল্প-বয়সের প্রায় কিশোরের জন্য সেকথা ভাবা যায় না।

হতশেপসুত উয়াচমেসের কক্ষে গিয়ে দেখে সেখানে সে নেই। তাড়াতাড়ি ছোটে প্রাসাদের পাঠাগারে। তার গতির মধ্যে এমন একটা ত্রস্তময়, এমন একটা ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছিল যে রক্ষীবৃন্দ বিস্মিত হয়। কারণ তারা জানে হতশেপসুত অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ নারী। কৈশোরের প্রান্ত থেকেই এই গুণাবলী প্রকাশ পেতে থাকে। যৌবনে এগুলি বাড়তি আকর্ষণীয় সুষমা এনে দিয়েছে তার চরিত্রে। কিন্তু আজ যেন তার ব্যতিক্রম। তারা নিষ্পলক দৃষ্টিতে হতশেপসুতের গমনপথের দিকে চেয়ে

থাকে। পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করে।

পাঠাগারের এক কোণে বসে উয়াচমেস অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে কিছু লিখছিল। একা সে। আর কেউ নেই। হতশেপসুত ছুটে গিয়ে তার গ্রীবা বেষ্টন করে অশ্রুসিক্ত নয়নে চুম্বনে চুম্বনে তার মুখমণ্ডল ভরিয়ে দেয়।

সহসা এভাবে তার গায়ের ওপর এসে পড়ায় উয়াচমেসের হাতের তুলিকা আর গোটান প্যাপাইরাস ছিটকে নীচে পড়ে যায়। সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে গিয়েও হতশেপসুতের সিক্ত মুখমণ্ডল দেখে শান্ত হয়ে যায়। তাকে দুই বাহু দিয়ে বেষ্টন করে বলে—আমি জানি তোমার কষ্ট। খুব একা একা লাগছে। সে যে আর নেই একথা বিশ্বাস করা যায় না। প্রতিমুহূর্তে নতুন করে আঘাত পেতে হয়।

—না না, তা নয়। সে চলে গিয়েছে। সে এখন অতীত। কিন্তু বর্তমান আর ভবিষ্যত যে পড়ে রয়েছে।

—তাতে কি? তোমার ভবিষ্যত কত উজ্জ্বল। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার কোন কাজে আমি বাধা দেব না। পিতার মনের ইচ্ছা তুমিও ফ্যারাও হও। তুমি তাই হবে।

—না না, সেকথা নয়।

—তবে কোন্ কথা?

হতশেপসুত মুখ ফুটে সেকথা উচ্চারণ করতে পারে না। শুধু উয়াচমেসের বুকে তার মুখ ঘষে আর সিক্ত করে তোলে।

উয়াচমেস তাকে শক্ত করে চেপে ধরে বলে—এমন অস্থির হচ্ছ কেন? তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?

—হ্যাঁ। দেহে নয়, মনে।

—কি কষ্ট?

—বলতে পারছি না। মুখ ফুটে বলা যায় না। তাই তো এত কষ্ট।

—তবু বলতে হবে।

হতশেপসুত কিছুটা সুস্থির হয়ে বলে—অমেনমেস তোমাকে কিছু বলে গিয়েছে?

—কোন্ বিষয়ে?

—যেমন ধর, ও বলত বেশীদিন বাঁচবে না ও।

—ওর নিজের সম্বন্ধে সোজা কিছু আমাকে বলেনি কখনো।

—আমার সঙ্গে কার বিয়ে হবে, এ সম্বন্ধে কিছু বলেছে কখনো?

—না। তাছাড়া সেকথা বলবেই বা কেন? ও তো জানত আমার রানী হবে তুমি। ফ্যারাও-এরও অজানা নয় এ কথা। তার জন্যে আমার কত গর্ব।

কথাটা শুনে নতুন করে হতশেপসুতের অশ্রু ঝরে পড়ে। হৃদয় মথিত হতে থাকে।

—একি! আবার কাঁদছ?

হতশেপসুত বলতে চায় কিছু। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারে না। সে শুধু

তার মাথাটা এদিকে ওদিকে বাঁকাতে থাকে। উয়াচমেস তখন সেই মাথা দুহাতে ধরে গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে বসে থাকে।

হতশেপসুত ভাবে বিশেষ দুটি দিনের কথা। প্রথম দিনটি হল সেই প্রাসাদশীর্ষের কথা। সূর্যাস্তের সময়। অমেনমেস সেদিন বলেছিল, উয়াচমেসের সঙ্গে তার বিবাহ হবে না। বিবাহ হবে তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে। হতশেপসুত তাঁকে বলেছিল, উয়াচমেসের সঙ্গে না হোক, তার সঙ্গেও তো হতে পারে। তার মধ্যেও পুরুষালী ভাব ফুটে উঠেছে।

আর একদিনের কথা। হেব-সেদ ভোজ শেষ হবার পরে সে অমেনমেসের কক্ষে চলে গিয়েছিল। অমেনমেস সেদিন মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখলেও অন্তরে বিষণ্ণ ছিল। সেদিনও অমেনমেস বলেছিল, মুতনেফার্তের পুত্রের সঙ্গেই তার বিবাহ হবে। এই কথার অর্থ খুব পরিষ্কার। আজ যে প্রিয়তম পুরুষের বক্ষে মুখ লুকিয়ে চোখের জলে ভাসাচ্ছে, সে তার কোনদিনও নিজের হবে না একান্তভাবে। আর তাকে না পাওয়ার একটাই অর্থ যা অমেনমেস পরিষ্কার করে বলে গিয়েছে। উয়াচমেস তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেই অনুসরণ করবে এবং এক বছরের মধ্যেই।

হেব-সেদ ভোজের কিছুদিন পূর্বে নীলনদে বন্যা এসেছিল। বন্যার সঙ্গে সঙ্গে বছর শুরু হয় এই দেশের। অর্থাৎ পরবর্তী বন্যা আসার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনে এক মর্মান্তিক পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। তখন সে কি নিয়ে থাকবে? এখনো কল্পনা করতে পারে না হতশেপসুত। সে ভাবে এত দেবতা, এত দেবী রয়েছেন—তাঁরা সবাই এ বিষয়ে মূক। কেন? হয়ত এটাই নিয়ম। নইলে তাঁরা নিজেরাও তো কম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেন না। ওসিরিস থেকে শুরু করে বহু দেবদেবীর জীবনই তার প্রমাণ। সব কিছু মেনে নিতে হবে। আইসিসের মত দৃঢ় হতে হবে। সঙ্কল্পে অটল থাকতে হবে। মনের দুর্বলতা জয় করতে হবে।

উয়াচমেসের বুকের উষ্ণতা তার চক্ষুদ্বয় শুষ্ক করে তোলে। মুখে একটা দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

—উঠলে যে?

—আমি যদি তোমাকে কোন কারণে না পাই, তাহলে সারা দেশ এক নতুন হতশেপসুতকে দেখতে পাবে। এখনকার এই কোমল তরুণীর সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য থাকবে না।

—হঠাৎ একথা বলছ কেন? তুমি নিষ্করুণ হবে একথা ভাবতেও পারি না। তেমন হলে মন আমার ব্যথায় ভরে উঠবে।

—আমি নিষ্করুণ হব না উয়াচমেস। তুমি যাকে ভালবেসেছ সে কখনো তেমন হতে পারে না। তবে আজকের মত কখনই থাকব না। কারণ ভালবাসা ভাগ করা যায় না। একবার দিয়ে ফেললে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমার ভালবাসা বাণিজ্যিক বস্তু নয়। হাত বদল হয় না অন্যান্য রমণীর মত। ক্রীতদাসীর মন নিয়ে আমি গড়ে উঠিনি। আমার আদর্শ আইসিস।

—কিন্তু তুমি আমাকে বাদ দিচ্ছ কেন? আমি তো রয়েছি তোমার জন্য। এত কথা আসছে কেন?

হতশেপসুতের এতক্ষণে হুঁশ হয় যে সে বেফাঁশ কথা বলে ফেলেছে। অতিকষ্টে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে—এমনিতে বললাম।

—তুমি আমার হস্তলিপি দেখতে চাইলে না তো? অমেনমেসের অভাব আমি এইভাবে পূরণের চেষ্টা করি। এখানে বসে দীর্ঘক্ষণ ধরে অভ্যাস করে যাই। সব ভুলে থাকি।

—আমি তোমার লেখা দেখেছি। তুমি যদি অতি সাধারণ ঘরেও জন্মাতে, এই গুণের জন্য ফ্যারাও-এর কাছে আদরণীয় হতে। নিজের উপার্জনে প্রাসাদ তৈরী করতে পারতে।

—তার প্রয়োজন হবে না। আমার প্রিয়তমা নিজেই হবে ফ্যারাও। আর সেই দৌলতে আমিও ফ্যারাও। এই প্রাসাদই আমার প্রাসাদ। নিজের তৈরী প্রাসাদে বাস করার ইচ্ছা নেই।

কথাটা শুনেই হতশেপসুতের চোখের দুকূল ছাপিয়ে আবার অশ্রুর প্লাবন নামে। সে উয়াচমেসের গ্রীবা বেষ্টন করে আকুলভাবে তাকে চুম্বন করতে থাকে। তার আকুলতায় হস্তলিপির প্রতি অভিনিবেশ টুটে যায় উয়াচমেসের। তার সর্বাঙ্গ টগবগ করে ওঠে। সে প্রথমে একটু একটু সাড়া দেয় হতশেপসুতের মনোবাঞ্ছায়। তারপর উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

বহুক্ষণ কেটে যায়। হতশেপসুত তার প্রিয়তম ভ্রাতাকে ছাড়তে চায় না।

সে বলে—আমার ঘরে চল।

—এখন?

—হ্যাঁ এখন। ওখানে আমরা সারাদিন থাকব। তারপর সন্ধ্যা হবে। রাত হবে।

—সবাই অবাক হবে।

—হোক। কিছু এসে যায় না। আমি কিছু মানব না। সেখানে একটা কবিতার বই রেখেছি।

—কি কবিতা?

—ভালবাসার।

উয়াচমেসের মুখে মিষ্টি হাসি ফোটে। বলে—সত্যি?

—হ্যাঁ। চল, দেখতে পাবে।

—কোথায় পেলে?

—তুমি যখন হস্তলিপি অভ্যাস কর, আমি তখন কিতাব ঘাঁটি এই পাঠাগারে! খুঁজতে খুঁজতে অমূল্য সম্পদ পেয়ে গেলাম। নিজের কাছে রেখে দিয়েছি।

—কি আছে ওতে?

—প্রেমের আকুলতা। পুরুষ ও নারী, উভয়েরই।

—বাঃ চল দেখি।

কক্ষে এসে হতশেপসুত সযত্নে রক্ষিত গোটানো প্যাপাইরাস নিয়ে শয্যার ওপর উঠে বসে। উয়াচমেসের হাত ধরে পাশে বসায়। তারপর তার কোলের ওপর বসে গোটানো প্যাপাইরাস একটু একটু করে খুলতে থাকে।

উয়াচমেস হেসে বলে—এভাবে আমার বুকে মাথা ঠেকিয়ে বসলে, তুমিও পড়তে পারবে না, আমিও শুনতে পারব না।

কথাটা শুনেই হতশেপসুত প্যাপাইরাস শয্যার ওপর ফেলে দিয়ে উয়াচমেসকে ঠেলে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে তার গায়ের ওপর পড়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। তাকে এত অস্থির এত উত্তেজিত হতে কখনো দেখেনি উয়াচমেস। সে স্বভাবতই ধীর স্থির সংযত। কিন্তু আজ এমন করছে কেন?

সে হাসির ছলে বলে—সুন্দর কবিতাটা তো?

—কোন্ কবিতা?

—এই মাত্র যেটা পড়লে।

উয়াচমেস জানে না, হতশেপসুতের মনের ভেতরে, বুকের ভেতরে, সারা দেহের ভেতরে কেমন করছে। তার ভয় যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে সে তার প্রিয়তম পুরুষটিকে হারাতে পারে। তার আগে সে তার জীবনের সাধ মিটিয়ে নেবে। আজ সব বিপরীত। আজ সে যন্ত্রী, উয়াচমেস যন্ত্র।

—আমাকে একটা সন্তান দিতে পার উয়াচমেস। পুত্রসন্তান।

—কি বলছ?

—ঠিক বলছি। দাও না। আমি ভিক্ষা চাইছি।

—যদি আমার ইচ্ছায় হত, দিতাম। তুমি ত-আর্তের কাছে প্রার্থনা কর।

বন্ধ দ্বারের বাইরে অনেকবার রক্ষীদের যাতায়াতের পদশব্দ শোনা যায়। কেউ ডাকতে সাহস পায় নি। অথচ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। হতশেপসুতের হুঁশ নেই। সে ভাবে, আজ যদি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত, বেশ হত। কেউ বেঁচে থাকত না। কিন্তু এটা উদ্ভট কল্পনা। পৃথিবী ধ্বংস হয় না। নীলনদের জলে প্লাবন এলেও কখনও এমন হয় নি। মাসের পর মাস বর্ষণ হলে তেমন ঘটতে পারে। কিন্তু এখানে বর্ষণই হয় না বলতে গেলে। তাছাড়া এত কষ্টের সৃষ্ট ধরিত্রীকে দেবতারা ধ্বংসই বা করবেন কেন? সেই কবে রা একবার বৃদ্ধ বলে মনুষ্যজাতি একটু বেয়াদপি করেছিল। তারপর তেমন করেনি কখনো। করলে না হয় কথা ছিল।

উয়াচমেস হতশেপসুতকে কাছে টেনে নিয়ে কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বলে—অনেক তো হল। ওদিকে বাইরে অস্বস্তি বাড়ছে বুঝতে পারছ না? দরজার সামনে বারবার পায়ের শব্দ এসে থেমে যাচ্ছে।

—যাক্ তোমাকে আমি ছাড়ব না।

—সম্রাজ্ঞীর কানে যাবে।

—যাক্, তবু ছাড়ব না।

—প্রেমের কবিতার কথা ভুলে গেলে?

—আজ যা হল, সহস্র সহস্র কবিতাও তার সমান নয়।

—আমাকে নিয়ে খেলা যখন তোমার শেষ হবে, তখন কিতাবটা আমি নিয়ে যাব সঙ্গে করে।

হতশেপসুত চমকে ওঠে। বলে—সঙ্গে নিয়ে যাবে? কোথায়?

—কেন? আমার ঘরে।

—ও তাই বল। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে উয়াচমেস বলে—ভয় পেয়ে গিয়েছিলে?

—বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ।

হতশেপসুত উয়াচমেসের একখানা হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে।

বিস্মিত উয়াচমেস দেখে সত্যিই তার বুকের ভেতরে খুব দ্রুত তালে ধুক ধুক করছে। হঠাৎ একটা পায়রা দুহাতে চেপে ধরলে তার বুকের ভেতরে যেমন করে ঠিক তেমনই। সে ভগিনীকে কাছে টেনে নিয়ে প্রশ্ন করে—কিসের এত ভয়?

—জানি না। শুনতে চেও না।

—তোমার কবিতার বই-এ এমন কথা লেখা আছে কোন প্রেমিকের?

—কোন কবির সাধ্য নেই এই ভয়ের কথা লেখে। তাদের জীবনে সেই অনুভূতি হয়নি কখনো।

—তাহলে বরং তুমি লেখার চেষ্টা কর। তোমার তো সেই অনুভূতি রয়েছে।

কান্না চেপে থাকে হতশেপসুত।

কয়েকদিন অতিবাহিত হলে, হতশেপসুতের মনে হয়, অমেনমেসের সব কথা হুবহু মিলে যাবে, এমন হতে পারে না। উয়াচমেসের নিশ্চয় মৃত্যু হবে না। এই কথা দিনের পর দিন ভাবতে ভাবতে তার মনের বিভীষিকা একটু একটু করে কেটে যায়। বাইরের প্রকৃতির দিকে তার দৃষ্টি যায়। এতদিন বাইরের কোন কিছুই তার চোখে পড়ত না। দেশের গাছপালা অবধি তার চোখের সামনে থেকে যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার সেগুলি দৃশ্যমান হয়। সেই সঙ্গে দৃশ্যমান হয় সেই সব গাছের ক্ষুদ্র এবং প্রলম্বিত ছায়া সূর্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে।

সে একদিন উয়াচমেসের হাত ধরে প্রাসাদোদ্যানে গিয়ে বসে, যেখানে এককালে আবাবা-পুত্রের কাছে বসে গল্প শুনত।

একটা গোটানো প্যাপাইরাস একটু একটু করে খুলতে খুলতে সে বলে—কবিতা।

উয়াচমেস হেসে বলে—জানি। পড়!

হতশেপসুত বলে—সুন্দর কয়েকটি কবিতা পর পর লেখা রয়েছে এখানে। কোন এক ভগিনীর সুন্দর আনন্দঘন সঙ্গীত, যাকে তার ভ্রাতা হৃদয় দিয়ে ভালবাসে। মেয়েটি শস্যক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছে তার প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে যাকে সে হৃদয়ের সবটুকুই দিয়ে বসে আছে। কোন কিছুতেই সে

সান্ত্বনা পায় না। সুখাদ্যে নয়, মদিরাতেও নয়। সবার মুখে যা সুমিষ্ট, প্রেমিকার কাছে তা পাখির পিত্তের মত কটু। তোমার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের ছোঁয়ায় শুধু আমি সান্ত্বনা পেতে পারি।

উয়াচমেস বলে—তুমি!

দুঃখের হাসি হেসে হতশেপসুত বলে—এখানে অমন লেখা রয়েছে। তাই বলেছি। এবারে কবিতাটা পড়ি ঃ

"... ... ...
আমি গিয়ে নিজের হাতে ফাঁদ পাতি।
আরব দেশের সমস্ত পাখি মিশরের ওপর ছেয়ে যায়।
তাদের সর্বাঙ্গে সুরভি মাখানো।
যে পাখি সব চেয়ে আগে আসে সে স্টোপ গেলে
সে ওদের থেকে সুঘ্রাণ নিয়ে আসে
তার নখর সৌরভসিক্ত।
আমার হৃদয় তোমার জন্য আকুলিত,
যাতে আমরা একসঙ্গে গিয়ে ফাঁদ খুলি।
আমি তোমাকে একা চাই, শুধু তুমি,
যাতে তুমিও আমার সুগন্ধি মাখানো
প্রাণের আকুল ক্রন্দন শুনতে পাও।
তুমি, শুধু তুমি আমার সঙ্গে
আমি ফাঁদ পাতি।
যে আসে সে কত সুন্দর, কারণ একজন তাকে ভালবাসে।"

তবু প্রেমিক তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে না ঃ

"রাজহংসীর ডাকে আর্ততা ফুটে ওঠে।
কোন কীট তাকে দংশন করেছে।
তোমার প্রেমে আমার সর্বাঙ্গ কম্পমান,
তাই ফাঁদের ফাঁস আলগা করতে পারি না।
আমি আমার জাল সরিয়ে দিয়ে যাব,
কিন্তু মায়ের কাছে গেলে মা কি বলবে?
প্রতিদিন আমি ধৃত পাখি নিয়ে যাই
কিন্তু আজ ফাঁদ পাততে পারলাম না,
কারণ তোমার প্রেমে আমি সম্মোহিত।"

শীঘ্রই প্রেমিকা তার মনোবাসনা আরও স্পষ্টভাবে বলে ঃ

"হে সুন্দরতম! যদি তোমার বধূ হতাম
তোমার বাহু আমার বাহুর ওপর থাকত।
আমার প্রিয়তম ভ্রাতা কি আজ রজনীতে আসবে না?
না এলে আমি কবরে শায়িত দেহের মত
কারণ তুমিই জীবন, তুমিই আলো।"

হতশেপসুত একবার মাথা তুলে উয়াচমেসের মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে আবার প্যাপাইরাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে—অবশেষে একটি বিনিদ্র রজনীর পর সে দয়িতকে পায়।

"বনকপোতীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়,
সে বলে, 'দেখ জগত আলোময়।'
তুমিই আমায় প্রলোভিত করেছ,
আমি আমার ভ্রাতাকে তার কক্ষে পাই,
দেখে আমার হৃদয় জুড়িয়ে যায়,
আমি তোমার কাছ থেকে সরে যাব না
আমার হাত থাকবে তোমার হাতে
আমি বাইরে গেলে তুমি সঙ্গে রইবে আমার।"

হতশেপসুত থামে। সে উয়াচমেসেব দিকে চেয়ে বলে—এতক্ষণ শুধু প্রেমিকার হাহুতাশ শুনলে। এবারে বিরহী প্রেমিকের কথা শোন। জানি না সেটা সত্যি কিনা। তোমরাই ভাল বলতে পার।

উয়াচমেস বলে—এত অবিশ্বাস ? তবু শুনি।

হতশেপসুত পড়ে ঃ

"আমি আমার শয়নকক্ষে শায়িত থাকব
আমি সত্যই পীড়িত।
প্রতিবেশীরা আমাকে দেখতে আসে।
কিন্ত যদি সেই সঙ্গে সে আসত
তবে সে সব চিকিৎসকদের লজ্জায় ফেলত।
কারণ সে জানে আমার পীড়ার মর্মকথা।"

তবু তা প্রণয়িনী, তার ভগিনী আসে না শয্যাপার্শ্বে। অথচ প্রেমিক সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত যদি তার প্রিয়া একটিবার এসে তার সঙ্গে কথা বলে ঃ

"ওই তো আমার ভগিনীর দুর্গপ্রাসাদ
সম্মুখে তার বিশাল সরোবর।
প্রাসাদের প্রতিটি দ্বার উন্মুক্ত
আমার ভগিনী বিরাগ-ভরে বাইরে আসে
আহা, আমি যদি তখন সেখানে দ্বাররক্ষী হতাম
তার ভর্ৎসনা আমার ওপর বর্ষিত হত
সে ক্রোধান্বিত হলেও তার সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনতাম
একটি বালক যেমন শোনে সভয় বিস্ময়ে।"

উয়াচমেসের চোখ মুখ আবেশ-আপ্লুত বলে মনে হয়। কবিতাগুলি সত্যিই সংবেদনশীল মনের সৃষ্টি। তাছাড়া হতশেপসুতের পড়ার ভঙ্গি অতীব মনোমুগ্ধকর। আরও কয়েকটি কবিতা পাঠ করে তার ভগিনী। কিন্তু কবিতা পাঠ শেষ হবার পরও সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তার কানে ভগিনীর

কণ্ঠস্বর কবিতার ছন্দে ছন্দে ঝঙ্কৃত হতে থাকে।

তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে হতশেপসুত। বলে—কি হল ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উয়াচমেস বলে—তুমি এক অমূল্য সম্পদ অধিকার করেছ পাঠাগার থেকে। আর তোমার আবৃত্তি অনবদ্য। কোথায় শিখলে ?

হতশেপসুত নিজের বুকে হাত রেখে বলে—এইখান থেকে।

অমেনমেসের মৃত্যুর পর হতশেপসুত আর উয়াচমেসের জীবনের বৈচিত্র্য অনেক কমে গিয়েছে। সে কখনো নিজেকে জাহির করেনি। তিনজনের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে শান্ত, সবচেয়ে নিরীহ। শৈশবের উজ্জ্বলতা আর দুরন্তপনা সহসা একদিন তার ভেতর থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল। পরিবর্তে একটা উদাসীনতা, একটা গাম্ভীর্য স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু তার কথার আর ব্যবহারের মাধুর্য একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি কখনো। বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার অভাব আজ প্রবল-ভাবে অনুভব করে ওরা দুজনা। অনেক সময় বিস্মৃত হয় যে সে পৃথিবীর জীবন থেকে চিরবিদায় নিয়েছে। মনে হয় সে প্রাসাদের অন্য কোথাও রয়েছে। কত সময় তাকে জব্দ করার জন্য দুজনা ফিসফিস্ করেছে। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে রূঢ় সত্য। তখন তারা মাথা নীচু করে স্তব্ধ হয়ে বসে থেকেছে। হতশেপসুতের নয়ন ছাপিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়েছে। উয়াচমেস তার বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জীকে নিষ্ফল আক্রোশে মুচড়াতে থাকে। ভাবে, প্রিয়তমা ভগিনীর মত কাঁদতে পারলে হালকা হতে পারত।

তবু একটা বিষয়ে হতশেপসুতের মনের মধ্যে একটা উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। ফ্যারাও তাকে আর উয়াচমেসকে সহ-শাসক রূপে ঘোষণা করতে খুব দেরি করে ফেলছেন। অদূর ভবিষ্যতে হেব-সেদ ভোজের আয়োজন করার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। আগের ভোজের আয়োজন হয়েছিল তারই উদ্যমে। সেবারে সে নিজে পিতাকে বেশ কয়েকবার বলে সম্মত করিয়েছিল। কিন্তু নতুন করে আবার ফ্যারাও-এর সামনে দাঁড়াতে তার বাধে। এই বয়সে একটা সম্ভ্রমবোধ আপনা থেকে বোধহয় এসে যায় স্বভাবের মধ্যে। উয়াচমেসও বলতে পারে না এ কথা। তাছাড়া সে ফ্যারাও-এর সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলা পছন্দ করে না। শৈশবে কবে কোন্ কালে তাকে একবার দুষ্টুমি করতে দেখে ফ্যারাও ধমকে দিয়েছিলেন। সেই স্মৃতি মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে তার। সামনে দেখা হয়ে গেলে সবিনয়ে কথা বলে, কিন্তু হৃদ্যতা আদৌ থাকে না সেই কথায়। ফ্যারাও হয়ত আঁচ করতে পারেন পুত্রের মনোভাব। তাই তিনিও অনেক সময় তাকে দেখেও দেখতে পান না। কিন্তু হতশেপসুত ভালভাবে জানে, উয়াচমেস একবার যদি পিতার চোখের দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে কোন কিছু বলে, তাহলে তাঁর পক্ষে সেটা অগ্রাহ্য করার সাধ্য নেই। এতেই মনে হয় ফ্যারাও-এর দেবত্ব তার মধ্যে বর্তমান। একথা সে ভালভাবে জানে, দুজনাকে সহ-শাসক করে নেবার জন্য ফ্যারাও কিছুতেই অনুরোধ জানাবে না উয়াচমেস। আসলে সব কিছুর ভার তার ভগিনীর ওপর সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত রয়েছে। ফ্যারাও-এর পদটি

হতশেপসুতকে যতটা প্রলুব্ধ করে উয়াচমেসকে তার ভগ্নাংশও করে না। এ ব্যাপারে তার মধ্যে কিছুমাত্র ছটফটানি নেই। অথচ একথা মনে মনে স্বীকার করে হতশেপসুত যে কোনদিন যদি এই মহান দেশটির ভার তার প্রিয়তম ভাই-এর ওপর গিয়ে বর্তায়, তাহলে সে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অক্লেশে তাকে সাফল্যের সঙ্গে বহন করে নিয়ে যেতে পারবে। এই বিশ্বাস জন্মেছে তার সঙ্গে কয়েকবার শিকারে গিয়ে। শুধু বুনো হাঁস শিকার নয়, হিংস্র জন্তু শিকারে গিয়ে, যে পরিস্থিতিতে অনেক কুশলী শিকারীর রক্ত হিম হয়ে যায়, সেখানে উয়াচমেস অকুতোভয়, অবিচল। সেই সময় ওকে দেখলে বোঝা যায় কী প্রচণ্ড মনোবলের অধিকারী সে। তার সঙ্গে থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সে যদি একই সঙ্গে মসনদে বসে, তাহলে অন্ধকারের দেশ থেকে বিপদের আশঙ্কায় চিন্তিত থাকতে হবে না। দেশে নিশ্চিন্ত শান্তির মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য সমৃদ্ধি লাভ করবে।

কিন্তু কবে ?

ফ্যারাও যেন ভুলেই গিয়েছেন তাদের কথা। অথচ সে যখন বালিকা এবং কিশোরী ছিল তখন কতবার শুনিয়েছেন ভবিষ্যতের কথা। কৈশোর অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও তেমন নেই। তাঁর স্থান উয়াচমেসই দখল করে নিয়েছে। পিতা হয়ত এইজন্যই তাদের নিজেদের মত থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু আর কতদিন ? ওদিকে মুতনেফার্তের পুত্রের মুখ দিন দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। ওসিরিসের অনেক দয়া যে তার মন আদৌ বলিষ্ঠ নয়। বলিষ্ঠ হলে এতদিনে সে নিজেই ফ্যারাও-এর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার অধিকারের কথা তুলত। বলিষ্ঠ হলে আরও একটা অসুবিধা হত। নিভৃতে নির্জনে তাকে বেশ কয়েকবার জাপটে ধরার সময় ধাক্কা দিয়ে যেভাবে সরিয়ে দিতে পেরেছে সেভাবে কিছুতেই পারত না। উয়াচমেস জড়িয়ে ধরলে, পারে ? তবে উয়াচমেস ওভাবে ধরলে তার শরীর আপনা থেকে অবশ হয়ে যায়। আত্মসমর্পণের জন্য উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তার দেহ-মন। কিন্তু যদি তেমন না হয়ে বিদ্রোহিনীও হয়ে উঠত, তবু পারত না উয়াচমেসের বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পেতে। কারণ ও যা ভাবে তাই করে। একবার সিদ্ধান্ত নিলে সেই সিদ্ধান্তের নড়চড় হয় না। অথচ উয়াচমেস তার জ্যেষ্ঠ ভাই-এর চেয়ে বয়সে অন্তত ছয় বছরের ছোট।

এইসব চিন্তা যখন হতশেপসুতের মনের মধ্যে আনাগোনা করছে তখন একদিন উয়াচমেস বলে যে সে শিকারে যাবে। প্রাসাদ আর নগরীর মধ্যে থেকে থেকে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

—কোথায় শিকারে যাবে ? মরুতে ? নাকি নীলনদে ?

—যেখানে হোক। শুধু প্রাসাদে নয়। এই নগরীর মধ্যে নয়। দম আটকে আসছে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থেকে থেকে।

ভগিনী মৃদু হাসে। তারপর তার মাথার মধ্যে হাত বুলিয়ে কেশগুচ্ছ এলোমেলো করে দিতে দিতে বলে—এর মধ্যেই ? তোমাকে যে সারা জীবন

এইখানেই থাকতে হবে। এখানে থেকেই তুমি ওপর আর নীচের মিশর শাসন করবে।

—ওটা তোমার কাজ। তুমি দুই মিশরের লাল আর সাদা কিরীটি শোভিত মস্তক নিয়ে বসে বসে মসনদ আলোকিত কর। আমি নীল রঙের মুকুটখানা মাথায় পরে অশ্বচালিত রথে বেরিয়ে পড়ব সিনাই-এর দিকে। আমি যুদ্ধ চাই।

হতশেপসুতের মন পুলকাপ্লুত হয়ে ভ্রাতার কথা শুনে। তারও মনোবাঞ্ছা তাই। ঘরে এবং বাইরে মিশরের প্রভাব ও খ্যাতি অপ্রতিহত হয়ে উঠবে।

সে ভ্রাতাকে সমর্থন জানিয়ে বলে—ঠিক আছে। তুমি যেখানে খুশী শিকারে যেতে পার। তবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

—তুমি!

—কেন জান না? ফ্যারাও-এর সঙ্গে তার রানীর যাওয়াই নিয়ম। আসলে আমাদের মা বাইরের উষ্ণতা আর গরম হাওয়া থেকে নিজের সুকোমল শ্বেতশুভ্র ত্বককে রক্ষা করার জন্য ফ্যারাও-এর সঙ্গে যেতে চান না। তবু প্রথম জীবনে বেশ কয়েকবার গিয়েছেন বলে শুনেছি। আর রানী মুতনেফার্ত আমাদের মায়ের যৌবনে পদার্পণের আগে শুনেছি এত বেশী সোহাগ পেয়েছেন ফ্যারাও-এর কাছ থেকে যে বাইরে যেতে মন চায়নি। ফ্যারাও বংশে জন্মাননি বলে রানীর রূপে বাইরে যাবার অধিকার তাঁর ঠিক ছিল না। এমনিতে হয়ত যেতে পারতেন। তবে যান নি।

বিস্মিত উয়াচমেস বলে ওঠে—এসব কোথায় শুনলে?

—বৃদ্ধা পরিচারিকার অভাব নেই প্রাসাদে। ভুলে যেও না এখন আমি পূর্ণ যৌবনা হলেও অল্পবয়সে হারেম-চত্বরে বহু থেকেছি। আর নারী বলে তোমাদের চেয়ে আমাদের মস্তিষ্ক অল্পবয়সেই একটু বেশী পেকে যায়।

প্রিয়তমায় কথার ধরনে উয়াচমেস হেসে ফেলে। বলে—হ্যাঁ, একথা একশো-বার স্বীকার করছি। আমি যখন কিছুই বুঝতাম না তখন তুমি নানান্ কৌশলে একটু একটু করে আমাকে পাকিয়ে তুলেছিলে।

হতশেপসুত লজ্জিত হয়। কিন্তু সেই লজ্জা গোপন করার জন্য বলে—আসল কথা হচ্ছে। আমি তোমার সঙ্গে শিকারে যাচ্ছি। যেখানেই তুমি যাও।

—তুমি সত্যিই যাবে?

নতুন শোনাল নাকি কথাটা? ভুলে যেও না এটা আমার অধিকার।

উয়াচমেস একটু খোঁচা দেবার প্রলোভন সামলাতে না পেরে বলে—আমি অবশ্যই জানি বোন। তবে সেটা প্রযোজ্য সেই সমস্ত পুরুষের বেলায় যারা তোমাকে বিয়ে করে মসনদের পথ পরিষ্কার করতে চায়। আমার ফ্যারাও-এর পদের প্রতি অত লোলুপতা নেই। বরং বলতে পার আমার লোলুপতা শুধু তোমার প্রতি যা তোমার নিজেরই দান।

হতশেপসুত হতাশার ভাব দেখিয়ে বলে—তাহলে আর কি করা যাবে? তুমি যেদিন শিকারে যাত্রা করবে আমিও সেদিন অন্য একটি দল নিয়ে বের হব।

—কোনদিকে যাবে?

—কেন ? তুমি যেদিকে যাবে।

—কোথায় থামবে ?

—তুমি যেখানে থামবে।

দুজনাই হেসে ফেলে।

পরদিন উষাকালে ওরা মৃগয়ায় বের হলেও বড় কোন শিকারের সন্ধানে যায় না। ওরা নৌকায় নীলনদ বেয়ে অনেকটা ওপর দিকে চলে যায় এবং সারাদিনে কিছু পাখি শিকার করে, আনন্দে মাতামাতি করে অন্ধকার নেমে আসার অনেক পরে রাজধানীতে ফিরে আসে।

প্রাসাদে ফিরে এসে হতশেপসুত নিজের কক্ষে প্রবেশের মুখে তার নিজস্ব পরিচারিকা নেসামুন খবর দেয় যে ফ্যারাও তাদের দুজনার খোঁজ করছিলেন। সম্রাজ্ঞী অহমেসও দুবার তাঁর খাস পরিচারিকাকে পাঠিয়ে রাজপুত্রের সন্ধান করছিলেন।

—কেন ? জান কিছু ?

—ঠিক বলতে পারব না। তবে রানী মুতনেফার্তকে এক ঝলক দেখার সুযোগ হয়েছিল বিকেলের দিকে। খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছিল তাঁকে ?

—তাই নাকি ?

হতশেপসুত নিজের কক্ষে না ঢুকে সোজা উয়াচমেসের কাছে যায়।

—কি হল ?

—একটু এসো তো আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

—এসোই না।

উয়াচমেসকে নিয়ে হতশেপসুত তাদের মায়ের প্রসাধন কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ায়।

—এখানে কেন ?

—সম্রাজ্ঞী আমাদের দুজনার খোঁজ করেছিলেন। নিশ্চয় কোন বিশেষ বার্তা আছে।

—এত রাতে উনি এখানে থাকবেন ?

—আরও বেশী রাত অবধিও থাকেন ? এটাই ওঁর নেশা।

তাদের আগমনবার্তা পেয়ে সম্রাজ্ঞী নিজে বের হয়ে আসেন। তাঁর গায়ের এবং কেশের সুগন্ধি তেল এবং প্রসাধনের সুঘ্রাণে চারিদিক আমোদিত হয়।

তিনি একটু বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন—আমার সঙ্গে চল।

অহমেস তাঁর শয়নকক্ষে নিয়ে আসেন পুত্রকন্যাদের। বলেন—বস।

ওরা উভয়ে মায়ের দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

—কি পেলে আজ ?

ওরা বুঝতে পারে না মায়ের কথার অর্থ।

মা আবার বলেন—আজ শিকার করতে গিয়ে কিছু মিলেছে ?

উয়াচমেস উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে—হ্যাঁ, ছয়টা বুনো হাঁস। আর মাছ।

—খুব আনন্দ হয়েছে তো ?

হতশেপসুত বুঝতে পারে, মা সরলভাবে কথাগুলো বলছেন না। বেশ বাঁকা বাঁকা। সে তাই চুপ করে থাকে। কিন্তু উয়াচমেস মায়ের মুখের দিকে একবারও তাকায় নি। হতশেপসুতকে একদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছিল যে মায়ের সাজসজ্জা দেখলে তার হাসি পায়। অথচ মা কত সুন্দরী।

তাই আজ যতটা পারা যায় অন্য দিকে এটা ওটা দেখতে দেখতে সে বলে ওঠে—নিশ্চয়। তবে মরুভূমিতে গেলে আরও বেশী আনন্দ পাওয়া যেত।

—বুঝলাম। কিন্তু এই সামান্য শিকারের জন্য যে আজ মসনদটা হাতছাড়া হতে যাচ্ছিল। তার বেলায় ?

চমকে ওঠে উভয়ে। মায়ের মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলে।

—হ্যাঁ। আজ ফ্যারাও তোমাদের সহ-শাসক করবেন বলে ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। রাত্রে ওসিরিস স্বপ্নে দেখা দিয়ে ওঁকে বলেছেন, খুব শীগগির সহ-শাসক নিযুক্ত করতে। তাই আজ রাজকর্মচারীদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু খোঁজ করে জানা গেল তোমরা মৃগয়ায় বের হয়েছে। ফ্যারাও বাইরে শান্ত হয়ে থাকলেও, মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি আমার কাছে এসে বলেন—হতশেপসুত তো সহ-শাসক হবেই। ওর বেলায় নড়চড় হবে না। আমি বরং আজ ওর সঙ্গে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ঘোষণা করে দেব। উয়াচমেসের প্রয়োজন নেই। আমার সঙ্গে ফ্যারাও-এর তর্কাতর্কি হয়। আমি বলি—উয়াচমেস নয় কেন ?

—সে নেই বলে।

—কি করে সে বুঝবে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তুমি করবে আজ ?

—তার বোঝার প্রয়োজন নেই। ওসিরিসের আদেশই শেষ কথা।

—ওসিরিস বলেছেন, যতটা সম্ভব সত্বর ঘোষণা করতে। তাই বলে তিনি বলেন নি যে, আজই ঘোষণা করতে।

—আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। দেরি হলে কোন অমঙ্গল হতে পারে। জ্যেষ্ঠ পুত্র আজ উপস্থিত আছে, তাকে সহ-শাসক বলে ঘোষণা করব।

—না। আপনি ফ্যারাও ঠিকই। কিন্তু তার জন্যে আমার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তেমনি হতশেপসুতের সঙ্গে যার বিবাহ হবে সে হবে ফ্যারাও। কথাটা ভুলে যাওয়া আপনার উচিত নয়।

স্তব্ধ পুত্রকন্যার দিকে চেয়ে একটু হেসে সম্রাজ্ঞী বলেন—তিনি আর কিছু বলেন নি। আগামী কাল ঘোষণা করবেন বললেন।

হতশেপসুত আর উয়াচমেস উভয়েই মাকে জড়িয়ে ধরে।

—শোন। আগামীকাল ফ্যারাও তোমাদের তিনজনকেই সহ-শাসক রূপে ঘোষণা করবেন।

হতশেপসুত বলে ওঠে—কেন ? তিনজন কেন ?

—ফ্যারাও-এর সেই রকমই ইচ্ছা।

হতশেপসুত গম্ভীর হয়ে বলে—এটা আমার পছন্দ নয়।

—তোমার পছন্দ অপছন্দের দিকে তাকিয়ে মিশরের ফ্যারাও চলেন না। আমার ধারণা, তিনি দুই রাজপুত্রের মধ্যে কে যোগ্যতর সেটা যাচাই করে নিতে চান।

—বেশ। ধর উয়াচমেসকে তিনি বাতিল করলেন। তাহলে কি হবে?

—অপরজন ফ্যারাও হবে।

হতশেপসুত হেসে ওঠে। বলে—তুমি সম্রাজ্ঞী, তার ওপর মিশরীয় নারী। তবু নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকতে ভুলে যাও মা।

সম্রাজ্ঞীর চোখের দৃষ্টি উয়াচমেসকে বিচলিত করতে না পারলেও অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। কিন্তু হতশেপসুত অবিচল। তার মুখ মায়ের মুখের চেয়েও কঠিন।

রাজ্ঞী বলে ওঠেন—তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

—না। উয়াচমেসের সহ-শাসক হবার প্রয়োজন নেই। ফ্যারাও-এর মৃত্যুর পরে কিংবা আগে আমি উয়াচমেসকে বিয়ে করলেই মিশরের মসনদ ওর পাকা।

সম্রাজ্ঞী স্তম্ভিত হন।

হতশেপসুতের চোখে তাচ্ছিল্যভরা চাহনি ফুটে উঠতে চায়। কিন্তু সেই দৃষ্টিকে দমিত করে সে।

তার গর্ভধারিণী সম্রাজ্ঞী অহমেসের বাক্যস্ফূর্তি হয় না। হতশেপসুতের প্রখর বুদ্ধি আর বাস্তববোধের পরিচয় তাঁর অজানা না থাকলেও, আজ যেন সে চোখে আঙুল দিয়ে ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিল। বুঝিয়ে দিল, তেমন হলে ফ্যারাও-এর বিরুদ্ধেও সে দাঁড়াতে পারে নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য এবং সেই ক্ষমতা তার আছে। এই বয়সেই সে মিশরের প্রধান প্রধান আইন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। সর্বজ্ঞ দেবতা থথ-এর একান্ত অনুরাগিণী সে। তাঁরই কৃপায় তার মেধার ঘাটতি নেই।

পরদিন প্রভাতের ক্রিয়াকর্ম সমাপনের পর দেবালয়ে যথারীতি পূজা দিয়ে সভায় এসে বসলেন ফ্যারাও। সভা পরিপূর্ণ। কারণ সবাই ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটির কথা জেনে গিয়েছে।

হতশেপসুত এবং দুই রাজপুত্রকে সভায় আসতে বলা হল। তারা প্রবেশ করলে শুধু হতশেপসুত নয়, উপস্থিত শীর্ষস্থানীয় রাজকর্মচারীরা সবাই জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। ক্রোধান্বিত হন, আজকের এই বিশেষ দিনে ফ্যারাও-এর পার্শ্বে উপবিষ্ট সম্রাজ্ঞী অহমেস। তিনি বুঝতে পারেন এর পেছনে রয়েছে রাজপুত্রের মাতা মুতনেফার্তের শঠতা কৌশল। রাজপুত্রের মস্তকে শুধু রাজমুকুটটাই নেই। বাকী সবকিছু রয়েছে তার অঙ্গসজ্জায়। তার দেহ রাজকীয় সজ্জায় সজ্জিত। তার মস্তকে কৃত্রিম কেশদাম। তার চিবুকে শোভা পাচ্ছে সুবর্ণনির্মিত কৃত্রিম শ্মশ্রু। শুধু যেন ফ্যারাও কর্তৃক স্বহস্তে মস্তকে কিরীট অর্পণের অপেক্ষা। ফ্যারাও নিজেও যেন একটু চমকিত।

কিন্তু পরমুহূর্তে তাঁর মুখমণ্ডলের সূক্ষ্ম রেখায় রেখায় মৃদু হাসির তরঙ্গ খেলে যায়। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—হ্যাঁ, তোমরা তিনজনই উপস্থিত। আমি বয়স অনুযায়ী ঘোষণা করব।

কথাটা শেষ হতেই হতশেপসুত নমনীয় অথচ ক্ষিপ্রপদে দুপা এগিয়ে এসে ফ্যারাওকে অভিবাদন জানিয়ে বলে—তার আগে আমার একটি নিবেদন আছে।

ফ্যারাও তাঁর প্রিয় কন্যার বাধাদানে বিরক্ত না হয়ে কৌতুক বোধ করেন। তিনি বলেন—বেশ। বল, তোমার কি বক্তব্য।

—অমন রা না করুন, আজ যদি আপনি কোন উত্তরাধিকারী নির্বাচন না করে সেই সুন্দর দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন, যেখানে চির শান্তি বিরাজমান, তাহলে এই মিশরের উত্তরাধিকারী কে হবে?

—কেন? তুমি। তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে। তোমার মা যদি স্বেচ্ছায় অন্য কাউকে বিবাহ করেন, তবে সেই পুরুষই ফ্যারাও হবে ভুলে যেও না।

সম্রাজ্ঞী বলে ওঠেন—তেমন দুঃসময় এলে আমি মেয়েকেই ছেড়ে দেব। আমার বিবাহের প্রশ্ন ওঠে না।

হতশেপসুত বলে—আমার মা শুধু রূপবতী নন, বুদ্ধিমতীও বটে। সবার ওপর তিনি কন্যার হিতকাঙ্ক্ষিনী। তবে এই মুহূর্তে তিনজনের মধ্যে আমিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বয়স অনুযায়ী নয়, আগে আমার নাম ঘোষণা করতে হবে।

সভা স্তব্ধ। ফ্যারাও-ও যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত। তবে সেই দ্বিধা পলকের জন্য। তিনি স্মিত হেসে কন্যার নিকট পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে বলেন—তুমি ঠিক বলেছ। তোমাকেই আজ আমি সবচেয়ে প্রথম সহ-শাসক রূপে নিযুক্ত করলাম।

সবাই দেখল, যারা নকল নবিশের কাজ করে তাদের একজন একটি গোটানো প্যাপাইরাস খুলে এগিয়ে যায় ফ্যারাও-এর সামনে। তিনি সেটির ওপর দস্তখত করেন। লিখিত-পড়িত ভাবে হতশেপসুত সহ-শাসক নিযুক্ত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন রাজকর্মচারী এসে হতশেপসুতের সামনে দাঁড়িয়ে আনত হয়ে দুহাত দিয়ে তাকে আহ্বান করে নিয়ে যায় ফ্যারাও-এর সবচেয়ে নিকটের আসনটিতে। আসনটি আজই আনা হয়েছে। আরও দুটি আসন স্থাপিত হয়েছে রাজ্ঞীর পাশে।

হতশেপসুত আসন গ্রহণ করে।

এরপর ফ্যারাও দুই রাজপুত্রের নাম ঘোষণা করেন। সেই দুই আদেশ-পত্রের ওপরও অনুরূপ ভাবে দস্তখত করেন তিনি। তারা দুজনা আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সভাকক্ষের এক কোনা থেকে বাজনা বেজে ওঠে। আনন্দধ্বনি শোনা যায়।

ফ্যারাও উৎফুল্ল হৃদয়ে বলেন—আজ আমি নিশ্চিন্ত। মনে হচ্ছে, আমার ওপর চাপানো বোঝা অনেকখানি হালকা হয়ে গেল। আমি আজই ঠিক করে

দিতে চাই কে কোন বিভাগ দেখাশোনা করবে। তোমাদের মত নিয়েই আমি ঠিক করব। প্রথমেই হতশেপসুতকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কোন বিভাগ দেখাশোনা করতে চাও ?

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে সে জবাব দেয়—অবশ্যই ব্যবসা আর বাণিজ্য। দেশের সমৃদ্ধির মূলে এটি। সেই সঙ্গে কৃষি। কৃষিই হল মিশর সভ্যতার ভিত্তি। ব্যবসা বাণিজ্য, সব কিছু তারই ওপর দাঁড়িয়ে।

সভাসদগণ বিমুগ্ধ। সম্রাজ্ঞী অবাক হন, মেয়েটা এত সব জানল কি করে ? চোখের সামনেই তো ধীরে ধীরে শিশু থেকে বালিকা, বালিকা থেকে কিশোরী এবং কিশোরী থেকে নবোদভিন্ন যুবতীতে পরিণত হল। সময় পেল কখন ? রাজ্ঞী নিজেই জানেন না, তাঁরও বুদ্ধি কম ছিল না। কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময় নিজেকে সুন্দরী করে তুলতে তুলতেই তাঁর সময়ের অপচয় ঘটে গিয়েছে। তাছাড়া ফ্যারাও-এর দায়িত্ব লাঘব করার মত গুরুদায়িত্ব নেবার মানসিকতা তাঁর আদৌ ছিল না।

কন্যার কথায় ফ্যারাও রীতিমত গর্ববোধ করেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে বলেন—উত্তম। তোমার ওপর কৃষি আর বাণিজ্যের ভার ন্যস্ত করা হল আজ থেকে। ও বিষয় নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাবই না।

একজন করণিক ফ্যারাও-এর আদেশ লিখে সেটির ওপর তাঁর দস্তখত নিয়ে নেয়। এগুলি হল অত্যন্ত মূল্যবান দলিল। এখান থেকে সোজা মহাফেজখানায় পাঠানো হবে সভা শেষ হলে। সেখানে সংরক্ষিত থাকবে।

এবারে জ্যেষ্ঠ কুমারের ডাক পড়ল। একই ভাবে ফ্যারাও প্রথম থুথমস তাকে প্রশ্ন করেন যে সে কোন্ বিভাগের ভার নিতে ইচ্ছুক।

জ্যেষ্ঠপুত্র একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়। তাই দেখে কিছুটা দূরে উপবিষ্ট তার গর্ভধারিণী কিছুটা বিচলিত বোধ করেন। শেষে পুত্রের চোখ তাঁর চোখের ওপর পড়ে। তিনি কিছু একটা ইঙ্গিত করেন যা বাহ্যত কারও দৃষ্টিগোচর হয় না। সভার সবাই নড়েচড়ে বসে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে এতটা বিলম্ব সুলক্ষণ নয় মোটেও। নিজের ওপর আস্থার অভাব ও অস্থিরমতির পরিচয়।

রাজপুত্র হঠাৎ বলে ওঠে—যুদ্ধ—মানে সৈন্যবাহিনীর ভার আমি নিতে চাই।

ফ্যারাও বলেন—ঠিক আছে।

সভার কিছু লোকের মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠলেও অধিকাংশের মুখ গম্ভীর।

অবশেষে শেষ রাজপুত্রের প্রতি ফ্যারাও-এর একই প্রশ্ন উচ্চারিত হয়।

উয়াচমেস বলে—যুদ্ধবিদ্যা আমারও প্রিয়। তবে এক জিনিস তো দুজনকে দেওয়া যায় না। আমি চাই ওপর আর নীচের মিশরের যাবতীয় মন্দির ও সমাধিস্থলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার। কারণ অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি ভালভাবে দেখাশোনা করা হয় না। সমাধিস্থলের সম্পদ অপহরণের জন্য একদল দুষ্ট চক্র বরাবরই এদেশে রয়েছে। তাদের শায়েস্তা করাই আমার উদ্দেশ্য হবে আপাতত।

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তাদের নাক আর কান কেটে দেওয়া হবে। তাছাড়া আরও ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে যা দেখে কেউ ওপথে যেতে সাহস না পায়।

সভাসদগণ হর্ষধ্বনি করে ওঠে। হতশেপসুত আনন্দে ঘন ঘন শ্বাস নেয়। তার উয়াচমেস যে কতখানি জনপ্রিয় হতে পারে এই সামান্য সুযোগেই তার প্রমাণ করে দিল। শুরুটা ভালই হল বলতে হবে। সে একবার আড়চোখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখের দিকে চায়। সেই মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। তবে মুতনেফার্তের মুখে আত্মপ্রসাদের ছাপ। বোধহয় তাঁর ধারণা সৈন্যবাহিনী যার অধীনে দেশের ক্ষমতাও তার করায়ত্ত।

প্রধান পরামর্শদাতা নিম্ন অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বলে ফ্যারাওকে—ভবিষ্যতের ফ্যারাও সম্বন্ধে দেশবাসীকে কি আপনি আজই জানিয়ে দেবেন?

কথাটা শুনে হতশেপসুতের ভ্রূকুঞ্চিত হয়। ফ্যারাও-এর পাশে উপবিষ্ট সম্রাজ্ঞীর মুখে আশঙ্কার ছায়া ফুটে ওঠে। কোনরকম পরামর্শ ছাড়া ফ্যারাও নিজে থেকে কিছু মন্তব্য করে ফেললেই বিপদ। কারণ সেটা মুতনেফার্তের পক্ষে যেতে পারে। মনে হয় যৌবনের প্রথম লগ্নে মুতনেফার্তকে নিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করার সুখস্মৃতি আজও তিনি ভুলতে পারেন না। অথচ প্রতিদিন তো নতুন নতুন রূপসীর সংস্পর্শে আসেন তিনি। তবু কেন যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি তাঁর চাপা পক্ষপাতিত্ব এর কারণ বোঝা যায় না।

পরামর্শদাতার কথার পর সভায় গুঞ্জন ওঠে। সেই গুঞ্জন থামতে চায় না। কারণ এই অল্প সময়ের মধ্যেই দুই রাজপুত্রের পক্ষে এবং বিপক্ষে মত গড়ে নিয়েছে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ। অথচ গতকালও এ সম্বন্ধে তাদের মন ছিল শূন্য। দুই রাজকুমারের কারও সম্বন্ধে কোন চিন্তাই তাদের মধ্যে ছিল না।

গুঞ্জন থামতে চায় না। সবাই উৎসুক। তাদের প্রত্যেকেই ফ্যারাও-এর মুখে শুনতে চায় তাদের আকাঙ্ক্ষিত রাজপুত্রের নাম।

ফ্যারাও হাত তুলতে সভা শান্ত হয়। ফ্যারাও তখন বলেন—আজ নয়। আসন্ন হেব-সেদ ভোজের দিন আমি ঘোষণা করব।

—কবে হবে সেই ভোজ?

—বর্ষা আসার পড়ে। তখন নদীর দুকূল ছাপিয়ে দেশের অভ্যন্তরে জল-ধারা কতদূরে চলে যাবে। সারা বছর ধরে উত্তপ্ত বালুকারাশি বহন করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়া দুপাশের অসংখ্য ডোবা পুকুর নতুন জলে ভরে উঠবে। সেই সময় হবে হেব-সেদ ভোজ।

মুতনেফার্তের মুখ শুকনো দেখায়। তিনি ভেবেছিলেন আজকেই তাঁর পুত্রের নামটি ঘোষণা করে দেবেন ফ্যারাও। কদিন আগে গোপনে অনেক কষ্টে দেখা করতে গেলে তেমন আশ্বাসই দিয়েছিলেন ফ্যারাও। আজ তিনি মর্মে মর্মে বুঝতে পারেন পুরুষ জাতির কাছে নারীর রূপ আর যৌবন ছাড়া অন্য কিছুর কানাকড়ি মূল্যও নেই।

হতশেপসুতও পিতার এই ঘোষণায় খুশী হল না। সে-ও ভেবেছিল

আজই তার সঙ্গে উয়াচমেসের নাম ঘোষণা করা হবে ভবিষ্যতের ফ্যারাও রূপে। হল না। আবার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হল তাকে। তবে একটা সুবিধা হবে। উয়াচমেস ভালভাবে প্রমাণ করার সুবিধা পাবে যে ফ্যারাও-এর পদের জন্য সে-ই অধিকতর উপযুক্ত।

সভা দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে। কারণ প্রথম দিনেই সবার সমক্ষে নতুন সহ-শাসকত্রয় তাদের নিজ নিজ বিভাগের কাজ বুঝে নিতে থাকে। তারা দু-একটা আদেশও দেয়। ফ্যারাও সন্তুষ্ট হন।

সভা সাঙ্গ হলে দিনান্তের আর বাকী থাকে না বেশী। কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে। সম্রাজ্ঞী এতক্ষণ এক ভাবে বসে থাকতে থাকতে অনেক-বার অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন। যখনই কোন কর্মচারীকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছেন তখনই মনে হয়েছে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার অসাবধানতায় তাঁর প্রসাধনের কোন গলদ বেরিয়ে পড়েছে। তিনি ভেবে উঠতে পারছিলেন না সেই গলদকে ঢেকে কিভাবে আবার নিখুঁত করে তুলবেন তাঁর রূপকে। যদিও এখন তিনি সচেতন যে তাঁর মুখে বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে এবং নিজেকে তরুণীর মত রূপসী করার স্বপ্ন আর নেই, তবু আরও কয়েকবছর নিজেকে আকর্ষণীয় করে রাখা সম্ভব।

সভা শেষ হতে নিষ্কৃতি পান সম্রাজ্ঞী। সোজা গিয়ে প্রবেশ করেন সাজঘরে। সেখানে আরশিটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে একটি বাতির সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখ দেখেন। না, কোন খুঁত নেই। চোখের ভ্রুকে প্রলম্বিত করতে যে রেখা টেনেছিলেন তা যথাস্থানেই রয়েছে। চোখের কোণের বাইরের রেখাও মুছে যায়নি। আঁখিপল্লবের ওপরে যে ছায়া-রঙ দেওয়া হয়েছিল, তাও যথাযথ অটুট রয়েছে। শুধু শুধু অকারণে এতক্ষণ তিনি ছটফট করেছেন। সবুজ রঙের তাম্র আকরিক ও ধূসর রঙের আকরিক সীমা দিয়ে প্রস্তুত সুর্মা অত সহজে মুছে যায় না। এর চেয়ে ভাল সুর্মা পৃথিবীতে নেই।

সাজঘরেই পরিচারিকা এসে জানায় যে তার খানা প্রস্তুত। সারাদিন টুক-টাক নানান সুস্বাদু দ্রব্য অল্প অল্প গ্রহণ করলেও সাধারণ মিশরীয়দের মত তিনি তাঁর প্রধান আহার্য দিনান্তে একবারই গ্রহণ করে থাকেন। এই সময় তাই তাঁর ক্ষুধার উদ্রেক স্বাভাবিক ভাবেই হয়। আজ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আহারের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। পরিচারিকার কথায় তাঁর খেয়াল হয় এবং তিনি সন্তুষ্ট হন। সঙ্গে সঙ্গে ভোজনের জন্য প্রস্তুত হয়ে রওনা হন।

খেতে বসে খাদ্যসামগ্রীর সুঘ্রাণ তাঁর ক্ষুধা দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলে। তাকিয়ে দেখেন অতি প্রিয় কৃষ্ণসার হরিণ আর গজনা হরিণের মাংস রয়েছে। পেঁয়াজ কড়াইশুঁটি শালগম আর রসুন দিয়ে প্রস্তুত একটি ব্যঞ্জন রয়েছে। আছে বুনো হাঁসের মাংস। তাছাড়া গাজর মসুর ডাল আর মুলো দিয়ে তৈরী ব্যঞ্জন। সবগুলো তাঁর পছন্দ নয়। তবে সবই পরিবেশিত হয়। তিনি নিজের পছন্দমত যতটা ইচ্ছা গ্রহণ করেন। সব খাদ্য গ্রহণের পর যব দিয়ে প্রস্তুত এক ধরনের হাল্কা সুরা পান করা তাঁর বরাবরের অভ্যাস। এতে খাদ্যগ্রহণের পরে

নিজেকে সতেজ বলে মনে হয়। তিনি শুনেছেন পুরাকালে মিশরের ফ্যারাওদের খাদ্যতালিকায় শূকরের মাংসও থাকত। কিন্তু এখন সেটিকে পরিবেশন করার প্রচলন আর নেই। কারণ শূকর হচ্ছে হোরাসের শত্রু ওসিরিসের ভ্রাতা ও হত্যাকারী সেথ-এর পশু। তাই ঘৃণ্য। পশুটিও বড় ঘৃণ্য ভাবে থাকে। সেইজন্যই বোধহয় ওটিকে বর্জন করা হয়েছে খাদ্যতালিকা থেকে। ভালই হয়েছে।

সারাদিনের শেষে আহার্য গ্রহণের পরে একটু একটু করে ডুমুর, আঙুর, খেজুর, বৈঁচি বা ডালিম, এদের যে কোন দুএকটির রসাস্বাদন করা তাঁর কাছে সুখপ্রদ বলে মনে হয়। আহারের পরে আজকের সভায় চিত্রগুলো মনের আরশিতে প্রতিবিম্বিত হতে থাকে। মুতনেফার্ত ফ্যারাওকে প্রায় বশে এনে ফেলেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্যারাও ভুলে যান নি তাঁর প্রধানা মহিষীর কথা ও তাঁর অধিকারের কথা। তাই বোধহয় উয়াচমেসকে বাতিল করে দিতে সাহসী হননি আপাতত।

শকটকে অনেক দূরে রেখে খর্জুর বৃক্ষ পরিবেষ্টিত একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ডের আড়ালে উয়াচমেসের ক্রোড়ে বসে দুই বাহু দ্বারা তার গ্রীবাদেশ বেষ্টন করে হতশেপসুত অর্ধনিমীলিত চক্ষে গুনগুন করে গান গাইছিল আর সুখসাগরে ভাসছিল। বর্ষা আসতে আর বড়জোর ছয় মাস। বর্ষার অর্থ বৃষ্টি নয়। ওপর থেকে জল বয়ে এসে নীলনদ যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখনই বর্ষা। তারপর হেব-সেদ ভোজ। আর সেইদিনই ঘোষিত হবে তার সঙ্গে তার কোন্ ভ্রাতা মিশরের ভবিষ্যত ফ্যারাও রূপে নির্বাচিত হবে। ফলাফল অজানা নয়।

কথাটা ভেবেই উয়াচমেসের মুখটা দুবাহু বাড়িয়ে নিজের মুখের কাছে নামিয়ে আনে সে।

—কি হল ?

—কিছু না।

—তাহলে ?

—এমনি।

—ও।

—কী ও ?

উয়াচমেস বলে—কিছু না।

দুজনা হেসে ওঠে।

—গুনগুন করে কি গান গাইছিলে এতক্ষণ ?

—কত গান। সব কি মনে আছে। আমরা কতক্ষণ এখানে বসে আছি বল তো উয়াচমেস ?

—খেয়াল নেই।

—আমারও।

—তোমার গানের কথা না বুঝলেও সুরগুলো চেনা চেনা।

—হবেই তো। ও গান প্রেমের নয়—প্রার্থনার।

—সত্যি? কোন দেবতার?

—রা দেবতার।

—শোনাবে?

—না শোনানোর কি আছে?

—শুনি তবে।

হতশেপসুত খুব শান্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে গাইতে শুরু করে ঃ

"হে উদীয়মান সূর্য, কান পেতে রাখ আমার দিকে।
দেশের দুই অংশকে সৌন্দর্য আর সুষমায় ভরিয়ে রেখেছ তুমি,
হে মানব জাতির জীবনরশ্মি! আঁধার দূরীভূত কর,
স্বর্গে উদিত তোমার পিতা রা-এর মতই তোমার অঙ্গসৌষ্ঠব
তোমার আলো অন্ধকার ভেদ করে প্রত্যন্ত প্রান্তে পৌঁছে যায়।
যখন তুমি তোমার প্রাসাদে বিশ্রাম নাও
তখনো সকল দেশের বার্তা তুমি শুনতে পাও
কারণ তোমার রয়েছে অনন্ত শ্রবণেন্দ্রিয়।
তোমার চক্ষু স্বর্গের তারকারাজির চেয়েও স্বচ্ছ।
হে রা! তুমি তোমার পুত্র সূর্যের চেয়েও চক্ষুষ্মান
বহুদূর থেকে আমি কিছু বললেও তুমি শুনতে পাবে
আমি গোপনে কিছু করতে গেলেও তোমার আদেশ থাকবে না।
হে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যবান রা, হে সৌন্দর্যের সম্রাট
তোমারই কৃপায় মানব-বক্ষ শ্বাসপ্রশ্বাসে আন্দোলিত হয়।"

উয়াচমেস তন্ময় হয়ে শোনে। সে নানান্ দেবতার প্রতি হতশেপসুতের প্রার্থনায় কত সময় পাশে বসে শুনেছে। কিন্তু এমন সুরেলা কণ্ঠে কখনো প্রার্থনা জানাতে শোনেনি। এই সুর মন্দিরের দেবদাসীদের কণ্ঠে শ্রুত হয় কোন বিশেষ বিশেষ দিনে। হতশেপসুত নিশ্চয় তাদের কারও কাছ থেকে শিখেছে। বেশ মিষ্টি গলা। সে আনন্দের সঙ্গে গর্বও অনুভব করে। ভাবে, পৃথিবীতে তার মত সুখী ও গর্বিত পুরুষ বোধহয় অতীতে কখনো জন্মায় নি, ভবিষ্যতেও জন্মাবে না।

হতশেপসুত বলে—কি হল? আমার গান শুনে বোবা হয়ে গেলে কেন? এতই খারাপ?

তন্ময় ভাব কাটিয়ে উয়াচমেস বলে—আমি মুগ্ধ। আর একটা গাইবে?

হতশেপসুত উয়াচমেসের দুই গালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—হ্যাঁ।

সে গাইতে লাগল ঃ

"তাঁর চক্ষু প্রতিটি জীবের অন্তস্থল দেখতে পায়,
তিনিই, যিনি তাঁর অন্তর্ভেদী রশ্মি দ্বারা অবলোকন করেন।
তিনি সূর্যের চেয়েও মিশরকে অধিকতর আলোকিত করেন।
তিনি নীলনদের চেয়েও দেশকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেন।

তিনি তাঁর অনুসরণকারীদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন।
তিনি তাঁর অনুগতদের নিরাপত্তা দেন।"

প্রার্থনা সঙ্গীত শেষ হলে উয়াচমেস তার প্রিয়তমাকে জড়িয়ে ধরে বলে—সত্যিই তোমার তুলনা হয় না।

হতশেপসুত দুষ্টুমীর হাসি হেসে বলে—ভাগ্যিস তুমি নিজেকে চেন না। তাহলে এ কথা বলতে না।

—কেন ?

—তুমি যে কী, তুমি নিজেই জান না।

—এটা অতিশয়োক্তি। আমাকে বড় করে দেখাতে চাইছ। অথচ তুমি জান না তোমার খ্যাতিতেই আমার খ্যাতি। তোমার প্রতিষ্ঠায় আমার প্রতিষ্ঠা। আমি তোমাকে শুধু সারা জীবন নিরাপত্তা দিয়ে যেতে চাই। মিশর যাতে নিরাপদে থাকে শুধু সেইটুকু দেখতে চাই। আর কিছু নয়। ফ্যারাও-এর সবটুকু গরিমা তোমার হোক। আমি ওই পদের জন্য একটুকুও লালায়িত নই।

হতশেপসুত বলে ওঠে—তুমিও আজকাল মাঝে মাঝে অমেনমেসের ঢংএ কথা বল।

কথাটা বলে ফেলেই হতশেপসুতের বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। একী বলল সে ? সঙ্গে সঙ্গে অমেনমেসের উক্তি তার মনে পড়ে যায়। সে ইঙ্গিত দিয়েছিল উয়াচমেসও তাকে অনুসরণ করবে। মিশরের পরবর্তী ফ্যারাও ওই অনভিপ্রেত রাজকুমার যার মুখের ওপর সেই প্রচ্ছন্ন রেখা ভেসে উঠলে অত্যন্ত নিষ্ঠুর দেখায়। অথচ সে কাপুরুষ। বীর্য বলতে তার কিছু নেই।

উয়াচমেসকে সহসা দুই বাহু দ্বারা জড়িয়ে ধরে হতশেপসুত পাগলিনীর মত কাঁদতে থাকে।

—একি তুমি কাঁদছ কেন। কি হল ? আমাকে বল।

হতশেপসুতের কান্নার বিরাম নেই। এই নির্জন পরিবেশে সুখের ঘোরে কাটাতে কাটাতে এক ঝাঁক দুঃখ এসে সুখকে বিতাড়িত করে। উয়াচমেস কি করবে ভেবে পায় না। সে জানে মেয়েদের এই ধরনের কান্না কোনভাবে থামান যায় না। যখন থামার আপনা থেকেই থামে। বাইরে থেকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে বা প্রবোধ দিয়ে কোন লাভ নেই। আর দেবেই বা কি করে। কান্নার উৎস মুখ তার জানা নেই যে সেই মুখ চাপা দেবে কিছু দিয়ে। অসহায় ভাবে সে প্রিয়তমাকে অব্যক্ত বেদনার তীব্র জ্বালা সইতে দেখে। সেই জ্বালা তাকেও স্পর্শ করে।

কত কিছু করবে ভেবে তারা এখানে এসেছিল। কিছুই হল না। কি ভাবে যে কি হল বুঝতে পারল না উয়াচমেস।

ক্রন্দন স্তিমিত হয়। শেষে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। শুধু কয়েকটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পায় উয়াচমেস অন্য দিকে তাকিয়ে। হতশেপসুতের দিকে চাইতে তার মুখ ভেঙে যায়।

সহসা ছোট্ট মন্তব্য শোনে সে—অমেনমেস সব কিছুর মূলে।

একটা তড়িৎপ্রবাহ খেলে যায় যেন উয়াচমেসের সর্বাঙ্গে। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে সে বলে—কি বললে ?

—ঠিক বলেছি। অমেনমেস এর জন্য দায়ী।

—তুমি অমেনমেসকে ভালবাস না ?

—ভীষণ ভালবাসি। এখনো তোমার পরেই তার স্থান। কিন্তু সেই সঙ্গে তার ওপর আমার ক্রোধের অন্ত নেই।

—কেন ? সে বেচারার মন ছিল কত কোমল। তার ওপর ক্রোধ হতে পারে কখনো ?

—পারে। তাই হয়েছে। সে আমাদের সহজ সরল জীবনে জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

—কি ভাবে ?

—আমাদের যতই বুদ্ধি থাকুক তার একটা পরিসীমা রয়েছে। অমেনমেস জন্মেছিল সীমাহীন বুদ্ধি আর দৃষ্টি নিয়ে। সেই দৃষ্টি আর বুদ্ধি স্বর্গতে স্পর্শ করতে পারত মাঝে মাঝে। তাই আমার ক্রোধ।

—কিন্তু আজ সে তা আর নেই।

—না, নেই। কিন্তু তার অনেক কিছু রয়েছে। অনেক কিছু সে বলেছে যা সত্য কিনা আজও প্রমাণিত হয় নি। সেই জন্যই যত অশান্তি।

—তুমি অনর্থক, বড় বেশী চিন্তিত হও।

—বুঝতে পারবে না তুমি।

উয়াচমেস হেসে বলে—না বোঝাই ভাল।

সেই সময় উয়াচমেসের নজরে পড়ে দূরে তাদের শকটের পাশে আর একটি শকট থেমে রয়েছে।

হতশেপসুতকে সে বলে—দেখ তো আর কেউ এসেছে বলে মনে হচ্ছে।

বিস্মিত হতশেপসুত বলে ওঠে—তাই তো। কে এল এখানে ?

উভয়েই সংকুচিত হয়। প্রাসাদের শকটগুলি সবার পরিচিত। সেই শকটের পাশে অপর একটি এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূর থেকে দেখে মনে হয় সেটিও প্রাসাদের। তবে কি বড় রাজকুমার এসেছে ? তার ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক।

ওরা খেজুর গাছগুলোর মধ্যে অন্বেষণ করে। দেখতে পায় না কাউকে। যদি কারও তাদের রতিবিলাস গোপনে দেখার আগ্রহ থাকত তাহলে তাদের শকটের পাশে ওভাবে গাড়ি দাঁড় করাত না। সেটিকে অন্যত্র লুকিয়ে রাখত। তাছাড়া তারা উভয়ে এখন সহ-শাসক। এভাবে গোপনে দেখার ধৃষ্টতা একমাত্র বড় রাজকুমার ছাড়া এই ধরাধামে আর কারও নেই।

ওরা উঠে পড়ে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। অতি সাবধানে চলে খর্জুর বীথির মধ্য দিয়ে। তারা শকটের কাছে এসে দাঁড়াতেই একজন রাজকর্মচারী ব্যস্ত হয়ে অন্য শকট থেকে নেমে এসে তাদের অভিবাদন জানায়।

—কি খবর ? এখানে ?

রাজকর্মচারী অত্যন্ত সসম্ভ্রমে বলে—একজন বিদেশী ব্যবসায়ী এসেছেন।

ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে চান আপনার সঙ্গে। তাই ফ্যারাও আপনার সন্ধানে পাঠিয়েছিলেন। আপনার শকট দেখে প্রতীক্ষা করছিলাম।

এতক্ষণে উভয়ের প্রথম খেয়াল হয় তারা আর নিছক রাজকুমার ও রাজকুমারী নয়। তারা এখন সহ-শাসক, ফ্যারাও-এর সাহায্যকারী। তাদের ওপর গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এভাবে স্বাধীনভাবে সবার অজ্ঞাতে ঘুরে বেড়ান উচিত নয় তাদের। এদেশের শাসক হবার অর্থ দৈনন্দিন জীবনকে একটা নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে ফেলা। ফ্যারাও-এর জীবনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কোথাও এতটুকু স্বাধীনতা নেই। নিজের জন্য কিছু করার উপায় নেই। অবসর সময়টুকুও বেঁধে দেওয়া।

হতশেপসুত কর্মচারীকে বলে—আপনি গিয়ে বিদেশীকে খবর দিন আমি এখুনি যাচ্ছি।

সে বিদায় নিলে দুজনা দুজনার দিকে চেয়ে হেসে ফেলে।

মুতনেফার্তের রুদ্ধদ্বার কক্ষের এক কোণে তাঁর একমাত্র পুত্র চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চলেছিল তার গর্ভধারিণীকে—তুমি বুঝতে পারছ না মা। মিশরের সৈন্যদল এখন আমার অধীনে। সেই সৈন্যদলে যেমন রয়েছে বীর যোদ্ধা তেমনি রয়েছে অসমসাহসী গুপ্তচরবৃন্দ। তারা দেশে আর বিদেশে অবিশ্বাস্য সমস্ত কাণ্ড করে থাকে। এবিষয়ে এতদিন আমার কিছুমাত্র ধারণাও ছিল না। কিন্তু এখন আমিই হলাম সৈন্যদলের অধিপতি। তাই খুঁটিনাটি সব কিছু ওরা আমাকে জানাতে বাধ্য হয়।

পুত্রের মুখ থেকে প্রকৃত কথাটা বের করার জন্য মুতনেফার্ত বলেন—তাতে কি হয়েছে? ঘরের দরজা বন্ধ করে এই কোণে সরে এসে এসব কথা বলার অর্থ কি?

—অর্থ না বোঝার মত বুদ্ধিহীনা তুমি নও তা আমি ভালভাবে জানি।

—না। আমি বুঝিনি।

—সত্যিই বোঝোনি?

—না।

—আমি ইচ্ছে করলে অতি সহজে আমার পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে পারি।

মায়ের সর্বশরীর কেঁপে ওঠে—কি বললে?

—উয়াচমেসের মৃত্যু ঘটাতে পারি। কেউ বুঝতে পারবে না।

তীব্র কণ্ঠে মা বলে ওঠেন—এত দূর? ছি ছি। স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি আমার গর্ভের সন্তান এত নীচ হবে।

পুত্র থতমত খেয়ে যায়। এমন একটি সুন্দর প্রস্তাবে তার মায়ের যে এরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে সে ভাবতে পারেনি। তাই বলে—শেষে তুমিও।

—হ্যাঁ, আমিও। এভাবে তুমি ফ্যারাও হও আমি চাই না। এতে ওসিরিসের অভিশাপ লাগবে। আইসিস আর অনুবিসের কোপ বর্ষিত হবে তোমার ওপর।

অচিরেই তোমার মৃত্যু ঘটবে। মনের মধ্যে যে এই পাপ পুষে রেখেছ এর জন্যও হয়ত তুমি দীর্ঘায়ু হবে না। ছি ছি।

—বেশ। আমার তাহলে আর ফ্যারাও হওয়া ভাগ্যে নেই বুঝতে পারছি।

—তুমি আমার পুত্র। আমি কায়মনোবাক্যে চাই তুমি মিশরের ভবিষ্যত অধীশ্বর হও। কিন্তু ওভাবে নয়। ফ্যারাও-এর জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে তোমার অধিকার সর্বাগ্রে। আমি নানা ভাবে ফ্যারাও-এর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছি। একটা কথা মনে রেখ আজ যদি তাঁর ওপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে তুমিই হবে পরবর্তী ফ্যারাও। কিন্তু তিনিই সব নন। সম্রাজ্ঞীর দৌলতে তিনি আজ ফ্যারাও। তাই সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছার গুরুত্ব অনেক বেশী। সবচেয়ে বড় কথা হতশেপসুতই হল সম্রাজ্ঞীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী। এই হতশেপসুত তোমাকে একেবারে পছন্দ করে না। সে যদি পছন্দ করত তাহলে ফ্যারাও তোমার নাম কবে ঘোষণা করে দিতেন।

—জানি। আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার মন পাইনি।

—সে বড় অহঙ্কারী। তার ধমনীতে প্রবাহিত রক্ত সম্বন্ধে সে সচেতন। তোমার ধমনীতে মিশ্র রক্ত।

—এখন তাহলে কি করব ?

—ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর। তবে উয়াচমেসের অনিষ্ট চিন্তা একেবারে করবে না। মন থেকে ওসব মুছে ফেল। মিশরকে রক্ষা করেন দেবী বাস্ত্। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে যাও। প্রার্থনা জানাও মিশরের অসংখ্য দেবদেবীকে। তাঁদের কেউ না কেউ তোমার প্রতি সদয় হবেন বলে আমার দৃঢ় ধারণা। কারণ আমি জেনেশুনে তেমন অন্যায় কখনো করিনি। আমি চিরকাল দেবদেবীর অনুগত।

—তোমার কথা মনে থাকবে। তবে বড় অশান্তিতে দিন কাটবে।

—স্বাভাবিক। তুমি নীলনদের তীরবর্তী কৃষকদের পরিবারের কেউ নও। তুমি পিরামিড নির্মাণকারী কোন শ্রমিক নও। তারা সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ নাচগান আনন্দ স্ফূর্তি করে প্রথম রাতেই অকাতর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। তাই তাদের অপার শান্তি। তখন তারা শত অভাব শত অত্যাচার অবিচারের ঊর্ধ্বে চলে যায়। কিন্তু রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আরম্ভ হয় আবার সেই ক্লেশকর জীবন। তুমি তাদের কেউ নও। তাই দেহের ক্লেশের চেয়ে মানসিক চাপ তোমার ওপর বেশী। রাতের নিদ্রাতেও তাই ব্যাঘাত ঘটে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ফ্যারাও কিংবা রানীরা যত সুদর্শন আর সুন্দরীই হোক না কেন একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে তাঁদের চোখের কোলে দুশ্চিন্তার ছায়া। নারীরা রূপচর্চার দ্বারা সেই ছায়া ঢেকে রাখতে পারে। ফ্যারাও তা ঢেকে রাখেন তাঁর মুখোশ দিয়ে। তবু তা ধরা পড়ে যায় কখনো সখনো। কারণ স্বাভাবিক মুখখানাকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে অনেক সময়ই খুলে রাখতে হয়।

মায়ের কথা শুনতে শুনতে বড় রাজকুমার ভাবে, সে নিজে যদিও ততটা শিক্ষিত নয়, যতটা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাই বলে মায়ের চেয়ে নিশ্চয় বেশী

জানে। অথচ মায়ের মধ্যে জ্ঞানের এত গভীরতা এল কোথা থেকে ? শিক্ষাই তো জ্ঞানের প্রকাশ ঘটায়। মায়ের শিক্ষা তবে কি ?

মাকে সে প্রশ্ন করে—তুমি এত জানলে কোথা থেকে ?

—চোখ কান খোলা রেখে। আর অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণের কাজে লাগিয়ে। প্রাসাদের নারীদের এর চেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় না। এই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, সৈন্যবাহিনীর একজনকেও নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজে লাগিও না। কথাটা মনে রেখ।

—রাখব।

—চোখ কান খোলা রাখি বলে আর একটা খবরও আমার অজানা নয়।

—কোন খবর ?

—আসেত্ নামে মেয়েটির সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা।

এবারে চবরোস রীতিমত অবাক হয়ে যায়। বলে—তুমি জান ?

—এটা জানা এমন কিছু কঠিন নয়। সবাই জানে।

—হতশেপসুত ?

—সেও জানে।

—কিছু বলে না তো ?

—কেন বলবে ? তুমি তো তার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ নও। খুব ভাল করনি।

—আমি অন্যায় করেছি ?

—সে কথা বলছি না। তুমি যুবক হয়েছ। এখন এমন ঘটনা স্বাভাবিক। কিন্তু আসেত্-এর গর্ভসঞ্চার হলে জটিলতাই বাড়বে শুধু।

—গর্ভসঞ্চার হবে না।

—অত জোর দিয়ে কি করে বলছ।

—তুমি দেখে নিও।

মুতনেফার্ত পুত্রের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে মৃদু হেসে দ্রুত চলে যান। ফ্যারাও এই সময় প্রায়ই হারেমে সুন্দরীদের কাছে আসেন। যদি একবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, তাতেই চলবে। ফ্যারাও-এর মনে শুধু একটু-খানি চাপ সৃষ্টি করা। এখন বয়স হয়েছে তাঁর। আগের মত চাপ সহ্য করার অসামান্য ক্ষমতা এখন তাঁর নেই। অনেক হ্রাস পেয়েছে।

প্রাসাদের উদ্যানে আনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একা হতশেপসুত। উয়াচমেস কোথায় যেন গিয়েছে। কিছুদিন ধরে সে একটু অন্যমনস্ক। সে খবর পেয়েছে গিজায় দুটি পিরামিডের ক্ষতিসাধন করেছে কিছু তস্কর। খুব বিচলিত হয়েছিল সে। এখানে উপস্থিত থেকে যথাসাধ্য ব্যবস্থা নিয়েছে এবং বলে রেখেছে এবারের বর্ষার পরে নীলনদ শীর্ণকায় হয়ে যাবার আগেই সে একবার যাবে সেখানে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি ছোট বড় সমাধিক্ষেত্র পরিদর্শন করবে।

কিন্তু অবিদস নগরীর একটি বার্তা তাকে অস্থির করে তুলেছে। এই নগরী হল প্রতিটি মিশরবাসীর তীর্থস্থান। ওখানে তাদের প্রিয়তম উপাস্য দেবতা

ওসিরিসের সমাধিস্থল রয়েছে। নগরীটি দেবদেবীর উপাসনালয়ে চিরসমৃদ্ধ। উয়াচমেস জেনেছে একটি মন্দিরের ভগ্নপ্রায় অবস্থা। ওই মন্দিরটির কথা সে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমেনমেসের পরিচারক পিমাই-এর মুখে বেশ কয়েকবার শুনেছিল। ওটি উল্লেখ করার সময় পিমাই-এর মস্তক শ্রদ্ধাবনত হত। উয়াচমেস তাতে প্রভাবিত হয়েছিল। গিজার পিরামিড পরিদর্শন বর্ষা না আসা পর্যন্ত স্থগিত রাখলেও এটির বেলায় সে পারল না। ঠিক করেছে কয়েকদিনের মধ্যে অবিদস রওনা হবে। ফ্যারাও প্রথম থুথমস সম্মতি দিয়েছেন। সম্মতির কোন প্রয়োজন ছিল না। সে নিজেই নিজের বিভাগের চূড়ান্ত নির্দেশদাতা। তবু শত হলেও ফ্যারাও তার পিতা। পিতার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা মিশরবাসী রূপে তার কাছেও গুরুত্বপূর্ণ।

হতশেপসুত চেয়েছিল উয়াচমেসের সঙ্গিনী হতে। কিন্তু পিতা নিষেধ করেছেন। এখন আর ভ্রাতা-ভগিনী বা প্রিয়তম-প্রিয়তমার মত একত্রে রাজধানীর বাইরে বেশীদিনের জন্য স্বতন্ত্র ঘুরে বেড়ান সম্ভব নয়। কারণ হতশেপসুতের নিজেরও একটি বিভাগ রয়েছে যা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিভাগ সব সময়ে তার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। দুইজনে একসঙ্গে বাইরে গেলে প্রশাসনের একটা বড় অংশ অচল হয়ে পড়বে। তবু উয়াচমেসের দুশ্চিন্তা দেখে সে মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করে। এতটা অস্থির আগে কখনো তাকে হতে দেখেনি হতশেপসুত। মন্দিরটির সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত রাতের নিদ্রা কেউ যেন কেড়ে নিয়েছে বলে মনে হয়। ওখানে গিয়ে দেবতার সম্মুখে দাঁড়ানর আগে অবধি তার শান্তি নেই। মন্দিরটির তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছে যেন সে।

হতশেপসুত নিজের উদ্বেগ চাপতে না পেরে দুদিন আগে তার হাত টেনে ধরে বলেছিল—কী এমন হয়েছে? তোমাকে আমি জানি যোগ্যতম প্রশাসক রূপে। এত সামান্য বিষয়ে চিন্তা করে তুমি ভেঙে পড়ছ দেখে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

—জানি প্রিয়তমা, তুমি কি ভাবছ। কিন্তু কে যেন ওই মন্দির থেকে অহরহ আহ্বান করছে 'আয় আয়' বলে। সেই ডাক আমি শুনতে পাচ্ছি।

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

—আমি নিজেও সেই সন্দেহ করেছি। কিন্তু মাথা খারাপ হলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার প্রকাশ পেত। তেমন তো হচ্ছে না। আমার মনে হয় ওখানকার দেবতা কোন অনাচার সহ্য করতে পারছেন না।

—কিন্তু ওটি তো ওসিরিসের মন্দির নয়। ওটি অনুবিসের মন্দির।

—জানি। মনে হয় অনুবিস তলব করে পাঠিয়েছেন আমাকে। নইলে মনের অবস্থা এমন হবে কেন? কোন বিষয়ে মন দিতে পারছি না। নিশ্চয় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন কোন কারণে।

আজ উয়াচমেস কোথায় যেন বের হয়েছে। বোধহয় অবিদসে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে। তাই সঙ্গীহীন অবস্থায় এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল হতশেপসুত। কয়েকজন বণিক এসেছিল। তারা এই দেশেরই। বাইরে যেতে চায় কাঠের আমদানী করবে

বলে। এদেশে কাঠের খুব অভাব। অথচ কাঠের আসবাব সামগ্রী তৈরীর জন্য নিপুণ কারিগর রয়েছে। তাদের জন্য কাঠের যোগান দেওয়া প্রয়োজন। নইলে বসে যাবে তারা। এছাড়া রয়েছে নৌ-যান নির্মাণের কারখানা। তার জন্যও প্রচুর কাঠের প্রয়োজন। অথচ এজন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। তাই কাঠব্যবসায়ীদের গুরুত্ব খুব বেশী। সকালে এমনই একটি দল এসেছিল। তারা হতশেপসুতের কাছ থেকে পত্র নিয়ে গিয়েছে সেই দেশের শাসনকর্তাকে দেবে বলে।

হতশেপসুত হিসাব করছিল বর্ষার আর কত দেরী। তখনই হবে হেব-সেদ ভোজ। তখনই পিতা ঘোষণা করবেন পরবর্তী ফ্যারাও-এর নাম। অর্থাৎ কার সঙ্গে তার বিবাহ হবে। বেশী দেরি নেই। নীলনদের উৎপত্তিস্থল তার মানস-চক্ষে ভেসে ওঠে। সেখানে সে শুনতে পায় নতুন জলরাশির জন্মকালে ধরিত্রীর প্রসব বেদনা। সত্যিই দেরি নেই বেশী।

আজকের দিনটা বড় শান্ত ছিল। মরু-ঝড়ের বালাই নেই। সূর্যের তাপের প্রখরতা যে কোন কারণেই হোক বেশ স্তিমিত। আজ উয়াচমেস কাছে থাকলে বড় ভাল হত। অনেকদিন পরে হেকারনেহেহ্-এর কথা মনে পড়ে। বোধহয় ওই সরোবরের সোপানশ্রেণী দেখে তাঁর কথা মনে পড়ল। ওখানে বসে তিনি কত কথা বলতেন। ওখানে বসে আবানা-পুত্র অনেক বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী শুনিয়েছেন। চরিত্রবল বাড়াতে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের দুইজনের মত তার নিজের শিক্ষকও একদিন পরিপক্ব খর্জুরের ন্যায় টুপ্ করে জীবন থেকে খসে পড়ে গিয়েছিলেন। তার নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও টেনে হিঁচড়ে জীবন থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরা সবাই ছিল দেশের সম্পদ। সম্পদ অনেক রয়েছে দেশে। নইলে দেশ চলছে কি ভাবে? কিন্তু এই অতি পরিণত এক গুচ্ছ সম্পদের কথা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে মনে রাখবে।

সে ধীরে ধীরে সোপানশ্রেণীর একটিতে গিয়ে বসে। একটি ক্ষুদ্র উপলক্ষ নিয়ে আনমনে স্থির বারিরাশিতে নিক্ষেপ করে। তরঙ্গ ওঠে। সেটি বড় হতে থাকে। হতশেপসুত এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে।

সেই সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে উয়াচমেস দণ্ডায়মান।

চিৎকার করে ওঠে হতশেপসুত—উয়াচমেস।

সে সিঁড়ি থেকে উঠে ছুটে তার কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েও থেমে যায়। উয়াচমেস তার পরিচারককে সঙ্গে করে এনেছে। বেশ বিরক্ত হয় হতশেপসুত। এখানে পরিচারককে সঙ্গে না আনলে কি চলত না? কিন্তু উয়াচমেসের মুখের দিকে চেয়ে তার বিরক্তি অন্তর্হিত হয়। পরিবর্তে দেখা দেয় উদ্বেগ। সদাহাস্যময় উয়াচমেস বেশ গম্ভীর।

—তোমার কি হয়েছে?

—কিছু হয়নি। আমি কালই অবিদসে চলে যাচ্ছি। ভোরবেলায়। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না ভেবে এখানে চলে এলাম।

অদ্ভুত কথা বলছে উয়াচমেস। কেন, প্রাসাদের দুজনার যে কোন একজনের কক্ষে কি রাতে দেখা হতে পারে না?

কিন্তু পরিচারকের সামনে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে—প্রাসাদে আমার কিংবা তোমার কক্ষে দেখা হতে পারত।

—না, সেটা সম্ভব হবে না। আমি একটু ব্যস্ত থাকব। এখান থেকে দুজন কারিগর নিয়ে যাচ্ছি যারা পুরনো মন্দির সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তাদের সঙ্গে আজ রাতে একটু আলোচনা করতে হবে। দেবতা অনুবিসের মন্দির বলে কথা।

—বেশ তো। সেই আলোচনা সেখানে পৌঁছে মন্দিরের অবস্থা দেখে করলে ভাল হত না কি? এখানে এতদূরে বসে মন্দির না দেখে কি ভাবে আলোচনা করবে?

—আমি তাদের সঙ্গে কথা বলে যাচাই করে নিতে চাই তারা কতটা দক্ষ। শুধু শুধু অতদূরে নিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই।

হতশেপসুত উয়াচমেসকে সঙ্গে নিয়ে পায়চারি করতে করতে পরিচারকের থেকে অনেকটা দূরে চলে আসে। তারপর তার বিস্ফোরণ ঘটে।

সে বলে—তুমি বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছ। একটা মন্দির মেরামত করতে যদি এতটা মানসিক চাপের মধ্যে পড়তে হয় তাহলে সমগ্র দেশের লক্ষ লক্ষ মন্দিরের কথা ভাবতে গেলে ভেঙে পড়বে কিংবা পাগল হয়ে যাবে।

—এই বিশেষ মন্দিরটির কথা স্বতন্ত্র। আমি অবিরত ডাক শুনছি। স্বপ্ন দেখছি।

হতশেপসুত মৃদু কণ্ঠে বলে—আমি তোমার সঙ্গে থাকলে ভাল হত। ফ্যারাও যেতে দিলেন না। আজ গভীর রাতে একবার তোমার কাছে যাব?

—না। আমি সাতদিনের মধ্যেই ফিরে আসব। আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

জীবন্ত উয়াচমেস আর ফিরে এল না। এল তার শবদেহ। এল চুপিসাড়ে গভীর রাতের হিমেল অন্ধকারে। প্রাসাদপুরী তখন নিদ্রায় অচেতন। শুধু প্রহরীরা সতর্ক। হারেমের নারীরক্ষীদেরও কারও কারও চোখে নিদ্রার ঝিমুনি। অতি কষ্টে চোখের পাতা দুটো টেনে রাখতে রাখতে যখন সত্যিই অপারগ হচ্ছে তখন উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী শুরু করছে তারা।

তারই মধ্যে প্রাসাদে এসে প্রবেশ করল উয়াচমেসের শবদেহ। সেই দেহকে নিয়ে যাওয়া হল সমাহিত হবার পূর্বে দেহটিকে নানান প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করার জন্য যে প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট রয়েছে সেইখানে।

কেউ জানল না। কেউ শুনল না। সূর্যোদয়ের পূর্বে এই নিদারুণ-সংবাদ কাউকে জানাতে নিষেধ করেছেন ফ্যারাও। হ্যাঁ, ফ্যারাও শুধু জানেন। তিনি জেনেছিলেন সন্ধ্যার প্রাক্কালে। আর জেনেছিল তাঁর প্রধান অমাত্য এবং অমাত্যের দুই সহায়ক। ফ্যারাও চাননি দিন অবসানে এই মর্মান্তিক সংবাদ তাঁর সম্রাজ্ঞী অথবা হতশেপসুতের কাছে গিয়ে পৌঁছক। অন্তত রাতটুকু তারা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাক। আগামীকাল একটু বেলায় জানান হবে। তারপর তো বুক ভেঙে

যাবে উভয়ের। তাঁরও কি ভাঙেনি? একটি নয়, দুই দুইটি পুত্রের শোক পিতৃ-হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। কিন্তু তিনি ফ্যারাও। ভেঙে পড়তে পারেন না। তাঁর দুঃখপ্রকাশের মধ্যেও সংযম এবং শোভনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। নইলে তাঁর দেবত্বে কলঙ্ক লাগে। সারারাত তাঁকে একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছটফট করতে হবে। কোন রানী বা অপর কোন নারীকে আসতে দেবেন না তাঁর শয্যায়। মনের সেই অবস্থা আবার কবে হবে জানা নেই তাঁর। হয়ত হবেই না। তাঁর যৌবনের শেষ লালিত্যটুকু সূর্যাস্তের শেষ রক্তাভার মত অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবে আজকের রাতের পরেই।

সন্ধ্যার পূর্বেই এসেছিল সেই নিদারুণ দুঃসংবাদ। নিয়ে এল অবিদসের মন্দিরের পুরোহিতের প্রধান সহায়ক। তার সঙ্গে ছিল উয়াচমেসের পরিচারক। এই পরিচারককে আজই প্রথম দেখলেন ফ্যারাও, অথচ দেখেই ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠলেন। তার উপস্থিতি অসহ্য বলে মনে হতে লাগল তাঁর। কনিষ্ঠ-পুত্র অমেনমেসের সেই পরিচারকের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। এখনো তাঁর বিশ্বাস তারই উস্কানিতে কনিষ্ঠ পুত্র মরু অভিযানে উৎসাহিত হয়েছিল। আজও তাঁর মনে হল, এই লোকটিই তাঁর পুত্রকে মন্দির-নগরীতে যাবার জন্য তাতিয়ে ছিল। নইলে ওই বিশেষ দেবালয়টির সংস্কারের জন্য সে নিজে যেত না কখনো। দেশে কত শত উপাসনালয় রয়েছে। অনেকগুলোতে সংস্কারকার্য চলছে। সেখানে তো যেতে হয়নি কাউকে।

পরিচারক ফ্যারাও-এর চোখ মুখ দেখে ভয়ে কেঁপে ওঠে। কিন্তু পুরোহিতের সহায়ক এতটুকু বিচলিত নয়। জীবনে প্রথম ফ্যারাও-এর সামনে দাঁড়াবার সৌভাগ্য হওয়ায় তার মনের মধ্যে অন্য প্রতিক্রিয়া। সে মর্মে মর্মে পীড়িত হচ্ছিল এই কথা ভেবে যে আজ যদি সে একটি সুসংবাদের বাহক হয়ে ফ্যারাও-এর সামনে এভাবে দাঁড়াতে পারত তাহলে তাঁকে কতই না সুখী করা যেত। দেবতাকে সুখী করার মত ভাগ্য নিয়ে সে জন্মায় নি।

অস্ফুট কণ্ঠে ফ্যারাও তাকে প্রশ্ন করেন—কি হয়েছিল?

—মন্দিরের ছাদের নীচের দিকে কয়েক খণ্ড প্রস্তর বহুদিন থেকেই শিথিল অবস্থায় ছিল। আশঙ্কা ছিল, যে কোন মুহূর্তে সেগুলি কিংবা তাদের মধ্যে কোন একটি খসে পড়বে। নীচে পড়লে ঠিক দেবমূর্তির মাথার ওপর পড়ার কথা। রাজকুমারকে পুরোহিত নিষেধ করেছিলেন দেবতার মূর্তির কাছে যেতে। উনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন সেকথা শুনে। বলেছিলেন যে দেবতার মূর্তি নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা অথচ তিনি যাবেন না, সেটা মানতে পারবেন না।

এই সময় ফ্যারাও প্রশ্ন করেন—দেবতাকে অন্যত্র সরানো হয় নি কেন?

পুরোহিত বলেন, দেবতা সরতে চাননি।

—কেন?

—অনুবিসের এই মন্দিরটি অন্যান্য মন্দিরগুলির তুলনায় অনাদৃত অবস্থায় ছিল। পুণ্যার্থীদের সংখ্যা দিন দিনই কমে আসছিল। মন্দিরের অর্থভাণ্ডার হ্রাস পেয়েছিল। তাই দেবতা চেয়েছিলেন যতদিন পর্যন্ত এই অবস্থার উন্নতি না

হয় ততদিন অনড় হয়ে ওইখানেই বসে থাকবেন। এক চুলও এদিক ওদিক যাবেন না।

—তাহলে সংস্কারের কাজ কিভাবে সম্ভব ?

—সেই ব্যবস্থা করার জন্যই রাজকুমার তাঁর লোকদের নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুরোহিতের অনুরোধ রাখলেন না। গিয়ে দাঁড়াতেই একটি প্রস্তর খসে পড়ল তাঁর কাঁধে।

—কিছু বলতে পেরেছিল ?

—হ্যাঁ। বলেছিলেন, এবারে মন্দিরটির সুদিন আসবে।

—আর কিছু ?

—বলেছিলেন, তিনি জানতেন এমন হতে পারে। স্বপ্নে দেখেছিলেন। আর বলেছিলেন, রাজকুমারী যেন শোকাকুলা না হন। এটাই অদৃষ্টে ছিল। তিনি যেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করেন।

—আর কিছু ?

—আরও কিছু বলেছিলেন, কিন্তু খুব অস্পষ্ট। ততক্ষণে রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করেছিল সর্বাঙ্গে। কাঁধের এক পাশ ভেঙে নেমে গিয়েছে।

দৃশ্যটি বার্তাবাহকের চোখের সামনে ভেসে ওঠায় ফ্যারাও-এর সামনেও সংযত থাকতে পারে না। কেঁদে ওঠে সে। তার দেখাদেখি পরিচারকও কেঁদে ফেলে। যতটা না দুঃখে, তার চেয়েও বেশী ভয়ে। কেন যেন তার পিমাই-এর পরিণতির কথা মনে হয়। প্রভু জীবিত না থাকলে তার বান্দাকে দায়ী করা হয় স্বাভাবিক ভাবে। তাই তাকেও হয়ত জীবিত অবস্থাতেই কুমীরের মুখের সামনে নিক্ষেপ করা হবে। কিংবা পাথরের বা কাঠের তৈরী উশবতির কালে তাকেই হয়ত তার প্রভুর দেহের সঙ্গে রেখে দেওয়া হবে। আগে এমন নিয়ম তো চালুই ছিল। সেই নিয়ম একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিনা কে জানে। কারণ এককালে প্রভুর মমির সঙ্গে অনেক ক্রীতদাসকেও জীবন্ত অবস্থায় সমাধি মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখে আসা হত। তারা প্রভুর হয়ে পরিশ্রম করে দেয়। প্রভুকে আর অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় ওই দেশে শস্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করতে হয় না। জীবন্ত সমাধিস্থ বান্দারা কিংবা তাদের পরিবর্তে রক্ষিত উশবতিরাই সব করে দেয়।

ফ্যারাও ওদের ক্রন্দনে বিরক্ত হয়ে হাত উঁচিয়ে থামতে ইঙ্গিত করেন। প্রধান অমাত্য ওদের চলে যেতে বলে। কারণ সে উপলব্ধি করেছিল ফ্যারাও-এর মনের শোচনীয় অবস্থার কথা। তাঁকে বিধ্বস্ত বলে মনে হচ্ছিল।

পরদিন প্রভাতে ফ্যারাও নিজে অটল ধৈর্যের সঙ্গে সম্রাজ্ঞী অহমেস-এর কাছে দুঃসংবাদটি প্রকাশ করেন। কিন্তু কথাটা উচ্চারিত হবার আগেই সম্রাজ্ঞী আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন ফ্যারাও-এর অস্বাভাবিক আচরণে। এই বয়সে স্ত্রীকে এত কাছে টেনে নিয়ে কখনো আদর করেন নি তিনি। আর আজও আদরে কোন উষ্ণতা ছিল না। ফ্যারাও-এর চাহনিও ছিল উদ্‌ভ্রান্তের মত। সম্রাজ্ঞীর মনে হচ্ছিল স্বামী তাঁর অসুস্থ। কিংবা তিনি কোন কিছু বলতে চাইছেন, অথচ বলতে পারছেন না।

—তুমি অমন করছ কেন ? কি বলবে আমাকে ?

—তুমি হলে মিশরের সম্রাজ্ঞী। যে সব শোকতাপে সাধারণ মানুষ ভেঙে পড়ে তুমি তাতে থাক অবিচল। কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর সময় তোমার মুখের দিকে চেয়েই আমি সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। আমি বুঝেছিলাম, কত সংযত তোমার মন। সেদিন তুমি ছিলে আমার একমাত্র ভরসাস্থল।

অধৈর্য সম্রাজ্ঞী বলে ওঠেন—কী বলতে চাইছ তুমি ? আবার কি হল ?

আরও কিছুক্ষণ নানান কথার জাল বিস্তারের চেষ্টা করে অবশেষে ফ্যারাও উয়াচমেসের মৃত্যুসংবাদ দেন তাঁর স্ত্রীকে।

সঙ্গে সঙ্গে সম্রাজ্ঞী মূর্ছিত হল।

ফ্যারাও কক্ষ থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাজ্ঞীর খোদ পরিচারিকাকে বলেন, হকিমকে খবর দিতে। তিনি নিজেও সারারাত অনিদ্র অবস্থায় বসে থাকা প্রধান অমাত্যকে সম্রাজ্ঞীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বলেন।

নিমেষে সম্রাজ্ঞীর অসুস্থতার সংবাদ প্রাসাদে ছড়িয়ে পড়ে, আর ছড়িয়ে পড়ে কেন তিনি এভাবে সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রাসাদের প্রতিটি প্রাণী রুদ্ধবাক্ রুদ্ধশ্বাস হয়ে যায়।

হতশেপসুতের পরিচারিকা নেসামুনও খবরটি শোনে। শুনে চমকে ওঠে। উয়াচমেসের প্রতি তার কর্ত্রী প্রেমের গভীরতার কথা তার চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না। সব শেষ। তার কর্ত্রীর জীবনের সবটুকু রস শুকিয়ে গেল আজ থেকে। এর পর হয়ত অন্য ধরনের এক জীবন শুরু হবে তার। নেসামুন বুঝতে পারে, জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে বিবাহ করা ছাড়া এখন আর অন্য কোন পথ খোলা নেই হতশেপসুতের কাছে। কিন্তু সেই বিবাহ নামেই বিবাহ। মনের মিলন ঘটবে না কখনো—ঘটতে পারে না। কারণ উভয়কেই সে ভালভাবে চেনে। একজন যদি হয় উপরের তাম্রখনি অঞ্চল, অন্যজন তবে সর্বনিম্নে মেমফিস এবং গিজা পেরিয়ে সমুদ্রাঞ্চল। একজন যদি হয় ভয়াবহ শুষ্ক মরু অঞ্চল, অন্যজন তবে নীলনদের তটভূমির শস্যশ্যামলা উর্বর ক্ষেত্র। কোন্ সূত্রকে অবলম্বন করে উভয়ের মনের মিল হবে। নেসামুন সত্যই তার কর্ত্রীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। হতশেপসুত এখনো নিদ্রিত রয়েছে। সবাই জানলেও সে এখনো জানে না তার জীবনের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ ঘটে গিয়েছে। অথচ তাকে জানাতেই হবে। সে না জানালে ফ্যারাও-এর নির্দেশে অন্য কেউ এসে জানাবে।

আর ঠিক সেই সময় একজন নারী বার্তাবাহিকা এগিয়ে আসে দ্বারপ্রান্তে। ফ্যারাও-এর খাস পরিচারিকা সে। সবাই তাকে খাতির করে। সে নিজেও তার ওজন বুঝে যতটা সম্ভব গম্ভীর থাকে।

সে নেসামুনকে বলে—রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করব। ফ্যারাও পাঠিয়েছেন।

নেসামুন ভাবে, দুঃসংবাদটি তার মুখ থেকে আর শুনতে হবে না কর্ত্রীকে। সে বলে—আমি তাঁকে জাগিয়ে দিচ্ছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

নেসামুন কক্ষে প্রবেশ করে দেখে হতশেপসুতের ঘুম ভেঙেছে। সে শয্যায় শুয়ে ওপরের দিকে চেয়ে রয়েছে। তার মুখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন-মাখান আলতো হাসির ছোঁয়া। নেসামুনের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। সেই মোচড়ে তার চোখদুটি ছলছল্ করে ওঠে। কোনরকমে সামলে নেয়।

হতশেপসুত তাকে দেখে রসিকতা করে বলে—এত দেরি! রাতে কাউকে স্বপ্ন দেখছিলে নাকি? ওসব স্বপ্ন দেখা চলবে না। ওটায় আমার একচেটিয়া অধিকার।

এভাবে কখনো তামাসা করে না হতশেপসুত। এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। তবু আজ এভাবে বলে ফেলল। শুনে চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে নেসামুনের।

—একি? কাঁদছ? কি হল? সত্যিই কেউ আছে নাকি তোমার?

—আপনার জন্য ফ্যারাও-এর বার্তাবাহিকা বাইরে অপেক্ষা করছে। ফ্যারাও কিছু বলে পাঠিয়েছেন।

—আমার কাছে পাঠিয়েছেন? এই সকালেই?

—হ্যাঁ।

—ডাকো তাকে।

স্ত্রীলোকটি হতশেপসুতের শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ায়। এভাবে রাজকুমারীকে কখনো সে দেখেনি। নেসামুনের প্রতি মনে মনে একটু ঈর্ষান্বিত হয়।

—কি খবর?

স্ত্রীলোকটির কৃত্রিম গাম্ভীর্য খসে পড়ে। সে অনেক ভেবেচিন্তে এসেছিল কিভাবে খবরটা প্রকাশ করবে। সব গুলিয়ে যায়। বিচলিত হয়ে সে একবার নেসামুনের মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চায়, যদি কোন সাহায্যের ইঙ্গিত মেলে। কিন্তু নেশামুন নির্বাক। তার নয়নদ্বয়ে তখনো বাষ্প।

স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত স্থূল ভাষায় বলে—মহামান্য ফ্যারাও আপনাকে জানাতে আদেশ দিয়েছেন যে রাজকুমার উয়াচমেসের অবিদসে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে।

নেসামুন বিস্মৃত হয় তার নিজের শোকের কথা। তার দৃষ্টি থেকে ক্রোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হয়। কিন্তু সেটা ক্ষণেকের জন্য। সে তাড়াতাড়ি হতশেপসুতের দিকে ছুটে যায়। কারণ সে দেখল তার কন্যার মুখের রক্তিমাভা বিলুপ্ত, তার দৃষ্টি স্থির নিশ্চল।

স্ত্রীলোকটি তাই দেখে প্রায় ছুটতে ছুটতে কক্ষ পরিত্যাগ করে চলে যায়। আর নেসামুন পূর্বে যা কখনো করেনি তাই করে বসে। সে হতশেপসুতকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু এ কি! তার হৃদস্পন্দন থেমে যায়নি তো? সর্বাঙ্গ এত শীতল কেন? তার দৃষ্টিতে ভাষা নেই কেন? কোন্ দিকে চেয়ে রয়েছে সে? ওই আঁখিপল্লব হাত দিয়ে বুঁজিয়ে দিলে কি আর উন্মীলিত হবে না? না না, এই তো দেখছি বুকের স্পন্দন থেমে যায়নি। অতি ক্ষীণভাবে ওঠানামা করছে এখনো। হয়ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবীর হৃদয়েও এমন ক্ষীণতম প্রাণের স্পন্দন মিলবে।

কি করবে ভেবে না পেয়ে সে হতশেপসুতের সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। তবু কোন প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় না।

সে ডাকে—রাজকুমারী।

সাড়া নেই।

তবে কি রাজকুমারীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল? তিনি কি তাঁর অনুভবশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন? এই হৃদয়বিদারক বার্তা সহ্যাতিরিক্ত হওয়ায় মস্তিষ্কের কাজ এলোমেলো হয়ে গিয়েছে?

—রাজকুমারী?

—কে নেসামুন? আমার গায়ে আঘাত কর তো।

—কেন রাজকুমারী। এমন কোমল ত্বকের ওপর আঘাত করব কেন?

—আচ্ছা আমি কি জেগে আছি?

—হ্যাঁ, আপনি জেগে আছেন।

—তুমি স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছ না তো? ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখছি। ভেবে বল, সত্যিই কি আমি জেগে আছি?

এবারে নেসামুন কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে—হ্যাঁ, রাজকুমারী। আপনি জেগে আছেন। আপনি যা শুনেছেন, সত্য।

—ও।

—হ্যাঁ, তাঁকে দক্ষিণের সেই নির্দিষ্ট কক্ষে রাখা হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যার পরে প্রথম সংবাদ আসে। দেহ আসে গভীর রাতে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হতশেপসুত বলে—এত দেরিতে জানলাম? তার মন চায়নি। রাতের নিদ্রা নষ্ট হবে।

—আগামী রাতে তাহলে কি হবে? তাছাড়া আমি হলাম ফ্যারাও। আমি সব সহ্য করতে পারি। এই দেখ, পারছি না? ফ্যারাও আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি ফ্যারাও—শুধু ফ্যারাও। সত্যিকারের ফ্যারাও। নারীও নই, পুরুষও নই। শুধু ফ্যারাও। যে সব পুরুষেরা ফ্যারাও হয়েছে, তারা ব্যভিচারী হয়—ব্যভিচারী হওয়া তাদের সাজে। আমি পুরুষ নই নেসামুন। আমি যেদিন ফ্যারাও হব সেদিন দৈবশক্তি পাব। হ্যাঁ, আমিই ঈশ্বর সেদিন থেকে। পেছন ফিরে তাকানো আমার সাজে না।

—হ্যাঁ রাজকুমারী।

—আর আমি পেছন ফিরে তাকাব না। দৃষ্টি থাকবে সামনে। জীবন থেকে ওরাই যখন ঝরে গেল, তখন অন্যেরা ঝরে গেলেও আমার কিছুই এসে যায় না। আমি ফ্যারাও। দেশ দেখবে আমি ফ্যারাও, পৃথিবী দেখবে আমি মিশরের ফ্যারাও।

নেসামুন অবাক হয়ে লক্ষ্য করে হতশেপসুতের মুখে সেই রক্তিমাভা ধীরে ধীরে ফিরে আসে। কিন্তু সেই আগের উজ্জ্বলতা আর আসে না। তার দেহের কোমলতাও যেন এক লহমায় হ্রাস পেয়ে যায়। পরিবর্তে একটা ঋজুতা দেখা যায় তার মধ্যে।

শয্যা ছেড়ে যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন সে অন্য মানবী। আগের মত মোহ-জাল সৃষ্টি করার সুষমা যেন তার আর নেই। পরিবর্তে অন্য এক দুর্নিবার শক্তির অধিকারিণী হয়ে ওঠে সে।

—চল।

—কোথায় রাজকুমারী?

—সেই দক্ষিণের প্রকোষ্ঠে, যেখানে আমার প্রিয়তম উয়াচমেস শায়িত রয়েছে। পরে আর তাকে পরিপূর্ণভাবে দেখার সুযোগ পাব না। পরে তার দেহকে ঘিরে সমাধিস্থ করার যোগ্য করে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। এখুনি চল।

হতশেপসুত দায়সারা ভাবে তার দেহকে আবৃত করে দৃঢ় পদে গিয়ে সেই প্রকোষ্ঠের বহির্দ্বারে গিয়ে থামে। সেখানে প্রহরী প্রহরারত। রাজকুমারীকে দেখে সে অভিবাদন করে সরে দাঁড়ায়। ভেতরে প্রবেশ করে হতশেপসুত।

স্থানটি অন্যান্য কক্ষের মত আলোকিত নয়। একদিকে একটি বাতি জ্বলছিল। উয়াচমেসের শবাধার রয়েছে একটি উচ্চ বেদীর ওপর। ঠিক এই-খানেই রাখা হয়েছিল অমেনমেসের মৃতদেহ। সেদিন হতশেপসুত আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে দাঁড়িয়েছিল শবদেহের পাশে। ভেঙে পড়েছিল কনিষ্ঠ ভ্রাতার দেহের ওপর। তাকে সংযত করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

আজ কিন্তু কোনরকম চাপল্য নেই। ধীর স্থির ভাবে এক পা এক পা করে এগিয়ে যেতে থাকে শবাধারের দিকে। যাবার সময় শুধু বারকয়েক ওপর দিকে মুখ তুলে বিড়বিড় করে কি যেন বলল। বোধহয় প্রার্থনা জানাল কোন দেবতাকে। হয়ত সে বলল, এতক্ষণ যা কিছু ঘটে চলেছে সবই যেন দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত হয়। কিংবা হয়ত বলল, আমাকে অবিচলিত থাকার শক্তি দিন। তোমাদের হাতে আমার জীবন-মরণ সমর্পণ করলাম। শুধু দেখো, ফ্যারাও রূপে আমি যেন ব্যর্থ না হই। পৃথিবীর এক অদ্বিতীয় এবং শেষ আকর্ষণ আজ চলে গেল। বাকী রইল শুধু কর্তব্য আর উচ্চাশা। উচ্চাশা আর কঠোর কর্তব্য।

শবাধারের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় হতশেপসুত। আধারের ঢাকনা বন্ধ। নেসামুন পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। হতশেপসুত একবার তার দিকে তাকায়। নেসামুন বুঝতে পারে তাকে ঢাকনা খুলতে বলছে। তাই একটু এগিয়ে সেটাতে হাত রাখতেই হতশেপসুত তাকে সরে যেতে বলে।

—আমি খুলব নিজের হাতে।

একটু একটু করে ঢাকনা খোলে হতশেপসুত। হাত একটুও কাঁপতে না দেখে নেসামুন বিস্মিত হয়। এ কোন্ ধরনের নারী। সে দেখে উয়াচমেসের শান্ত দেহ শায়িত রয়েছে। চক্ষুদ্বয় নিমীলিত। সে ভেবেছিল রাজকুমারের মস্তক বুঝি অক্ষত নেই। কিন্তু তেমন নয়। কাঁধের একদিকে ভেঙে গেলেও বোঝা যাচ্ছে না। সুন্দর ভাবে ঢাকা রয়েছে বহুমূল্য বস্ত্রে। রাজকুমার যেন শান্তভাবে শুয়ে রয়েছেন।

হতশেপসুত একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। তার ওষ্ঠদ্বয় একবার শুধু একটু থর-

থর করে কেঁপে উঠল। কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্য। সে চেয়ে রইল তার প্রিয়তমের দিকে। চেয়ে থাকার আর শেষ নেই যেন। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটল। তারপর বোধহয় হুঁশ ফিরে এল। তার ঋজুদেহ নুয়ে পড়ে। মাথাটি উয়াচ-মেসের মুখের কাছাকাছি চলে আসে। সে চুম্বন করে তার প্রিয়তমকে। ভেবে-ছিল একাধারে ভ্রাতা, স্বামী ও প্রিয়তম তিনরূপেই সে পাবে তাকে। পেল না। কিছুই পেল না। হৃদয়টা একেবারে শূন্য হয়ে গেল।

ঢাকনা বন্ধ করে হতশেপসুত। তারপর শবাধারের ওপরে হাত বোলাতে থাকে। বোলাতেই থাকে। শেষে একসময় তার হাত থেমে যায়। সে উন্নত মস্তকে দ্বারের দিকে এগিয়ে যায়। একবারও পেছন ফিরে তাকায় না।

পুত্র পরবর্তী ফ্যারাও হবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েও উয়াচমেসের মর্মান্তিক মৃত্যু মুতনেফার্তকে আনন্দিত করতে পারে নি। সেখানে তিনি মাতৃহৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন সম্রাজ্ঞীর মর্মবেদনা। পর পর দুই তরুণ পুত্রের মৃত্যুর আঘাত যে কী নিদারুণ হতে পারে এ কথা সবাই বুঝতে পারে। তাই নিজ পুত্রের হালচাল তাঁর মনে বিরক্তির উদ্রেক করে। পুত্রের মুখের ওপরের সেই নিষ্ঠুর রেখাটি তাঁর চোখেও ধরা পড়ে যায়।

একদিন তাকে কাছে ডেকে বলেন—একটু সংযত হও। ভুলে যেও না তোমার ওপরেই দেবত্ব আরোপ করা হবে এর পরে। আসেত্ এবং তার শিশুপুত্রটিও কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারবে না।

পুত্রকে মা হয়ে তিনি সবচেয়ে ভাল করে চেনেন। তিনি জানেন, তার মন আদৌ বলিষ্ঠ নয়। তার মধ্যে সাহসিকতার একান্ত অভাব। তাই লোক-দেখানো একটা বিকৃত বীরত্ব প্রকাশের অছিলা খোঁজে কথায় কথায় এবং তাতে কৃতকার্য হলে সেই অহমিকায় বুঁদ হয়ে থাকে। মুতনেফার্তের দৃঢ় বিশ্বাস যারা তাঁর পুত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছে তারা মুখে কিছু না বললেও এই সব দুর্বলতার কথা জানে। শত হলেও ফ্যারাও-এর পুত্র। মুখ ফুটে কিছু বলায় ঝুঁকি রয়েছে। পুত্র ফ্যারাও হলে তিনি তাকে শুধু এইটুকু বলবেন, সে যেন হতশেপসুতের মন বুঝে চলে। কারণ হতশেপসুত তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারিণী। তার এবং অমাত্যবর্গের পরামর্শে চললে ফ্যারাও রূপে সে অসফল হবে না।

মায়ের কথা শুনে পুত্র হেসে বলে—এখন তো হতশেপসুতের অন্য উপায় নেই। এখন আমি যা খুশী করতে পারি, এসে যায় না কিছু।

—তোমার কথা সম্পূর্ণ সত্য না-ও হতে পারে। একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। আজ যদি হতশেপসুত তোমাকে বিয়ে না করে কোন উচ্চবংশের তরুণ কিংবা কোন উচ্চপদের রাজকর্মচারীকে বিবাহ করে? তাহলে?

—তাহলে কি হবে?

—সেই তরুণ হবে ফ্যারাও। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত।

—তাই কখনো হয়?

—নিশ্চয় হয়। কারণ সম্রাজ্ঞীর পরে তাঁর উত্তরাধিকারিণীই হল হত-

শেপসুত। তাঁর সব কিছু হতশেপসুতের। সুতরাং সাবধান।

পুত্রের মুখে ভয়ের ছাপ। এই সামান্য আশঙ্কাতেই রক্তশূন্য হয়ে যায় ভাবী ফ্যারাও-এর মুখ। নিজ পুত্রের জন্য গর্ববোধ করতে পারেন না মুতনেফার্ত।

—আমি সাবধানেই থাকব। হতশেপসুতের মনের বিরুদ্ধে কিছু করব না।

—হ্যাঁ, সেটাই সমীচীন হবে।

মুতনেফার্ত জানেন, ফ্যারাও চান তাঁর পুত্রের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ হোক। হতশেপসুতের মন না চাইলেও সে যুক্তিবাদী, তাই সহসা প্রাসাদের বাইরের কাউকে বিবাহ করতে চেয়ে সমস্ত বিষয়টা জটিল করে তুলবে না। তবু তাঁর নিজের পুত্র যদি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে থাকে, তাহলে তেমন সিদ্ধান্ত নিতেও পারে সে। আর সে যদি একবার মনস্থির করে ফেলে তাহলে ফ্যারাও-এর পক্ষেও তার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটান কঠিন হবে। কারণ তিনি তাঁর কন্যাকে প্রগাঢ় স্নেহ করেন। তার ব্যক্তিত্বরেও মূল্য দেন।

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার মাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কক্ষের বাইরে এসে একবার থামে। ভেবে নেয় কোথায় যাওয়া যায়। উয়াচমেসের মৃত্যুর পর দিন সাতেক কেটে গিয়েছে। তার দেহকে সমাধিস্থ করে তোলার উপযোগী করা হচ্ছে দক্ষিণের সেই কক্ষে। উপত্যকায় নিয়ে যেতে অনেক দিন বাকী। হতশেপসুতের সঙ্গে এর মধ্যে চবরোস কথা বলেনি। বলতে সাহসী হয় নি। সে লক্ষ্য করেছে হতশেপসুত কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। তার স্বভাবে চঞ্চলতা কোনদিনই ছিল না। এখন সে আরও বদলে গিয়েছে। রাজকার্য নিয়মিত করতে শুরু করেছে উয়াচমেসের মৃত্যুর দুদিন পর থেকেই। শুধু অমাত্যবর্গ নয়, স্বয়ং ফ্যারাও-ও তাকে দেখে হতচকিত হয়ে যান। কিন্তু কিছু বলেন নি। হতশেপসুত ফ্যারাও-এর কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে যে উয়াচমেসের বিভাগের ভারও সে নিতে চায়। ফ্যারাও সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয়ে যান। কারণ তিনি জানেন দেবালয়, পিরামিড ও সমাধিস্থলগুলির প্রতি তাঁর কন্যার রয়েছে এক গভীর মমতাবোধ যা উয়াচমেসের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাছাড়া তিনি মৃত পুত্রের প্রতি কন্যার মনোভাবের কথা ভালই জানেন। দেবালয় ইত্যাদি নিয়ে পুত্রের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কন্যার জানা আছে। সেইগুলিকে সে একে একে রূপ দিতে চায় নিশ্চয়।

বড় রাজকুমার হতশেপসুতের সঙ্গে কথা বলার জন্য মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু কোথায় তাকে পাবে? পাওয়া যায় উদ্যানে অপরাহ্নের পরে। সেখানে উয়াচমেসের সঙ্গে প্রায়ই গিয়ে বসত। আজও এই অপরাহ্নে নিশ্চয় তাকে পাওয়া যাবে।

মাতার কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে একটু ভেবে নিয়ে উদ্যানের দিকে যাবে বলে দুই পা এগিয়ে যেতেই এক পরিচারিকা এসে জানায় তার মা আবার ডাকছেন। অসন্তুষ্ট হয়ে সে ভেতরে গিয়ে মায়ের সামনে দাঁড়ায়।

—আবার ডাকলে কেন?

—তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই ডেকেছি।

—কোন্ কথা ?

—আমার হঠাৎ মনে হল তুমি হতশেপসুতের সঙ্গে কথা বলার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছ।

—তাতে কি হয়েছে ?

ক্রোধ সংবরণ করে মুতনেফার্ত বলেন—তাতে তোমার খুব ক্ষতি হবে।

—কেন ?

—সে কথা বোঝার অন্তর্দৃষ্টি তোমার নেই বলেই আমার দুশ্চিন্তা।

—তার মানে ?

—একটু যদি লক্ষ্য করতে তাহলে বুঝতে পারতে বাইরে হতশেপসুত যতই স্বাভাবিক আচরণ করুক না কেন, মনের ভেতরে সে এক দুঃসহ যাতনা নিয়ে শোক পালন করে চলেছে। উয়াচমেসের দেহ সমাহিত হবার পূর্বে তুমি নিজে থেকে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করো না। তার মন এখন উয়াচমেসময় হয়ে রয়েছে।

—কিন্তু সে যে অনেক দিন বাকী।

—হ্যাঁ। ততদিন তোমাকে সংযত থাকতে হবে। তবে হতশেপসুত যদি নিজে থেকে কথা বলে তাহলে অবশ্য অন্য কথা।

যতটা উদ্যম নিয়ে প্রথমবার মায়ের ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল সে, ঠিক ততটাই হতাশা নিয়ে এবারে ধীরে ধীরে বের হয়ে আসে বড় রাজকুমার।

উয়াচমেসের দেহ পশ্চিম উপত্যকায় সমাহিত হবার দিন সবাই গিয়েছিল বলতে গেলে। কিন্তু হতশেপসুত যায় নি। সে গেল পরের দিন একটি ক্ষুদ্র নির্বাচিত দল নিয়ে। সেখানে সবাইকে দূরে রেখে হাতে নীলপদ্ম নিয়ে সে একাকী গিয়ে উপস্থিত হয় নতুন সমাধি মন্দিরের সামনে। সেখানে নতজানু হয়ে বসে পুষ্প অর্পণ করে। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে। এই কান্নার আর বিরাম নেই। অবিরলধারে অশ্রু ঝরে পড়ে তার নয়ন থেকে। মনে হয় যেন সেই অশ্রুরাশিকে শুষে নিতে শেষপর্যন্ত হয়ত মরুবেষ্টিত উত্তপ্ত প্রস্তরও বিফল হবে। হতশেপসুত হারিয়ে ফেলে নিজেকে। সে জানে, এর পরে আর সে অশ্রুজল ঝরাবে না। সে জানে, এই পর্বতখণ্ডের মত তার মনের এক বিশেষ ধরনের কোমলতা ধীরে ধীরে শিলীভূত হয়ে যাবে। সেখানে আর সাড়া মিলবে না। কারও আদরে, কারও সোহাগে, কারও চুম্বনেও তার ওই নিদ্রিত প্রস্তরীভূত অংশটুকু জেগে উঠবে না। সেখানকার শিরা উপশিরাতেও আর কখনো শোণিত-সঞ্চারণ হবে না।

হয়ত কাঁদতে কাঁদতে দেহের জলীয় অংশের আর কিছুই বাকী ছিল না হতশেপসুতের। নইলে অশ্রুবর্ষণ একসময় আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল কেন ? একটা চূড়ান্ত অবসাদ পেয়ে বসে তাকে। ভাবে, এখানে উয়াচমেসের পাশে শুয়ে পড়তে পারলে বড় শান্তি পেত। ও এখন ওই জগতের মানুষ। ওর হৃদ্‌পিণ্ড মাপা হয়ে গিয়েছে। সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার পরে ওকে স্নান

দেওয়া হয়েছে সেখানে। ওকে কোনরকম পরিশ্রম করতে হবে না। কারণ ওর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে অনেক প্রস্তরনির্মিত উশবতি। তারা ওখানে প্রাণ পেয়ে রাজকুমারের হয়ে সমস্ত পরিশ্রমটুকু করে দেবে। তাদের বলা আছে, কেউ যদি রাজকুমারকে ক্ষেতে চাষ করতে বলে, কেউ যদি শকট চালাতে বলে তাহলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠবে—এই যে আমরা রয়েছি এখানে। রাজকুমারের হয়ে আমরা সব কিছু করে দেব। ওঁকে একাকী থাকতে দিন। ওঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্ন ঘটাবেন না।

উপত্যকা থেকে ফিরতে প্রায় রাত হয়ে যায়। হতশেপসুত জানে, এবারে তার এক নতুন জীবন শুরু হয়ে যাবে। এই জীবনে রস বলতে কিছু থাকবে না। অকারণ পুলকে শিহরিত হবার কিছু থাকবে না। তবে এই জীবনও টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার মত অতটা ব্যর্থ হবে না। কারণ এতে থাকবে তার শৈশব থেকে মনের মধ্যে লালিত উচ্চাশার চরিতার্থতার সুযোগ। সে হবে ফ্যারাও। হ্যাঁ, প্রকৃত অর্থেই ফ্যারাও। অন্য সমস্ত উত্তরাধিকারিণীর মত ফ্যারাও-এর বিবাহিত স্ত্রী রূপে সম্রাজ্ঞী হয়েই সে সন্তুষ্ট থাকবে না। এই উচ্চাশাই তার ভবিষ্যত জীবনের আকর্ষণকে জাগিয়ে রাখবে। নারী হতশেপসুতের মৃত্যু হয়ত ঘটল, কিন্তু ফ্যারাও হতশেপসুতের জন্ম হল আরও প্রবলভাবে। তাই উপত্যকা থেকে ফেরার পথেই সে ঠিক করে ফেলে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করবে বিনা বাক্যব্যয়ে। এতে ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন নেই। এটা তার উচ্চাশার পথে প্রথম সোপান। মুতনেফার্ত নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ফ্যারাও নিশ্চিন্ত। হ্যাঁ, পিতা সঙ্গোপনে এই ইচ্ছাই পোষণ করতেন। এবারে ইচ্ছা ফলবতী হবে তাঁর।

প্রাসাদে প্রবেশের মুখে হতশেপসুত লক্ষ্য করে নির্লজ্জ জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাকে অভ্যর্থনার জন্য দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান। যেন সে দিগ্বিজয় করে ফিরল, কিংবা ফিরল কোন নৌ-বিহার সমাপন করে। কাল অবশ্য চবরোস সবার সঙ্গে উপত্যকায় গিয়েছিল। হতশেপসুতের ধারণা সেটা সম্ভব হয়েছিল তার গর্ভধারিণীর পরামর্শে। কারণ রাণী মুতনেফার্ত খুবই বুদ্ধিমতী। তার নিজের মায়ের মত ফ্যারাও-বংশ-জাত বলে একটা উৎকট অহমিকার আবরণে নিজেকে আচ্ছাদিত রাখেন না। মস্তিষ্কের উৎকর্ষতায় মুতনেফার্ত তার মায়ের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে রয়েছেন। তার মা মস্তিষ্ককে কর্মতৎপর রাখার বিশেষ কোন চেষ্টাই করেন না। তাঁর সব কিছু তৎপরতা নিজের এখনো যতটুকু রূপ রয়েছে তার বৃদ্ধিসাধন করা।

শকট থেকে অবতরণের পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা তার সঙ্গে সঙ্গে চলে। সে মনের বিরক্তি চেপে রেখে বলে—এখন আমি বড় ক্লান্ত।

ব্যস্ত হয়ে ভ্রাতা উত্তর দেয়—জানি হতশেপসুত। আমি চলে যাচ্ছি। আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়ত নিঃসঙ্গ অনুভব করবে, তাই।

—না, আমি আজ বরং একাই থাকতে চাই।

রাজকুমার চলে যায়।

হতশেপসুত ভাবে ওই দুই দুর্বল বাহু পাশে আবদ্ধ না হয়ে আর উপায়

নেই। ওই মুখ, যাতে সেই বিশেষ রেখাটি ফুটে ওঠে, তার মুখের সঙ্গে ঘন হবে। ওই দেহ সর্বাঙ্গ দিয়ে তার সর্বাঙ্গকে গভীরভাবে স্পর্শ করবে। উপায় নেই। কারণ তার অন্তত একটি সন্তানের তো প্রয়োজন হবেই। এখন সেকথা ভাবতে ঘৃণাবোধ হচ্ছে বটে, কিন্তু বাস্তব বুদ্ধি একথা না ভাবিয়ে পারে না। সন্তানটি কন্যাসন্তান হতে হবে। একটি সন্তানের বেশী সে চাইবে না। তাতে আবার ওই পুরুষটির সংস্পর্শে আসতে হবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীলোকটিকে সে দেখেছে কয়েকবার। দেখতে বেশ সুন্দর। নামটিও ভাল। আসেত্। কিন্তু তাদের পুত্রটিকে দেখেনি। শুনেছে শিশুটিও সুন্দর। তারও মুখে কি ওই নিষ্ঠুর রেখাটি ভেসে উঠবে?

পরদিন সভায় ফ্যারাও ঘোষণা করলেন, এবারে যে হেব-সেদ ভোজ হবে তখন তিনি তাঁর পুত্র কন্যার বিবাহের দিন বলে দেবেন। সভায় সম্রাজ্ঞী অহমেস উপস্থিত ছিলেন। একমাত্র তিনিই বুঝতে পারলেন কেন এই ঘোষণা। উয়াচমেসের মৃত্যুর পর থেকেই ফ্যারাও মাঝে মাঝে তাঁকে বলছেন, তিনি আর বেশীদিন বাঁচবেন না। ভেতরটা কেমন শূন্য হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। হকিমরা নানান্ ভাবে পরীক্ষা করেও তাঁর মধ্যে কোনরকম রোগের লক্ষণ দেখতে পায় না। অবশ্য তিনি নিজে থেকে তাদের কিছু বলেন নি। ফ্যারাওকে প্রতিদিন নিয়মমাফিক পরীক্ষা করা তাদের কর্তব্য। তিনি অবশ্য তাদের মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন—ঠিক ভাবে দেখছ তো?

ফ্যারাও-এর মুখে একথা শুনে তারা কেঁপে ওঠে। ফ্যারাও তাদের ওপর আস্থা হারালে কপালে অশেষ দুর্গতি। তাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে—হ্যাঁ প্রভু। আপনাকে আমরা সব সময় একাগ্রচিত্তে পরীক্ষা করি।

—ভাল।

—আপনার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে?

—না, তেমন আর কি? শুধু বার্ধক্য দেহের ওপর চেপে বসছে। তাকে তো অস্বীকার করা যায় না। বার্ধক্য এলে ভেতরটা কেমন শূন্য হয়ে যেতে থাকে। কি বল?

ওরা কথাটাকে ঠিক ধরতে পারে না। তাই গুরুত্ব না দিয়েই তোষামোদ করার ঢং-এ বলে—তা তো বটেই। আমরা তাই বার্ধক্য নিরোধক বটিকা দিয়ে যাচ্ছি প্রতিদিন।

ফ্যারাও মনে মনে হাসেন আর প্রাসাদের অলিন্দ থেকে পশ্চিমের দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকেন। কী সুন্দর তাঁর দেশ। উষ্ণ মরু আর শ্যামল ক্ষেত্রের মিলনস্থল যেন। মনকে ভুলিয়ে দেয়। বয়ে চলেছে নীলনদ। কল্পনায় দেখতে পান অক্ষয় অবিনশ্বর পিরামিডশ্রেণী। যদিও সেগুলি অনেক নীচে, তবু তাঁরই দেশ। অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেলে তিনি দেখেন, ফ্যারাও রূপে মোটামুটি তিনি সার্থক। প্রথমেই ওপরের আর নীচের নুবিয়ার জন্য প্রশাসক নিয়োগ। যাদের বলা হয় 'কুশের রাজা'। তারপর বুহেন-এর ওপর আধিপত্য বিস্তার। তমবস্ দ্বীপের ওপর দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ। সবই তাঁর নিজস্ব

কীর্তি। এরপর তিনি গিয়েছেন সিরিয়া অভিযানে। সেই দেশের উত্তরে নাহারিণা নদী পর্যন্ত গিয়ে তবে থেমেছেন। দুই সেনাধ্যক্ষ অহমেস আর অহমেস-বেন-নেফের অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছিল। অনেক শকট, অশ্ব ও বন্দীকে নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন সেবার। কারনাক এবং আরও অনেক জায়গায় বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়া অবিদসে ওসিরিসের মন্দির নতুন করে সংস্কার করেছেন। আরও কত কি। বলে শেষ করা যায় না।

আগেরবারের হেব-সেদ ভোজের কোন সুখ স্মৃতি নেই হতশেপসুতের অন্তরে। সেই দিনের কথা মনে পড়তেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমেনমেসের বিষণ্ণ মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে সেই ভোজের দিনের স্মৃতি মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। সেইদিন সবার মধ্যে থেকেও অমেনমেস ছিল একেবারে নিঃসঙ্গ। তার মন তখন থেকেই নিশ্চয় ঘুরে বেড়াচ্ছিল অপর জগতের বৃক্ষছায়ায় আর শস্যশ্যামল মাঠে সেখানকার সুখী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে। কারণ সে সুনিশ্চিত জানত যে শীঘ্রই সে তাদের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে।

উয়াচমেস অবশ্য তার পরিণতি সম্বন্ধে আদৌ অবহিত ছিল না। অমেনমেস যেমন খুব ধীরে ধীরে এই জগত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিল ; উয়াচমেস তেমন পারেনি। সে ছিল প্রাণবন্ত। তার শ্বাসপ্রশ্বাসে বইত জীবন্ত প্রাণশক্তির জোয়ার। তাই তার পরিণাম হয়েছিল বড় আকস্মিক। সে অপর জগতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে নি। তাই বোধহয় ভারী পাথরের পতনে তার কাঁধের একদিক যখন ধসে গিয়েছিল তখনো সে অমিতবিক্রমে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারে নি। কেউ পারে না। ওসিরিসও পারেন নি।

আজ যদি উয়াচমেস বেঁচে থাকত, তাহলে আসন্ন হেব-সেদ ভোজ নিয়ে দুজনা কল্পনার কত রঙিন জাল বুনত। কিন্তু তা হবার নয়। আজ ওই ভোজের একমাত্র আকর্ষণ জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে তার বিবাহের দিন স্থির হয়ে যাওয়া। বিবাহ হয়ে গেলে সে আরও পাকাপাকিভাবে ফ্যারাও হবার পথে এগিয়ে যাবে। আশৈশব যে স্বপ্ন সে দেখে এসেছে, যাতে স্বয়ং ফ্যারাও পর্যন্ত ইন্ধন যুগিয়েছেন তা ফলবতী হতে এই বিবাহ হবে দৃঢ় পদক্ষেপ। নইলে এই ভোজের অন্য কোন আকর্ষণ নেই। উয়াচমেসের মৃত্যুর পর পৃথিবীতে তার একমাত্র আকর্ষণ হল মসনদ। হ্যাঁ, আর একটি আকর্ষণও রয়েছে। শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহিত স্বামীর ঔরসে একটি কিংবা বড় জোর দুটি সন্তান গর্ভে ধারণ করা। একটি হলে অবশ্যই তাকে হতে হবে কন্যা। আর দুটি হলে একটি কন্যা ও অপরটি পুত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে দেবী ত-আর্তের মনের ইচ্ছা যে কি একমাত্র তিনিই জানেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চবরোস অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে তার দিকে এগিয়ে এলে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়। তার চোখেমুখে বিরক্তি ফুটে উঠতে দেখে সে তাড়াতাড়ি বলে—আমি জানি তোমার মন ভাল নেই। আমি শুধু জানতে এসেছি ভোজের

বিষয়ে আমার কিছু করণীয় আছে কিনা।

জীবনে প্রথম ভ্রাতার প্রতি হতশেপসুতের মন প্রসন্ন হয়। এই নির্ভরতাই সে চায় তার ভাবী স্বামীর কাছ থেকে। অবিসংবাদিত ফ্যারাও হতে তাহলে তার আর বাধা থাকবে না। সে লক্ষ্য করেছে ভ্রাতার যে চোখে কিছুদিন আগে পর্যন্ত শুধু ফুটে উঠত লালসার কটাক্ষ এখন সেই চোখ সম্ভ্রমে শান্ত। কথা বলছে সে সন্তর্পণে। হয়ত তার মনের অস্থিরতা দূর হয়েছে বলে এমন ঘটেছে। হতশেপসুতের ওপর তার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত এ বিষয়ে সে এখন নিঃসংশয়। সে শুধু জানে না বিবাহের পর স্ত্রীর ক্রীড়নক হতে চলেছে সে। বাইরের যে অহমিকা আর দম্ভ নিয়ে সে অন্যকে ঠকায়, সেই দম্ভ এখানে খাটবে না। এখানে নীচু হয়ে থাকতে হবে। তবে হতশেপসুতের স্বামী হতে হলে যতটুকু সম্মান তার প্রাপ্য সেটুকু সে অবশ্যই পাবে।

হতশেপসুত ভাবী স্বামীকে বলে—তোমার সৈন্যদল যেন সেদিন রাজধানীর বাইরের দিকে নজর রাখে। আর একদল প্রাসাদ ঘিরে রাখে। কারণ এদিনে সবাই অরক্ষিত অবস্থায় থাকবে। তুমি তোমার প্রধান সেনাপতিকে কাছাকাছি রাখবে সেদিন।

—ঠিক আছে। আর ভোজের ব্যবস্থা কি হবে? একথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতাম না। কিন্তু এই মুহূর্তে ফ্যারাও অসুস্থবোধ করছেন বলে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

—ভোজের দিকটা আমি দেখব। আর একটা কথা। ভোজের দিনে ওই মেয়েটা কি হারেমে থাকবে?

—কোন্ মেয়ে?

—আসেত্।

—ও যেখানে থাকে থাকুক। ওকে অত প্রাধান্য দিয়ে কি হবে?

—তুমি ফ্যারাও হলে আসেত্-ও রানী, একথা ভুলে যেও না।

—রানী হতে পারে, কিন্তু সম্রাজ্ঞী হবে না।

—সেদিন আসেত্ও অনুষ্ঠানে যোগ দেবে।

—না না, ফ্যারাও ভীষণ রেগে যাবেন।

—রাগবেন না। আমি তাঁর সঙ্গে আসেত্কে নিয়ে আলোচনা করেছি।

—আলোচনা করেছ?

—ভয় নেই। প্রাসাদে যে শিশু জন্মায় তার একটা বাড়তি গুরুত্ব আছে। আসেত্ আর তার শিশুপুত্র আমার মনে এতটুকুও ক্রোধের উদ্রেক করেনি।

—তুমি সত্যি বলছ?

—হ্যাঁ।

যে মানুষটার প্রতি তার বিন্দুমাত্র ভালবাসা নেই, সে কতজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেলামেশা করে, কত জনের গর্ভসঞ্চার করল এতে কিছু এসে যায় না। তাছাড়া সেই মানুষটিরও লক্ষ্য শুধু মসনদের দিকে। সেটিতে আরোহণ করতে হতশেপসুতকে সোপান রূপে পাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন তার।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চলে গেলে হতশেপসুত একটু বিষণ্ণ হাসি হাসে। ভাবে, পৃথিবীতে এত যে আদর্শ, এত যে শিক্ষা, এ সবের কতটুকু মূল্য আছে বলা কঠিন। শিক্ষা মানুষের মনকে আদৌ উন্নত করতে পারে কি? মানুষের মানবীয় গুণাবলী এতে কি সত্যই পরিমার্জিত হয়? তার প্রেম ভালবাসা সূক্ষ্মবোধ ও অনুভূতিগুলি কি এতে স্থায়িত্ব লাভ করে মনে? হতশেপসুতের সন্দেহ জাগে। তার মনে হয়, একটা লোভাতুর পশু সর্বদা ঘাপটি মেরে বসে থাকে মনের নিভৃত কোণে। একটু সুযোগ পেলেই সে তার স্বরূপ নিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে। শিক্ষা আর আদর্শের স্বচ্ছতা মনের ভেতরের একটু নাড়াতেই ঘোলা হয়ে যায়। নইলে আজ কেন সে উয়াচমেসকে ভুলে গিয়ে তার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে বসেছে? কেন? কেন সে থীবস ছেড়ে, সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে পারছে না অন্য কোনখানে? সে ভালভাবে জানে যে পারবে না। কারণ এত দেবদেবীকে পূজা করে আরাধনা করেও সে মানবীরূপী পশু। তাই সে মনগড়া যুক্তি খুঁজে নিয়েছে যে মিশরের মঙ্গলের জন্যই তার উপস্থিতির প্রয়োজন। এমন যুক্তি যুগ যুগ ধরে নিশ্চয় সবাই খাড়া করেছে নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত। আর এরজন্য কেউ কিছু মনে করে না। কারণ সবাই সমান লোভাতুর, সমান স্বার্থপর। এটাই মানুষের স্বভাব।

অদূরে নেসামুন এসে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় কিছু বলবে। অপেক্ষা করছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এই পরিচারিকা। প্রাসাদে বোধহয় একমাত্র নেসামুন তার মনের হদিস কিছুটা রাখে। আর কেউ নয়। তার মা তো ননই। অথচ মায়েদের তো অমন হওয়া উচিত নয়। মা হবেন আইসিসের মত মমতাময়ী। আইসিসের মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে তাঁকে। কিন্তু তার মা তো সেরকম নন। আজ পর পর দুটি পুত্রের শোকেও তিনি তাঁর প্রিয় নেশা একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। এখনো সময় পেলে সাজঘরে গিয়ে বসে থাকেন।

—কিছু বলবে নেসামুন?

—সম্রাজ্ঞী আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

—বলে এস, সন্ধ্যায় যাব।

নেসামুন স্থানত্যাগ করে।

সন্ধ্যায় মায়ের কক্ষে প্রবেশ করতে মা তাঁর বাঁদীদের কক্ষ থেকে বাইরে চলে যেতে বলেন। বলে দেন, কেউ যেন এখন প্রবেশ না করে।

হতশেপসুত বিস্মিত হয়। মায়ের মুখের দিকে চায়। মা তাকে বলেন—গোপনীয় কথা আছে।

—আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—বল।

মা একটু চুপ করে থেকে বলেন—আচ্ছা, আমার মধ্যে কোনরকম বৈলক্ষণ্য দেখতে পাও?

—বৈলক্ষণ্য? কেন?

—পাও কিনা ?

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

—কথায় বার্তায় ব্যবহারের মধ্যে কোন অসঙ্গতি ?

—পাগলামী ?

—ধর তাই।

মনে মনে হতশেপসুত বলে, তুমি তো চিরক্যালই একধরনের পাগল। নইলে এভাবে নিজের দেহখানার পরিচর্যা করতে করতে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে কেউ ?

মুখে বলে—না।

—তুমি তাহলে সেভাবে লক্ষ্য করনি। লক্ষ্য করলে দেখতে পেতে। আমি নিজেই বুঝতে পারি।

—কি রকম ?

—অমেনমেসের মৃত্যুর খবর যখন পেয়েছিলাম তখন আমার বুকের মধ্যে জ্বলে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, প্রাসাদের সরোবরের মধ্যে গিয়ে ডুবে থাকলে বোধহয় জ্বলুনি কমবে। তাই ভেবে অনেক রাতে চুপি চুপি বের হয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে উঠল, "ওকি করছিস ? তুই কি পাগল ? এ জ্বলুনি সারে না।" আমি চমকে উঠেছিলাম। কোন নারীর কণ্ঠস্বর ছিল সেটা। মনে হয় দেবী হথোর।

হতশেপসুত ঘাড় নেড়ে বলে—হতে পারে।

—সেদিন আমার মধ্যে আর কোন অসঙ্গতি দেখা দেয় নি। কিন্তু উয়াচমেসের খবর শুনে—

মা কথাটা অর্ধসমাপ্ত রেখে দেন। মনে হল, বলতে তিনি ভয় পাচ্ছেন। তাই সে মাকে প্রবোধ দিয়ে বলে—থামলে কেন ? বল। বললে মন হাল্কা হবে।

—উয়াচমেসের খবর পেয়েই বুকের ভেতরটা আগের মত তীব্র ভাবে জ্বলে উঠে পরক্ষণেই একেবারে শান্ত হয়ে গেল। তারপর থেকে আমার শুধু হাসি পেতে লাগল। প্রথমে খুক্‌খুক্‌ করে একটু হেসে ফেললাম। পরিচারিকারা চমকে আমার দিকে তাকাল। আমি তাদের চলে যেতে বললাম। ওরা চলে যেতেই আমি খুব জোরে হেসে উঠলাম। যেন বাঁচলাম। এখনো মাঝে মাঝে খুব হাসি পায়। হেসে উঠি। এই তো আবার হাসি পাচ্ছে। সামলাতে পারছি না।

সম্রাজ্ঞী হেসে ওঠেন।

হতশেপসুত ভাবে, মা শিক্ষার বড়াই করে না, কোন আদর্শের কথা কখনো বলেন না। উচ্চাশা বলে কিছু তাঁর কোনদিন ছিল না। মনে তেমন কোন অহমিকাও ছিল না যে তাঁরই দৌলতে তাঁর স্বামী মিশরের ফ্যারাও। যেটুকু ছিল সবার থাকে। তিনি চিরকাল নিজের রূপ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তাঁর ভেতরের মানসিক গুণগুলি একটুও নষ্ট হয়ে যায় নি। তিনি মানবী। তাই পুত্রশোক তাঁর হৃদয়-মনকে এভাবে চুরমার করে দিয়েছে। এতদিন হতশেপসুতের

মনে মনে একটা গর্ববোধ ছিল যে মা তার কাছে অনেকবার পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু আজকে স্বীকার করে নিল যে চূড়ান্ত পরাজয় তারই হয়েছে মায়ের কাছে। মা তার চেয়েও অনেকগুণ বেশী মানবী। সে সেই ছেলেবেলার মত মায়ের কাছে সরে গিয়ে তাঁর কোলে মুখ গুঁজে দেয়।

একটু পরে উঠে বসে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে—আগে তোমার বুকের ভেতরে জ্বলে যেত। উয়াচমেস নেই শুনে এখন তোমার হাসি পাচ্ছে। এ হাসি তো হাসি নয় মা। অনেক চাপা কান্না গুমড়ে গুমড়ে উঠে এই হাসির সৃষ্টি করেছে। এ হাসি কান্নার চেয়েও বড় কান্না। এই হাসির অদৃশ্য অশ্রু নীলনদে বন্যা আনতে পারে। তুমি পাগল হওনি মা। পুত্রশোকে তুমি বিধ্বস্ত। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবে।

মায়ের মুখে কন্যার প্রতি নির্ভরতার ছাপ ফুটে ওঠে। মেয়ে হয়ে যায় মা।

হেব-সেদ ভোজ আপাতদৃষ্টিতে খুবই সফল হল। জাঁকজমকের ত্রুটি ছিল না। সুরার স্রোত বইল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সুরায় মাতোয়ারা হয়ে উঠল। ফ্যারাও তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুগত ব্যক্তিবর্গকে সুগন্ধি তৈল দ্বারা সিক্ত করলেন এবং নব পরিচ্ছদে ভূষিত করলেন। সম্রাজ্ঞী নীলপদ্ম উপহার দিলেন বিশিষ্টা নারী অতিথিবর্গকে। কিন্তু কোথায় যেন ছন্দে মিলল না। বাইরের কেউ উপলব্ধি না করলেও ফ্যারাও পরিবারের প্রত্যেকেই মর্মে মর্মে অনুভব করল এটি। সম্রাজ্ঞী সর্বদা হাসি মুখে তাঁর অতিথিবর্গকে উৎসাহিত করলেও তাঁর অন্তর যেন রুধিরাক্ত। সেই ক্ষতস্থান দিয়ে অবিরলধারে শোণিত চুইয়ে চুইয়ে পড়ল। ফ্যারাও নিজেও অসুস্থ। তাঁর মুখ অত্যন্ত রক্তশূন্য। তবু সেই রক্ত-শূন্যতাকে ঢেকে রাখল তাঁর রাজকিরীট আর নকল শ্মশ্রু গুম্ফ। তিনি বুঝতে দিলেন না যে দীর্ঘক্ষণ এক ভাবে বসে থাকতে তাঁর যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে। একটু দূরে মুতনেফার্ত একদৃষ্টে ফ্যারাও-এর মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। তাঁর পুত্রের দৃষ্টিও ফ্যারাও-এর প্রতি নিবদ্ধ। দুজনেই অপেক্ষা করছে কখন তিনি তাদের বহুপ্রার্থিত ঘোষণাটি করবেন।

অবশেষে। হ্যাঁ, অবশেষে ভোজপর্বের শেষ লগ্নে ফ্যারাও উঠে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে সেই আকাঙ্ক্ষিত ঘোষণাটি করলেন। তিনি যা বললেন, তা পার্শ্ববর্তী দুএকজন ছাড়া কারও শ্রুতিগোচর হল না। সবাই বলল, তারা শুনতে পায়নি ফ্যারাও-এর ঘোষণা।

তখন ফ্যারাও-এর মুখ্য অমাত্য বেশ উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে—ফ্যারাও বললেন, আজ থেকে পনেরো দিন পরে যেদিন নীলনদের বর্ষায় প্রথম জলধারা নদীর গতিপথের তৃতীয় প্রপাতে আছড়ে পড়ে থীবস-এর দিকে ধেয়ে আসার কথা সেইদিনে তাঁর কন্যা হতশেপসুতের সঙ্গে পত্নী মুতনেফার্তের গর্ভজাত তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। পরদিনই তাঁর কন্যার অভিষেক হবে পুত্রের সঙ্গে। কন্যাকেও ফ্যারাও রূপে অভিহিত করা হবে। পুত্রের রাজকীয় নাম হবে তাঁরই মত থুথমস—দ্বিতীয় থুথমস।

সবাই হর্ষধ্বনি করে ওঠে। তবে প্রত্যেকের মনে প্রশ্ন থেকে যায় নারী হয়ে হতশেপসুত কি করে ফ্যারাও রূপে আখ্যাত হবেন? কিন্তু ফ্যারাও-এর ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা যায় না। ফ্যারাও কখনো ভুল করেন না। কারণ তিনি দেবতা। তিনি যখন ঘোষণা করেছেন তাঁর কন্যাও ফ্যারাও, তখন সেটাই ঠিক। আইসিস ওসিরিসের চেয়ে কম কিসে? বরং তাঁর জন্যেই ওসিরিসের পুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠা। হতশেপসুত যে বিদুষী নারী এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমতী সেকথা মিশরবাসীর অজানা নয়। এ বরং ভালই হল।

ফ্যারাও ঘোষণা করার অব্যাহতি পরেই বিশ্রামাগারে যেতে চাইলেন। তাঁর অনুচরবৃন্দ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ফ্যারাও-এর ঘোষণার পূর্ব মুহূর্তে নৃত্যগীত থেমে গিয়েছিল। কয়েকজন নর্তকী আগ্রহভরে এগিয়ে আসে ফ্যারাওকে সাহায্য করার জন্য। তিনি তাদের অগ্রাহ্য করেন। স্বয়ং উঠে দাঁড়ান। দেখতে ছোট-খাটো হলেও কখনো তাঁকে খর্বকায় বলে মনে হয় নি কারও কাছে, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁকে একটি বাড়তি উচ্চতা দিয়েছিল। কারও কখনো ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নি তাদের দৃষ্টি ফ্যারাওকে দেখতে নীচের দিকে প্রসারিত হয়। ফ্যারাও অনেক উঁচুতে—নাগালের বাইরে।

ফ্যারাও বিদায় নিতেই সভার আকর্ষণ নিঃশেষিত হয়। সবাই একে একে বিদায় নেয়। শুধু দাঁড়িয়ে থাকে নতুন নামে আখ্যাত দ্বিতীয় থুথমস। সে খুব স্বাভাবিক ভাবে চট্‌পট্‌ হতশেপসুতের কাছে এগিয়ে এসে বলে—অভিষেকটা কবে হবে বলে মনে হয়!

বিরক্ত হয়ে হতশেপসুত জবাব দেয়—সে কথা কি জানার জন্য আজকের এই মুহূর্তের চেয়ে প্রকৃষ্ট সময় খুঁজে পাওয়া যেত না?

—না না, এমনিতে।

—এখন চলে যাও। আমার মা বসে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কিছু কথা আছে।

—আমার মা-ও তো বসে রয়েছে।

—অনুগ্রহ করে তাঁকে এখান থেকে নিয়ে যাও। আমি বিগড়ে না গেলে তোমাদের আর ভয় নেই।

ওরা চলে গেলে কক্ষ একেবারে নির্জন হয়। শুধু দুইজনের পরিচারিকা-বৃন্দ বাইরে অপেক্ষা করে। সম্রাজ্ঞী কন্যার কাছে ছুটে এসে বলেন—আমি ঠিকমত ব্যবহার করেছিলাম তো?

—হ্যাঁ মা। চমৎকার ব্যবহার করেছ। একেবারে সম্রাজ্ঞীর মত।

—একবার শুধু আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। অনেক কষ্ট করে গম্ভীর হয়েছিলাম। ফ্যারাও যখন ঘোষণা করছিলেন তখন আমার হঠাৎ মনে হল, উয়াচমেস একেবারে পাশে এসে ফিসফিস করে বলছে—"তুমি চুপ করে আছ? কিছু বলছ না?" আমি বুঝতে পারলাম, ওটা আমার মনের ভুল। উয়াচমেস আমার পাশে নেই। কি করে থাকবে? তবু খুব হাসি পেয়ে গেল।

—তুমি সত্যিই পাগল হলে হেসে উঠতে। তুমি জানতেও না যে তুমি হাসছ।

—হ্যাঁ। আমি পাগল হইনি। জান আমি এখনো সন্তানবতী হতে পারি। কিন্তু ফ্যারাও আর আমার কাছে আসেন না।

মায়ের কথা শুনে হতশেপসুত স্তম্ভিত হয়। সে মাথা নীচু করে বলে—তিনি এখন অসুস্থ।

—সে তো কয়েকদিন হল হয়েছে। তার আগে ? আমার আরও উয়াচমেস থাকতে পারত, অমেনমেস থাকতে পারত। আমার কি ভাবনা থাকত ? কিন্তু হল না।

—শুনেছি তুমি পিতাকে তেমন পছন্দ করতে না।

—করতাম না পছন্দ। কিন্তু সে তো পুরুষ। জোর করেনি কেন ? জোর করতে পারত। তাহলে আমার আজ এ দশা হত না। আমার অমেনমেস নেই, উয়াচমেস নেই। কেউ নেই।

—আমি আছি।

—হ্যাঁ, তা আছ। তবু। তাদের কেউ থাকলে দ্বিতীয় থুথমস হত।

সম্রাজ্ঞী ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে এগিয়ে যান। হতশেপসুতও পেছনে পেছনে চলে।

ওসিরিসের যেমন মৃত্যু হয়েছিল, তেমনি সব দেবতার মৃত্যু হতে পারে। তবে সেই মৃত্যুতে তাঁদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। তারা আগের মতই থাকেন। দেবতারা বৃদ্ধ হন। একবার দেবতা রা অসুস্থ হয়ে পড়লে মানুষেরা অবধি সুযোগ বুঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাই বলে কি রা-এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে ? তিনি চিরকাল ভাস্বর।

ফ্যারাও হলেন রা দেবতার সন্তান। সর্বশেষ দেবতা-রূপী ফ্যারাও হোরাস তাঁর মনুষ্য বংশধরদের হাতে ফ্যারাও-এর অপরিসীম ক্ষমতা অর্পণ করে গিয়েছিলেন। তাই সব ফ্যারাও-ই দেবতার সন্তান। তাই বলে কি তাঁরা অমর ? বার্ধক্য কি তাঁদের অশক্ত করে না ? লুব্ধ করে না ? করে। অবশ্যই করে। তাঁদের মৃত্যুও হয়। কোন ফ্যারাও-এর মৃত্যু হলে তাঁর দেহের সঙ্গে ভোগ-বিলাসের যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর সমাধিমন্দিরে। সেখানে তাঁর দেহের সঙ্গে সব কিছুকে মন্দিরের কক্ষে সুরক্ষিত অবস্থায় রেখে আসা হয়। তিনি অন্য জগতে গিয়ে এই জগতের মতই তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে কালাতিপাত করতে পারেন। তবে আজকাল তাঁর শবদেহের সঙ্গে জীবন্ত দাস-দাসীকে আবদ্ধ করে রাখা হয় না। পরিবর্তে দেওয়া হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠপুত্তলি বা পাথরের মূর্তি। তারাই ওপারে গিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠে দাসদাসীর কাজ করে। ফ্যারাওকে সেখানে যে যে প্রশ্ন করা হয় সেই সবের উত্তরও দেয় এরা। এরা উত্তরদাতা। এদেরই বলা হয় উশবৃতি।

ফ্যারাও প্রথম থুথমসের স্বাস্থ্যের আরও অবনতি হয়। চিকিৎসকরা প্রতিদিন সদাসর্বদা তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকে। কিন্তু তাদের মুখ গম্ভীর। তারা বুঝতে পারে তাদের অধীশ্বর অত্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে শেষ

পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। অথচ তারা কিছু বুঝতে পারছে না।

ফ্যারাও বলেন—আমি জানি আমার মৃত্যু সন্নিকট। তার আগে আমি আমার কন্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভিষেক দেখে যেতে চাই।

অন্য সবাই চুপ করে থাকলেও সম্রাজ্ঞী অহমেস বলেন—না। এ হতে পারে না। তুমি যতদিন জীবিত ততদিন তুমি ফ্যারাও এবং আমি সম্রাজ্ঞী। ওদের অভিষেক হবে তোমার মৃত্যুর পরে। দেবতার কৃপায় তোমার মৃত্যু এখন না-ও হতে পারে। একজন ফ্যারাও জীবিত থাকতে অন্য ফ্যারাও কি করে সম্ভব?

—আমি যদি আমার কন্যা ও পুত্রকে ফ্যারাও হতে অনুমতি দিই?

—তবু নয়। তুমি এখন অসুস্থ। ওসব নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। তাছাড়া অনুমতি দেবার আগে আমার অনুমতি তোমাকে নিতে হবে।

হতশেপসুত অবাক হয় মায়ের কথা শুনে। আনন্দও হয়। মায়ের সুপ্ত ব্যক্তিত্ব যেন ঝলসে ওঠে তাঁর কথার মধ্যে, তাঁর যুক্তির মধ্যে। এতদিন পরে সত্যই তিনি সাবালিকা হলেন। বোধহয় পুত্রশোকের আঘাত তাঁকে সাহায্য করেছে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে এখন থেকেই নিজেকে পরবর্তী থুথমস রূপে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। সম্রাজ্ঞীর কথা শুনে তার উজ্জ্বল মুখ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশেষ রেখাটি মুখের ওপর ভেসে ওঠে। ফ্যারাওকে সম্রাজ্ঞীর কথার প্রতিবাদ না করতে দেখে সে হতাশ হয়ে কক্ষ ত্যাগ করে।

অভিষেক না হলেও বিবাহদানে ক্ষতি নেই। দুজনার বিবাহ হল বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে। মুতনেফার্ত এতদিনে নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর পুত্রের মুখও আনন্দে উদ্ভাসিত। নিজের কেশদামের প্রতি তার বরাবর অত্যধিক যত্ন। অনেক চর্চার ফলে সেগুলি কুঞ্চিত। তার ধারণা ওই কেশদামের আকর্ষণ রয়েছে সবার কাছে। হতশেপসুতও নিশ্চয় মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে পছন্দ করে। তাই বিবাহের রাতেই হতশেপসুতকে নিজের স্ত্রীরূপে পেয়ে তার গায়ে আলগোছে হাত রাখে।

এই অপেক্ষাতেই ছিল হতশেপসুত। তবু একটু চমকে ওঠার ভাব করে বলে—কি হল?

—আমার এই চুল তোমার পছন্দ হয়?

তার কথা শুনে হতশেপসুত অবাক না হয়ে পারে না। স্ত্রীকে প্রথম সম্ভাষণের যোগ্য কথাই বটে। সে মনের অসন্তোষ মুখে ফুটতে না দিয়ে বলে—ওই চুলের মূল্য কতটুকু? তুমি ফ্যারাও হতে চলেছ। প্রজারা তো ফ্যারাও-এর কেশদাম দেখার সৌভাগ্য করে আসেন। সেই চুল উত্তর আর দক্ষিণের মিশরের যুগ্ম শিরোভূষণে নীচে ঢাকা থাকে। পিতাকে তো দেখেছ।

—তাঁর টাক রয়েছে।

—চিরকাল টাক ছিল না। তাছাড়া তাঁর পূর্ববর্তী ফ্যারাও-রাও অহেতুক

এত চুল মাথায় রাখা পছন্দ করতেন না।

—আমি রাখব।

স্বামীর কথায় মেয়েলী ঢং। এই ঢং অতি পরিচিত হলেও আজকের দিনে ভাল লাগে না। আজ একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের প্রত্যাশী ছিল সে। শুনতে পেলে আনন্দ হত। আজ ওভাবে আলতো ভাবে তাকে না ছুঁয়ে কেউ যদি দৃঢ় বাহুদ্বয় দিয়ে বেষ্টন করে তাকে জোর করে টেনে নিত সেটা অনেক বেশী প্রার্থিত হত। উয়াচমেসের মুখখানা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। ওই মুখ বড় উজ্জ্বল। কিন্তু ওই মুখ আর বাস্তব নয়। সুতরাং মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে না পারলে শান্তি থাকবে না।

—তুমি কথা বলছ না কেন হতশেপসুত?

—নতুন করে বলার তো কিছু নেই। সভায় রোজই কথা হচ্ছে। নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। ফ্যারাও তোমায় অভিষেক দেননি বলে মনঃক্ষুণ্ন হয়েছ তাও আমার অজানা নয়।

—হ্যাঁ। অভিষেকটা ঘটা করে দিয়ে দিলেই পারতেন।

—সবই হবে। ধীরে ধীরে হবে। তুমি সীমাহীন ভাগ্য নিয়ে জন্মেছ। নইলে তোমার দুই সৎ ভাই ওভাবে আকস্মিক মৃত্যু বরণ করত না। ভয় নেই থুথমস। তোমার সব আশাই পূর্ণ হবে।

হতশেপসুত তাকে এই বিশেষ দিনে থুথমস বলে সম্বোধন করায় সে বিচলিত হয়। সন্তর্পণে স্ত্রীর পাশে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলে—তোমার মুখে এই নাম শুনে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি তুমি আমার চেয়ে ছোট হলেও মনে মনে খুব সমীহ করতাম।

—তাই নাকি? এখন কর না!

—নিশ্চয় করি। কিন্তু এখন তো তুমি আমার নিজের।

—ঠিক। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে ফ্যারাও-এর পদটি কখনো তোমার একার বলে ভুল করে বস না যেন।

—না না, পিতা তোমাকে কত আগে থেকে ফ্যারাও-এর স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছেন। তুমিই তো প্রকৃত সহ-শাসক। আমি তোমার সঙ্গে আছি।

—মনে থাকে যেন কথাটা।

—তা থাকবে। ওসব তো অন্য কথা। স্ত্রী হিসাবে তোমার তো আর একটা ভূমিকা রয়েছে।

—কোন্ ভূমিকা?

—আমার সন্তান ধারণ করা।

—অবশ্যই।

উৎসাহিত থুথমস এবারে হতশেপসুতকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। তার আলিঙ্গনে ভেঙে পড়ে না হতশেপসুত। শক্ত হয়ে ওঠে। মনে হয় সর্বাঙ্গের রক্ত-স্রোত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। তবু তাকে স্বাভাবিক হতে হবে। জোর করে হলেও ভাল লাগাতে হবে এই আলিঙ্গন। নইলে সন্তান উৎপাদন দুরূহ হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই ফ্যারাও-এর শারীরিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। তিনি সম্রাজ্ঞী অহমেসকে অনুরোধ করেন পুত্রকন্যাদের অভিষেকের অনুমতি দিতে নিজের চোখে একটু দেখে যেতে চান। তিনি বলেন যে, তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে। শুধু এইটিই একমাত্র বাসনা।

সম্রাজ্ঞী অহমেসের মনের জোর আগের মত না থাকলেও মৃদু কণ্ঠে বলেন—না।

এবারে ফ্যারাও থুথমস যেন জ্বলে ওঠেন। প্রদীপশিখা শেষবারের মত যেমন জ্বলে, ফ্যারাও-এর কণ্ঠস্বরে তেমন ক্রোধের অভিব্যক্তি। রানীকে কখনো চড়া স্বরে কিছু বলেন নি। আজ বললেন। জীবনের শেষে এসে প্রথম এবং বোধহয় শেষ বারের মত বললেন।

তিনি বললেন—আমাদের দেশের অতীত ইতিহাসের কথা তোমার নিশ্চয় অজানা নয়। তবু আমি জানি সেই সব কথা তোমার মনের কোণে চাপা পড়ে রয়েছে। আজ একটু মনে করিয়ে দিতে চাই। অবশ্য তুমি যদি শুনতে চাও।

ফ্যারাও-এর মুখের দিকে চেয়ে সম্রাজ্ঞী গররাজি হতে পারেন না। তিনি বলেন—বল। এ বিষয়ে আমার সত্যিই কোন স্পষ্ট ধারণা নেই।

—ওসিরিস আপামর জনসাধারণের মেদ-মজ্জায় মিশে আছেন। তিনিও মরণশীল ছিলেন। মিশরের সবাই বিশ্বাস করে হোরাসের পরের ফ্যারাওরা দেবতা নন। তাঁরা দেবতার অবতার। কিংবা বলা যেতে পারে ফ্যারাওকে ঈশ্বরের শক্তির ভাগ দেওয়া হয়। তুমি কি ভুলে গিয়েছ ঈশ্বরের এহেন প্রতিনিধিকেও পুরাকালে আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

শঙ্কিত সম্রাজ্ঞী বলে ওঠেন—মনে পড়েছে।

—ফ্যারাও-এর মধ্যেই ঈশ্বরের আত্মার অধিষ্ঠান। তাই তিনি ঈশ্বরের অবতার। এই আত্মাই হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, তিনিই জীবনদাতা। এই অবতারের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মনুষ্যকুলে এবং শস্যক্ষেত্রে উর্বরতা প্রদানের অপরিসীম ক্ষমতা। তাই প্রজাদের কাছে ফ্যারাও হলেন সাক্ষাৎ দেবতা। এই চিন্তাটা তাদের কাছে সুখপ্রদও বটে। কারণ দেবতা স্বয়ং ফ্যারাও রূপে তাদের মধ্যে বিচরণ করছেন, তারা তাঁকে প্রত্যক্ষ করছে। সবার মত তিনিও মানুষ অথচ ঈশ্বরের শক্তি আর রহস্য দিয়ে ঘেরা তিনি। সেই সঙ্গে আদি যুগ থেকে একথাও বিশ্বাস করে, এদেশের মানুষ যে ঈশ্বরের আত্মা অবিনশ্বরও নয় ওই দেহে। সেই আত্মা দেহের বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। দেহের মৃত্যু ঘটলে, সেই মৃত্যু স্বাভাবিক কিংবা দুর্ঘটনাজনিত যাই হোক না কেন, আত্মারও বিলুপ্তি ঘটে। আর সৃষ্টিকর্তার যদি মৃত্যু ঘটে, তাহলে তাঁর ভক্তরা, যাঁরা তাঁকে পূজা করে, তাঁদের কি দশা হবে? তাদেরও তো মৃত্যু কিংবা ধ্বংস হওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। তাদের জীবন ও সম্পদ সবই বিনষ্ট হবে। এই বিধ্বংসী পরিণাম থেকে রক্ষা পেতে বহু পুরাকালে সাধারণ শ্রমজীবী ও

কৃষককুল এবং অন্যান্য সব সাধারণ শ্রেণীর মানুষেরা একটা বিকল্প পথের সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা ঈশ্বরের আত্মা ও শক্তিকে বৃদ্ধের দেহের আবাস থেকে কোন নবীনতর ব্যক্তির দেহে স্থাপনের কথা চিন্তা করে। অন্য দেহে আত্মার এই সময়োচিত অপসারণ একমাত্র হত্যার মধ্যেই সম্ভব। এবং এই হত্যা ঘটাতে সবরকমের সংযম, নিয়মনিষ্ঠা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। কারণ এই হত্যা ঈশ্বরকে বধ করার সমপর্যায়ের।

সম্রাজ্ঞী অহমেস এতক্ষণ ফ্যারাও-এর কথা একাগ্র মনে শুনছিলেন। তাঁর এ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা ছিল। কিন্তু ফ্যারাও যা বলছেন, তা যেন অবিশ্বাস্য। তাঁর ধারণা ছিল ফ্যারাও সব কিছুর ঊর্ধ্বে, চিরকাল সর্বশক্তিমান। নিজের স্বামী যে এত কিছু জানেন, তাঁর জানা ছিল না। অবশ্য কোনদিন জানার চেষ্টাও করেন নি।

তিনি বলেন—তোমার কথা বিশ্বাস করতে ভরসা পাচ্ছি না। সত্যিই কি তাই?

—হ্যাঁ। যা বলছি তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ফ্যারাও-এর দেহ যতদিন নবীন থাকে, তাজা থাকে ততদিন তার বিরুদ্ধে একটি আঙুলও উঠবে না। কিন্তু তাঁর দেহে বার্ধক্যের ছায়াপাত ঘটলে শরীর একটু অশক্ত হয়ে পড়লে একটি আঙুলও উঠবে না তাঁকে রক্ষা করার জন্য।

—এখন তো এমন হয় না।

—কে বলল হয় না? মনে মনে ঠিকই হয়। শুধু প্রথাটা চালু নেই। মিশর-বাসীর মন একটুও বদলায় নি। তুমি কি ভাবছ এই অবস্থায় প্রজাকুল আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কখনই না। আমার অশক্ত দেহের কথা সবাই জেনে গিয়েছে। তাই আমি ওদের অভিষেকের কথা বলছিলাম। হ্যাঁ, ওদের দুজনার। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে অভিষেক হলে তোমার কন্যার গুরুত্ব থাকবে। নইলে থাকবে বলে মনে হয় না। এ দেশের মানুষেরা নারী ফ্যারাও-এর কথা কল্পনা করতে পারে না। আমি কন্যাকে সহ-শাসক করেছি বলে অনেকে অখুশী হয়েছে বলে আঁচ করেছি। ফ্যারাওকে হত্যার প্রথা চালু না থাকলেও মনোভাব চালু আছে। ফ্যারাওকে হত্যার প্রথা খুব ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়েছে। প্রথমে ফ্যারাও-এর পরিবর্তে তাঁর প্রতিকল্প নিযুক্ত করা হত। তার প্রাণের বিনিময়ে ফ্যারাও-এর প্রাণ বাঁচত। তবে পদটি তিনি খোয়াতেন। এই প্রতিকল্প কয়েকদিন কিংবা কয়েক সপ্তাহ ফ্যারাও-এর পদ অলঙ্কৃত করত। যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও জাঁকজমক ভোগ করে নিত সে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে তাকে বধ করা হত নিয়ম-নিষ্ঠা ও পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

সম্রাজ্ঞী বলে ওঠেন—আচ্ছা কোন ফ্যারাও কিংবা তাঁর প্রতিকল্প প্রতিবাদ করেনি কখনো?

থুথমস হেসে বলেন—না। তারা জানত তাদের পরিণতির কথা। জেনে-শুনেই তারা ফ্যারাও হত কিংবা তাঁর প্রতিকল্প হত।

—আশ্চর্য! আচ্ছা এদের কিভাবে হত্যা করা হত?

—তিনরকম ভাবে। তুমি হয়ত জান ফসলের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের দেশের সব কিছু। এ দেশ কৃষিনির্ভর। অবতারের মৃত্যু ঘটান হত সেই কথা ভেবে। প্রথমত তাঁকে হত্যা করা হত রক্তপাত ঘটিয়ে। তাতে সেই রক্ত ভূমিতে পড়বে এবং ভূমি উর্বরা হবে। দ্বিতীয় উপায়টি হল তাঁকে দগ্ধ করে হত্যা করা। দেহটিকে একেবারে ভস্মীভূত করে ফেলা হত। সেই ভস্ম শস্যক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া হত। আবার তাঁকে নীলনদীর স্রোতেও ভাসিয়ে দেওয়া হত, যাতে প্রয়োজন মত বৃষ্টি হয়। তৃতীয় উপায়টি হল শ্বাসরোধ করে হত্যা করা। জলের মধ্যে চুবিয়ে রেখে কিংবা গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটান হত। তারপর তার দেহকে খণ্ডবিখণ্ড করে দেশের নানান স্থানে পুঁতে ফেলা হত। এই অনুষ্ঠানের গূঢ় অর্থ তুমি জান না নিশ্চয়।

এই প্রথম ফ্যারাও-এর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করেন সম্রাজ্ঞী। মানুষটা এত কাছে থেকেছে চিরকাল, অথচ তার খর্বাকার চেহারা, উঁচু হয়ে থাকা দাঁত আর প্রায় কেশহীন মস্তক দেখে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হত বলে দূরে দূরে সরে থেকেছেন। আসল মানুষটা অপরিচিতই থেকে গেলেন।

তিনি ফ্যারাও-এর এই কথার উত্তরে অপরাধবোধের ভারী গলায় বলেন—না।

—সব হত্যার পরই দেহাবশেষকে মাটির সংস্পর্শে আনা হচ্ছে। এর কারণ কি? যুগ যুগ ধরে কৃষিকাজের অভিজ্ঞতা থেকে সব সৃষ্টি। প্রতি বছর এত ফসল ফলে, সেই ফসলে থাকে জীবনের প্রাচুর্য। তারা ভূমি থেকে জীবনকে টেনে এনে ভূমিকে করে তোলে নিষ্প্রাণ। সেই নিষ্প্রাণ মাটিকে আবার প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য মানবরূপী সৃষ্টিকর্তার দেহের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কি থাকতে পারে? তাই সেই দেহকেই আবার মাটির সঙ্গে নানা উপায়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়। যেমন, যে ফসল ফলানো হয়, সেই ফসলের বীজ বপন করেই আবার পরবর্তী বছরের ফসল ঘরে তোলা হয়।

ফ্যারাও জীবনে বোধহয় তাঁর প্রধানা মহিষীর সঙ্গে এত বেশী কথা বলেন নি। এমন মনোযোগের সঙ্গে রাজ্ঞী অহমেস আর কখনো তাঁর স্বামীর কথা শুনতে চাননি। রূপচর্চার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে এসেছেন। ফ্যারাও-এর সব কথাতেই তাঁর মুখে ফুটে উঠত উপেক্ষার ভঙ্গি। ভাবখানা, যে পুরুষ সুদর্শন না তার মাথার ভেতরে ভাবগর্ভ মস্তিষ্ক থাকতে পারে না। দৈহিক মিলনের সময়ও যেন কর্তব্য করে চলতেন। নইলে তাঁর গর্ভসঞ্চার হবে না। নাহলে তিনি উত্তরাধিকারীহীন হয়ে পড়বেন। তাঁর বংশধারায় ছেদ পড়বে। কখনো আজকের এই পুরুষটিকে পরম প্রেমসহকারে কাছে টেনে নেন নি। এখন মনে হয়, সেভাবে কাছে টেনে নেননি বলেই তিনি আজ পুত্রহারা। পুত্রদের মধ্যে পরিপূর্ণ জীবনীশক্তির সঞ্চার ঘটেনি তাঁর নিজের বিরূপতার জন্য। হতশেপ-সুতের বেঁচে থাকার কারণ, সেই সময় স্বামীর রূপের বিচার করার বয়স তাঁর ঠিক হয়নি। তাছাড়া পুরুষের সংস্পর্শে আসার অভিজ্ঞতা তখন প্রথম। তখন মনে হয়েছিল, জীবনের একটা নতুন দিগন্তের উন্মোচন হল, নতুন আস্বাদ।

দীর্ঘক্ষণ এত বেশী কথা বলে অসুস্থ ফ্যারাও ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তিনি অবসন্ন হন। বসে থাকতে কষ্ট হয়। ভেতরটা আনচান করে। তাঁর অস্থিরতা দেখে সম্রাজ্ঞী জীবনে প্রথম ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি ফ্যারাও-এর কাছে এসে বিরলকেশ মস্তকখানা বুকে চেপে ধরে বলেন—হকিমকে ডাকব ?

ফ্যারাও এত শান্তি জীবনে আর কখনো পান নি। মুতনেফার্তের সঙ্গে জীবনের প্রথম যৌবন উপভোগ করার সময়ও নয়। হারেমের সুন্দরী ললনাদের সঙ্গে আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থতা করার সময়ও নয়। এ এক অন্য অনুভূতি। এতে দেহের চেয়ে হৃদয়ের উত্তাপ সহস্রগুণ বেশী।

তিনি বলেন—না। আমি বেশ আছি। তুমি শুধু সরে যেও না।

অহমেস আরও নিবিড় ভাবে স্বামীর মাথাটি টেনে নিয়ে বলেন—বড় দেরি হয়ে গেল।

—এতে কারও হাত নেই। হৃদয়ের ওই নীলপদ্ম কবে কুঁড়ি থেকে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে, কেউ বলতে পারে না।

—তুমি ওদের অভিষেকের ব্যবস্থা কর।

—কিন্তু তুমি যে—

—না, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা বাকি দিনগুলি। আমার আর কিছুতে আগ্রহ নেই।

—বেশ।

সেই সময় একজন এসে জানায়, রানী মুতনেফার্ত ফ্যারাও-এর দর্শন-প্রার্থিনী। ফ্যারাও তাঁকে পাঠিয়ে দিতে বলেন।

পরিচারিকা চলে গেলে তিনি বলেন—ও আবার এখন আসতে চায় কেন, কে জানে।

—আসুক।

—হ্যাঁ আসুক। ও চলে গেলে তুমি থেক। সব সময় আমার কাছাকাছি থেক। এতদিন পরে তোমাকে যখন পেয়েছি তখন আর ছাড়তে ইচ্ছে হয় না।

—তোমার মনে এত অভিমান ছিল জানতাম না।

অহমেসের চোখে জল আসে। কিন্তু মুতনেফার্তের পদশব্দে সেই অশ্রু ঝরে পড়ার অবকাশ পায় না।

রাজ্যাভিষেক আর হেব-সেদ বা লাঙল উৎসবের মধ্যে মূলগত পার্থক্য তেমন বিশেষ নেই। তবে রাজ্যাভিষেক স্বভাবতই অনেক আড়ম্বরের সঙ্গে সমাধা হয়। কারণ এখানে সম্পূর্ণ নবীন এক ব্যক্তিকে ফ্যারাও রূপে নির্ধারিত করা হয়। এই নবীন মানুষটি সেদিন থেকেই প্রথম ঈশ্বরের অংশ রূপে পরিগণিত হয়। এই উৎসবের দিনে তাকে হোরাসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। হেব-সেদ-এ যা যা করণীয় সবই রাজ্যাভিষেকের সময়ও করা হয়। দুইজন পুরোহিত হোরাস আর থথ-এর মুখোশ ধারণ করে সুদীর্ঘ পবিত্রকরণের ক্রিয়াকর্ম শুরু করে। তারপর নবীন ফ্যারাওকে প্রজাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয় এবং তাকে

সর্বসমক্ষে নতুন উপাধি প্রদান করা হয়। এরপর দুইবার তার মস্তকে মুকুট পরানো হয়। একটি মুকুট উপরের মিশরের অধীশ্বর রূপে এবং দ্বিতীয়টি নীচের মিশরের অধিপতির নিদর্শন। এরপর প্রাচীর প্রদক্ষিণের পালা। এই প্রাচীর বাইরের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য নীচে মেমফিসে নির্মাণ করেছিলেন পুরাকালে মেনেস। তিনিই এই দেশের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য থীবস-এ মেমফেসের প্রাচীর আসরে কোথা থেকে ? তাই সেই প্রাচীরের একটি প্রতীক নির্মাণ করা হয়।

শুধু রাজ্যাভিষেকের সময় নয়, এই একই হেব-সেদ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে কোন প্রাসাদ নির্মাণের সময়, পিরামিড গড়ে তোলার সূচনায়। এই উৎসব পালন করা হয় কোন দুর্গ তৈরীর পূর্বে। এমনকি কৃষিকর্মের জন্য জলসেচ ব্যবহার করার প্রাবল্যেও এই ধরনের অনুষ্ঠানের ঢল আছে। অর্থাৎ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রাক্কালে হেব-সেদ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র দেবালয় নির্মাণের সময় তো কথাই নেই। রাজ্যাভিষেকের সময় এই উৎসবে ফ্যারাওকে ষাঁড়ের লাঙুল উপহার দেওয়া হয় ফ্যারাও-এর তক্‌মা চিহ্ন রূপে। হেব-সেদের অর্থই তো ষাঁড়ের লাঙল।

অভিষেকের দিন যত এগিয়ে আসতে থাকে ফ্যারাও-এর স্বাস্থ্যেরও তত অবনতি হতে থাকে। কেন এমন হচ্ছে হকিমরা ধরতে পারছে না। অথচ অনেকদিন থেকেই বুঝতে পারছে, ক্রমাবনতি হচ্ছে। প্রথমে তারা ভেবেছিল বংশগত কোন রোগ বোধহয় বার্ধক্যের সুযোগ জেঁকে বসার চেষ্টা করছে, কিন্তু তেমন কোন প্রবল লক্ষণও নেই। একবার তারা ভেবেছিল, ফ্যারাও-এর শরীরের কোন এক অজ্ঞাত অংশে বোধহয় কর্কট রোগের আক্রমণ ঘটেছে। কিন্তু বুকে, মুখে বা পাকস্থলীতে বা গণ্ডে কোনরকম লক্ষণ নেই। সামান্য বেদনাও নেই। অথচ তিনি দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছেন।

প্রজারা শেষপর্যন্ত শুনে ফেলল যে তাদের ফ্যারাও থুথমসের দেহের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তখন থেকে গুঞ্জন শুরু হল। শুরু হল প্রথমে সাধারণ মানুষের মধ্যে, তারপর রাজকর্মচারীদের মধ্যে। তারা একজন স্বাস্থ্যবান নবীনকে দেখতে চায় ফ্যারাও রূপে। তারা বিশ্বাস করে যে দেবতাকেও স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়লে সরে যেতে হয়। তারা জানে ফ্যারাও-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র থুথমস নাম নিয়েই মসনদে বসবে। তারা শুনেছে যে পিতার মত তাঁর পুত্র আপাতদৃষ্টিতে অতটা উপযুক্ত নয়। কিন্তু উপযুক্ত হতে কতক্ষণ ? অভিষেকের দিনে যেদিন সে হোরাস হবে সেদিন থেকে তার স্বভাবের আমূল পরিবর্তন হবে বলে বিশ্বাস। কারণ সেদিন থেকে সে হবে সোজাসুজি দেবতার প্রতিনিধি। দেবতার অংশ হয়ে যায় যে, সে কি অনুপযুক্ত থাকতে পারে ?

সম্রাজ্ঞী অহমেসের কানে এসেছে যে রাজকর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ হতশেপসুতকে ফ্যারাও রূপে মেনে নিতে কুণ্ঠিত। সে যে একজন দক্ষ প্রশাসিকা, তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই তারা পেয়েছে। তারা অনুভব করেছে পরবর্তী ফ্যারাও-এর চেয়ে হতশেপসুতের বুদ্ধি বেশী তীক্ষ্ণ, তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব

প্রচণ্ড এবং তার সিদ্ধান্ত অনমনীয়। তবু তারা একজন পুরুষকেই ফ্যারাও রূপে চায়।

কথাটা প্রকারান্তরে কন্যার কর্ণগোচর করলেন তিনি। হতশেপসুত যে কথাটা প্রথম শুনল তা নয়। তবু সে ভীষণ ক্রোধান্বিত হল। তার জেদ আরও বেড়ে যায়। মাকে সঙ্গে নিয়ে সে ফ্যারাও-এর কাছে গিয়ে সংযত কণ্ঠে বলে—আপনি বরাবর বলে এসেছেন আমিও ফ্যারাও হব।

সর্বাঙ্গ ব্যথায় তখন ছিঁড়ে যাচ্ছিল প্রথম থুথমসের। তবু তিনি স্থির কণ্ঠে বলেন—আমি এখনো তাই বলি। তুমিও ফ্যারাও হবে। আমার বিশ্বাস নারী হয়েও তুমি তোমার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারবে। এর মধ্যেই তা প্রমাণিত সত্য।

—কিন্তু কেউ চায় না আমাকে।

—তাও জানি।

—তবে?

—তবু তুমি ফ্যারাও হবে। কারণ থথ-এর বাণী মিথ্যা হয় না।

—থথ?

—হ্যাঁ, একথা এতদিন বলিনি। আজ বলছি তোমাকে। তোমার মা-ও রয়েছেন এখন। তোমার যেদিন জন্ম হল সেদিন প্রকাশ্য দিবালোকে আমার কক্ষের পশ্চিম কোলে উদয় হলেন দেবতা রা। কক্ষটির আলো সহস্রগুণ বৃদ্ধি পেল। আমি সহ্য করতে না পেরে চোখ বন্ধ করলাম।

—দেবতা রা?

—হ্যাঁ, ঠিক তেমনি। আমিও ভেবেছিলাম এ কেমন করে সম্ভব? তারপর দেখলাম রা-এর তেজ ধীরে ধীরে প্রশমিত হল। সেখানে এবারে রা-এর পরিবর্তে দেখা গেল দেবতা থথকে। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। ভাবলাম, এ কি দিবাস্বপ্ন! হাত দিয়ে দুই চোখ ঘষলাম। থথ হেসে বলে উঠলেন—"স্বপ্ন না, সত্যিই আমি এসেছি। তোমার সন্তানটি কন্যা হলেও সে ফ্যারাও-এর মত দীর্ঘদিন ধরে মিশরকে শাসন করবে। সে-ই তখন হবে একমাত্র অধীশ্বরী।" কথাটা বলেই তিনি মিলিয়ে গেলেন। আমি একথা অবিশ্বাস করি কি করে? তাই তোমাকে শুনিয়ে এসেছি তুমিই হবে মিশরের ফ্যারাও। সেই জন্যেই আমি তোমাকে সহ-শাসক রূপে নির্বাচিত করেছি।

—কিছু প্রজা এবং কয়েকজন রাজকর্মচারী তাহলে দেবতার বিরুদ্ধাচরণ করছে। এটা ঘোর অন্যায়।

—না, অন্যায় নয়। তাদের দোষ কি? তারা তো আর একথা জানে না। তারা প্রথাবিরুদ্ধ কোন কিছু মানতে চায় না।

—কি করলে তারা মেনে নেবে?

—তোমাকে শান্ত থাকতে হবে। যে সুযোগ তুমি পেয়েছ নিজের দক্ষতা আর স্বভাবের গুণে সবার কাছে তা গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।

হতশেপসুত চুপ করে যায়।

ফ্যারাও বলেন—তোমাদের অভিষেক ভেবেছিলাম কয়েকদিন পরে সম্পন্ন করব। কিন্তু তা হবার নয়। আমি দেখে যেতে চাই। আমার হয়ে তুমি ঘোষণা করে দাও আগামী পরশু তোমাদের অভিষেক হবে। তাহলে আমার সামনে তোমার সম্বন্ধে কেউ আপত্তি তুলতে পারবে না।

হতশেপসুত ঘাড় হেলায়।

প্রথম থুথমস অবসর নিলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন একাধারে দ্বিতীয় থুথমস এবং সম্রাজ্ঞী হতশেপসুত। উত্তর আর দক্ষিণ মিশরের শিরোভূষণ একে একে উভয়ের মস্তকেই শোভা পেল অভিষেকের সময়ে। প্রজারা হতচকিত হল। রাজকর্মচারীরা মাথা নীচু করে রইল। কিন্তু যন্ত্রণাকাতর ফ্যারাও-এর সামনে তারা কোন কিছু বলল না। প্রজারা শুধু বলাবলি করে—"রানীর উপাধি তাহলে কি হবে? থুথমস তো হতে পারে না।"

তা তো পারেই না। হতশেপসুত নিজেও এ সম্বন্ধে আগে কিছু ভাবেনি। অভিষেকের সময়ে মুখোশধারী যুগ্ম পুরোহিতও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সাময়িক ভাবে। তারপর ঘোষণা করা হল সম্রাজ্ঞী হতশেপসুতের নাম। নামে কি এসে যায়। নামে কি এসে যায়। ভাবল হতশেপসুত। ক্ষমতার অধিকারই আসল। সে থাকতে তার স্বামীর পক্ষে দাপট দেখানো কখনো সম্ভব হবে না।

সেদিনের অনুষ্ঠানের পরে প্রজারা বিদায় নিলে ভোজপর্বের সূচনা। এই ভোজপর্ব দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী ছিল। নীলপদ্ম বিতরণ করা হল। নারী সঙ্গীত-শিল্পীরা সুরেলা কণ্ঠে গাইল। তাদের সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্যে মেতে উঠল সুন্দরী নর্তকীগণ। এইদিনে সবাই তাদের দক্ষতার সবটুকু উজার করে দিতে চায়। দিলও তাই। বৃদ্ধ থুথমস কিছুক্ষণ একপাশে বসে নির্লিপ্ত ম্লিয়মাণতায় সেসব দেখলেন। তারপর একসময় নারী সহায়িকার সাহায্যে ভেতরে চলে গেলেন। রানী অহমেসও তাঁর সঙ্গে ভেতরে চলে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী তাঁকে থাকতে বললেন। নইলে হতশেপসুত ব্যথিত হবে। মুতনেফার্ত অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যেখানে উপস্থিত রয়েছেন। সেখানে তাঁর পক্ষে না থাকাটা অশোভনীয়ও বটে। বৃদ্ধ ফ্যারাও-এর বিদায় আজ আর মুতনেফার্তের নজরে পড়ল না। হয়ত পড়েছিল। কিন্তু তাকে তিনি গুরুত্ব দিলেন না। আজ থেকে তাঁর পুত্র ফ্যারাও। ভূতপূর্ব ফ্যারাও-এর জন্য ব্যস্ত হবার মত সময় অন্তত আজ তাঁর নেই। আজকের হেব-সেদ উৎসব তিনি পুরো মাত্রায় উপভোগ করতে চান। তাই নৃত্যের তালে তালে তিনি হাতের তালি বাজাতে থাকেন।

উপস্থিত মাননীয় অতিথিবৃন্দের অনেককে নতুন পোশাকে ভূষিত করা হয়। এ ছাড়া সবাইকে সুগন্ধি আতরে এবং তেলে সিক্ত করা হয়। উৎসব প্রাঙ্গণ মোহময় হয়ে ওঠে। রানী অহমেস ভাবেন, জগত অতীতকে কত সহজে ভুলে যায়। এই বিস্মৃতির মধ্যে এতটুকুও বেদনাবোধ নেই। সবার দৃষ্টি শুধু সমুখপানে। পশ্চাতে ফিরে চাইবার অবকাশ নেই। এতদিন যে ব্যক্তি সমগ্র

দেশটিকে রক্ষা করলেন, দেশের সম্মান বৃদ্ধি করলেন, যাঁকে দেবজ্ঞানে এতদিন সবাই পূজা করল, তোষামোদ করল, নিমেষেই তাঁর মূল্য নিঃশেষ হয়ে গেল। ঠিক যেন ভোজবাজী। এই আছে, এই নেই। এতদিন পরে স্বামীর জন্য চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই অশ্রু লুকিয়ে ফেলতে হবে। বড়ই বেমানান এখানে।

হতশেপসুত লক্ষ্য করে যে তার বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং স্বামী, নতুন ফ্যারাও হয়ে ঠিক যেন নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। কখনো আচার-আচরণে অতি মাত্রায় চটপটে ভাব দেখাতে গিয়ে সুরাপাত্র ভেঙে ফেলছে, কখনো নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ছে। এই প্রথম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দুর্বলতাকে নিজের দুর্বলতা বলে মনে হয় তার। অথচ সে তার প্রিয়তম নয়। একাধারে ভ্রাতা, স্বামী ও প্রিয়তমকে লাভের ভাগ্য কয়জনেরই বা হয়। তবু সে অনুভব করে উভয়ের স্বার্থ আজ থেকে অভিন্ন।

একটু পরে ধীরে ধীরে নতুন ফ্যারাও অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে প্রতি পদে তার স্ত্রীর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। মুতনেফার্ত বিরক্ত হন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন এটাই বিধিলিপি। হতশেপসুত কৌশলে স্বামীকে পরিচালিত করে মুখরক্ষা করে। এরপরে নিশ্চয় দ্বিতীয় থুথমস ধীরে ধীরে ফ্যারাও-এর পক্ষে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

কদিন পরেই প্রথম থুথমসের মৃত্যু হল। অভিষেকের আমেজ তখনো কাটেনি রাজধানী থীবস-এ। নতুন যুগ্ম শাসক মাত্র দুতিনদিন বসেছে জোড়া মসনদে। দ্বিতীয় থুথমসের পাশে সম্রাজ্ঞী হতশেপসুত।

বৃদ্ধ ফ্যারাও উপযুক্ত সময়েই বিদায় নিলেন। তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। পশ্চিমের রাজকীয় উপত্যকায় তাঁর জন্য সমাধি-মন্দির প্রস্তুত। সেটি অপেক্ষা করছে আপনজনকে বক্ষে ধারণ করতে। এই সমাধিস্থল অতি যত্নের সঙ্গে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন এখানকার প্রসিদ্ধ স্থপতি ইনেনি। এমন ভাবে এটি নির্মিত যে সমাধির অভ্যন্তরে রক্ষিত ঐশ্বর্য থাকবে তস্করদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ইনেনি বলেছেন, তাঁর পরিকল্পিত এই সমাধি মন্দিরই এখন বহুদিন পর্যন্ত আদর্শ বলে বিবেচিত হবে। তবে কক্ষের সংখ্যা হয়ত ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাবে।

হতশেপসুত মনস্থ করে তার পিতার শবদেহ চিরপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কাষ্ঠনির্মিত শবাধারে রাখা হবে না। সে শবাধারকে চিরস্থায়ী করার জন্য প্রস্তরনির্মিত ও কারুকার্যমণ্ডিত করতে চায়। সে সেইভাবেই নির্দেশ দিয়েছে। কতটা সম্ভব হবে সে জানে না। কারণ সময় বড় কম। নতুন কিছু প্রবর্তনের জন্য সময় লাগে। কারণ পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা থাকে না।

এই বয়সের মৃত্যুতে কি শোকের ছায়া নামে? নামা উচিত। কারণ এদেশে এক শত দশ বছরকে পরিপূর্ণ আয়ু বলে বিশ্বাস করে মানুষে। সেই তুলনায় থুথমস যুবক। তবু দেশের মানুষের অন্তর তো বোঝার উপায় নেই। কারণ

ফ্যারাও-এর মৃত্যু হলে কতকগুলি অনুষ্ঠান বহুদিন থেকে অবশ্যপালনীয়। তবে তাতে থুথমসের পিতামহের সময় থেকে একটা বিশেষ মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। তাঁর আগে মিশর এতটা সমৃদ্ধশালী ছিল না। মিশর ছিল হিকসোসদের পদানত। তারপর তাকে বিদেশী শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করা হল। তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল বহুদূরে, পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিরও সীমা ছাড়িয়ে। সেই সব রাজ্য মিশরের অধীন হল। বশ্যতা স্বীকার করল সেখানকার অধিপতিরা। নিয়মিত কর ও নজরানা দিতে শুরু করল। এতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটল। এদিকে নুবিয়ার তাম্র ও স্বর্ণখনির উৎপাদনও বৃদ্ধি পেল। ফলে দেশের আচার-অনুষ্ঠানগুলি অনেক বেশী জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হতে থাকল। চিরপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী শোক পালনের মধ্যেও দেখা গেল আধিক্য। দেশের আপামর জনসাধারণ অশ্রুবিসর্জন করতে থাকে। নিজের নিজের পরিধেয় পরিচ্ছদ দুহাত দিয়ে সজোরে টেনে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলে শোকের বহিঃপ্রকাশ রূপে। দেবস্থানগুলি বন্ধ হয়ে যায়। লোকেরা দেবতার কাছে পশুপক্ষী কিংবা অন্য কিছু উৎসর্গ করা থেকে বিরত থাকে। তারা বাহাত্তর দিন কোন উৎসব পালন করে না। দু'তিনশো স্ত্রী-পুরুষের দল তাদের মস্তক কর্দমলিপ্ত করে রাস্তায় রাস্তায় উন্মাদের মত ঘুরে বেড়ায়। তাদের ছিন্ন পোশাকগুলো স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে তাদের বুকের নীচে কোমর-বন্ধের মত বেঁধে ফেলে। তারা দিনে দুইবার মৃতের স্মরণে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কালীন প্রার্থনা সঙ্গীত গায়। তারা এই বাহাত্তর দিন গম-জাত খাদ্য গ্রহণ করে না। তারা পশুর মাংস গ্রহণে বিরত থাকে। মদ্য স্পর্শ করে না, প্রমোদভ্রমণ বর্জন করে। তারা স্নান করে না। দেহে সুগন্ধি আতর কিংবা তৈল লেপন করে না। তারা আরামপ্রদ স্থানে শয়ন পর্যন্ত করে না। এমনকি প্রেম নিবেদনের এবং প্রেমের রসাস্বাদনের আনন্দ থেকে সংযত থাকে।

এই বাহাত্তর দিন দুঃখের মধ্যে, শোকের মধ্যে অতিবাহিত হয়। ইতিমধ্যে ফ্যারাও-এর দেহ সমাধিস্থ করার উপযুক্ত করে তোলার জন্য সবরকমের প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

তবু কেউ কারও নয়, কিছুই কারও নয়। ফ্যারাও-এর নীলনদের জলপ্রবাহ এক মুহূর্তের জন্য থমকে থাকল না। পশুদের জৈব আনন্দ, তাদের চিৎকার স্তব্ধ হল না। পাখিদের সুমিষ্ট গান, তাদের প্রেমনিবেদনে কোন বাধা পড়ল না। কেউ কারও নয়, কিছুই কারও নয়। একথা বোধহয় সবচেয়ে বেশী জানে পুরাকালের ফ্যারাও জোসেবরর রাজত্বকালে তাঁর অত্যন্ত প্রতিভাবান উজির ইমহোটেপের পরিকল্পিত সেই সুউচ্চ পিরামিড যা ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে আকাশের দিকে। এই ধাপগুলির প্রতিটিতে পা ফেলতে ফেলতে ওপরের দিকে এগিয়ে যাবেন মৃত ফ্যারাও। উঠতে উঠতে অবশেষে স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হবেন এই আশায়। এ কথা জানে সেই সব পিরামিডগুলির প্রতিটি যারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটকে রয়েছে সক্কারা এবং গিজার সুবিস্তীর্ণ মরু অঞ্চলে। এরা যুগ যুগ ধরে দেখে আসছে আর অনুভব করে আসছে যে কেউ

কারও নয়, কিছুই কারও নয়।

দেশের জনসাধারণের মধ্যে বাহ্যিক শোকের ছায়া নামলেও, অন্তরেও কি নেমেছে? বলা মুশকিল। অথচ নামা উচিত ছিল। কারণ তিনি তো কম করেন নি দেশের সুস্থিতের জন্য, শান্তির জন্য। হিকমোসদের আক্রমণের আগে দেশে স্থায়ী কোন সৈন্যদল ছিল না। তাদের বিতাড়নের পরে অনুভূত হল এই সৈন্যদলের অভাব। থুথমসই তাদের পরিকল্পিত রূপ দেন। বাহিনীকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। তাদের প্রত্যেকের নাম দেওয়া হয় যথাক্রমে অমন, প্টহ, রা এবং সেথ। উপরের এবং নীচেয় মিশরে তাদের দুটি কার্যালয় এবং থাকার ব্যবস্থা করা হয়। থুথমসই প্রথম উপর ও নীচের মিশরের জন্য দুটি পৃথক অমাত্যের পদের সৃষ্টি করেন। একজন বসবে মেমফিসে, অপরজন থীব্স-এ। দেশের গবাদি পশুর গণনা এবং সাল-তামামির ব্যবস্থা তিনিই করেন। তাছাড়া পিতৃপুরুষের মত তাঁরও দেশের গোখাদ্য বিতরণের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর ছিল। তিনি দেশের সংরক্ষিত জলাধারগুলি পরিদর্শনে নিয়মিত যেতেন। কোথায় কত গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে তার হিসাব রাখতেন। নীলনদের জলধারা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কোথায় কেমন এ খবরও সবসময় তাঁর নখদর্পণে থাকত।

কিন্তু বাইরে শোক পালন করলেও অন্তর দিয়ে কি কেউ একথা মেনে নেয়? তারা হয়ত ভাবে, ফ্যারাও হয়েছেন যখন, এসব তো দেখবেনই তিনি। এতে কৃতিত্ব কোথায়? বরং ব্যর্থতায় রয়েছে দুর্নাম। হয়ত সেটাই সত্য।

যাহোক দীর্ঘ দিন ধরে মৃত ফ্যারাও থুথমসের দেহটিকে অক্ষয় করার প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রাসাদের সেই নির্দিষ্ট নির্জন কক্ষে। সেখানে চিকিৎসক থাকে, ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী থাকে, আর থাকে আইন মোতাবেক কয়েকজনের একটি গোষ্ঠী। প্রথমেই ফ্যারাও-এর মস্তিষ্ককে নরম করে নেওয়া হবে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে। তারপর একটি বাঁকানো লৌহশলাকা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে সেই নরম মস্তিষ্ককে সুকৌশলে বের করে নেওয়া হবে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এই অতি ব্যয়সাধ্য প্রক্রিয়া প্রযোজ্য নয়। নুবিয়ারও ওপরের দেশে পাওয়া যায় বিশেষ এক ধরনের প্রস্তর। সেই প্রস্তর দ্বারা নির্মিত অস্ত্রদ্বারা কুঁচকির কাছে কাটা হবে। সেই স্থান দিয়ে পাকস্থলী ও অন্ত্রকে বের করে এনে বিভিন্ন খনিজ-তৈল দ্বারা শোধিত করে চারটি বিশেষ ধরনের পাত্রে রাখা হবে। প্রতিটি পাত্রকে রক্ষা করার জন্য ভার দেওয়া হয় দেবতা হোরাসের চার পুত্রের ওপর। এই চার পুত্র হলেন মেসতা, হাপি, তুয়ামুতেফ এবং কুয়েভসেনুফ। তাই এই চার দেবতার মস্তক খোদিত থাকে চারটি পাত্রের গাত্রে। এই চার দেবতা এবং অলঙ্কৃত শবাধারে রক্ষিত দেহের ওপর আবার দৃষ্টি রাখেন দেবী আইসিস, নেফথিস, নীথ এবং সেলকিত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত হৃদপিণ্ডটিকে বাইরে এনে আবার পুনঃস্থাপিত করা হত যথাস্থানে। কারণ এই হৃদয়ই হল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবাবেগের পীঠস্থান। কিন্তু সম্প্রতি হৃদয়ের স্থানে স্থাপিত হচ্ছে প্রস্তর-নির্মিত গুটিপোকা। এটি একটি অতি পবিত্র প্রতীক। এর গুরুত্ব এবং

মাহাত্ম্য হৃদপিণ্ডের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বিচারকালে এই হৃদয়ের ওজনের ওপরই যাচাই হয় মৃত ব্যক্তি নির্দোষ এবং নিষ্কলুষ কিনা। হৃদয় কিংবা তার প্রতীক দেহের মধ্যে না রাখলে মমির পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয় না। স্বর্গে প্রবেশের মুখে বিচারকালেও এর উপস্থিতি অপরিহার্য।

এরপর অন্ত্র, পাকস্থলী ইত্যাদি দেহাভ্যন্তর থেকে বের করে নেবার ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় সেই শূন্যস্থান প্রথমে খেজুর গাছের রস দ্বারা প্রস্তুত মদ্য দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেওয়া হয়। তারপর ভরাট করা হয় জড়ানো কাপড় কিংবা কাঠের গুঁড়ো, বৃক্ষজ আঠা এবং সুগন্ধি মশলায়। এ ছাড়াও চুপসে যাওয়া দেহের সুঠাম সৌষ্ঠব ফিরিয়ে আনতে দেহের ভেতরে আরও নানা ধরনের পদার্থ প্রবেশ করান হয়। দেহটিকে এরপর খনিজ তৈলের মধ্যে চুপিয়ে রাখা হয়। সেটি বিশুষ্ক হলে তাকে স্নান করানো হয়। এরপর নানা ধরনের সুগন্ধি আতর ইত্যাদি মাখানো হয়।

তারপর শুরু হয় একটি জটিল প্রক্রিয়া। সমস্ত দেহটির প্রতিটি স্থান বস্ত্র দ্বারা জড়ানো হয়। দীর্ঘ এবং সরু ফালা ফালা করা বস্ত্র বৃক্ষজ আঠায় ভিজিয়ে সর্বাঙ্গে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে জড়ানো হয়। হাত ও পায়ের প্রতিটি আঙুল পৃথকভাবে জড়াতে হবে। শুধু একবার নয়, বারেবারে দেহটিকে এভাবে জড়াতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে পনেরো ষোলবার জড়াতে হয়। সব সময় নজর রাখতে হয় জীবিত অবস্থার আকার যেন বিকৃত না হয়। তাই কাপড়টি অতি সূক্ষ্ম এবং বহু মূল্যবান ক্ষৌমবস্ত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়—অন্ততঃ ফ্যারাও কিংবা অভিজাত বংশের ব্যক্তির ক্ষেত্রে। রঙটি তাই হরিদ্রাভ। সাধারণ মানুষের বেলায় তুলা থেকে উৎপাদিত বস্ত্রই যথেষ্ট। কিন্তু ফ্যারাও তো সাধারণ নন।

দেহটি বস্ত্র দ্বারা জড়ানোর সময় মাঝে মাঝে থামতে হয়। কারণ ক্ষৌমবস্ত্রের প্রতিটি ভাঁজে মন্ত্রলাঞ্ছিত লিপিকা দেওয়া হয়। মৃতদের জন্য লিখিত প্যাপাইরাসের কিতাব একটি ভাঁজে দেওয়া হয়। বস্ত্রেও এই মন্ত্র লেখা থাকে। এটাই রক্ষাকবচের কাজ করে। এ ছাড়াও বৃহৎ প্যাপাইরাসে মন্ত্র লিখে সেটি গুটিয়ে জড়ানো বস্ত্রের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। কোথাও যেন কোন ফাঁকে না থাকে। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হল বৃহৎ সবুজ গুবড়ে পোকা, যা হৃদয়ের পরিবর্তে সেইস্থানে রাখা হয়েছে। এতেও মন্ত্র লেখা রয়েছে। এই মন্ত্রে হৃদয়কে অনুনয় করা হয়েছে সে যেন প্রভুর বিরুদ্ধে কোন কিছু না বলে।

ফ্যারাওকে অবশেষে কারুকার্যশোভিত শবাধারে শয়ন করানো হয়। কিন্তু তিনি কি একা যাবেন সেই জগতে। পৃথিবীতে কখনো তিনি ভূমি কর্ষণ করেন নি, কাস্তে ধরেন নি হাতে। ওখানে গেলে ওসিরিস তাঁকেও সবার মত মাঠে পাঠাতে পারেন। পুরাকালে শত শত ক্রীতদাসকে জীবন্ত অবস্থায় ফ্যারাও-এর সমাধির ভেতরে আটকে রেখে আসা হত। ফ্যারাও-এর পরিবর্তে তারাই শ্রমসাধ্য কাজকর্ম করে দেবে বলে। ফ্যারাও-এর ব্যক্তিগত কাজকর্ম করে দেবার জন্য একজন ক্রীতদাসীকেও হত্যা করে সেখানে রাখা হত। কিন্তু এখন জীবন্ত বা মৃত কাউকে রাখা হয় না। এখন তাদের পরিবর্তে রাখা হয় কাঠ, প্রস্তর বা

ধাতুনির্মিত উশেব্‌তি। এরা উত্তরদাতা। ওপারের জগতে যখনই মৃত ফ্যারাও-এর ডাক পড়বে শ্রমদানের জন্য, তখনই এইসব মন্ত্রঃপূত মূর্তিগুলি এগিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি। বলবে—"এই যে আমরা হাজির হজুর। আমরা আমাদের প্রভুর হয়ে সমস্ত কাজ করে দেব।" এরা সামান্য পুত্তলিকা নয়। কারণ এদের সর্বাঙ্গে মন্ত্র এবং মৃতদের জন্য প্যাপাইরাসে লিখিত যে কিতাব রয়েছে, সেই কিতাবের চতুর্থ অনুচ্ছেদের সবটুকু লেখা থাকে। শবদেহের পাশে রাখা হয় দাঁড় সমেত একটি ক্ষুদ্র নৌ-যান। এই নৌকাতে মৃত ফ্যারাও আলো এবং অন্ধকারের দেশ অতিক্রম করে পৌঁছে যাবে সেই প্রার্থিত দেবলোকে।

কিন্তু প্রার্থিত দেবলোকের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলেই তো আর ভেতরে যাবার অধিকার মেলে না। তার আগে পরীক্ষা দিতে হবে যে। তাঁকে পরীক্ষা করে দেখা হবে তিনি স্বর্গলোকে প্রবেশের যোগ্য কিনা।

এই বিশেষ বিচার অনুষ্ঠিত হয় সত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মুত-এর বিশেষ কক্ষে। এই কক্ষের মাঝখানে একটি অতিকায় দাঁড়িপাল্লা রাখা আছে। এই পাল্লার একদিকে স্থাপন করা হয় মৃত ব্যক্তির হৃদপিণ্ড এবং অপর দিকে মুত-এর মস্তকের পালক। মনুষ্যদেহের মধ্যে হৃদপিণ্ডই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু একথা অজানা নয়। যখন এটিকে ওজন করা হয় তখন এর মালিক সামনে দণ্ডায়মান থাকে আর নিজের হৃদপিণ্ডের কাছে আকুতি জানায় যেন সে তার বিরুদ্ধাচরণ না করে। হৃদপিণ্ডটি ওজন করেন দেবতা অনুবিস স্বয়ং। আর ওজনের ফলাফল লিখে রাখেন থথ। থথ-এর সঙ্গী বেবুন দাঁড়িপাল্লার মাথার ওপর বসে থাকে। দেবী মুত নিজে সমস্ত সময় উপস্থিত থেকে নজর রাখেন। আর সেখানে উপস্থিত থাকে একটি ভয়ংকর আকারের দানব যার মাথাটা কুমীরের, সামনের অংশ সিংহের এবং পেছনের ভাগ জলহস্তীর। সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। বিচার যদি মৃতব্যক্তির বিরুদ্ধে যায় তাহাল সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে গোগ্রাসে গিলে ফেলবে। আর যদি হৃদপিণ্ড এবং দেবীর পালকের ওজন সমান সমান হয় তাহলে দেবতা থথ সেখানে উপস্থিত দেবতামণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলেন—"এই ব্যক্তি সাচ্চা। এর মধ্যে কোন পাপ নেই।" হৃদপিণ্ড ওজনের পূর্বে এই সব দেবতাদের কাছেই মৃত ব্যক্তি শপথ নিয়ে বলে যে সে নির্দোষ, থথ-এর ঘোষণার পরে দেবতা হোরাস নিজে এসে মৃত ব্যক্তির হস্ত ধারণ করে তাকে নিয়ে যান দেবতা ওসিরিস সকাশে। কারণ প্রমাণ হয়ে গিয়েছে মৃত ব্যক্তি আইনের কিতাবে লিপিবদ্ধ বিয়াল্লিশটি পাপের কোনটিই স্পর্শ করেনি। পাপগুলি অন্যতম হল বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবঞ্চনা, দাম্ভিকতা, মিথ্যসাক্ষ্য, যৌনবিকৃতি প্রভৃতি। দেবী মুত ধর্মীয় সততার চেয়ে সামাজিক সততাকে বেশী প্রাধান্য দেন।

দেবলোকে মৃতব্যক্তি তো তার পার্থিব আকার নিয়ে বাস করতে পারে না। কিভাবে থাকবে তাহলে? তার দেহ নয়, থাকবে তার বা অর্থাৎ আত্মা। এই বা-কে দেখতে কেমন? শ্মশ্রু গুম্ফ সংবলিত মনুষ্যমুখী সারস পাখির মত, তার সম্মুখে থাকে একটি বাতি। বাতিটি থাকার অর্থ এই যে আকাশের প্রতিটি

তারকাই এক একজন মানুষের বা। এই বা ইচ্ছা করলে মনুষ্যমূর্তি ধারণ করতে পারে, আবার পশুপক্ষী বা মৎস্যের রূপও ধারণ করতে পারে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই বা শবদেহ থেকে বের হয়ে আসে। শুধু বা নয়, রয়েছে আর এক সত্তা, তার নাম হল কা। বা-এর সঙ্গে আবার কা-এর সম্পর্ক রয়েছে। এই কা মনুষ্যদেহের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। মানুষের জন্মের সঙ্গেই এর জন্মমৃত্যুর পর পৃথিবীতেই এর অবস্থিতি। দেহের সঙ্গে কা কখনো সম্পর্কচ্যুত হয় না। তাই মৃত ব্যক্তির মমির সঙ্গে সমাধিমন্দিরেই থেকে যায় সে। মৃত ব্যক্তিকে উৎসর্গীকৃত খাদ্যবস্তুই সে গ্রহণ করে। যদি খাদ্যবস্তু উৎসর্গ করা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ক্ষুধার্ত কা এদিকে ওদিকে বিচরণ করে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বেড়ায়। ফলে সেই ব্যক্তির স্বর্গলোকে বসবাসকারী বা-এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। তবে মৃত ব্যক্তির কা-এর যাতে খাদ্য বা পানীয়ের অভাব না হয় তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কারণ তেমন হলে দেহের কিছু কিছু অংশের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সেই কথা ভেবেই তো দেহের অভ্যন্তরের অংশগুলি চারটি ঘটে রাখা হয় এবং চার দেবপুত্রের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় যাতে অঙ্গগুলি ক্ষুধার্ত অনুভব না করে। পৃথিবীর মমিকেও তাই সযত্নে রাখতে হয়। কারণ যদি মমির মারাত্মক কোন ক্ষতি হয় কিংবা যদি একেবারে বিনষ্ট হয় তাহলে স্বর্গলোকে তার বা-ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

যাইহোক মৃত প্রথম থুথমসের দেহকে সযত্নে উপযুক্ত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট বাহাত্তর দিন প্রায় শেষ হয়ে আসে। এবারে তাঁকে চিরপ্রচলিত শোকযাত্রা সহকারে নীলনদ অতিক্রম করে পশ্চিমের রাজকীয় উপত্যকায় নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে তিনি নিজেই নিজের সমাধিমন্দির নির্মাণের সূচনা করে গিয়েছিলেন, মসনদে উপবেশনের পর থেকেই। সেটি হয়ত একেবারে সম্পূর্ণ হয়নি। তবে তার দেহ ওখানে সমাধিস্থ করার পর বাকীটুকু বিশেষ ব্যবস্থা বলে সমাপ্ত করতে বেশীদিন লাগবে না।

ফ্যারাও-এর পরিবার পরিজন বন্ধুবান্ধব মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত হতে থাকে শবযাত্রার অংশীদার হবার জন্য। যে ফ্যারাও তাদের এত প্রিয় ছিলেন, তাঁকে শেষ সময়ে সঙ্গ না দিয়ে থাকা অসম্ভব।

অবশেষে সেই দিনটি আসে। মৃত্যুকে যেমন ঠেকিয়ে রাখা যায় না, এই দিনটিকেও তেমনি রোখা যায় না। নির্মমভাবে এটি এসে উপস্থিত হবেই। প্রিয়জনের দেহটি এতদিন তবু কাছাকাছি ছিল, এখন নিয়ে যাওয়া হবে তাঁর কাঙ্খিত স্থানে যা লোকালয় থেকে বহুদূরে। সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে পুষ্পস্তবক বা খাদ্য পানীয় রেখে আসা যায় মাত্র। প্রতিনিয়ত চোখের সামনে রাখা যায় না। তবু সেখানে রেখে আসতে হয় প্রিয়জনকে। থুথমসের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর সমাধিস্থলের ওপরে দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোন সৌধ নির্মাণ করা হয়নি। সেটি পাহাড়ের খাঁজে থাকবে লুক্কায়িত। তাঁর ধারণা ছিল এইভাবে তার দেহ থাকবে সুরক্ষিত। তস্কারেরা হামলা করতে পারবে না।

তবু ভাল, মৃতদেহকে পুরাকালের মত অবিদসে নিয়ে যাবার প্রথা আর

চালু নেই। আগেকার দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানের অধিপতিদের মৃত্যু হলে তাঁদের শবদেহ নিয়ে যেতে হত অবিদসে। তাঁদের জীবনের একান্ত বাসনাই ছিল তাই। কারণ এই নগরীতেই সমাহিত রয়েছেন প্রিয়তম দেবতা ওসিরিস। তাঁর মস্তক প্রোথিত রয়েছে এখানে। সুতরাং এই নগরীতে শবদেহ রক্ষিত হলে ওসিরিসের সান্নিধ্যে থাকা যাবে। কথাটা ভাবতেই ফ্যারাও এবং অন্যান্য উচ্চপদাধিকারীদের মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকার অর্থই হল তাঁরা ধূপ এবং অন্যান্য স্বর্গীয় উপহার পাবেন ওসিরিসের সঙ্গে। অবিদসের শ্রেষ্ঠ দেবতা তাঁদেরও স্বাগত জানাবেন। নেক্রোপোলিশের উৎসবে তাঁদেরও স্থান হবে জলযান নেশমেতে। সে যুগে মমিকে কারুকার্য করা ক্ষৌমবস্ত্রে জড়িয়ে একটি নৌযানে করে নিয়ে যাওয়া হত অবিদসে। সঙ্গে অপর একটি নৌযানে যেত তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা। অনেক সময় অবিদসে শবদেহকে একবার নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত নির্দিষ্ট সমাধিমন্দিরে।

এখন আর অবিদসে যেতে হয় না। থুথমসের দেহকে পশ্চিমের উপত্যকায় নিয়ে যাওয়ার আয়োজন সমাপ্ত হল। শবদেহকে একটি অতি মূল্যবান সুদৃশ্য আধারে স্থাপন করা হয়। শবাধার পুষ্পদ্বারা সজ্জিত করা হয়। তারপর নদী অতিক্রমের জন্য সেটিকে একটি বজরায় রাখা হয়। শবাধারকে ঘিরে বসেন সম্রাজ্ঞী অহমেস, রানী মুতনেফার্ত। সেখানে বসেন হতশেপসুত। প্রচলিত প্রথাকে মান্য করে ওঁদের পরিবর্তে কিছু নারী বক্ষ উন্মোচন করে শোক প্রকাশ করতে থাকে। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের দ্রব্য উৎসর্গ করতে থাকেন। তিনি ধূপ প্রজ্বলিত করার সময় বলেন—"আপনাকে ধূপ উৎসর্গ করছি হে হরমটিস শেপ্‌রে। আপনি রয়েছেন নুন-এর জলযানে যিনি দেবতাদের পিতা।"

শবদেহের সামনের নৌকাতেও অনেক স্ত্রীলোক, যারা অবিরত বিলাপ করতে থাকে। একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নৌকার পেছনে দাঁড়িয়ে মাঝিকে উচ্চকণ্ঠে বলে—"পশ্চিমের দিকে নৌকা ঘোরাও। ওদিকে রয়েছে ন্যায়ের ভূখণ্ড। আপনারা আরও বিলাপ করুন রমণীগণ। পশ্চিমে রয়েছে অখণ্ড শান্তি। হে নরশ্রেষ্ঠ। আপনার শান্তি হোক। সময় যখন হবে অন্তহীন, তখন আবার আপনার দেখা পাব। আপনি সেই দেশে যাত্রা করেছেন যেখানে সবাই সমান।"

তৃতীয় নৌকায় রয়েছে পুরুষ আত্মীয়েরা। চতুর্থটিতে রয়েছে উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ এবং বন্ধুবান্ধব। তারা ফ্যারাও-এর প্রতীক চিহ্ন মনে করে নিয়ে চলেছে। সেখানে তারা সৌধে নানা উপহার প্রদান করবে। ওদিকে শবদেহের পাশে সম্রাজ্ঞী বলে ওঠেন—"আমি তোমার ভগিনী, আমি তোমার প্রিয়তমা। হে বীর, আমাকে ছেড়ে যেও না।" হতশেপসুত বলে—"তুমি ছিলে আমার প্রিয় পিতা। এখন আমি তোমার কাছ থেকে কত দূরে।" মুতনেফার্ত বলে—"আমার সঙ্গে কথা বলে তুমি আনন্দ পেতে। এখন তুমি স্তব্ধ কেন? কথা কও।" অন্যান্য রমণীরা মাথায় ধুলো মেখে বলে—"হায়, আমাদের কী দুর্ভাগ্য।"

সমাধি সৌধের কাছে উপনীত হয় সবাই। সেখানে ফ্যারাও-এর প্রিয় দ্রব্যসামগ্রী, সৌধের মধ্যে বসবাসকালে তাঁর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং যাবতীয় বহুমূল্যবান রত্নরাজি রাখা হয়। তাঁর জন্য খাদ্য ও পানীয়ও দেওয়া হয়। সমাধিক্ষেত্রের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হল মুখবিবর উন্মোচন করার। এই অনুষ্ঠান প্রতিদিন প্রাতঃকালে মন্দিরেও অনুষ্ঠিত হয় একটু অন্যভাবে। এখানেও "মুখ খোলা" অনুষ্ঠিত হল। যাতে মৃত ফ্যারাও তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করতে পারেন। মমিকে একটি বালির ঢিবির ওপর রাখা হয়। মুখ ও চোখে সুগন্ধি তৈল মাখানো হয়। তারপর ওষ্ঠদ্বয়কে একটি ধাতব পদার্থদ্বারা সযত্নে ফাঁক করা হয়। এই সময় পুরোহিত অনর্গল মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন যে মন্ত্র পুত্র হোরাস পিতা ওসিরিসের মমির সামনে এই সময় উচ্চারণ করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। এই সময় রুটি, ফলমূল, মাংস, সুরা ও অন্যান্য নানা প্রকারের খাদ্য ও পানীয় একটি নীচু বেদীর ওপর রক্ষিত হয় যাতে ফ্যারাও-এর বা এবং কা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে, দেবতা রা-এর প্রাণদানকারী উত্তাপ যাতে সমাধিস্থলে মমির কক্ষে শবদেহের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। মৃত ফ্যারাও ওসিরিসের প্রাসাদশ্রেণীর অভ্যন্তরে নিজের খুশীমত যাতে চলাফেরা করতে পারেন তার জন্য আর একটি অনুষ্ঠান করা হয়। এটি করা হয় সমাধিমুখ চিরতরে বন্ধ করে দেবার পূর্বমুহূর্তে। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে মমির কক্ষে এটি সম্পন্ন করা হয়। এখানে মৃত ব্যক্তির পিতা কিংবা পুত্র ব্যতীত অপর কারও থাকার অধিকার নেই। তাই এক্ষেত্রে থুথমসের পুত্র দ্বিতীয় থুথমস রইল। আর রইল মৃত ফ্যারাও-এর পুত্রসম কন্যা হতশেপসুত। তাছাড়া রাখা হল ফ্যারাও-এর এক বিশ্বস্ত অনুচরকে সাহায্যকারী রূপে। এই অনুষ্ঠানে প্রয়োজন হয় চারটি মাটির পাত্রের। এই পাত্র সুগন্ধি আতর দ্বারা সিঞ্চিত করা হয়। তারপর এই পাত্র চারটি শ্বেতবর্ণ গাভীর দুধে পরিপূর্ণ করা হয়। এই দুধের প্রয়োজন হয় অনুষ্ঠানের শেষে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করার জন্য। চারটি পাত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত করার সঙ্গে সঙ্গে সেই পাত্র চারটি এক এক জন করে চারজনের হস্তে সমর্পণ করা হয় যাদের প্রত্যেকের বাহুতে ওসিরিসের চার পুত্রের নাম অঙ্কিত রয়েছে। এই চারজন মানুষ হোরাসের চার পুত্রের প্রতিনিধি, এরা প্রত্যেকে মমি-কক্ষের একটি কোণে গিয়ে দাঁড়ায় যে কক্ষকে বলা হয় তুয়াত। এবারে মৃতদের কিতাব থেকে পাঠ করা হয়ঃ

"উত্তাপ প্রবেশ করুক তোমার কা-এ হে ওসিরিস খেন্‌তি-অমেনতি
উত্তাপ সঞ্চারিত হোক তোমার কা-এ হে তত্ত্বাবধায়ক ওসিরিস নু।
উত্তাপ আসুক তোমার কা-এ হে ওসিরিস
রা-এর ভগিনীদ্বয়কেও সেইভাবে স্বাগত জানাই।
অগ্নি জাগ্রত হয়েছেন অবিদসে, হোরাসের নেত্রের তিনি দৃশ্যমান।
... ...
এই চার অগ্নিশিখা তোমার কা-এ প্রবেশ করুক হে ওসিরিস।

এই চার অগ্নিশিখা তোমার কা-এ প্রবেশ করুক হে ওসিরিস নু
ধন্য হোরাসের পুত্রগণ তোমরা রক্ষা করেছ স্বর্গীয় পিতা ওসিরিসকে
এখন রক্ষা কর ওসিরিস নুকে।

... ...

এই মন্ত্রোচ্চারণের ফলে নু এবং তাঁর কা-এর সঙ্গে ওসিরিস এবং তাঁর কা-এর মিলন হয়। এটা হলে পরলোকের সব দেবদেবী ফ্যারাওকে সম্মান জানাবেন। এর আর একটি সুফল হল এই আবৃত্তি আইসিস ও নেকথিসের আত্মাকে এই দুয়াত বা মমিকক্ষে নিয়ে আসবে ফ্যারাও-এর শবদেহকে রক্ষা করতে।

যাবতীয় আচার অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে দিনের অবসান হয়। একটা শূন্যতা বিরাজ করে সবার অন্তরে। তবু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই প্রত্যাবর্তন শুরু হয়।

জ্যেষ্ঠ পুত্র ফ্যারাও হল এখন থেকে দ্বিতীয় থুথমস। সে হতশেপসুতের পাশে এসে দাঁড়ায়। একাধারে সম্রাজ্ঞী এবং ফ্যারাও হতশেপসুত তার স্বামীকে আজ প্রশ্রয় দেয়। কারণ অভিষেক হয়ে গেলেও ভূতপূর্ব ফ্যারাও আজ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন এই পৃথিবীতে—ছিলেন আপামর জনসাধারণের অন্তরে। তাই আজ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন প্রথানুযায়ী মিশরের ফ্যারাও।

আগামী কাল থেকে নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

প্রথম থুথমস চলে গেলেন। তবু মিশর মিশরই রইল। এতটুকুও পরিবর্তন হল না। হতশেপসুত বুঝতে পারে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র তার মত মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হৃদয়ে। আর সমস্ত স্বাভাবিক, কোন পরিবর্তন নেই। নীলনদ বয়ে চলেছে আগের মতই। কৃষকদের লাঙ্গলের ফলা নদীর উভয় পার্শ্বের পলিমাটিতে গভীর আঁচড় কেটে কেটে ফসল ফলানোর উপযুক্ত করে তুলছে আগের মতই। বালুকারাশি নিয়ে ঝড় উঠে আছড়ে পড়ছে প্রাসাদের গায়ে, অন্যান্য অট্টালিকায় এবং সক্কারায় ও গিজায় অবিচল পিরামিডের গায়ে।

হ্যাঁ, মিশর মিশরই রয়েছে। প্রথম থুথমস তাঁর অনন্ত জীবন উপভোগ করতে করতে বহুবছর পরে হয়ত মনেও রাখবেন না তাঁর অতি প্রিয় দেশটির কথা। অতীতকালের বিখ্যাত নরপতিরাও কি মনে রেখেছেন? পিরামিডগুলির গর্ভে, মস্তকের ভেতরে রয়েছেন যে সব সম্রাট, তাঁদের কি অন্য জগতের ভোগ-বিলাসের আতিশয্য ভুলিয়ে দেয় নি। এই জগতের কথা? কেউ বলতে পারে না। পারলে ভাল হত।

প্রথম থুথমস চলে গেলেন। দ্বিতীয় থুথমস ও রাজ্ঞী হতশেপসুতের রাজত্ব এখন। মিশরবাসী সবাই জানল একথা। এমন কখনো ঘটেনি। অতীতে প্রাসাদের অনেক নারীই বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁদের নাম-ডাক ফ্যারাও-এর চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না, কিন্তু ফ্যারাও হতে পারেন নি তাঁদের কেউ। হতশেপসুতই এক ব্যতিক্রম। কিন্তু যা বাস্তব তাকে তো অস্বীকার করা যায়

না। মিশরবাসীর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তারা ভাবে, নারী কি কখনো ফ্যারাও হয়? ফ্যারাও তো মানব-রূপী হোরাস। নারী তো হোরাস হতে পারেন না। হোরাস স্বয়ং শ্রেষ্ঠ পুরুষ। নইলে ভয়ংকর যুদ্ধে পিতৃহন্তা পিতৃব্যকে ওভাবে পরাস্ত করতে পারতেন না। না না, হতশেপসুত সম্রাজ্ঞী হলেও, নিজে ফ্যারাও হতে পারেন না।

মিশরবাসীর মনের এই সন্দেহের কথা হতশেপসুতের অজানা থাকে না। তিনি একবার দুর্বল-চিত্ত স্বামীর কথা ভাবেন। তারপর রটিয়ে দেন যে স্বয়ং অমন রা কর্তৃক তিনি নির্বাচিত। অমন রা-এর ঔরসে তাঁর জন্ম। রা ফ্যারাও প্রথম থুথমসের রূপ পরিগ্রহ করে একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে সম্রাজ্ঞী অহমেসের শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন। হতশেপসুতের জন্মবীজের বপ্তা স্বয়ং রা। সুতরাং দেবতার কন্যারূপে তিনিও দেবী। সম্রাজ্ঞী অহমেসের পবিত্র গর্ভাশয় তাঁকে ধারণ করে ইহজগতে এনেছেন মানব জাতির আশীর্বাদরূপে।

এটি রটিয়ে দেবার পরই তার স্বামী তার সামনে এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতে সে মৃদু হেসে চবরোসের সযত্নে লালিত বাদামী রঙের কেশদামের উচ্চ প্রশংসা করে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় থুথমসের মনের দ্বন্দ্ব কোথায় ভেসে যায়। হতশেপসুত নানান্ মন-যোগানো কথার মাধ্যমে স্বামীকে বুঝিয়ে দেয় যে মিশরের মঙ্গলের জন্য এই সত্য ঘটনার কথা না বলে উপায় ছিল না কোন।

—সত্য ঘটনা?

—কেন, তুমি জানতে না?

—আগে শুনিনি।

মৃদু হেসে হতশেপসুত বলে—কি করে শুনবে? আমার সঙ্গে তো তোমার তেমন আলাপ ছিল না। সন্দেহ থাকলে আমার মাকে জিজ্ঞাসা করতে পার। সেদিন তিনি যে স্বামীরূপী দেবতার সঙ্গে শৃঙ্গারে লিপ্ত হয়েছিলেন একথা প্রথমে বুঝতে না পারলেও কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝেছিলেন। কারণ মানুষ আর দেবতা কখনো এক হয় না।

স্বামীকে শান্ত করে হতশেপসুত ভাবে, তার জন্মের এই ইতিবৃত্ত শুধু মুখে বললে চলবে না। মুখের কথা মানুষের মনে অধিকাংশ সময়ে স্থায়ী দাগ কাটতে পারে না। কিছুদিনের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। জন্মের ইতিহাসকে অক্ষয় করতে হলে পাথরের বুকে কেটে কেটে ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু কিভাবে কোথায় সে দেখাবে? পুরাকালের ইমহোটেপের মত কেউ কি আছেন এখন?

নুবিয়ায় অশান্তি দেখা দিয়েছে। বহুদিন আগে পিতার আমলে একবার যেখানে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে। তারপর বহুবছর সেখানে শান্তি বিরাজ করেছে। আবার এতদিন পরে সেখানে অশান্তি ধূমায়িত হতে শুরু করেছে। এই অশান্তি এরপর বিস্ফোরিত হবে বিদ্রোহের রূপে। হতশেপসুতের যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তারক্তি পছন্দ না হলেও সে জানে অশান্তি দানা

বেঁধে ওঠার আগেই তাকে দমন করা প্রয়োজন। উয়াচমেসের কথা মনে পড়ে তার। সে জীবিত থাকলে এই মুহূর্তে রওনা হয়ে যেত ওই অঞ্চলে। পুরাকীর্তির প্রতি তার যেমন অন্তরের টান ছিল তেমনি ছিল যুদ্ধবিগ্রহের বেলায়। কিন্তু স্বামী থুথমস সেই শ্রেণীর নয়। ফ্যারাও হয়েও তার বাক-সর্বস্ব স্বভাব পালটাতে পারেনি। অথচ নুবিয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এখানে কোনরকম চাঞ্চল্য দেখা দিলে খনিজ সম্পদ আহরণে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। সেটা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।

স্বামীকে প্রশ্ন করতেই থুথমস বলে ওঠে—আমি অমনরা-এর নামে প্রতিজ্ঞা করছি, ওই বেয়াদব, বেতরিবত কুশ সর্দারকে হত্য করব। তার বংশকে নির্বংশ করব। কুশের কোন বাসিন্দাকে জীবিত রাখব না। রা আমাকে ভালবাসেন। অমনরা আমার প্রতি সদয়। কেউ আমাকে এই প্রতিজ্ঞা থেকে টলাতে পারবে না।

—সবই তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি যাবে কবে?

—শিগ্‌গিরই যাব। এদিকটা একটু গুছিয়ে নি। অনেক কাজ জমে রয়েছে।

—কোন্ কাজ? আমার কাজ তো কিছু পড়ে নেই। তোমার যে সমস্ত কাজ বাকী রয়েছে আমাকে বলে যাও। আমি করে রাখব।

—যুদ্ধে গেলে আমার এই চুল কেটে ফেলতে হবে না তো?

—না যুদ্ধকালীন চর্মনির্মিত নীলরঙের মুকুট পরলে ওই চুল ঢাকা পড়ে যাবে। কিন্তু দুএকদিনের মধ্যেই তোমাকে যাত্রা করতে হবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

টালবাহানা করে চতুর্থদিনে থুথমস সসৈন্যে নুবিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। হতশেপসুত নিশ্চিন্ত হয়। অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষরা রয়েছে সঙ্গে। কুশ বিদ্রোহীদের পরাস্ত না করে তারা ফ্যারাওকে ফিরে আসতে দেবে না রাজধানীতে।

নুবিয়াতে গিয়ে কিন্তু ফ্যারাও দ্বিতীয় থুথমস যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চাইল না। প্রধান সেনাধ্যক্ষকে ডেকে সে বলে—আমার শিবির এখানে স্থাপন করা হোক।

—আপনি যুদ্ধ করবেন না প্রভু?

—কোন প্রয়োজন নেই। এই বর্বরদের শায়েস্তা করতে আপনিই যথেষ্ট। আমি এখানে অপেক্ষা করব। কুশসর্দারের বংশের একজনকেও জীবিত রাখা চলবে না এটাই আমার নির্দেশ।

যুদ্ধ হল। শত্রুপক্ষের সৈন্যবল নগণ্য। তবু বীরত্বে আর সাহসিকতায় কুশসর্দার কম নয়। প্রাণপণ যুদ্ধ করল সে। কিন্তু অসমশক্তি নিয়ে বেশীক্ষণ সে দাঁড়াতে পারল না। সে হত হল। সৈন্যরা তখন ফ্যারাও-এর হুকুম তালিম করতে ছুটে গেল কুশরাজের বাসস্থানে। রাজবংশের প্রতিটি ব্যক্তিকে একজন একজন করে হত্যা করল। বেঁচে রইল শুধু একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু। তার ওপর কারও অস্ত্র উঠল না।

শিবিরের অভ্যন্তরে ফ্যারাও মসনদ-সদৃশ একটি বহুমূল্যবান আসনের ওপর বসে অপেক্ষা করতে থাকে। দিন প্রায় শেষ হয়ে আসে যখন, তখন

সৈন্যদলের জয়ধ্বনি ফ্যারাও-এর কর্ণগোচর হয়। সে নড়েচড়ে বসে।

প্রথমে সেনাধ্যক্ষ প্রবেশ করে।

থুথমস হুংকার দিয়ে ওঠে—সবাইকে খতম করেছেন তো?

—হ্যাঁ প্রভু।

—চমৎকার। একজনও বেঁচে নেই তো?

—একটি শিশু রয়েছে মাত্র।

—শিশু? ঠিক আছে। নিয়ে আসুন তাকে।

শিশুকে সামনে নিয়ে এলে থুথমসের মুখের সেই রেখাটা ভেসে ওঠে। সে বলে—একে আমার পায়ের কাছে রাখুন।

শিশুটিকে সেইভাবে রাখা হলে ফ্যারাও বিজয়ীর হাসি হাসতে হাসতে তাচ্ছিল্য ভরে পা দিয়ে তাকে নাড়াচাড়া করতে থাকে। শিশুটি অবাক হয়ে ফ্যারাও-এর দিকে চায়। তার মুখে স্বর্গীয় হাসি ফুটে ওঠে। সে ফ্যারাও-এর পা নিয়ে খেলা করতে যায়! ফ্যারাও পাদুকাসমেত পা দিয়ে তার কচি কচি ঠোঁট হাতের আঙুলে সজোরে চাপ দেয়। শিশু ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ওঠে।

ফ্যারাও হেঁকে ওঠে—বন্দী কাউকে আনেননি।

—হ্যাঁ প্রভু, অনেক বর্বরকে এনেছি।

—নিয়ে আসুন আমার সামনে।

তাদের রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় নিয়ে আসা হলে ফ্যারাও তাদের গায়ের ওপর পা রেখে আবার হেসে ওঠে বিজয়ীর হাসি। মাঝে মাঝে তাদের গ্রীবার ওপর পায়ের চাপ দিতে থাকে।

—এদের সব সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। অনেক কাজে লাগবে।

—অবশ্যই প্রভু।

—ধনরত্ন পেয়েছেন কিছু?

—অনেক পেয়েছি।

—রাজধানীতে গিয়ে দেখব সব। অমন রা-এর ভাগে অনেকটা দিতে হবে।

ফ্যারাও ফিরে এলে হতশেপসুত সব কিছু শোনে। স্বামী এতটা পৌরুষ-হীন সে কখনো ভাবতে পারেনি। উয়াচমেস হলে সে নিজেই সবার আগে এগিয়ে যেত যুদ্ধক্ষেত্রে। অসহায় বন্দীদের সঙ্গে অমন হীন ব্যবহার করতে পারত না। চবরোসের প্রতি ঘৃণা আরও বৃদ্ধি পায় তার। তবু সে জানে, এই অপদার্থের সন্তানই তাকে গর্ভে ধারণ করতে হবে। ধারণ করতে হবে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কিন্তু কিভাবে। সে তো আসেত নয়। আসেতও যে চবরোসের প্রেমে মত্ত এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। সে-ও তার আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। সে নিশ্চয় ভবিষ্যতের কল্পনা করে। ভাবে, তার পুত্র কোনদিন ফ্যারাও হতে পারে। ফ্যারাও না হলেও সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার কোন অসুবিধা হবে না। আসেত প্রেমের কত ছলনাই করে এই অপগণ্ডের সঙ্গে। মাথার ওই বাদামী কেশ নাড়িয়ে নাড়িয়ে কত খেলা করে মন ভোলায়। এই ভাবেই সে গর্ভবতী হয়েছে। তাকেও আসেত-এর পথ অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু সফল হবে কিনা কে

জানে। উয়াচমেস চলে যাবার পর দেহের সব চাহিদা যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তবু উপায় নেই। সে যে ফ্যারাও এ কথা ভুললে চলবে না। বহুদিন ধরে এই ফ্যারাও-এর পদ তাকে অলঙ্কৃত করে থাকতে হবে। ওই পদের বড্ড বেশী মোহ। চবরোস উয়াচমেসের মত নয়। তার মধ্যে উয়াচমেসের পৌরুষ বা বীর্য কিছুই নেই। সে হতশেপসুতের দেহখানা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে না। উয়াচমেসের কাণ্ড দেখে অন্তত সেইরকমই মনে হত। সেখানে সে-ই ছিল একচ্ছত্র। কিন্তু ফ্যারাও হয়ে চবরোস তার পাশে শুলেই কেমন যেন মিয়ানো বলে মনে হয় তাকে। কেন এমন হয় সেকথা ভেবে দেখার চেষ্টা করেছে। তার মনে হয় তার প্রতি অতিমাত্রায় সম্ভ্রমের জন্য এমন অবস্থা হয় ফ্যারাও-এর। আসেত-এর সঙ্গে শুলে নিশ্চয় অমন হয় না। সেখানে সে কিছুটা পুরুষ। এ হেন চবরোসকে উসকে দেবার চেষ্টা করতে হবে।

এই সব চিন্তা ভাবনা হতশেপসুতের মনে যখন উদয় হচ্ছিল আর মিলিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই খবর পাওয়া গেল আসেত-এর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। যাক, আসেত তাহলে এতদিনে সফল হল। হতশেপসুত শুনল মুতনেফার্ত জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পৌত্রের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। আসেতকে বলেছেন, পুত্রের চিন্তা তাকে আর করতে হবে না। মুতনেফার্ত মানুষ হিসাবে আদৌ খারাপ নন, কিন্তু বড়ই ধূর্ত। কেনই বা হবেন না। এইভাবেই তো তিনি অনেক উঠেছেন। এখন পুত্রের বংশধরের ভবিষ্যতের চিন্তা করছেন। অথচ তার নিজের গর্ভধারক অহমেসের এইসব কূট চিন্তার বালাই নেই। একসময় রূপচর্চায় ব্যস্ত রাখতেন নিজেকে, এখন শোনা যায় অতিমাত্রায় ভোজনরসিক হয়ে উঠেছেন। সুস্বাদু সব রকমের খাদ্য তাঁর সামনে উপস্থিত করা চাই। তাই ওই সুন্দর দেহ-কাঠামো নিজের স্বামীর মৃত্যুর দেড় বছরের মধ্যেই চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হতশেপসুত শুনেছে সুগন্ধি কাষ্ঠ আর আতরের দেশ পুন্ত-এর রানী নাকি এইরকম স্থূলকায়। সেখানে যে যত স্থূলকায় সে তত সুন্দরী। সুতরাং সেই দেশের রানীর স্থূলত্ব নিশ্চয় সব চেয়ে বেশী। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে অহমেস সারা জীবন ধরে রূপচর্চা করে যে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি, এই দেড়টি বছরেই সেটি সম্ভব করে ছেড়েছেন। তাছাড়া মুতনেফার্তের মত সতত উদ্বেগ নিয়ে জীবন কাটাতে হয়নি তাঁকে। তিনি জানতেন তাঁর দৌলতে স্বামী হয়েছেন ফ্যারাও আবার তাঁর কন্যার দৌলতে মুতনেফার্তের পুত্র হয়েছে ফ্যারাও। সেই সঙ্গে তাঁর কন্যাও ফ্যারাও। সুতরাং জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি খেয়ে দেয়ে অতিবাহিত কর। নিজের রূপকে ধরে রাখতে গিয়ে সারা জীবন অনেক সংযম দেখিয়েছেন।

আসেত-এর পুত্রের জন্মের দিন রাতে চবরোস গুটি গুটি এসে হতশেপসুতের শয্যায় এসে শয়ন করল। মনে মনে হাসে হতশেপসুত। আগামীকাল সকালে ফ্যারাও-এর নিদ্রাভঙ্গের অনুষ্ঠান এই কক্ষেই তাহলে হবে। নিজে তিনি ফ্যারাও হলেও নিদ্রাভঙ্গের অনুষ্ঠানের অধিকারটি পুরুষ বলে চবরোসই ভোগ করে। সে হল দ্বিতীয় থুথমস। সেই সময়টুকু হতশেপসুত থুথমসের সম্রাজ্ঞী শুধু।

সকালে দুইজন পুরোহিত আসবে থথ আর হোরাসের মুখোশ পরে। তারা থুথমসকে পবিত্র হ্রদ থেকে নিয়ে আসা জল দিয়ে স্নান করাবে। তারপর রাজপরিচ্ছদ আর উষ্ণীষ পরিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে দেবস্থানে।

হতপেশসুত স্বামীকে প্রশ্ন করে—কেমন দেখতে হল ?

চমকে উঠে অস্বাভাবিক জোরে ফ্যারাও বলে—কে ? কাকে দেখতে ?

—জান না ?

—মানে—

—আজ একটি নতুন শিশু ভূমিষ্ঠ হয় নি প্রাসাদে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ আসেত-এর ছেলে হয়েছে।

—ছেলেটি তোমার কে ?

—আমার ? কেন ? আমার মানে ?

—বুঝতে পারছ না ? ওটির পিতা কে ?

—এবারে বুঝেছি। আমি ওর পিতা।

হতশেপসুত আর কিছু বলল না। সে লক্ষ্য করল স্বামী আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রয়েছে এক পাশ ফিরে। সে তার পিঠের ওপর হাত রাখে। সঙ্গে সঙ্গে আরও কুঁচকে যায় চবরোস। কিন্তু তার পাশে শুয়ে এরকম সন্ত্রস্ত হয়ে যদিও থাকে তাহলে আশা কোনোদিনও ফলবতী হবে না তার। তাই চবরোসকে আরও একটু কাছে টানে।

চবরোস বলে—তুমি রাগ করেছ ?

—কেন ?

—আসেত-এর ছেলে হয়েছে।

—তাতে রাগ হবে কেন ? আমার বরং খুব আনন্দ হয়েছে।

—আনন্দ ? কেন ?

—ওই ছেলে তোমার ছেলে। প্রমাণ হয়ে গেল তুমি আমাকেও অমন একটি ছেলে উপহার দিতে পার।

—তুমি ঠাট্টা করছ ?

হতশেপসুত এবারে তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বলে—সত্যি বলছি। সমস্ত দেবদেবীর নামে শপথ নিয়ে বলছি।

দ্বিতীয় থুথমস এবারে অনেক সহজ হয়। হতশেপসুত আশা করে, আজ রাতে না হোক, অন্য কোন রাতে চবরোস আরও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

হতশেপসুত তার স্বামীকে খুব সন্তর্পণে বুঝিয়ে দেয় যে নুবিয়ার যুদ্ধে জয় হলেও, ব্যক্তিগতভাবে তার একটু বদনামই হয়েছে সৈন্যদের মধ্যে। সাধারণ মিশরবাসীর কোন খোঁজখবর না রাখলেও নুবিয়া অভিযানের সেনাদলের কাছে তার আচার-আচরণ একটু অস্বাভাবিক ঠেকেছে। প্রথমত সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটু দূরে সরে ছিল। তার ওপর তার সম্মুখে নীত ধৃত ব্যক্তিদের প্রতি অহেতুক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা হয়েছে। সৈন্যরা প্রথমটা এই আচরণকে

মানবরূপী দেবতার আচরণ ভেবে অবহেলা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের বিবেক আর বুদ্ধি তা হতে দেয়নি। অথচ ফ্যারাওকে সাধারণ মানুষ বলে ভাবতেও পারে না তারা। তাই তাদের অনেকেই মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়ে ছিল।

কথাটা হতশেপসুতকে প্রথমে আভাসে জানিয়েছিল হাপু-সেনেব নামে এক তরুণ। সে তার অতি তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও আনুগত্যের জন্য খুব দ্রুত হতশেপসুতের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। বংশপরম্পরায় সে প্রধান অমাত্যও বটে। সে বলেছিল, সৈন্যদের মনের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বকে দূর করার জন্য ফ্যারাওকে বীরত্বব্যঞ্জক একটা কিছু করে দেখাতে হবে।

কথাটা হতশেপসুতের মনে ধরে, কিন্তু কী দেখাবে ফ্যারাও? তার কোন্ কাজের মধ্যে বীরত্ব প্রকাশ পেতে পারে? হতশেপসুতের চোখে জিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসার দৃষ্টি সে মেলে ধরে হাপু-সেনেব-এর চোখের দিকে।

হাপু-সেনেব বলে ওঠে—সিংহ শিকার।

—হ্যাঁ সিংহ শিকার। চবরোসের মুখে শুনেছে আগে দুবার শিকারে গিয়েছে ফ্যারাও। একবার নাকি একটা সিংহকে স্বহস্তে বধ পর্যন্ত করেছে। কথাটা মনেই ছিল না। অর্থাৎ সেই সময় কোন গুরুত্বই দেয়নি চবরোসের এই কথায়। নিজেকে গৌরবান্বিত করার জন্য সত্য মিথ্যা মিশিয়ে এমন অনেক কল্পিত ঘটনার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করা তার স্বভাব। কিন্তু আজ হতশেপসুতের মনে হয় সিংহবধ নিশ্চয় সত্য ঘটনা, সব কথা কি ও মিথ্যা বলে?

দুদিন পরে দুজনা যখন রাজকার্য শেষ করে প্রাসাদে ফিরছিল তখন হতশেপসুত বলে—তোমাকে এর মধ্যে একদিন শিকারে যেতে হবে।

—হঠাৎ শিকারে কেন?

—তুমি শিকারে যেতে ভালবাস না?

—নিশ্চয় ভালবাসি। কে না ভালবাসে?

—সিংহ শিকার?

—আবার সিংহ শিকারের কথা কেন? তাছাড়া কি অন্য শিকার নেই?

—তুমি ভয় পাও?

—আমি? ভয় পাব? আমি ফ্যারাও।

—আমিও তাই বলি। তাছাড়া একবার একটা সিংহকে বধ করেছিলে।

চবরোস একটু ভেবে নিয়ে বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ। বধ করেছি বৈকি।

—সুতরাং তোমাকে সিংহ শিকারে যেতে হবে। তুমি তো জান নুবিয়া অভিযানের ফলে নানা কথা উঠেছে। তার ফল ভবিষ্যতে মারাত্মক হতে পারে। প্রজারাও অনেকে নাকি জেনে গিয়েছে। সিংহ বধ করে প্রমাণ করতে হবে তুমি কাপুরুষ নও।

—সিংহ বধ করলেই প্রমাণিত হবে?

—নিশ্চয় হবে। সবার কাছে প্রমাণ কর যে তুমি সাক্ষাৎ হোরাস। আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমার দেহে রা-এর রক্ত প্রবাহিত। আমার কোন ভয়ডর নেই।

—তুমি আবার কেন ?

—ক্ষতি কি ?

—না, ক্ষতি আর কি ? সিংহ শিকার বড়ই কষ্টসাধ্য। তাই বলছিলাম।

—ভুলে যেও না বারবার যে আমিও ফ্যারাও। কষ্টসাধ্য বলে কোন কাজ আমার জানা নেই।

—তা জানি। কিন্তু সিংহ বড় ভয়ঙ্কর জীব।

—সেইজন্যই সিংহ শিকারে শিহরন আছে। সেই আনন্দ ভিন্ন স্বাদের।

দ্বিতীয় থুথমস আর কিছু বলতে পারে না। তাকে অভিযানের আয়োজন করতে হয়।

নীলনদ পার হয়ে দক্ষিণ পশ্চিমের দিকে দিগন্তবিস্তৃত মরুপ্রান্তরে সিংহের আবাসভূমি। তবে তাদের সাক্ষাৎ মরুভূমির প্রান্তভাগে যেকোন স্থানেই মেলে। থীবস-এর নিকটে নদীর অপর পারে লোকালয় থেকে কিছু দূরেও ওদের দেখতে পাওয়া যায়।

জলযানে নীলনদের ওপর দিয়ে যাবার সময় স্বামীকে বড় বেশী চিন্তিত দেখায়। যে সালুকী কুকুর শিকারে ব্যবহারের জন্য সঙ্গে রয়েছে তার উৎসাহ-ব্যঞ্জক চিৎকারে চিন্তামুক্ত হয় না ফ্যারাও।

—কি হল ? এত চিন্তা কিসের ?

—চিন্তা শুধু তোমার জন্য।

—কিছু ভেবো না।

অপর তীরে অবতরণের সময় ফ্যারাও বলে—তুমি বরং এখানেই অপেক্ষা কর। অনেক সৈন্য রেখে যাচ্ছি।

—না। আমি শিকারে এসেছি। বসে থাকতে নয়।

—কিন্তু তুমি তো স্বহস্তে শিকার করবে না।

—না। কিন্তু তুমি করবে। সেই সময় আমি দেখতে চাই তোমার বীরত্ব।

ফ্যারাও ঢোঁক গিলে বলে—তাহলে চল।

সৈন্যরা সবাই যাবার জন্য প্রস্তুত। তাই দেখে হতশেপসুত বলে—এরা সকলেই যাবে নাকি ?

—হ্যাঁ। এটা সিংহ শিকার।

—তাই বলে, এত লোক ? তুমি কি যুদ্ধে যাচ্ছ ?

—যুদ্ধই তো ?

—না। একটা সিংহ বধ করতে এত লোকের প্রয়োজন হয় না।

—ভুলে যাচ্ছ, ওরা দল বেঁধে থাকে।

—জানি। তার জন্যে কুড়ি পঁচিশজন লোক যথেষ্ট।

—আমরা ফ্যারাও, আমাদের প্রাণের মূল্য নেই ?

—আছে বৈকি ? তার জন্যেই তো পঁচিশজন সঙ্গে থাকবে। কিন্তু এদের মধ্যে কতজন শিকারে দক্ষ ?

—পাঁচজন।

—তাতেই হবে।

সবাই সিংহের আস্তানার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সালুকী কুকুর মাটি শুঁকতে শুঁকতে সবার আগে ছোটে। তাদের উৎসাহই যেন সবচেয়ে বেশী। ওরা একসঙ্গে না গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। এখানে কাঁটাগাছের অনেক ঝোপ আছে। অন্যান্য ছোট ছোট গাছও রয়েছে।

খুব সাবধানে এগিয়ে চলে সবাই। কারণ যে কোন মুহূর্তে সিংহ আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ওদের শান্তির আলয়ে এসে কেউ উৎপাত করুক, এটা ওরা সহ্য করে না।

একমাত্র হতশেপসুতের হাতে কোন অস্ত্র নেই। বাকী সবাই সশস্ত্র। তবু হতশেপসুতই সবার আগে এগিয়ে চলেছে। তাকে ঘিরে রয়েছে তিনজন সেনা। তাদের মধ্যে একজন শিকারী।

শিকারী বলে—আপনাকে এখানেই থামতে হবে সম্রাজ্ঞী। এর পরে যাওয়া নিরাপদ নয়।

—আমি শিকার করা দেখতে চাই।

—ওই ঢিবির ওপর চলুন, ওখানে দাঁড়িয়ে সব কিছু নজরে পড়বে।

বিনা বাক্যব্যয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় হতশেপসুত। দাঁড়িয়ে দেখে একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

—ওই দেখুন সম্রাজ্ঞী।

হতশেপসুত একটি সিংহ এবং তার সঙ্গিনীকে দেখতে পায়। খুব আনন্দ হয় তার। তার স্বামী অন্যান্যদের নিয়ে সেইদিকেই এগিয়ে চলেছে। সালুকী কুকুরেরা এখন অনেক সাবধান। তারাও যেন পা টিপে টিপে চলছে। ফ্যারাও এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে ইশারায় কথা হচ্ছে বোঝা যায়। হঠাৎ দেখা গেল আরও একটু এগিয়েই স্বামী দুবার হোঁচট খেল। এখন এভাবে হোঁচট খাওয়া কখনই ঠিক নয়। সঙ্গীরা তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, পেছন দিকে হাত দিয়ে দেখাল। থুথমস মাথা ঝাঁকায়। হতশেপসুতের ভ্রু কুঞ্চিত হয়।

তার সঙ্গী শিকারী উদ্বেগের সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে—ফ্যারাও-এর সম্ভবত শরীর খারাপ। উনি চলে এলে ভাল করবেন।

হতশেপসুত মনের ঝাঁঝকে যতটা সম্ভব সংযত করে নিম্ন কণ্ঠে বলে—না না। অতদূর এগিয়ে গিয়ে ফিয়ে আসা উচিত নয়।

শিকারী চুপ করে যায়। কিন্তু তার দৃষ্টিতে দুশ্চিন্তা ফুটে ওঠে। তবে ফ্যারাও-এর পাশে অনেকে রয়েছে। তার কোন ক্ষতি হতে দেবে না প্রাণ থাকতে।

হতশেপসুত লক্ষ্য করে সিংহ বুঝতে পেরেছে শত্রুদের উপস্থিতি। একবার আকাশের দিকে মাথা তুলে মুখব্যাদান করে। তারপর দুজনা গুটি গুটি এগিয়ে গেল একটি ঝোপের আড়ালে। সেখানে দুজনা দুজনার মুখ শুঁকে নেয়। পরক্ষণেই সিংহী এগিয়ে যায় ফ্যারাও-এর দলের দিকে অতি সন্তর্পণে। সিংহ সেখানেই বসে রইল মাথা নীচু করে। সালুকী কুকুর সিংহীর গতিবিধি বুঝতে পেরে দলকে দক্ষিণদিকে যেতে ইঙ্গিত করে।

ফ্যারাও-এর সঙ্গে যে দুটি শিকারী রয়েছে, তারা তাদের তীর ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হয়। তারা বুঝতে পারে একটা আক্রমণ আসন্ন অনতিবিলম্বে! অন্যান্য লোকেরাও তাদের নানা ধরনের অস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়! ফ্যারাও তার তীর সংযোজিত করে ধনুকে।

সেই সময় সিংহী তাদের আক্রমণ করে। হতশেপসুত দেখতে পায় সবাই তীর ছুড়ল। যাদের হাতে অন্য ধরনের অস্ত্র ছিল তারা সেগুলি ব্যবহার করার আগেই সিংহী চকিতে মিলিয়ে যায়। হতশেপসুত লক্ষ্য করে সিংহী আহত হয়ে একটি ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসেছে। তার গলার কাছে একটি মাত্র তীর বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ তার তেমন কিছুই হয়নি। ঠিক তাই। সে ঘুরে গিয়ে অন্যদিক দিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করবে এবারে।

কিন্তু সেই সময় ফ্যারাও এক অদ্ভুত আচরণ করে। সে তীর ধনুক নিয়ে ছুটতে থাকে সামনের দিকে ঠিক যেখানে বিশালাকার সিংহটি ওৎ পেতে বসে রয়েছে। ফ্যারাওকে ওভাবে ছুটতে দেখে শিকারীরা ঘাবড়ে যায়। তারা কয়েক মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তারপর বুঝতে পারে আহত সিংহীর কাছ থেকে আসা বিপদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার চেয়েও তাদের প্রধান কর্তব্য হল ফ্যারাও-এর জীবন রক্ষা। তারা সদলে হৈ হৈ করে ছুটতে থাকে ফ্যারাও-এর পেছনে পেছনে।

ফ্যারাও-এর ছোটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সে দেখতে পায় অদূরে একটি বিরাটাকার সিংহ অতি উৎসাহ নিয়ে তারই জনা অপেক্ষা করছে। সে তীর ধনুক সমেত মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। সিংহ কিন্তু তাকে ধরার জন্য এক পাও অগ্রসর হয় না। সে শুনতে পেয়েছে ধেয়ে আসা অনেক মানুষের কণ্ঠস্বর। সে দুই লাফে দূরে চলে যায়। কিন্তু আহত সিংহী ক্রোধোন্মত্তা। সে এসে চড়াও হয়। মৃত্যুভয় বা ব্যথা-বেদনা কোন কিছুকে তোয়াক্কা করে না সে। প্রতিহিংসার জ্বালায় জ্বলছে।

একসঙ্গে অনেকগুলো তীর তাকে বিদ্ধ করে। সে মাটির ওপর আছড়ে পড়তেই সবার অস্ত্র তার ওপর গিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু হয়।

হতশেপসুত লক্ষ্য করে তার সঙ্গের শিকারী মাথা নীচু করে রয়েছে। অন্যান্যরা অন্যদিকে চেয়ে রয়েছে, যেন ধূসর মরুতে দর্শনীয় দ্রব্যের অভাব নেই। ক্রোধে লজ্জায় বালুকারাশির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা হয় হতাশেপসুতের। চবরোসকে সে অক্ষম বলে জানত। কিন্তু সে যে এতটা অপদার্থ এবং ভীরু এমন ধারণায় আসেনি। এলে, কখনো তাকে এভাবে শিকারে এনে ফ্যারাও পদটির ওপর কলঙ্ক লেপনে প্রবৃত্ত হত না। মস্ত ভুল হয়ে গেল তার। ভেবেছিল সঙ্গে অনেক লোকজন থাকে। সিংহ এলে সবার তীরের সঙ্গে চবরোসের তীরও ছুটে যাবে। সেটুকুই যথেষ্ট। এরপরে দ্বিতীয় থুথমসের সম্মান ঘনিষ্ঠ জনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা আর সম্ভব হবে না। ভাগ্য ভাল, শিকারে যারা সঙ্গী হয়, তারা সবাই অতি ঘনিষ্ঠদের মধ্যে থেকেই নির্ধাচিত।

ফেরার সময় হতশেপসুত কানাঘুষা শোনে যে ফ্যারাও অসুস্থ। তারই কোন হিতৈষী রটিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়। তরুণ মুখ্য অমাত্য হাপু-সেনেব উপস্থিত থাকলে আরও উঁচু ধরনের কিছু আবিষ্কার করতে পারত। তার মস্তিষ্ক তার পিতার চেয়েও উর্বর। ফ্যারাও দেখা গেল পা টেনে টেনে এসে কোনরকমে নৌযানে আরোহণ করে। তার অসুস্থতার কথা নিশ্চয় তার কানে দিয়েছে সেই হিতৈষী। তাই নিজের পদক্ষেপণে মানানসই করে নিয়েছে। এতবার হোঁচট খাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত পড়ে যাবার ব্যাখ্যা এভাবে না দিলে ঢি ঢি পড়ে যেত। সে স্বয়ং হোরাস এই যা ভরসা। সে সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

প্রত্যাবর্তনের পথে একটিও কথা বলে না হতশেপসুত। প্রাসাদে ফিরেও নয়। তারপর পাঁচদিন উভয়ের মধ্যে কোন বাক্যালাপ হয় না। ছয়দিনের দিন বেলা শেষে চবরোস তাকে বলে—তুমি কি বিশ্বাস করনি যে আমি সত্যিই অসুস্থ ছিলাম?

হতশেপসুত অবাক হয়। তার হাসিও পায়। সে বলে—দেখ, আমি তোমাকে ভাল ভাবে চিনি। তাই আমি কি বিশ্বাস করলাম আর না করলাম তাই নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই তোমার। তুমি তোমার প্রজাদের বিশ্বাস করাও। তাদের মুখ বন্ধ কর।

—তারা ঠিকই বিশ্বাস করবে।

—তাদের তুমি চেন না। তুমি তো শুধু মনুষ্যরূপী হোরাস। স্বয়ং ঈশ্বরও মানুষের প্রতাপে অস্থির হয়ে মানব জাতিকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই কাহিনী তুমি জান কিনা জানি না।

দ্বিতীয় থুথমস ধীরে ধীরে সম্রাজ্ঞীর সামনে থেকে সরে আসে।

পুন্ত দেশ আর পূর্বের দেশগুলি মিশরবাসীদের কাছে চিররহস্যাবৃত। পুন্ত আর পূর্ব সম্বন্ধে অপরিসীম ঔৎসুক্য সবার। কারণ ওই দেশ থেকে পাওয়া যায় সব দুর্লভ সামগ্রী। বহু বছর আগেও ওই সব দেশে এখানকার অসমসাহসী বীরেরা গিয়ে পৌঁছেছিল। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল সুগন্ধি কাষ্ঠ, ধূপ, বৃক্ষের আঠা। তাছাড়া পরে এনেছে সোনা সুন্দর সব বৃক্ষের চারা গাছ। বিশেষ করে পুন্তের প্রতি চিরকাল এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে এসেছে পিরামিডের দেশের মানুষেরা। সেই আকর্ষণ হতশেপসুতেরও রয়েছে। তাই কর্ণকের অমন রা একদিন তাঁকে আদেশ করলেন—"অভিযাত্রী দল পাঠাও ওই দেশে। ওখানকার যা কিছু মূল্যবান, সব তারা গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসে যেন। দেশকে এই ভাবে সমৃদ্ধ কর। বাণিজ্যই হল দেশকে সমৃদ্ধ করার প্রকৃষ্ট পথ।"

পুন্ত সম্বন্ধে শৈশব থেকে হতশেপসুত বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য কতরকমের কাহিনী শুনেছে। সেইসব কাহিনী রূপকথার গল্পের মত। রূপকথার কাহিনী ছাড়াও সে শুনেছে পুরাকালে মিশরের অধিপতি মেনটুহোটেপের আমলে তাঁরই দ্বারা নিয়োজিত সেনাধ্যক্ষ হেনুর কাহিনী। এই কাহিনী অত্যন্ত সরল।

কোনরকম রঙচঙ নেই এতে। হেনুর বিবৃতিতে আছে যে মিশরের অধীশ্বর তাকে পুন্তের দিকে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। কারণ তাঁর অনেক সুগন্ধি ধূপ-ধুনোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পুন্ত ছাড়া ওই দ্রব্য অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। হেনু তখন কোপটাস নগরীর দিকে রওনা হল। তার যাত্রার পূর্বেই রাজার আদেশে মিশরের দক্ষিণ দিকের সৈন্যরা তার যাত্রাপথ সুগম করার জন্য রাস্তা নির্মাণ করে দিয়েছিল। হেনু তিন হাজারের একটি সৈন্যদল সঙ্গে নেয়। সেই সঙ্গে সবরকমের কারিগর, শিল্পী ইত্যাদিও ছিল। রাজার নির্দেশে আয়োজন এত সুন্দর হয়েছিল যে সঙ্গের প্রতিটি মানুষকে প্রতিদিন দুই পাত্র তৃষ্ণার জল আর কুড়িটি করে রুটি দিতে হেনুর কিছুমাত্র অসুবিধা হল না। তাছাড়াও সে এভাহেটে আর এয়াহেটেব নামে দুইটি স্থানে গভীর কূপ খনন করে দেয়।

হেনু তার বিবৃতিতে আরও লিখেছে ঃ

"আমি সমুদ্রের তীরে গিয়ে পৌঁছলাম। পুন্ত-এ যাবার জন্য জাহাজ নির্মাণ করলাম। সেই জাহাজ প্রয়োজনীয় সব কিছু দ্রব্যসম্ভার দ্বারা পূর্ণ করলাম। পরিশেষে যাত্রা যাতে শুভ হয় তার জনা দেবদেবীর কাছে গো-বৎস, বৃষ এবং মৃগ উৎসর্গ করলাম।"

সুগন্ধি দ্রব্যাদি ছাড়াও হেনু যদিও মিশরাধিপতির সন্তুষ্টির জন্য আরও অনেক কিছু সঙ্গে নিয়ে ফিরেছিল, সে কিন্তু নিজে পুন্ত দেশে যায় নি। জাহাজ প্রেরণ করে তার প্রত্যাবর্তনের জন্য সমুদ্রতীরে অপেক্ষা করে বসেছিল। তারপর জাহাজ ফিরলে রাজাকে সব কিছু উৎসর্গ করে প্রিয়পাত্র হয়েছিল। অথচ অভিযান কেমন হয়েছিল, কোন বিঘ্ন ঘটেছিল কিনা কেউ জানল না। ফলে রূপকথার মত গল্পকাহিনীই চালু থেকে গেল। সেই কাহিনীও হতশেপসুতের অজানা নয়। সেই কাহিনীর উৎপত্তিস্থল প্যাপাইরাসের এক লিখন। এক পর্যটকের বিবৃতির মত সেটি।

প্যাপাইরাসে লেখা রয়েছে ঃ

"আমি ফ্যারাও-এর খনি অঞ্চল পরিভ্রমণ করছিলাম। সেখান থেকে গেলাম সমুদ্রতটে। সেখানে পৌঁছে সমুদ্রযাত্রার জন্য একশো পঞ্চাশ হাত দীর্ঘ এবং চল্লিশ হাত চওড়া একটি জাহাজে উঠলাম। এই জাহাজে মিশরদেশের একশো পঞ্চাশ জন বাছাই করা নাবিক ছিল। তাদের চেয়ে ভাল নাবিক দেশে আর কেউ ছিল না। আকাশ আর পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের ছিল গভীর জ্ঞান। সিংহের হৃদয়ের চেয়েও তাদের হৃদয় ছিল জ্ঞানসমৃদ্ধ। তারা বলল যে অ্যবহাওয়া থাকবে শান্ত। ঝোড়ো হাওয়া বইবে না। কিন্তু কিছুদূর যাত্রার পরই হাওয়া হল অশান্ত, সমুদ্র হল উত্তাল। পুন্তদেশে পৌঁছোবার আগেই বিরাট বিরাট ঢেউ এসে আছড়ে পড়তে লাগল জাহাজের ওপর। উত্তুঙ্গ তরঙ্গরাশি বিরাট জলযানকে গ্রাস করে ফেলতে চাইল। একমাত্র আমি একখণ্ড কাষ্ঠ অবলম্বন করে অন্তহীন সাগরের মধ্যে অসহায়ের মত ভাসতে থাকলাম। অন্যেরা সবাই কোথায় ভেসে গেল বলতে পারি না। তাদের অস্তিত্ব মুছে গেল পৃথিবীর বুক

থেকে। আমি কাষ্ঠখণ্ড আঁকড়ে ধরে তিনদিন ভাসতে থাকলাম। হাত অবশ হয়ে আসে, জ্ঞান হারাবার উপক্রম হয়। তিনদিন পরে ঢেউ আমাকে এক অজানা দেশের বেলাভূমিতে ঠেলে দেয়। সেখানে আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকি; কতক্ষণ তা জানি না। তারপর একসময় ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। আমি খাদ্যের সন্ধানে রওনা হলাম। অনেক রকমের ফল দেখলাম। ডুমুর, আঙুর, তরমুজ ইত্যাদি। তাছাড়া মাছ এবং পাখির খোঁজও পেলাম। সব কিছুই পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। তখন আমি যতটা সম্ভব খেলাম। এত বেশী পরিমাণে খেলাম যে মাটির ওপর বহুক্ষণ পড়ে রইলাম। তারপর আমি একটি গর্ত খনন করলাম। আমি বাতি জ্বালালাম এবং দেবতার কাছে দগ্ধ দ্রব্য উৎসর্গ করলাম।

"সহসা বজ্রনিনাদে আমি সচকিত হলাম। ভাবলাম বুঝি সমুদ্রের গর্জন। বৃক্ষ আন্দোলিত হতে থাকে, ধরিত্রী কম্পিত হয়। আমি আমার মুখ তুললাম। দেখলাম একটি বিরাটাকার সর্প এগিয়ে আসছে। সেটা প্রায় ত্রিশ হাত দীর্ঘ। তার সর্বাঙ্গ স্বর্ণখচিত আর তার বর্ণ নীলকান্তমণি সদৃশ। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার মুখব্যাদান করল। আমি তার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম।

"সে বলে—হে ক্ষুদ্র জীব, কে তোমাকে এখানে আনল? এই মুহূর্তে সেকথা না বললে তোমার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

"তারপর সেই বিশালাকার সর্প আমাকে তার মুখে তুলে নিল এবং আমাকে তার গুহায় নিয়ে গিয়ে রাখল। কোন ক্ষতি করল না আমার। তারপর সে আবার তার মুখ ফাঁক করল। আমি আবার আমার দেহটিকে তার সম্মুখে নিক্ষেপ করলাম।

"সে আবার বলে—কে তোমাকে এখানে এনেছে। হে ক্ষুদ্র জীব, কে এনেছে এখানে তোমায়? এই দ্বীপ চারদিকে সমুদ্রবেষ্টিত। এর চতুর্দিকে উথালি-পাথালি ঢেউ। কে এনেছে তোমাকে?

"তখন আমি আনত হয়ে হাত দুখানি দেহের দুপাশে রেখে বললাম—হে সর্পরাজ, মিশরের ফ্যারাও-এর নির্দেশে একশো পঞ্চাশ হাত দীর্ঘ এবং চল্লিশ হাত প্রস্থ একটি প্রকাণ্ড নৌযানে একশো পঞ্চাশ জন সুদক্ষ নাবিক নিয়ে আমি রওনা হয়েছিলাম। স্বর্গমর্ত্য সবকিছুর জ্ঞান সেই নাবিকদের ছিল। তারা বলেছিল, সমুদ্র থাকবে শান্ত। কিন্তু তা হল না। অশান্ত সমুদ্রে ঢেউ-এর তোড়ে জাহাজ সমেত কোথায় তারা ভেসে গেল। আমি একা একখণ্ড কাঠ ধরে ভাসতে থাকলাম। তারপর এখন আমি আপনার নিরাপদ আশ্রয়ে আছি। ঢেউ আমাকে তীরে এনে ফেলেছে।

"সর্প তখন বলে—কোন ভয় নেই ক্ষুদ্র প্রাণী, কোন ভয় নেই। তোমার মুখের ওপর ওভাবে ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠতে দিও না। কারণ তুমি যখন আমার কাছে এসে পৌঁছেচ, তখন বুঝতে হবে বিধাতা তোমাকে রক্ষা করতে চান। তিনিই তোমাকে এই আশীর্বাদ-পুষ্ট সমৃদ্ধিশালী দ্বীপে এনেছেন,

যেখানে কোন কিছুর অভাব নেই। শোন, তুমি এই দ্বীপে একমাসের পর আর এক মাস, এইভাবে চার মাস অতিবাহিত করবে। তারপর এই দ্বীপের সমুদ্রে একদিন দেখতে পাবে তোমার দেশের জাহাজ। তখন তুমি সেই জাহাজের নাবিকদের সহায়তায় তোমার দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। তুমি তোমার নিজের দেশের ভূমিতেই মৃত্যুবরণ করবে। শোন, পরস্পরের মধ্যে কথোপকথনের মাহাত্ম্য অনেক। তাতে অনেক দুঃখের মুহূর্ত অতিক্রম করা সহজ হয়। আমি তাই তোমার সঙ্গে কথা বলছি, তোমাকে জানাচ্ছি এই দ্বীপে কি কি আছে। আমি এখানে আমার ভ্রাতা ও সন্তানদের সঙ্গে বসবাস করি। আমরা সবাই মিলে এখানে পঁচাত্তর জন বাস করি। যদি তোমার মন যথেষ্ট মজবুত হয়, যদি তোমার সহিষ্ণুতা থাকে তাহলে তুমিও তোমার সন্তানদের বুকে চেপে ধরতে পারবে। তোমার পত্নীকে আলিঙ্গন করার সুযোগ পাবে। তুমি আবার তোমার বাসভূমি দেখতে পাবে, যা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেশে ফিরবে এবং আবার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বসবাস করবে।

"তখন আমি আবার নত হলাম। নিজেকে মাটিতে নিক্ষেপ করে বললাম—আমি ফ্যারাওকে আপনার কথা বলব। আমি তাঁকে বলব আপনি কত মহৎ। আপনার জন্য পবিত্র তেল আর্ পাঠানোর ব্যবস্থা করব। আরও অনেক দ্রব্য প্রেরণ করব। আমি ফ্যারাওকে এই দ্বীপের অভিজ্ঞতার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করব। সমস্ত মিশর দেশের অধিবাসী আপনার নাম শুনে ধন্য ধন্য করবে। আমি আপনার নামে গর্দভ উৎসর্গ করব। আমি আপনার নামে রাজহংসী উৎসর্গ করব। মিশরের শ্রেষ্ঠ দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ জাহাজ প্রেরণ করব। যে সকল দেবতা মানবজাতির কাছে অতি প্রিয় তাঁদের যে সব দ্রব্য দেওয়া হয়, সবই দেব আপনাকে—যিনি এত প্রিয় অথচ বসবাস করেন এক অচিন দেশে।

"সর্প তখন মৃদু হেসে বলে—তোমাদের দেশ তো সুগন্ধি দ্রব্যে সমৃদ্ধ নয়। আমার দেশ অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী। আমি পুন্ত দ্বীপের রাজা হিসাবে তোমাকে বলছি যে একমাত্র হেকেন তৈল তুমি এদেশে পাঠাতে পার। কিন্তু তোমার অত ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ যে মুহূর্তে তুমি এই দ্বীপ পরিত্যাগ করবে তারপর আর কখনো এখানে পদার্পণ করতে সক্ষম হবে না। কারণ এই দ্বীপ তখন জলরাশিতে পরিবর্তিত হবে।

"সর্পের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল। চার মাস পরে সত্যই একটি জাহাজ এল। পুন্ত দ্বীপের রাজা আমাকে বিদায় জানাতে বলেন—শান্তিতে দেশে ফিরে যাও ক্ষুদ্রপ্রাণী। স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে দীর্ঘদিন পরে মিলিত হও। আমার শুভেচ্ছা রইল, তুমি যেন তোমার নগরীর সুনাম রাখতে পার।

"সে আমাকে যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্য ও কাঠ দিল। দিল চিতাবাঘের চামড়া, হাতির দাঁত, শিকারী কুকুর, দুই জাতের বানর এবং আরও অনেক কিছু। আমি তার পায়ের কাছের নত হলাম।

"সে বলে—কতদিন পরে দেশে ফিরছ। সন্তানদের বুকে জড়িয়ে ধরবে

সেখানে গিয়ে। তারপর অনেক পরে একদিন তুমি তোমার অক্ষয় সমাধিসৌধে চিরশান্তিতে বিরাজ করবে।"

প্যাপাইরাসে লেখা এই রূপকথার মত গল্প হতশেপসুতকে এককালে মুগ্ধ করত, এখন আর করে না। সে উপলব্ধি করে পুন্ত-এর সঙ্গে তার দেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রয়োজন রয়েছে। সেই দেশ সম্বন্ধে রূপকথার গল্পের মত যে ধারণা মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে তা ভেঙে দিতে হবে। বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে সেই দেশের সঙ্গে। সে ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধবিগ্রহ পছন্দ করে না। তার আগের কয়েক পুরুষ অনেক যুদ্ধ, অনেক রক্তপাত দেখেছে। হিকসোসদের দৌলতে সেই সাধ মিটেছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে দেশটাকে ছারখার করে দিয়ে গিয়েছে। পুরোনো মন্দির আর আরাধনার স্থানগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। শৈশব থেকে হেকেরনেহেহ্ আর আবানার পুত্রের সান্নিধ্যে থেকে হতশেপসুত মনে মনে বরাবর সংকল্প করেছে যে কোনদিন যদি ফ্যারাও হতে পারে তাহলে মন্দির সংস্কার করবে। অমন রা এর জন্য একটি অতি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করবে। মিশরের প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে কোন বাধাকেই বাধা বলে মনে করবে না। আর যুদ্ধের পরিবর্তে বাণিজ্যের দিকে মন দেবে।

তার আশা ফলবতী হয়েছে। সে একাধারে সম্রাজ্ঞী এবং ফ্যারাও। তাই কর্ণক-এর মন্দিরের অমন রা-এর আদেশ পালন করতে উদ্যোগী হয়। সবাই জানল থীবস-এর অমন তাঁর অতি প্রিয় শাসক হতশেপসুতকে পুন্ত দেশে অভিযাত্রী দল প্রেরণ করতে বলেছেন।

বাণিজ্যের প্রস্তুতির জন্য পিতার আমল থেকেই সে লোহিত সাগরে একটি বন্দরে তার জলযানগুলি রাখার ব্যবস্থা করেছিল। প্রতিটি জাহাজ প্রায় বাইশ হাত দীর্ঘ। তাদের বিশাল বিশাল পাল পাখির পাখার মত দুই পাশে বিস্তৃত হয়ে থাকে। প্রতি জাহাজে ত্রিশ জন করে দাঁড়ি। যে বৃক্ষে জাহাজগুলিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয় সেই বৃক্ষের সন্নিকটে দেবী হথোরের উদ্দেশ্যে পশুবলি প্রদান করা হল, যাতে দেবী অনুকূল হাওয়া প্রেরণ করেন। তারপর জাহাজের দড়ি বৃক্ষ থেকে খুলে ফেলা হল। দাঁড়িদের দীর্ঘ দাঁড় সমুদ্রের জলের গভীরে নিমজ্জিত হল। পাল তোলা হল। জাহাজের মুখ্য নাবিকদ্বয়ের একজন যাত্রার সূচনা করতে হাত আন্দোলিত করে ইঙ্গিত দিল। রাজকীয় জাহাজ পুন্ত-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে এক বার্তাবাহক এই শুভ সংবাদ বহন করে নিয়ে চলল থীবস্-এর পথে রাজ্ঞী হতশেপসুতকে দেবার জন্য।

কয়েকমাস পরে তারা ফিরে এল প্রচুর দ্রব্যসম্ভার নিয়ে। তারা বাদ্য বাজিয়ে বিজয়ীর মত ফিরল। সমস্ত রাজধানীর লোকজন ভেঙে পড়ল পথের দুই পাশে। অবশেষে তাদের সম্রাজ্ঞীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। হতশেপসুত সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল রূপকথার গল্পে যেসব দ্রব্যের উল্লেখ রয়েছে অধিকাংশই তাই। সেই ধূপ, সেই সুগন্ধি কাষ্ঠ, মেহগনি, চিতাবাঘের চামড়া, বানর, দামী গাছের চারা, হাতির দাঁত ইত্যাদি। জাহাজের মুখ্য নাবিক বলল যে বানর-

গুলোকে জাহাজে ছেড়ে রাখা হয়েছিল। তারা সারাটা পথ কিচিরমিচির করেছে। নতুনের মধ্যে তারা এনেছে দুটি জীবন্ত চিতাবাঘ। মিশরবাসীর কাছে এটা এক বিস্ময়।

হতশেপসুত জাহাজের অধিনায়ককে পরদিন আসতে বলে পুন্তদেশ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে তাকে সব জানাতে। কারণ তার কৌতূহলও ছিল অদম্য। এতদিনে দেশটি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য প্রথম জানা যাবে।

পরদিন জাহাজের অধিনায়ক প্রাসাদে এলে তাকে সোজা সভাগৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে হতশেপসুতের সঙ্গে দ্বিতীয় থুথমসও উপস্থিত ছিল। আর ছিল রাজপুরুষেরা এবং সভাসদগণ। সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল পুন্ত-এর বিবরণ শোনার জন্য।

হতশেপসুত তাকে শুরু করার অনুমতি দিলে সে তাকে আর একবার অভিবাদন জানায়। কারণ সম্রাজ্ঞীর নির্দেশেই সে অভিযানে গিয়েছিল। সে থুথমসকেও অভিবাদন জানায়। তারপর শুরু করে ঃ

পুন্ত সম্বন্ধে আমাদের সবার কল্পনায় যে ছবি ফুটে ওঠে, সেখানে গিয়ে পৌঁছলে সেই ছবি কোথায় মিলিয়ে যায়। হতাশায় বুক ভরে ওঠে।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সূচনাতেই সবার মুখের ওপর হতাশার ছায়া নেমে আসে।

হতশেপসুত সবাইকে উৎসাহিত করার জন্য বলে—অন্য বিষয়ে আশাভঙ্গ হলেও, ওদেশের সঙ্গে বাণিজ্য যে খুবই লাভজনক তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। আপনারা সবাই তো দেখেছেন কী বিপুল সামগ্রী আনা হয়েছে ওদেশ থেকে। মীন দেবতার অশেষ দয়া। সুতরাং কল্পনার সঙ্গে না মিললেও এসে যায় না।

সবাই ঘাড় ঝাঁকিয়ে সম্রাজ্ঞীর কথায় সায় দেয়।

অধিনায়ক বলে—আমাদের জাহাজ যখন পুন্তের তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন সবার মন খারাপ হয়ে গেল। এ কি দেশ! বড় বড় সব নাম না জানা গাছপালায় তীরভূমি ঘন সবুজ হয়ে রয়েছে। ভেতরের দিকে দৃষ্টি যায় না বললেই চলে। আমরা ভেবেছিলাম, অট্টালিকাশ্রেণী দেখব, চওড়া চওড়া পথঘাট দেখব, ব্যস্ত মানুষের যাতায়াত দেখব, গাড়ি ছুটতে দেখব। কিন্তু কিছুই নেই। বিক্ষিপ্ত দুএকটি কুটির দেখতে পেলাম। তাদের আকার শঙ্কুর মত। বুঝলাম, এখানে এখনো সভ্যতার আলো পৌঁছয় নি। অধিবাসীরা এখনো আদিম।

কয়েকজন বলে ওঠে—এ কি বিশ্বাসযোগ্য?

—হ্যাঁ। স্বচক্ষে সব দেখলাম, কিছুদিন থাকলাম। শুধু আমি নই, নাবিকেরা সবাই দেখেছে। ওদেশ এখনো উন্নত হয়নি।

—তবে এতসব দ্রব্য দিল কি করে?

—ওরা কৃষিকাজ জানে আর জানে মুগয়া। পশুদের আর শত্রুদের হাত থেকে বাঁচতে ওরা ওদের কুটির নির্মাণ করে উঁচু টিলার ওপর। কুটিরে প্রবেশ

করতে হলে মই বেয়ে উঠে একটা গহ্বরের কাছে যেতে হয়। সেই গহ্বরই হল প্রবেশ পথ। ওদের গৃহপালিত পশু হচ্ছে ক্ষুদ্র শিংবিশিষ্ট গরু আর গর্দভ। গর্দভে ভার এবং মানুষ দুই-ই বহন করে। ওদের পোশাকেও আদিমতার ছাপ। মাথার চুল শূকরের লেজের মত বিনুনি করা। পুরুষদের দাড়ি ছুঁচলো।

হতশেপসুত একটু বাধা দিয়ে বলে—এদের কোন রাজা নেই।

—হ্যাঁ দেবী। সর্দার মত একজন আছেন। তিনিই ওই দ্বীপের অধিপতি। আমাদের জাহাজ যখন তীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তারা দল বেঁধে এগিয়ে আসে। তারা আমাদের অভ্যর্থনা জানায়। সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, আমাদের শোনা গল্প, আমাদের কল্পনা কত অসত্য ছিল। ওরা অসভ্য কখনই নয়। কিন্তু আদৌ উন্নত নয়। আমরা সমুদ্রের তীরে একটি উঁচু কাঠের পাটাতনের ওপর এদেশ থেকে নিয়ে যাওয়া ছোরা, যুদ্ধের কুঠার ইত্যাদি নানা সামগ্রী সাজিয়ে রাখলাম। তাই দেখে ওদের কী আনন্দ। বলতে গেলে নাচতে শুরু করল। ওদের সঙ্গে মিশে এবং কথা বলে বুঝতে পারলাম ওদের সর্দারনি বা রানীর রূপ নাকি অতুলনীয়। সেই রূপের গর্বে ওদের বুক ভরে থাকে। আমাদের দেখার খুব আগ্রহ হল। ওদের জিজ্ঞাসা করলাম, রানীর রূপ দেখার সৌভাগ্য কি আমাদের হবে? ওরা বলল—কেন হবে না? দুদিন পরে যেদিন রানীকে দেখার প্রথম সৌভাগ্য হল সেদিন আমরা যে কয়জন দেখতে গিয়েছিলাম, তারা ভিড়মি খেয়ে পড়ে যাই নি এই যথেষ্ট।

একজন প্রশ্ন করে—কেন? খুব কুৎসিত?

—কুৎসিত? তারও প্রকার ভেদ আছে। স্ত্রীলোকটির বিশাল বপু। পা দুটো থামের মত। বুক দুটি এত বড় যে কল্পনা করা যায় না। তিনজন মানুষ হাতে হাত ধরে তাঁকে বেষ্টন করতে পারবে না। আমার দৃঢ় ধারণা, রানী এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন। আমাদের এখানেও তো দুএকজনকে চোখে পড়ে অস্বাভাবিক মোটা হয়ে যায়। রানীর পোশাকও কদর্য। ছোট হলদে রঙের একটা জামা গায়ের সঙ্গে আঁটোসাঁটো হয়ে লেপটে রয়েছে। জামাটা এতই বেমানান যে রানীকে আরও বীভৎস করে তুলেছে। রানী গর্দভের পিঠে চেপে যাতায়াত করেন।

হতশেপসুত প্রশ্ন করে—যে সমস্ত জিনিস আনা হল, সেগুলি কারা দিল।

—ওরাই দিয়েছে দেবী।

—কিভাবে কেনা হল?

—এখানে যেভাবে বেচাকেনা হয়, সেই ভাবেই হয়েছে। আমাদের নিয়ে যাওয়া প্রতিটি জিনিসের পরিবর্তে ওরা আমাদের ওদের দেশের জিনিস দিয়েছে। এত যে ধূপ ধুনো সুগন্ধি চিতাবাঘ সবই আমরা কিনেছি দ্রব্যের বিনিময়ে। তারপর দ্রব্যবিনিময় সমাপ্ত হলে ওরা খুবই সন্তুষ্ট হল। আমরাও কম আনন্দিত হইনি। তখন একদিন ওদের আমাদের জাহাজের কাছে সমুদ্রতীরে ফল মূল রুটি মদ ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়িত করলাম। ওরা বারবার করে বলল,

আমরা যেন আবার ওদেশে যাই বাণিজ্য করতে। ওরা আরও নতুন নতুন জিনিস সংগ্রহ করে রাখবে।

সব কথা শুনে হতশেপসুত পরিতৃপ্ত হয়। সে মনস্থ করে যে মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা তার রয়েছে সেই মন্দির প্রাঙ্গণে পুন্তদেশ থেকে আনা দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষ বপন করবে। আর মন্দিরগাত্রে খোদাই করে রাখবে ওই দেশে প্রথম অভিযানের কাহিনী। স্থূলাকায় রানীর আখ্যানও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কিন্তু তেমন ভাস্কর কোথায়? তবে সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এক তরুণের। এখনো পরীক্ষা করা হয়নি। পরীক্ষা সফল হলে তার নিজের জন্মবৃত্তান্তও মন্দির গাত্রে খোদাই করা হবে। সবারই বিশ্বাস সে অমন রা-এর ঔরসজাত। স্বয়ং রা তার পিতার রূপ ধরে রানীমহলে প্রবেশ করেছিলেন সেদিন। মন্দির গাত্রে রানীর সঙ্গে দেবতার সহবাস অক্ষয় করে রাখতে হবে।

•

হতশেপসুত জানে, সে একাধারে সম্রাজ্ঞী এবং ফ্যারাও হলেও পুরুষ ফ্যারাও-এর মত ছোটখাটো বিষয়ে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। শৈশব থেকে প্রাসাদের প্রতিটি স্থান, প্রতিটি কক্ষ তার অত্যন্ত পরিচিত। সে যেমন হারেমে ঘুরেছে, তেমনি ঘুরে দেখেছে দাসদাসীদের মনে। উদ্যানে তার যেমন ছিল অবাধ যাতায়াত, তেমনি প্রাসাদের বিরাট বন্ধনশালায় তার ছিল অবারিত গতি। সে দাসদাসীদের প্রকৃতি যতটা চেনে ফ্যারাও বংশের কারও পক্ষে ততটা চেনা সম্ভব নয়। খুব খুঁটিনাটি বিষয়ও তার নজর এড়ায় না। ওরা কি কি ভালবাসে। কোন কাজে ওদের কতটা উৎসাহ আর কতটা বিরক্তি এ বিষয়ে সে মোটামুটি ওয়াকিবহাল। সম্রাজ্ঞী হবার পর হামেশাই সে প্রাসাদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সঙ্গে হারেম উদ্যান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে। খোঁজখবর নেয়। বিশেষ করে রন্ধনশালার প্রতি তার তীক্ষ্ন নজর। কারণ সে জানে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি ওদিকে সহজেই যায়। বিষপ্রয়োগে মৃত্যু ঘটানোর চেয়ে সহজ পন্থা সচরাচর চোখে পড়ে না দুষ্টচক্রের।

শৈশবে সে অনেকবার রন্ধনশালায় গিয়েছে নেহাৎ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে। তখনকার অনেক খণ্ড চিত্র তার মনের মধ্যে আজও উঁকি দেয়। সেখানে রন্ধনকাজে নিযুক্ত থাকে অনেক দাসদাসী। সেখানে রুটি তৈরীর ভার সম্পূর্ণরূপে মেয়েদের ওপর ন্যস্ত। তবে রুটি তৈরীর আগে ময়দা মাখা, তাল পাকানো ইত্যাদি কাজ ছেলেরাও করে। গমকে আটা করতেও পুরুষের প্রয়োজন। বড় বড় হামানদিস্তায় গম ঢেলে হামান দিয়ে পেষাই হয়। কখনো বড় বড় দুটি প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে ঢেলে পেষাই করা হয়। দুই প্রস্তরখণ্ডের নীচেরটি বেশী বড় এবং সামনের দিকে ঢালু। সামনে একটা বড় গর্ত আছে। পেষাই হলে আটা গর্তের মধ্যে দিয়ে নীচে পড়ে স্তূপীকৃত হয়। সেই আটা মেখে তাল তাল করা হয়। তারপর সেই তাল থেকে একটু একটু করে নানা আকারের পিঠে তৈরী হয়! কোনটা দেখতে শামুকের মত, কোনটার আকার শঙ্কুর মত, কোনটা ডিম্বাকৃতি, কোনটা বা থালার মত। অল্প আঁচে তাদের রঙও এক এক রকমের হয়। পোড়া

মাংসের মত রঙও হয় কোনটার। সম্রাজ্ঞী জানে প্রাসাদে পিঠের এতরকম বাহার থাকলেও, কৃষক কিংবা মেষপালকেরা খুব সংক্ষেপে তাদের রুটি প্রস্তুত করে। অনেক সময় মাঠে কাজ করতে করতে গরম ছাই-এর মধ্যে রুটি করে নেয়। ময়দার তাল কোন মাটির পাত্রের গায়ে চেপে দিয়ে উনোনের কয়লা কিংবা ছাই-এর মধ্যে অল্প আঁচে সেঁকে নেয়। গম বা যবের রুটিই হল সবার প্রধান খাদ্য। হতশেপসুত জানে দেবতা ওসিরিস গম যব আর আঙুর লতা অন্য দেশ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি এসব জিনিস দিয়ে শুধু খাদ্য প্রস্তুতপ্রণালী শিখিয়ে দিয়েই নিবৃত্ত হননি, তিনি যব দিয়ে আর আঙুর দিয়ে সুরা তৈরীর প্রণালী শিখিয়ে দিয়ে সবার উদরপূর্তির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উৎসের সন্ধানও দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর তুলনা নেই।

রন্ধনশালায় রুটি কিংবা ময়দার অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত ছাড়া বাকী সবই পুরুষেরা করে। বড় বড় উনুনে আগুন-গনগন করে। তার ওপর লম্বা-লম্বি শিকে গাঁথা রয়েছে কোথাও গোটা একটি ষাঁড়, কোথাও রাজহংস। কোথাও ছোট ছোট শিক মুখের ভেতর দিয়ে বিঁধিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে লেজের দিক দিয়ে সেই শিক বের করা হয়েছে বড় বড় মাছের। তাদেরও পোড়ানো হচ্ছে। পরিবেশনের আগে মাছের কিংবা অন্যান্য মাংসের ওপরটা ভাল করে মুছে দেওয়া হয় যাতে দেখতে কুৎসিত না লাগে।

হতশেপসুতের ছেলেবেলার একদিনের একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। সেদিন একপাশে দুজন বান্দা মিলে একটি ষাঁড়কে লম্বালম্বি শিকের ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছিল, যাতে সব দিক সমান ভাবে দগ্ধ হয়। অন্যপাশে একজন বান্দা একটি রাজহংসীকে ঝলসাচ্ছিল। আগুনের উত্তাপ তার মুখে লাগছিল বলে এক হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে বকবক করছিল—"দুনিয়ার জন্ম যেদিন, সেদিন থেকে এই আগুনের তাতে আমি আছি, কিন্তু বাপের জন্মে এমন উদ্ভট হাঁস আমি কখনো দেখিনি।" লোকটির পাশে দাঁড়িয়েছিল রন্ধনশালার প্রধান রাঁধুনি। সে হাতে একটি সুদৃশ্য থালা নিয়ে হাঁসটির দিকে অধীর আগ্রহে চেয়ে ছিল। কারণ একটু পরেই ফ্যারাও অশ্বশকটে প্রাসাদের প্রত্যাবর্তন করবেন। তখন লোকটি ছুটে যাবে থালা হাতে ওই শকটের পাশে। ফ্যারাও বাইরে থেকে ঘুরে এসে এই সায়াহ্নে প্রথমেই ঝলসানো হাঁস খেতে ভালবাসতেন। শকটের কাছে সেটি দেখলে তাঁর ক্ষুধার উদ্রেক হত।

সম্রাজ্ঞী হয়ে হতশেপসুত পা দিয়ে ময়দা চটকানো বন্ধ করেছে। আগে দুপাশে প্রোথিত দুটি লম্বালম্বি লাঠি চেপে ধরে শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে দুপা দিয়ে বিশাল পাত্রের মধ্যে রাখা ময়দা মাখত সবাই। দেখে ভাল লাগত না।

সম্রাজ্ঞী হয়ে একদিন সে কোনরকম খবর না দিয়ে রন্ধনশালায় প্রবেশ করে। এ বিষয়ে তার সাহায্যকারী এখনো নেশামুন। সবাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। তারা স্বপ্নেও ভাবেনি, না জানিয়ে এভাবে স্বয়ং সম্রাজ্ঞী চলে আসবেন। সুতরাং যা স্বাভাবিক তাই হল। অসতর্ক মুহূর্তের কয়েকটি গাফিলতি ধরা পড়ে

গেল। হতশেপসুত জানত, কেউ না কেউ ধরা পড়বেই এবং যারা ধরা পড়বে তাদের শাস্তি দিতেই হবে, নইলে তার পরিদর্শনের গুরুত্বই থাকবে না। সে তিনজনকে শাস্তি দেয়। তাদের মধ্যে দুজন নারী, একজন পুরুষ। প্রাসাদের ভেতরের কোন কাজে আর রাখা যাবে না তাদের। বাইরের সাধারণ কাজে নিযুক্ত করা হবে। তাদের মুখ দেখে কষ্ট হল তার। কিন্তু উপায় নেই।

রন্ধনশালার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী অন্যত্র ছিল। খবর পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে।

হতশেপসুত বলে—এরা ঠিকমত কাজ করে না কেন?

লোকটা কি জবাব দেবে ভেবে উঠতে পারে না। তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়। যারা শাস্তি পেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারও করতে পারে না। প্রায় খাবি খাওয়ার অবস্থা তার।

হতশেপসুত সময় না দিয়ে তাকে প্রশ্ন করে—কত রকমের গোস্ত তৈরী করা হয় এখানে?

—দশরকমের সম্রাজ্ঞী। তাছাড়া পাখির গোস্ত পাঁচরকম।

—হুঁ। কতরকমের রুটি আর পিঠে তৈরী হয়?

—ষোল রকমের।

—ঠিক আছে। আচ্ছা বলতে পার, কতরকমের সুরা তোমাদের পরিবেশন করতে হয়?

—উৎকৃষ্ট সুরা ছয় রকমের। আর থরের থেকে প্রস্তুত নরম জিনিস চার প্রকারের।

—কতরকমের ফল পরিবেশন কর তোমরা?

—এগারো রকম ফলেরই ব্যবস্থা আছে। অন্য কোন ফল তো নেই। তাছাড়া মিষ্টান্ন রয়েছে।

হতশেপসুত বুঝতে পারে লোকটা করিৎকর্মা। যারা ধরা পড়েছে তাদের নিতান্ত ভাগ্য খারাপ। নইলে সে জানে, এখানকার কাজকর্ম ভালভাবে হয়। তবু আচমকা এভাবে মধ্যে মধ্যে আসা ভাল। অনেক সময় ষড়যন্ত্রের জাল এখান থেকে বিস্তার লাভ করে। এদের সব সময় সজাগ রাখা প্রয়োজন।

শুধু প্রাসাদের রন্ধনশালা নয়, হতশেপসুত লক্ষ্য রাখে যাতে দেবতারাও উৎকৃষ্ট ভোগ্যবস্তু পান প্রতিটি দেবালয়ে। মিশরের নানাস্থানে দেবতাদের নামে উৎসর্গীকৃত যে সব ভোজের ব্যবস্থা আছে, সেগুলি যেন নির্দিষ্ট দিনে সুচারু রূপে অনুষ্ঠিত হয়। কারণ সে মর্মে মর্মে জানে দেবতারাই সমস্ত মঙ্গল আর সমস্ত শক্তির উৎস। তাঁরা যদি এতটুকুও কুপিত হন, তাহলে ভয়ংকর রকমের বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে প্রাসাদে এবং দেশে। তাই বিশেষ করে বুটোতে হোরাসের ভোজ এবং এস্নায় মীন-এর ভোজের দিকে তার নজর থাকে। আর রাজধানীতে অমন রা-এর ভোজ, যা নতুন বছরের শুরুতে আরম্ভ এবং চলে চব্বিশ দিন তা তো সে ব্যক্তিগত ভাবে দেখাশোনা করে। কিন্তু সারা দেশের মধ্যে যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান, যা পবিত্র নগরী অবিদস-এ ওসিরিসের রহস্য

ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সেটি তত্ত্বাবধানের জন্য উচ্চতম পদের কয়েকজনকে সে পাঠায়। স্বয়ং দ্বিতীয় থুথমসকেও পাঠিয়েছিল গতবার। ইচ্ছা আছে আগামী বছরে সে নিজে যাবে। তবে শত হলেও সে নারী। যে কোন কারণে তার যাওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

চবরোসের সেই পত্নী আসেত-এর পুত্রটি দিনে দিনে বড় হয়ে উঠছে। এবার তার নিজেরও একটা চাই। সেইজন্য চবরোসের প্রতি তার ঘৃণ্য ভাবকে দূরে সরিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আগেও অনেকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সে প্রার্থনা করে অন্তত কিছুদিনের জন্যে যেন চবরোসের স্পর্শ তাকে শীতল করে না দেয়। গর্ভে একজনের আসা একান্তই প্রয়োজন। সেটি পুত্র বা কন্যা যা-ই হোক। কন্যা হলে আসেত-এর পুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে আপত্তি নেই। আর পুত্র হলে? সেক্ষেত্রে তার পুত্রই প্রথম দাবীদার। কারণ চবরোসও তার দৌলতে ফ্যারাও। আসেত-এর পুত্র যদি তৃতীয় থুথমস হয় তাহলে একই ভাবে হবে।

হতশেপসুত পিতার কথা চিন্তা করে। মাঝে একদিন তাঁর সমাধিতে নীল-পদ্ম সমর্পণ করে এসেছিল। তাঁর কা নিশ্চয় ঘোরাঘুরি করে তাঁর দেহের চারদিকে। এই কা-ই জীবিতকালে মানুষকে দেয় নিরাপত্তা, বুদ্ধি, পবিত্রতা, স্বাস্থ্য আর আনন্দ। প্রত্যেক মানুষের কা অনন্তকাল ধরে ইহজগতে আর পরজগতে মানুষের দেহের কাছাকাছি থাকে কিন্তু দেহটি বিনষ্ট হলে কা-এর থাকার আর জায়গা থাকে না।

পিতা জানতেন, কন্যার উচ্চাশার কথা। উচ্চাশা যদি না থাকত, তাহলে সে দুই প্রিয়তম ভ্রাতার মৃত্যুশোক কখনো কাটিয়ে উঠতে পারত না। বিশেষ করে উয়াচমেসের মৃত্যুর পর তার বেঁচে থাকার বিন্দুমাত্র আগ্রহও অবশিষ্ট ছিল না। সেই নিদারুণ সময়ে সান্ত্বনালাভের আশায় সে অবিদস-এ গিয়েছিল। সেখানে রাতে স্বপ্নে আইসিস ও ওসিরিসকে দেখল। তাঁদের উভয়ের মুখে লেগে ছিল উজ্জ্বল হাসি। আইসিস বললেন—আমি ওসিরিসকে হারিয়ে ভেঙে পড়িনি। যদি পড়তাম তাহলে এভাবে তাকে ফিরে পেতাম না।

হতশেপসুত বলেছিল—কিন্তু আমি সামান্যা মানবী। আপনি যেভাবে ওঁকে ফিরে পেয়েছেন, আমি তো তা পাব না।

—না। তবে জেনে রাখ, উয়াচমেস বেশ আনন্দেই আছে। অমেনমেসও ভাল আছে। তাদের একান্ত ইচ্ছা তুমি তোমার উচ্চাশা পূর্ণ কর।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হতশেপসুত বলেছিল—তাই করব।

—তুমি একটা বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করে কৃতী হবে।

—কিন্তু আমার যে ইচ্ছা অমন-রা-এর মন্দির তৈরী করা।

—বেশ তো। উনি সব দেবতার দেবতা। উনি তুষ্ট থাকলে সবাই তুষ্ট।

—কিন্তু কোথায় গড়ব সেই বিখ্যাত মন্দির।

—মনে মনে তুমি ঠিকই জান। প্রকাশ করতে পারছ না।

—দার-এল-বহরি।

—ঠিক। দেবতারা তীব্র আগ্রহ নিয়ে তোমার সেই অতুল কীর্তি দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন।

নিজের গর্ভে একটি অথবা দুইটি সন্তান ধারণ তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক বিশেষ পদক্ষেপ। কদিন ধরে তাই চবরোসের ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু উয়াচমেসের জীবিত কালে তাকে নির্জনে দেখলে যেমন কামার্ত হয়ে উঠত, এখন আর তেমন হয় না। এখন তাকে দেখে সংকুচিত হয়। তাকে বেশ সমীহ করে। সমীহ করা ভাল, কিন্তু সেজন্য তার দেহের প্রতি আকর্ষণ কমে গেলে ভীষণ অসুবিধা। আসেত-এর বেলায় নিশ্চয় সে এমন আচরণ করে না। করলে তাদের পুত্র মিসাফ্রিস জন্মাত না। আসেত-এর দেহকে নারীদেহ বলেই ভাবে সে, যা পুরুষভোগ্য। কিন্তু তার বেলায় তার চিন্তাশক্তিই বোধহয় লোপ পেয়ে যায়। বিশেষ করে সেই সিংহ শিকারের পর থেকে সে নিজের কাছেই নিজে অপরাধী।

একদিন দিনান্তে সভা ছেড়ে ফেবার পথে সে থুথমসকে বলে—ভেবে দেখলাম সেইবার সিংহশিকারের সময় তোমার যেমন হয়েছিল, যে কোন ফ্যারাও-এরই তেমন হতে পারত।

অতি উৎসাহে দ্বিতীয় থুথমস বলে ওঠে—কেন? কেন?

—তুমি তো শুধু সাধারণ শিকারী নও তুমি ফ্যারাও। নিজের প্রাণ যে কত মূল্যবান এই বোধ তোমার মধ্যে সব সময় ক্রিয়া করে।

—তা তো করেই।

—সেইজন্য অন্যদের মত অনায়াসে তুমি সিংহের মুখের দিকে এগিয়ে যেতে পার না।

—ঠিক তাই।

—ওসব নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিও না। কয়েক বছর হয়ে গেল। অনেকে ভুলেও গিয়েছে। আমারই সেদিন ভুল হয়েছিল।

—আমি জানতাম, তোমার ভুল একদিন ভাঙবে।

—হ্যাঁ। কিছু মনে করো না। আমার অনেক ভুল ভেঙে গিয়েছে। একসময় ভাবতাম তোমাকে আমি পছন্দ করি না। তখন অল্প বয়স। বুদ্ধি হয়নি। এখন বুঝতে পারি তুমিই আমরা সবচেয়ে আপন জন। তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু ভাবতে পারি না।

চবরোস একটু থমকে দাঁড়িয়ে হতশেপসুতের মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলে বলে —তুমি সত্যি বলছ?

—এর চেয়ে সত্যি আর কিছু হতে পারে না। মনের গভীর থেকে এই সত্য উঠে আসছে। গতকাল রাতে একা একা শয্যায় শুয়ে ছিলাম। কিছুতেই ঘুম আসছিল না। আপসোস হচ্ছিল অনেক কিছুর জন্য। তোমাকে না চিনতে পেরে কত অবহেলা করেছি। আজও রাত ওইভাবে কাটবে।

—একা একা? তা কেন? আমি যাব।

—তুমি যাবে ? আসেত-এর যদি দুঃখ হয় ?

—আসেত ? তোমার সঙ্গে ওর তুলনা ?

—সে তোমার পুত্রের জননী।

—ফ্যারাওদের পুত্র তো অনেক নারীর গর্ভেই জন্মায়। তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু সম্রাজ্ঞী হলেন অন্য বস্তু। তাঁর সঙ্গে স্বর্গের যোগাযোগ।

—তুমি তাহলে আসছ আজ রাতে ?

—রাতে কেন, একটু পরেই আমি যাচ্ছি। এভাবে তো তুমি আমাকে কখনো ডাকনি। তোমার আহ্বানকে অস্বীকার করার সাধ্য আমার নেই।

হতশেপসুতের সারা অঙ্গ এবং সেই সঙ্গে মনও ঘৃণায় আর ক্রোধে মোচড় দিয়ে উঠতে চাইছিল। কিন্তু সে নিজেই নিজেকে ধমকে বলে—এ কি হচ্ছে ? সর্বনাশ করছিস ? শান্ত হ, শান্ত হ। ওর সন্তান তোর গর্ভে আসা খুবই প্রয়োজন।

মনে মনে গর্ভধারণের দেবী এ-আর্তকে সে স্মরণ করে। সেদিন চবরোস আসে। রাতও কাটায়। প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ সে সহজ হতে পারেনি। তারপর হতশেপসুতের সহযোগিতায় সহজ হতে পেরেছিল। হতশেপসুত শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল আসেত-এর সঙ্গে চবরোসের প্রকৃত সম্পর্কটা কিরকম। বহুদিন পরে উয়াচমেসের কথা বড় বেশী মনে পড়েছিল। তার সঙ্গে মিলনে যে পুলক, যে শিহরন তার কিছুই সে পায়নি। তবে চবরোস এতদিনের এক নিষিদ্ধ বস্তুকে ভোগ করতে পেরে বড় বেশী আকুল হয়ে উঠেছিল। এভাবে তাকে মাঝে মাঝে সুযোগ না দিয়েও উপায় নেই।

নেশামুনকে দিয়ে একদিন আসেতকে ডেকে পাঠায় হতশেপসুত। বলে দেয়, সঙ্গে করে সে যেন পুত্রটিকেও নিয়ে আসে। সম্রাজ্ঞীর তলব। সুতরাং আসেত ভয় পেয়ে অনতিবিলম্বে হতশেপসুতের কক্ষে প্রবেশ করে !

—এসো এসো। অত সংকোচ কেন ? তুমি হলে ফ্যারাও-এর পুত্রের জন্মদাত্রী। তোমার সম্মান ভিন্ন। বস।

—আসেত বুঝতে পারে না সম্রাজ্ঞীর কথার মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ রয়েছে কিনা। তবে তার মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে সহজভাবে কথাগুলো বলেছে সম্রাজ্ঞী।

সে একটি উচ্চস্থানে আসন গ্রহণ করে।

—তোমার পুত্র কোথায় ?

—একটু অপরিষ্কার হয়ে পড়েছিল। নিয়ে আসছে।

একজন পরিচারিকা একটু পরে শিশু মিসাফ্রিসকে নিয়ে আসে।

হতশেপসুত শিশুকে আগে দেখেনি। সে তার রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। আসেত অসুন্দরী নয়। তাই বলে রূপবতী বলা যায় না। কিন্তু শিশুটি অসাধারণ। চবরোসের সঙ্গে সাদৃশ্য বিশেষ নেই। কোথা থেকে হল এমন পুত্র ?

—এ যে খুব সুন্দর হয়েছে ?

সলজ্জ হেসে আসেত বলে—সবাই তাই বলে।

—তারা মিথ্যা বলে না। তুমি ভাগ্যবতী।

আসেত কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না।

ভবিষ্যতে যারা বীর হবে, দিগ্বিজয়ী হবে শিশুকাল থেকেই তাদের মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একথা বলছিলেন, আবানা-পুত্র অহমেস। সেই লক্ষণগুলির কয়েকটি তিনি বলেছিলেন হতশেপসুতকে। বলার কারণ ঘটেছিল। উয়াচমেস একদিন উদ্যানের সরোবরের দিকে আসছিল। সেই সময় হতশেপসুত আবানা-পুত্রের পাশে বসেছিল। আবানা-পুত্র বলে উঠলেন —"উয়াচমেস আসাধারণ যোদ্ধা হবে।" হতশেপসুত জানতে চেয়েছিল কিভাবে তিনি বুঝলেন। সেই সময় উয়াচমেসের দেহের চিহ্নগুলি তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আজ এত বছর পরে সেই চিহ্নের কয়েকটি সে আসেত-এর পুত্রের মধ্যে দেখতে পেল।

—তোমার পুত্র বীর হবে।

—আশীর্বাদ করুন তাই যেন হয়। ফ্যারাও-এর অধীনে থেকে সে যদি সুনাম অর্জন করে আমি কৃতার্থ হব।

—ফ্যারাও-এর অধীনে কেন ? নিজেও তো ও ফ্যারাও হতে পারে।

—এ কি বলছেন দেবী ?

—ভুলে যেও না তোমার পুত্র ফ্যারাও-এর জ্যেষ্ঠ সন্তান। তোমার স্বামীও তাই ছিলেন।

—কিন্তু আপনার পুত্র ?

হতশেপসুত মনে মনে ভাবে, তাই যেন হয়। কয়েকদিনে চবরোসের আড়ষ্টতা ভেঙে গিয়েছে। সে এখন রাতের শয্যায় যথেষ্ট তৎপর।

আসেতকে সে বলে—জ্যেষ্ঠপুত্রের গুরুত্ব স্বতন্ত্র। তাছাড়া আমি যে গর্ভে সন্তান ধারণ করব তার স্থিরতা কোথায় ? আর সন্তান হলেও সে কন্যা হতে পারে !

আসেত অকৃত্রিম কণ্ঠে বলে—আমি অতশত ভাবি না। অত উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আমার নেই। নিজের পুত্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হলেই আমি নিশ্চিন্ত।

—তোমাকে কথা দিলাম তার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত।

আসেত-এর চোখে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

হতশেপসুত বলে—পুত্রকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমার কাছে এসো।

—আপনি কত ব্যস্ত থকেন।

—ঠিক আছে, আমি ডেকে পাঠালে এসো।

আসেত অভিবাদন করে সপুত্র কক্ষত্যাগ করে।

হতশেপসুত শিশুটির কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তার আজ আর কিছু ভাল লাগে না। শয্যার ওপর একটি প্যাপাইরাস গোটানো অবস্থায় পড়ে ছিল। তাতে পুরাকালের অনেক কাহিনী লেখা রয়েছে। সে

শয্যায় বসে সেটি ধীরে ধীরে খুলতে থাকে। তারপর একসময় অজ্ঞাতে তারই মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যায়। সে পড়তে থাকে অনুপ আর তার কনিষ্ঠভ্রাতা বাতার কাহিনী ঃ

একদা দুই ভ্রাতা বসবাস করত। তারা একই মাতা এবং একই পিতার সন্তান। জ্যেষ্ঠের নাম অনুপ আর কনিষ্ঠের নাম বাতা। অনুপের গৃহ ছিল। তার স্ত্রীও ছিল। বাতা তারই পুত্রের মত তার বাড়িতে থাকত। সে বস্ত্রবয়ন করত, ক্ষেতে লাঙল দিত, বীজ বপন করত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাজকারবারও সে দেখাশোনা করত। কৃষিকাজে সে এত দক্ষ ছিল যে সারা দেশে তার মত কৃষক দুর্লভ ছিল। দুই ভ্রাতার মধ্যে যথেষ্ট প্রীতি ছিল। কিন্তু এ প্রীতি আর ভালবাসায় বিঘ্ন দেখা দিল অনুপের স্ত্রীর দোষে। একদিন মাঠে বীজ বপন করতে করতে বীজ কম পড়ে গেল। অনুপ তখন বাতাকে বাড়িতে পাঠায় আরও কিছু বীজ আনতে। দ্বিপ্রহরে নির্জন কুটিরে তাকে দেখে তার ভ্রাতৃবধূর লালসা জাগ্রত হল। সে বাতাকে তার দৈহিক ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাতে অনুরোধ করল এবং তাকে জাপটে ধরল। বাতা অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং ভ্রাতৃবধূকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি বীজ নিয়ে মাঠে ফিরে যায়। সে অনুপকে এ বিষয়ে কিছুই বলল না। এই নীরব থাকা তার পক্ষে মারাত্মক হল।

সন্ধ্যা হলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনুপ গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। কনিষ্ঠভ্রাতা বাতা ক্ষেতের যত সব আগাছা ছিল সবগুলো একপাশে জড়ো করে মাথায় নিয়ে হালের পশুদের সঙ্গে তাদের পেছনে পেছনে গোশালার দিকে চলতে থাকে। এদিকে তার ভ্রাতৃবধূ নিজের কৃতকর্মের জন্য ভীত হয়ে আলুথালু বেশে মেঝেতে গড়াতে থাকে। দেশের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী স্বামী এলে তার হাতে জল ঢেলে দেয় না। সে গৃহে বাতিও জ্বালায় নি।

অনুপ তখন জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে ? এই অবস্থা কেন ? কে এসেছিল ?

অনুপের স্ত্রী তখন বলে—তোমার ভাই বাতা ছাড়া আর কেউ আসেনি।

অনুপ তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। সে একটি ছুরিতে শান দিয়ে সেটি দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধরে। তারপর সে ধীরে ধীরে পশুশালার দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার পেছন দিকে লুকিয়ে থাকে। সে জানে, বাতা পশুদের নিয়ে ওখানেই ঢুকবে।

সূর্য অস্তমিত হবার সময় বাতা যথারীতি আগাছা আর খড়ের বোঝা বহন করে গোশালার নিকটবর্তী হতে থাকে। তার প্রথম গরু গোশালায় ঢুকতে ঢুকতে মনিবকে সাবধান করে দিয়ে বলে—সাবধান, তোমায় দাদা তোমাকে হত্যা করার জন্য ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পালাও শিগ্‌গির।

বাতা স্তম্ভিত হয়ে প্রথম গরুর উক্তি শুনল। তারপর দ্বিতীয় গরুও ওই একই কথা বলল। তাই শুনে সে তখন আড়চোখে দরজার পাল্লার নীচের দিকে তাকালো। সেখানে সে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পায়ের পাতা দেখতে পেল। সে খড়ের বোঝা ধপ্ করে সামনে ফেলেই দৌড়তে শুরু করল। অনুপ তার ভাইকে পালাতে দেখে ছুরি হাতে পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে। তাই দেখে দেবতা রা

তাদের দুজনার মাঝখানে একটি জলধারার সৃষ্টি করলেন। তাতে বাতা বেঁচে গেল। কারণ অনুপ তাকে আর অনুসরণ করতে পারল না। সারা রাত তারা দুজন ওই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর উভয় তীরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। প্রভাতে পূর্ব-দিগন্তে নতুন সূর্যের উদয় হলে বাতা তার ভ্রাতাকে বেদনার্ত কণ্ঠে বলে—আমি রা দেবতার নামে শপথ করছি যে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তুমি আমাকে এত সহজে অবিশ্বাস করতে পারলে? এতদিন ধরে তোমাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আর সেবার কোন মূল্য দিলে না? তুমি এখন গৃহে ফিরে যাও। তোমার গরুবাছুরের দেখাশোনা কর। আমি আর তোমার ওখানে ফিরছি না। তোমাদের সঙ্গে আমি আর জীবনে থাকব না। আমি এখন বাবলা গাছের উপত্যকায় চলে যাব। আমার পরিণতির কথাটাও শুনে যাও। আমি আমার হৃদপিণ্ডটি বাবলা ফুলের মধ্যে সংরক্ষিত রাখব। তোমাকে কেউ যদি একপাত্র সুরা দেয় আর তাতে যদি তুমি ফেনা ভেসে উঠতে দেখ, তখনই চলে আসবে আমার হৃদপিণ্ডের খোঁজে। বুঝবে আমার মৃত্যু হয়েছে।

বাতার কথায় অনুপেব অনুশোচনার সীমা থাকে না। সে ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে আসে। এসেই স্ত্রীকে হত্যা করে বিষণ্ণ মনে বসে থাকে।

হতশেপসুত একাগ্রচিত্তে গল্পটি শেষ করে। তায় খুব ভালই লাগে। তারপর সে দেখে এই একই গল্পের আর একটি পরিণতির কথাও লেখা রয়েছে। সম্ভবত অন্য কোন লেখক সেটি লিখেছিল। এই প্যাপাইরাসের করণিক সেটিও সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে রেখেছে। সেখানে বাতা কৃষক বা রাখালের পরিবর্তে একজন বীর নায়কে রূপান্তরিত, তার জীবন একটি বৃক্ষের ফুলের মধ্যে রহস্যজনকভাবে নিহিত। সে সেই বৃক্ষেরই নীচে বসবাস করে। দেবতা রা এসে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে কথা বলেন। তাকে একা একা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে দেখে দেবতারা এক নারীকে স্ত্রীরূপে উপহার দেন। কিন্তু ওই স্বর্গীয় নারীই শেষ পর্যন্ত তার সর্বনাশের কারণ হল। সেই নারীর একগুচ্ছ কেশ সমুদ্রের ঢেউ-এ ভাসতে ভাসতে যে কোনভাবে মিশরের অধিপতির কাছে এসে পৌঁছালো। তিনি তখন বাতার স্ত্রীর কাছে একজন দূতকে পাঠালেন। বাতার স্ত্রী কিছুমাত্র চিন্তা না করে দূতের সঙ্গে মিশরে পালিয়ে এল। কিছুদিন পরে সেই বিশ্বাসঘাতিনী মিশরের অধিশ্বরের কাছে প্রকাশ করে দিল তার স্বামীর জীবনের গুপ্ত কথা। তাঁর আদেশে তখন সেই বাবলা গাছটিকে ভূপাতিত করা হল। বাতাও সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারাল।

ঠিক সেই মুহূর্তে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনুপ তার সুরাপাত্রের মধ্যে স্তূপীকৃত ফেনা ভেসে উঠতে দেখল। সে বুঝতে পারল তার ভাই-এর নিশ্চয় কোন বিপদ ঘটেছে। সে বাবলাগাছের উপত্যকার দিকে যাত্রা করল। সেখানে অনেক অনুসন্ধানের পরে বাতার শবদেহ উদ্ধার করল। তারপর দীর্ঘ সাত বছর ধরে অনুপ তার ভ্রাতার হৃদপিণ্ডের সন্ধান করল। অবশেষে সেটি পাওয়া গেল। বাতা ধীরে ধীরে চোখ মেলল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে একটি ষাঁড়ে রূপান্তরিত হল। অনুপ তখন সেই ষাঁড়কে নিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মিশর-

রাজ সকাশে উপস্থিত হল। মিশর-রাজের পার্শ্বে বাতারই স্ত্রী রানীরূপে উপবিষ্ট ছিল। ষাঁড়রূপী বাতা এমন কিছু ইঙ্গিত করল যাতে রানী সহজেই বুঝতে পারে ওই ষাঁড় আর কেউ নয় তারই স্বামী। রানী তখন ভীত হয় এবং তার আদেশে ষাঁড়কে হত্যা করা হয়। ষাঁড়ের রক্ত মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটি সুন্দর ডুমুর গাছ জন্মাল। রানী অধৈর্য হয়ে রাজাকে বলে—এই গাছ দুটো কেটে ফেল। রাজার আদেশে ডুমুর গাছ কাটার সময় সেই গাছের একফালি কাঠ রানীর মুখবিবরে প্রবেশ করে। তাতে রানীর গর্ভ সঞ্চার হয় এবং সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। মিশরের অধিপতি সেই পুত্রকে তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী রূপে ঘোষণা করেন। ওই পুত্র প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং বাতা। সে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে। তারপর একদিন রানীকে হত্যার ব্যবস্থা করে। শেষে সে তার ভ্রাতা অনুপকে নিয়ে একই সঙ্গে রাজত্ব করতে আরম্ভ করে।

হতশেপসুত গল্পটি শেষ করার পর অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে। কিন্তু গল্পটির মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারে না। সব গল্পেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে। বাতার গল্পের উদ্দেশ্য কি ? এই গল্প থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায় ? বুঝতে পারে না সে। তবে এটুকু বুঝতে পারে ওসিরিসের জীবন কাহিনীর সঙ্গে কোথায় যেন সাদৃশ্য রয়েছে। তাছাড়া এই গল্প প্রমাণ করে অবিশ্বাসী স্ত্রী কতটা ভয়াবহ হতে পারে।

দেশের বহুস্থানে প্রতি বছরই জলকষ্ট দেখা দেয়। প্রতি বছরই অনেক জায়গায় কূপ খননের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হতশেপসুত এ বিষয়ে খুবই মনোযোগী। সে নিজেই উদ্যোগী হয়, যা সচরাচর ফ্যারাও-এর কর্মচারীরাই দেখে।

রাজসভায় সাধারণভাবে কথাবার্তা বলা পছন্দ করে না হতশেপসুত। সে হেকারনেহেহ্‌র কাছ থেকে জেনেছিল ফ্যারাও-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলার ধরন আলাদা। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ফ্যারাও-এর সঙ্গে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলতে পারে না। সেই বিশেষ ধরনের কথা বলতে হলে যথেষ্ট শিক্ষা পেতে হয়। সেই ধরনের কথাবার্তাই যে তার অভিপ্রেত একথা সবাই জানে। তাই সেদিন কূপখননের বিষয় উল্লেখ করে সভায় যখন এক ব্যক্তি অতি সাদামাটাভাবে হতশেপসুতের প্রশংসা করতে উদ্যত হন তরুণ অমাত্য হাপু-সেনেব প্রবলভাবে বাধা দিল। মিশরের ওপরের অংশের প্রধান অমাত্যরূপে সে বাধা দিতে পারে। সে তীক্ষ্ন বুদ্ধির অধিকারী হলেও তার অতি উচ্চপদটি শুধুমাত্র বুদ্ধিবলে অধিকার করেনি একথা বলা বাহুল্য। সবার মত সে-ও পদটি পেয়েছে পুরুষানুক্রমে যা মিশরের প্রথা। তবে তার বিদ্যা ও বুদ্ধি এই পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

লোকটি প্রধান অমাত্যের কাছে এইভাবে বাধা পেয়ে থতমত খেয়ে যায়। সে বসে পড়ে। হাপু-সেনেব বুঝতে পেরেছিল লোকটির আদব-কায়দাবিহীন কথার ধরনে সম্রাজ্ঞী ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছে। কূপ খনন খুবই প্রয়োজনীয়। ফ্যারাও-এর সুনাম বৃদ্ধি পায় এতে। কিন্তু হতশেপসুত নিজে উদ্যোগী বলে,

তার প্রশংসা আরও সুন্দরভাবে করা কর্তব্য।

হাপু-সেনেব উঠে দাঁড়িয়ে সেবকের দৃষ্টিতে হতশেপসুতের দিকে চেয়ে বলে—আপনার সবকিছুই রা দেবতার সমতুল্য। আপনার হৃদয়ের ইচ্ছাতেই সব কিছু ঘটে চলেছে। আপনি এবং আপনার স্বামী যেদিন থেকে এই পদে অভিষিক্ত হয়েছেন আমরা বিভিন্ন প্রকার চমকপ্রদ ঘটনা ঘটাতে দেখছি আপনাদের। এমন ঘটনা আমরা পূর্বে কখনো ঘটতে দেখিনি বা শুনিনি। আপনাদের মুখনিঃসৃত বাক্য হরমচিসের বাক্যের মত। আপনাদের জিহ্বা মানদণ্ড সদৃশ। আপনাদের ওষ্ঠ থথ দেবতার মানদণ্ডে রক্ষিত ক্ষুদ্র জিহ্বার চেয়েও নির্ভুল। পৃথিবীতে কী আছে যা আপনাদের অজানা? এমন কোন দেশ রয়েছে যা আপনারা পরিভ্রমণ করেননি বা দেখেননি। মাতৃগর্ভ থেকেই আপনারা এই দেশ শাসন করে আসছেন। কারণ শিশুকাল থেকেই আপনাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে রাজকীয় শোণিতের ধারা। এই দুই দেশের যাবতীয় সমস্যা আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করা হত যখন আপনারা শিশু ছিলেন তখন থেকেই। আপনাদের সম্মতি ব্যতীত কোন কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়নি, কোন ব্যবসার সূচনা করা হয়নি। আপনারা যখন মাতৃস্তন্য পান করেন, তখন থেকেই মিশরের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক আপনারা। আপনারা যখন নির্দেশ দিলেন বাবিধারা দ্বারা পর্বতশ্রেণী বিধৌত হোক, সমুদ্র সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশ পালন করল। পৃথিবীতে আপনারা দেবতার জীবন্ত প্রতীক। আপনাদের মুখবিবরে দেবতার আস্বাদ, আপনাদের হৃদয়ে দেবতার জ্ঞান। আপনাদের জিহ্বা সত্যের পীঠস্থান। আপনাদের ওষ্ঠে দেবতা অধিষ্ঠিত। আপনাদের বাক্য প্রতিদিন কার্যে পরিণত করা হয়। তাই কূপ খননের আদেশ দিয়ে আপনারা যে আপনাদের প্রজাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন এ আর বেশী কি?

হতশেপসুত অতীব পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাপু-সেনেব-এর কথাগুলি আস্বাদন করে। পার্শ্বে উপবিষ্ট থুথমস একটু উসখুস করতে থাকে। সে জানে তাদের উভয়ের নাম উল্লিখিত হলেও প্রকৃতপক্ষে সম্রাজ্ঞীর প্রশংসা করে গেল এতক্ষণ ওপরের প্রধান অমাত্য। কিন্তু চুপ করে বসে থাকা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। তাছাড়া হতশেপসুত যেদিন থেকে তাকে তার শয্যাসঙ্গী হবার অধিকার দিয়েছে সেদিন থেকে সে তার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। কত সাধনা আর দেবতার আশীর্বাদে তার এই সৌভাগ্য হয়েছে। নইলে অমেনমেস আর উয়াচমেসের মত জ্বলজ্যান্ত দুই ভ্রাতা পর পর ওভাবে মৃত্যুবরণ করে? আসেত-এর ওপর তার প্রাণের টান আছে। অথচ হতশেপসুতের প্রতি তার প্রচণ্ড লোভ। তাই আসেত-এর সঙ্গে দেখা করে দিনের অন্য কোন সময়। তাতে আসেত-এর কোন আপত্তি নেই। সে প্রথম থেকেই জেনে নিয়েছে হতশেপসুত আর তার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।

তরুণ হাপু-সেনেব-এর স্তুতি শুনতে শুনতে হতশেপসুত অপর এক তরুণের কথা ভাবছিল। তার নাম সেন-মুত। তার সন্ধান বেশ কিছুদিন হল পেয়েছে। এখনো সাক্ষাৎ-পরিচয় হয় নি। ভালভাবে খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে ওই

তরুণ অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী। তার চিত্রশিল্প এবং ভাস্কর্য উভয়ই অতুলনীয়। সে ছটফট করছে একটা বৃহৎ কিছু সৃষ্টির তাড়নায়। সুযোগ পাচ্ছে না। সুযোগ পেতে হলে ফ্যারাও-এর আনুকূল্য প্রয়োজন। কোথায় পাবে সে অত লোক? আর সেই সব শ্রমিকদের শ্রমের বিনিময়ে যা দিতে হবে তারই বা সংস্থান কোথায়? হতশেপসুত ঠিক করে রেখেছে সেন-মুতকে সে ডাকবে মন্দির নির্মাণের সময়। সেন-মুতই হবে তার প্রধান স্থপতি। আগে ভেবেছিল তাকে একবার পরীক্ষা করবে। কিন্তু নানা ভাবে গোপনে খোঁজ নিয়ে জেনেছে পরীক্ষার কোন প্রয়োজন হবে না। তবে তাকে আহ্বান করার দিন এখনো আসে নি।

কিন্তু এই সবের মধ্যেও তাকে কৃষকদের কৃষিকাজের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কূপ যতপ্রয়োজনীয়ই হোক না কেন ফসল যদি না ফলে তাহলে দেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়। সে তাই কূপের প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে কৃষির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। সে জানতে চায় এ বছরে ফসলের অবস্থা কেমন।

একজন উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলে, আমাদের নদীর দেবতা হাপি আপনার প্রজাদের দুর্দশায় ফেলতে পারেন না। নীল নদ তার আরাধ্য দেবতা হাপির কল্যাণে এবারে সময়মত তার প্রবাহ ওপর থেকে এনে দুই কূলে বিছিয়ে দিয়েছে। ফসল এবারে চমৎকার।

হতশেপসুত জানে, কৃষকদের ক্ষতি দেবতারা সচরাচর করেন না। কারণ প্রতিটি কৃষক দেবতার অতি মাত্রায় বিশ্বাসী। তারা তাদের ফসল উঠলেই প্রথমে তাদের গৃহদেবতাকে উৎসর্গ করে। তারা এমন কোন কাজ করে না দেবতাদের যা অপছন্দ। যে পশুকে দেবতারা ভালবাসেন, তারা তার যত্ন নেয়। দেবতারা যাতে ক্রোধান্বিত না হন সেজন্য তারা তাঁদের নামে ভোজের আয়োজন করে। তাদের গৃহের সবচেয়ে পশ্চাতের কক্ষটিকে তারা তাদের দেবমন্দির রূপে ব্যবহার করে। সেখানে তাদের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে দেবতার প্রস্তর-নির্মিত বেদীর ওপর তাদের উপহার স্থাপন করে। প্রতিদিন নিয়মিত সেখানে বসে তাঁর স্তবগান করে। গৃহে যেখানে শস্যভাণ্ডার রয়েছে, কিংবা যেখানে রয়েছে মদ্য-নিষ্কাষণ যন্ত্র সেখানে ফসল উৎপাদন ও সংরক্ষণের দেবী রেনেনুতেত-এর মন্দির রয়েছে। সেখানে তারা সময়মত মদ্য ও পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে।

হতশেপসুত ভালভাবে জানে তাদের এই নিবেদনের মধ্যে কোন আড়ম্বর নেই, এর মধ্যে রয়েছে শুধু প্রাণের স্পর্শ। এ কথা তার নিজের উপলব্ধি করার ক্ষমতা হত না, যদি না আবানা-পুত্র তাকে অনেক আগে একদিন বুঝিয়ে দিতেন। কৃষকদের ঘরের কথা এখনো সে ভালভাবে জানে না। তবে তার পিতা যেমন ছিলেন, সেও তেমনি কৃষকদের কখনো অবহেলা করে না। তাদের সব সময় না বুঝলেও, তাদের প্রতি আচরণে কখনো রূঢ়তা প্রকাশ করে না। কারণ তারা দেশের বড়-সম্পদ। বাণিজ্যের প্রতি তার প্রবল আগ্রহ। এই বাণিজ্য এদের উৎপাদনের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। সুতরাং তারা তাদের প্রতি গৃহে ব্যক্তিগতভাবে অকৃত্রিম হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে বিলাসবিহীন যে আরাধনা করে

তার মূল্য আবশ্যই রয়েছে।

অথচ সামগ্রিক ভাবে দেশের ছবি তো তেমন নয়। এখানে সাধারণভাবে ধর্মকে পরিচালিত করছে ফ্যারাও-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি গোষ্ঠী। এখানে দেশের শাসকশ্রেণী এবং যাজকবর্গই শুধু মাত্র দেশের সমৃদ্ধির জন্য দায়ী, তারাই সর্বেসর্বা। সাধারণ মানুষ সেখানে শকটের পঞ্চম চক্র। শুধু ফ্যারাও এখানে মন্দির নির্মাণ করেন। তিনিই দেবতাকে সম্পদ প্রদান করেন। দেবতা সমীপে উৎসর্গীকৃত দীর্ঘ তালিকা রাজকীয় অর্ঘ্য বলে গণ্য হয়। ব্যাক্তিগত-ভাবে যা আসে তা খুবই গণ্য। তেমনি মন্দিরে একমাত্র ফ্যারাওই প্রতিনিধি। একমাত্র ফ্যারাও-এর জন্যই শুধু মন্দিরে প্রার্থনা করা হয়। ধার্মিক কোন পূজারীর উল্লেখমাত্র করা হয় না।

এত সব জেনেও হতশেপসুত এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা দেখে না। কারণ সে এবং ফ্যারওরা দেবতার অংশবিশেষ। তাদের মঙ্গলই দেশের মঙ্গল। প্রজারা জিনিস নিজের গৃহে যাই করুক না কেন সর্বজনসমক্ষে ফ্যারাও-এর প্রাধান্য অবশ্যই থাকবে। নইলে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। তাদের এর চেয়ে বেশী অগ্রসর হতে দিলে ধর্মকে অমান্য করা হবে। হিকসোসদের আমলের মত অরাজকতা শুরু হয়ে যাবে।

গর্ভে চবরোসের বীজ নড়াচড়া করে। যে মানুষটার ওপর কিছুমাত্র ভালবাসা নেই যার কথাবার্তা আর প্রতিটি আচরণ মনে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে, তারই সন্তান ধীরে ধীরে সবার অলক্ষ্যে বড় হয়ে উঠছে। ভাবতে অদ্ভুত লাগে হতশেপসুতের। এক একসময় মনে হয় তার, সে দেবী তা নয়-ই, মানবীও নয়। উয়াচমেসের মৃত্যুর আগে অবধি তার মনের মধ্যে প্রেমের যে উত্তাপ ছিল, যে রঙীন স্বপ্ন ছিল এখন তার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। এখন তার সারা হৃদয় জুড়ে বিরাজ করছে শুধু এক উত্তুঙ্গ উচ্চাশা। মিশরের ফ্যারাও সে। অথচ সে ভালভাবে জানে মিশরবাসীরা কোন নারীকে এখনো ফ্যারাও রূপে স্বীকার করতে পারে না মনে মনে। তারা বাইরে তাকে অস্বীকার করতে পারে না বটে, কিন্তু মনে মনে চবরোসকেই হোরাস বলে ভাবে। এতে হতশেপসুতের মনে সব সময় ঈর্ষার জ্বালা। তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার প্রধান বাধা তার স্বামী। তার অগ্রগতিতে ক্ষমতার উৎসমুখে বিরাট প্রস্তরখণ্ডের মত বসে রয়েছে ওই সৌখিন আর দুর্বলচিত্তের মানুষটি। তারই সহায়তায় আবার সে জননী হতে চলেছে। অথচ আশ্চর্য গর্ভের ভ্রূণটির প্রতি কোন আক্রোশ নেই। বরং মায়াই রয়েছে একটু। মায়ার চেয়েও যা তার মনকে বেশী করে অধিকার করে রেখেছে সেটি হল ওই ভ্রূণ শিশুরূপে জন্ম নিলে শিশুটি হবে তার ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার হাতিয়ার। সে পুত্র হলে তো কথাই নেই, কন্যা হলেও আসেত-এর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে নিজের ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা যাবে।

এক একসময় হতশেপসুতের মনে শঙ্কা জাগে শিশুটি দীর্ঘজীবী হবে তো? কত শিশুর অকালমৃত্যু ঘটে। অনেকে প্রসূতিআলয় থেকে বাইরে

আসারও অবকাশ পায় না। তেমন হলে, সেকথাও ভেবে রেখেছে হতশেপসুত। দুটি সন্তান ধারণ করবে সে। দুটির মধ্যে অন্তত একটি বেঁচে থাকবে ধরে নেওয়া যায়। তার মায়ের মত দুর্ভাগ্য কয়জনেরই বা হয়। দ্বিতীয় শিশুটি জন্মের পর সে দ্বিতীয় থুথমসকে তার শয্যা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আর কখনো তার কক্ষে প্রবেশ করতে দেবে না। ফ্যারাও-এর অবশ্য তাতে অসুবিধা নেই। আসেত-এর দ্বার তো সব সময়ই উন্মুক্ত। তাছাড়া হারেমে আরও অনেক সুন্দরী ললনা রয়েছে যারা তাদের সৌভাগ্যের দিন গুনছে। কিন্তু চবরোস আর যাই হোক তার পিতার মত নয়। পিতার হারেমে নারীর সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। তিনি প্রায় প্রতিদিনই সেখানে গিয়ে কাউকে না কাউকে কৃতার্থ করতেন। চবরোসের দেহমন সবই দুর্বল।

নেসামুন এসে বলে—আজ গোসলখানায় যাবেন ?

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয় হতশেপসুতের। সে বলে—হ্যাঁ যাব।

নেসামুন চলে যায়। হয়ত সব ব্যবস্থা করার জন্য। পুন্ত-এর সঙ্গে বাণিজ্য চালু হবার পর থেকে হতশেপসুতও অনেক সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে। চোখে ও মুখে ব্যবহারের অনেক দুর্লভ বস্তু তার ভাণ্ডারে। চবরোসের শয্যাসঙ্গিনী হবার পর থেকে তার স্নানের বাতিক বৃদ্ধি পেয়েছে। নেসামুনের মত বুদ্ধিমতী নারীর কাছে এটা সে গোপন রাখতে পারেনি। পারা সম্ভবও নয়।

একটু পরে নেসামুন ফিরে এসে বলে—এখন যাবেন ?

—হ্যাঁ। আচ্ছা আসেতকে দেখতে পাও ?

—রোজই দেখি।

—কোথায় ?

—প্রাসাদের অলিন্দে।

—ছেলেটাকে দেখ ?

—হ্যাঁ।

—কত বড় হয়েছে ?

—বেশ বড় হয়েছে।

—হাঁটতে পারে ?

—অনেক দিন থেকে হাঁটে। আপনার কাছে যখন আনা হয়েছিল তখনই হাঁটতে শিখেছিল। আপনি ভুলে গিয়েছেন। প্রায় বছর ঘুরতে চলল তো।

—তাই হবে।

প্রথমে কথা ছিল আসেত ছেলেটিকে এনে দেখিয়ে যাবে। তারপর হতশেপসুতই বলে দিয়েছিল, দেখতে চাইলে সে যেন দেখিয়ে নিয়ে যায়। তারপর সময় হয়ে ওঠেনি। সে মনে মনে জানে, ইচ্ছা করেই সে ছেলেটিকে দেখতে চায় নি। ছেলেটিকে দেখে দেখে তার মায়া হোক, স্নেহ জন্মাক এটা সে চায় নি। তার নিজের শিশুটি পুত্রসন্তান হলে এই শিশুটির মূল্য কানাকড়িও নয়।

নেসামুন জিজ্ঞাসা করে—আপনি তাকে দেখবেন ?

—না থাক।

—আপনার কন্যা হবে।

হতশেপসুত চমকে ওঠে। নেসামুন তার কাছে বহুদিন থেকে আছে বলে অনেক সহজভাবে কথা বলে। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা বজায় রেখেও সে অনেক ভাবে সহায়তা করে, পরামর্শ দেয়। কিন্তু এমন স্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করার দুঃসাহস কখনো দেখায় নি।

ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে—কি করে বুঝলে ?

—দেখলে বোঝা যায়।

—কোন চিকিৎসকও একথা বলতে সাহস পায় না।

—আমি অনেকের দেখে দেখে বুঝতে পারি। গড়ন দেখে বোঝা যায়।

—কিসের গড়ন ?

নেসামুন হতশেপসুতের স্ফীত স্থানটির ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলে—ওখানকার। তাছাড়া আপনার রূপ।

—রূপ ?

—কন্যাসন্তান হলে রূপ খোলে।

হতশেপসুত রীতিমত বিরক্ত হয়। কারণ সে আশাহত। সে বলে—যদি মিথ্যা হয় ?

—সত্যি হবেই এমন কোন কথা নেই। তবে আমার বিশ্বাস আমার কথা মিলে যাবে।

—কন্যাসন্তান না হলে শাস্তি পাবে।

—আপনার ইচ্ছা। আমার যা ধারণা হয়েছে আপনাকে বলেছি। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করেন বলেই বলতে সাহস হয়েছি। অন্য কেউ হলে মুখ বুজে থাকতাম। আপনি যে পুত্রসন্তান চান সেটা আমি বুঝতে পারি। তবু বলে ফেললাম।

হতশেপসুত আবার অবাক হয়। সে বলে—আমি পুত্রসন্তান চাই এ কথা কে বলল তোমাকে ?

—কেউ না। এটাও আমার ধারণা। তবু আমার বিশ্বাস এই ধারণা মিথ্যা হয়।

হতশেপসুত জানে সে দুই মিশরের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাকে সবাই যতটা ভক্তি করে ততটাই ভয় করে। সে শুধু একজন কেন নেসামুনের মত দশজন স্ত্রীলোককে টিপে মেরে ফেলতে পারে। অথচ আজ সে তার কথায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর নেসামুনের কথার গুরুত্ব লাঘব করার জন্য অবহেলা ভরে বলে—সব মায়েরাই পুত্রসন্তান চায়। নতুন কিছু নয়।

নেসামুন বলে—সাধারণ মানুষের মধ্যে, ছেলে হবে না মেয়ে হবে, সেকথা জানতে অন্য নিয়ম আছে। তারা সেই ভাবে দেখে।

কৌতূহল প্রকাশ করে হতশেপসুত বলে—কি নিয়ম ?

—গর্ভবতীর মূত্রের ভেতরে কিছু যব আর কিছু গমের বীজ ভিজিয়ে রাখতে হবে। যদি গমের বীজ অঙ্কুরিত হয় তাহলে বুঝতে হবে ছেলে হবে।

আর যবের বীজ অঙ্কুরিত হলে মেয়ে হবে।

—সত্যি হয় ?

—হয় কিনা জানি না। তবে সবাই বিশ্বাস করে বলে এইভাবে পরীক্ষা করা হয়।

হতশেপসুতের প্রবল ঈর্ষা হয়। কিন্তু সে ফ্যারাও এ কথা তো ভুলে গেলে চলবে না। তাই ইচ্ছাকে দমন করে।

নেসামুন বলে—নবজাতক বেঁচে থাকবে কি মরে যাবে সেটাও পরীক্ষা হয় জন্মের সঙ্গে সঙ্গে।

—তুমি অনেক কিছুই জান দেখছি। সেটা আবার কি ভাবে হয় ?

নেসামুন মনে মনে ভাবে, তুমি ফ্যারাও হতে পার, কিন্তু তবু তুমি নারী। এসবে তোমার আগ্রহ থাকতেই হবে। আমার কথাও তাই শুনতে হবে।

সে বলে—শিশু জন্মে যখন প্রথম চিৎকার করে ওঠে তখন সে যদি "নাই" বলে চেঁচায় তাহলে বেঁচে যাবে। আর সে যদি "মুরে" বলে চেঁচায় তাহলে বুঝতে হবে সেই শিশুর পরমায়ু বেশী দিনের নয়।

হতশেপসুত হতবাক হয়। সে ফ্যারাও-এর কন্যারূপে শুধু রাজ্যের অতীত ইতিহাস শুনেছে, দেবদেবীর কথা শুনেছে, রাজ্যশাসন প্রণালীর নানা বিষয়ে জ্ঞান আরোহণ করেছে। কিন্তু একেবারে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের কথা, তাদের সুখদুঃখের কথা কিছুই জানে না। নেসামুনের কথায় চিরকালের এক বন্ধ বাতায়ন আজ আচমকা খুলে গিয়েছে। সেই বাতায়ন পথে সে নতুন দৃশ্য দেখছে। সেই দৃশ্যের আকর্ষণ খুব প্রবল।

—আরও কিছু জান নিশ্চয়।

—জানার কি শেষ আছে দেবী। সাধারণ মানুষকে কত সব বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। তাদের অর্থ নেই, অনেক কিছুই নেই। জীবন তাদের দুঃখে ভরা।

—তোমার অনেক গুণ আছে নেসামুন। কিন্তু এত সব তুমি জান ভাবতে পারি নি।

—আমিও যে দরিদ্র ঘরের।

—বল দেখি আর কি জান।

—কথায় কথায় হকিমকে ডেকে আনতে পারে না সাধারণ মানুষ। তাই অনেক কিছু নিজেদেরই শিখে রাখতে হয়। মায়ের বুকের দুধের গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারে তারা সেই দুধ ভাল কি খারাপ। শিশু যদি আতরিক্ত কান্না-কাটি করে তার ব্যবস্থাও আছে। তাকে তখন শেপেন গাছের ফলের বীজ বেটে খাইয়ে দিলেই কান্না থেমে যাবে।

হতশেপসুতকে চুপ করে থাকতে দেখে নেসামুন বলে—এবারে গোসলখানায় যান। অনেক দেরি হয়ে গেল।

—হ্যাঁ।

একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় মিশরের সম্রাজ্ঞী। প্রথমে প্রাসাদে তারপর সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে এই সংবাদ। প্রাসাদে চিকিৎসকদের নিত্য আনাগোনা। তারা ঘনঘন শিশুকে পরীক্ষা করছে, শিশুর মাকেও পরীক্ষা করছে। ভীষণ গুরুদায়িত্ব তাদের। হতশেপসুতের প্রবল ব্যক্তিত্বের জন্য সেই দায়িত্বের সঙ্গে একটা অজানা আশঙ্কাও তাদের মনের মধ্যে ক্রিয়া করে। তবে সৌভাগ্য বলতে হবে প্রসূতি ও নবজাতিকা উভয়েই সুস্থ। কোন রকম জটিলতা দেখা দেয়নি প্রসবকালে কিংবা তার পরে।

হতশেপসুতের প্রসবালয়ে শুধু মাত্র চিকিৎসক এবং নিয়মিত অল্পসংখ্যক পরিচারিকার প্রবেশের সম্মতি রয়েছে। নেসামুনের সেখানে অবারিত দ্বার।

—নেসামুন।

নেসামুন চলে যাচ্ছিল। সম্রাজ্ঞীর ডাক শুনে ছুটে এসে বলে—ডাকছিলেন দেবী?

—হ্যাঁ। কোথায় যাচ্ছিলে?

—এখানে ধাত্রীরা রয়েছে। আমি থাকলে অসুবিধা হবে ভেবে চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু অন্য কোথাও গিয়েও স্বস্তি পাচ্ছি না।

—কে তোমাকে যেতে বলছে?

—কেউ বলেনি। কিন্তু এখানে আমার থাকা তো ঠিক নয়। আমি আপনার কোন কাজে লাগব না।

—তুমি কোন কাজে লাগবে কিনা সেটা আমি দেখব।

—আমি এখানে থাকব?

—হ্যাঁ। সব সময় থাকবে।

নেসামুনের আনন্দ হয়। শিশুর কান্না শুনতে তার খুব ভাল লাগে। স্তন মুখে দিলে এক অদ্ভুত শব্দ করে কান্না থেমে যায়। শৈশবের টুকরো টুকরো কয়েকটি ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বিগত জীবনের ছবি সেগুলি। বিগত জীবনের হলেও সেই সব ছবি হৃদয়ে একটি আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। সেই আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত রাখতে হবে সারা জীবন। তবু সম্রাজ্ঞীর নির্দেশ তাকে পুলকিত করে। বহুদিন সে শিশুর সান্নিধ্যে আসেনি। অথচ আজ বহুদিন পরে শিশুর গায়ের অতিপরিচিত এক বিশেষ গন্ধ তার নাকে এসে লাগে। সে জানে, এই গন্ধ সম্রাজ্ঞীর কন্যার নয়। কারণ প্রাসাদের কোন শিশুর গায়ে এই গন্ধ থাকতে পারে না। এ অতিসাধারণ পরিবারের শিশুর গায়ের স্বর্গীয় সুঘ্রাণ যা হৃদয়কে আমোদিত করে। প্রাসাদের শিশু এই সুঘ্রাণ কোথায় পাবে? এতে রয়েছে উগরে দেওয়া মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সাধারণ পরিচয়ের নবজাতকদের মাখানো তেলের মিশ্রিত গন্ধ। সেই সঙ্গে রয়েছে মাতৃজঠরের ঘ্রাণ। এই গন্ধ কোন্ সুদূর অতীত থেকে তার নাকে এসে লেগে তাকে আকুলিত করে। অবদমিত আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা তাকে কাতর করে।

হতশেপসুতের নির্দেশে সে প্রসবালয়ের পাশে তার থাকার জায়গা করে

নেয়। তিনজন ধাত্রীর একজন সব সময় সম্রাজ্ঞীর পাশে থাকে। অন্য দুইজন পালা করে বিশ্রাম নেয়।

একসময় হতশেপসুত নেসামুনকে ডাকে। সে গিয়ে দাঁড়ালে ধাত্রীকে একটু দূরে যেতে বলে সম্রাজ্ঞী।

—একটা কাজ করতে পারবে নেসামুন ?

—আপনার ইচ্ছাই আপনার আদেশ দেবী।

—এটা একটু অন্য ধরনের কাজ। তুমিই আমাকে বলেছিলে।

—বলুন।

—আমি একটি পাত্রে আমার বুকের দুধ গেলে দেব। তুমি কাউকে দিয়ে শুঁকিয়ে নিয়ে আমাকে বলবে আমার দুধ ভাল কি না।

নেসামুন একটু চিন্তিত হয়। কাকে দিয়ে পরীক্ষা করাবে সে ? প্রাসাদের বাইরে যদিও সে ইচ্ছামত যেতে পারে, কিন্তু সাধারণ পরিবারের সঙ্গে বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই তার। তবে কদিন চেষ্টা করলে সম্ভব হবে।

—আমাকে দুদিন সময় দিন। কিন্তু তার আগে এই তিনজন ধাইকে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয় ? এরা তো প্রাসাদের সমস্ত প্রসবই করায়। তাছাড়া বড় বড় রাজকর্মচারীদের বাড়ির প্রসবও এরাই করায়।

—ঠিক আছে। তুমি জিজ্ঞাসা কর। তবে সব কিছুর ভার তোমাকে নিতে হবে। আমি নিজে থেকে ওদের কিছু বলব না।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তিনজন ধাই-এর একজন নেসামুনকে বলে যে সে এভাবে শুঁকে বলে দিতে পারবে। নেসামুন তখন বলে, সম্রাজ্ঞীর স্তন্যদুগ্ধ পরীক্ষা করা যেতে পারে।

ধাই আঁতকে ওঠে। বলে—সর্বনাশ। কে তাঁকে বলবে, কত হকিম আসছেন। অহরহ দেখছেন তাঁকে। আমাদের সাধারণ ঘরের এইসব তুক্‌তাক্‌ কি উনি বিশ্বাস করবেন ?

—করবেন !

—কিন্তু ওঁকে বলার হিম্মত আমার নেই। আমার প্রাণের ভয় আছে।

—আমি বলব।

—বেশ। কিন্তু আপনার কিছু হলে আমাকে দায়ী করবেন না।

—আমার জন্য ভাবতে হবে না।

তখনি ধাইকে সঙ্গে নিয়ে সম্রাজ্ঞীর কাছে গিয়ে নেসামুন বলে—দেবী, আমার একটা আর্জি রয়েছে।

—বল।

—এই ধাই প্রসূতির বুকের দুধের গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারে সেই দুধ শিশুর পক্ষে ভাল কিনা।

হতশেপসুত ধাই-এর দিকে চেয়ে বলে—এ কি সত্যি কথা বলছে ?

সভয়ে ধাই বলে—আমাদের মত সাধারণ পরিবারে এই ভাবে পরীক্ষা করা হয় সম্রাজ্ঞী। এতে আমাদের বিশ্বাস আছে।

—ঠিক আছে। পরীক্ষা করেই দেখা যাক। কতটুকু দুধ দিতে হবে?

ধাই সাগ্রহে একটি পাত্র এগিয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে পরিমাণটুকু দেখিয়ে দেয়।

হতশেপসুত পেছন দিকে ফিরে কিছুক্ষণ চেষ্টার পর পাত্রে সেই পরিমাণ দুধ ধাই-এর হাতে দেয়।

ধাই পাত্রটি নিয়ে নাকের সামনে তুলে ধরে বার বার ঘ্রাণ নেয়। তার মুখে নিশ্চিন্তের হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে—আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আপনার স্তন্যদুগ্ধ উচ্চশ্রেণীর। শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপযোগী।

হতশেপসুতের আনন্দ হলেও সেই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে না।

আসেত এক সময় আসে হতশেপসুত জননী হওয়ায় তার আনন্দ প্রকাশ করতে।

হতশেপসুত প্রশ্ন করে—তোমার ছেলে কোথায়?

—ওকে রেখে এসেছি।

—ফ্যারাও কোথায়?

—তা তো জানি না।

—হারেমে গিয়েছেন হয়ত।

কথাটা হতশেপসুত বলতে চায়নি। হঠাৎ বলে ফেলল। কারণ কন্যার জন্মের পর একবারও আসেনি চবরোস। না এসে ভালই করেছে। ওর সন্তানের জননী হলেও এখনো ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না ওকে।

বেশীদিন নিজেকে আবদ্ধ করতে পারে না হতশেপসুত। আবদ্ধ থাকার একটাই অর্থ। অনেক কাজ জমে ওঠা। তার অনুমতির অপেক্ষায় কত কিছু বন্ধ হয়ে রয়েছে। সুতরাং কন্যাকে স্তন্যদুগ্ধ দেবার জন্য দুজন নারীকে খুঁজে আনা হল প্রাসাদে। তাদের দুজনাই শিশুর প্রসবের সময় মৃত্যু হয়েছে। হতশেপসুত নেসামুনকে বলে ওদের দুজনার দুধের ঘ্রাণ নিতে। সেই ধাত্রীই ঘ্রাণ নিল। একজন বাতিল হয়ে গেল। তখন আর একজনকে আনা হল অনেক দূর থেকে। তার শিশু নদী পারাপারের সময় জলে পড়ে মারা গিয়েছে। তার দুধ চমৎকার।

হতশেপসুত নিশ্চিন্ত হয়। তার নাম অনুযায়ী কন্যার নাম রাখা হয় হতশেপসেত। কন্য প্রায় তারই মত দেখতে হয়েছে। ভয় ছিল, চবরোসের মুখের সেই কঠিন রেখাটি বুঝি ফুটে উঠবে শিশুর মুখেও। কিন্তু না। সেই রেখার আভাস কিছুমাত্রও নেই। একেবারে স্বাভাবিক।

আজ এতদিন পরেও হতশেপসুতের মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমেনমেসের কথা। তার কথা মনে হলে বুকের ভেতরে এখনো মোচড় দেয়। এখন তার উচ্চাশা প্রায় পূর্ণ। সে এখন ফ্যারাও-এর পদটি সমান ভাবে ভাগ করে নিয়েছে। ভাগ্যে থাকলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফ্যারাও-ও হতে পারে। তবু অমেনমেসের কাছে নিজেকে খুবই ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। তার কথা মনে হলে

তারই মুখে শোনা এক চরিত্রের কথা মনে পড়ে যায়। সেই চরিত্রের নাম সি-ওসিরি। সি-ওসিরির সঙ্গে অমেনমেসের অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। গল্পটি হল কোন এক ফ্যারাও-এর পুত্র ও পুত্রবধূ সম্বন্ধে।

সেই ফ্যারাও-দম্পতির প্রথমে কোন সন্তান ছিল না। তাদের মন সন্তানের জন্য কাতর। তারপর একদিন স্ত্রী একটি যাদুফুল ভক্ষণ করে এবং সে গর্ভবতী হয়। সময় হলে তার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সন্তানের নাম রাখা হয় সি-ওসিরি অর্থাৎ ওসিরিসের পুত্র। শিশুটি অসাধারণ। তার মন পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ। সে সবার চেয়ে বিজ্ঞ। কোন কিছুই তার অজানা নয়।

যখন তার বয়স পাঁচ বৎসর তখন সে একদিন পিতার সঙ্গে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। সেই সময় দুটি শবযাত্রীর দল নজরে পড়ল। দলদুটি যাচ্ছিল মরুভূমির দিকে। প্রথম দলটি ছিল কোন বিত্তবান ব্যক্তির অন্তিম যাত্রার সঙ্গে। কারণ শেষ যাত্রার যাবতীয় আড়ম্বর সবাই ছিল সেখানে। অনেক পুরোহিত ছিল সেই দলে। অনেক ক্রন্দনরত রমণী কর্দমাক্ত অবস্থায় শোক প্রকাশ করছিল। সমাধিতে অর্পণের জন্য যে সমস্ত সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাও সংখ্যাতীত এবং রীতিমত মূল্যবান।

এই জাঁকজমকপূর্ণ দলটির পেছনে পেছনে আসছিল আর একটি শোকযাত্রার দল। দেখলেই বোঝা যায় তারা চলেছে এক অতি দরিদ্র ব্যক্তির মৃতদেহের সঙ্গে। সেই মৃতদেহের সঙ্গে তেমন লোকজন কেউ নেই বলতে গেলে। অন্তিম বিশ্রামাগারে দেবার মত কোন দানসামগ্রীও নেই সঙ্গে।

পিতা তার পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রকে বলে—আমার আকাঙ্ক্ষা ওই ধনী ব্যক্তির মত ভাগ্য যেন আমার হয়।

উত্তরে সি-ওসিরি বলে—তোমার জন্য আমি বিপরীতটাই আকাঙ্ক্ষা করি। আমি প্রার্থনা করি তোমার ভাগ্য যেন ওই দরিদ্র ব্যক্তির ভাগ্যের মত হয়।

কথাটা শুনে পিতা আহত হয়। তাই দেখে সি-ওসিরি বলে—দুঃখ করছ। চলো তবে, নিজেই গিয়ে দেখে আসবে।

তারা দুজনে তখন প্রথমে পশ্চিমের মরুভূমির সমাধিস্থানের নিকটে যায়। তারপর সেখান থেকে গিয়ে উপস্থিত হয় একেবারে পরলোকে। সেখানে দেখা গেল বিশালাকার সব প্রকোষ্ঠ। সেই সব প্রকোষ্ঠে অদ্ভুত রকমের সব দৃশ্যাবলী। তারা যেতে যেতে দেখল, একটি প্রকোষ্ঠে একজন মানুষের কান্না আর আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে। লোকটি একটি দরজার গোড়ায় পড়ে রয়েছে আর দরজার নীচের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ যা দরজাটিকে ঘোরায়, সেটি তার ডান চোখের ভেতরে ঘুরছে। সেই দরজা অতিক্রম করে তারা গিয়ে পৌঁছোল অপর একটি কক্ষে। সেখানে স্বয়ং দেবতা ওসিরিস বসে রয়েছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে একজন রয়েছেন যাঁর প্রতি সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। তিনি অতি মূল্যবান পোশাক পরিধান করে রয়েছেন। প্রতিটি ব্যক্তি তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। ওসিরিসের সম্মুখে রয়েছে একটি বিরাটাকার ওজন করার মানদণ্ড। সি-ওসিরি পিতাকে বুঝিয়ে বলে, যারা মৃত্যুর

পর আসে তাদের বিচার হয় এখানে। পৃথিবীতে তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম এখানে দুই পাল্লার ওপর রাখা হয়। একদিকে রাখা হয় ভাল কাজগুলো, অন্যদিকে খারাপ কাজগুলো। যদি খারাপ কাজের পাল্লা ভারী হয়ে নীচের দিকে নেমে যায় তাহলে মৃত ব্যক্তি শাস্তি পাবে। আর যদি ভাল কাজের পাল্লা বেশী ভারী হয় তাহলে সে পুরস্কৃত হয়। জাঁকজমকের সঙ্গে যে ধনী ব্যক্তিটির শবদেহ বহন করে আনা হয়েছিল পশ্চিমের মরুভূমিতে সে এখন দরজার ওখানে পড়ে অসহনীয় যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার ডান চোখের ভেতরে দরজার নীচের অংশ ক্রমাগত ঘুরে চলেছে। অথচ ধনী হয়ে তার ভাল কাজ করার সুযোগ ছিল অনেক বেশী। অথচ দরিদ্র ব্যক্তিটি যখনই সামান্য সুযোগ পেয়েছে, ভাল কাজ করেছে। তাই আজ সে অমন সুন্দর পোশাক পরে ওসিরিসের পাশে বসে সবার শ্রদ্ধেয় হয়েছে।

পুত্র পিতাকে সব দেখিয়ে বলে—এই জন্যই আমি চেয়েছিলাম, তোমার ভাগ্য ধনী ব্যক্তিটির মত না হয়ে দরিদ্র ব্যক্তির মত হোক।

যেদিন অমেনমেস এই গল্পটি বলেছিল, সেদিন উয়াচমেসও শুনছিল। গল্প শেষ হলে সে বলেছিল—আমাকে যদি কেউ অমন ঘুরিয়ে আনতে পারত।

অমেনমেস হঠাৎ বলে উঠেছিল—দুঃখ করো না, তোমার সেই সুযোগ আসবে।

—আমি ঘুরে আসতে পারব ?

হতশেপসুতের অবাক লেগেছিল কথাটা শুনে। সেও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কনিষ্ঠ ভ্রাতার দিকে।

অমেনমেস কোনরকমে বলে—সবাই তো একসময় না একসময়ে ওখানে যাবেই। এই কথাটা বুঝলে না ?

আজ এতদিন পরে হতশেপসুত বুঝতে পারে অমেনমেস উয়াচমেসের ভবিতব্য তখনই টের পেয়েছিল। তার মুখে সেদিন একটা বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছিল। সেদিন হতশেপসুত বুঝতে পারেনি। আজ চিন্তা করলে তার বিষণ্ণ মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কন্যা হতশেপসেত-এর সঙ্গে অমেনমেসের মুখের কোথায় যেন সাদৃশ্য রয়েছে। জন্মের দিনেই দেখতে পেয়েছিল সে। কন্যা এখন ধাত্রীর কাছে। অধিকাংশ সময় তাদের কাছেই থাকে। তবে মাঝে মাঝে সে বললে তার কাছে এনে দেওয়া হয়। হকিম বলেছে, দিনের শেষে অন্তত দুতিনবার নিজের স্তন্য-দুগ্ধ দেওয়া ভাল শিশুকে। নাহলে তার বুকের দুধ জমে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যেতে পারে। ব্যথা হতে পারে। হতশেপসুত জানে তার দুধ শক্ত হবে না জমে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে বুক ভাসিয়ে দেয়। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু তার সর্বক্ষণ অস্বস্তি হয়। রাজকার্য পরিচালনা করতে করতে অনেক সময় অবিরল ধারায় চুইয়ে পড়ে নীচের দিকে। মনে হয়, নীলনদ যেন উৎসমুখ থেকে নির্গত হয়ে নীচে মেমফিসের দিকে ছুটে চলেছে। এত দুধও থাকে নারীর বুকে। অথচ শিশুকে যখন তার কাছে এনে দেওয়া হয়, সে যখন নির্জন কক্ষে শিশুর

মুখে স্তন্যবৃন্ত দেয়, শিশু সেই বৃন্ত মুহূর্তের জন্য ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে বের করে দেয় পরের মুহূর্তে। তার উদর সব সময় পরিপূর্ণ থাকে ধাত্রীর দৌলতে।

চবরোস একদিন মাত্র এসে শিশুকন্যাকে দেখে গিয়েছে। নিয়মরক্ষা করে গিয়েছে মাত্র। ভালই হয়েছে। সে ঘন ঘন এলে অসুবিধা হত। তবে তাকে আর মাত্র একবার প্রয়োজন হবে। পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোন পুত্রসন্তান সে দিতে পারে কিনা। পুত্র হলে আসেতকে আর হাতে রাখার প্রয়োজন হবে না। ওর পুত্রটি সম্বন্ধেও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে হবে না। নিজের পুত্রের সঙ্গে কন্যা হতশেপসেতের বিবাহ দিয়ে ফ্যারাও-এর পদটি পাকাপাকি করে রাখা যাবে নিজের কব্জায়।

নেসামুনকে ডাকে হতশেপসুত। সে কাছে এলে কোলের কন্যাকে দেখিয়ে বলে—এভাবে একে আমার কাছে এনে কি লাভ ?

নেসামুন ব্যস্ত হয়ে বলে—কেন দেবী ?

—এর কোন খিদে থাকে না। আমি কি করে খাওয়াব ?

নেসামুন কি বলবে ভেবে পায় না।

হতশেপসুত এখন বলে—আমার কাছে যেন না খাইয়ে আনা হয়।

নেসামুন শিশুকন্যাকে সম্রাজ্ঞীর কোল থেকে সযত্নে তুলে নিয়ে ঘাড় হেলিয়ে বলে—আচ্ছা।

হতশেপসুত পোশাক পরিবর্তন করে সভাকক্ষের দিকে রওনা হয়। আজ পুন্ত দেশের চেয়েও আরও পূর্বের এক দেশ থেকে একদল বণিক তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তাদের দেশেও রয়েছে সুগন্ধি কাষ্ঠ, রয়েছে চিতাবাঘ, নানা রকমের মশলা। বহুদূরে সেই দেশ। সেই দেশের অনেক অংশ ঘন অরণ্যে আবৃত। মরুভূমি সেখানে নেই বললেই হয়। বছরের অর্ধেক সময় সেখানে বৃষ্টি হয়। এক বিচিত্র দেশ সেটি। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুললে যথেষ্ট লাভ। হাপু-সেনেব তাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে খুঁটিনাটি সব জেনে তাকে বলেছে। হাপুর ওপর বিরাট আস্থা তার। এত অল্প বয়সে এতটা পরিণত বুদ্ধি সচরাচর দেখা যায় না।

অলিন্দে ফ্যারাও দ্বিতীয় থুথমসের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। চবরোস একটু থতমত খায় তাকে দেখে। হতশেপসুত হেসে জিজ্ঞাসা করে—মিসাফ্রিসের খবর কি ?

—মিসাফ্রিস ? সে আবার কে ?

—চেনো না ?

—সত্যিই চিনি না।

—আসেত-এর সঙ্গে কতোদিন দেখা হয়নি।

একটু ইতস্তত করে চবরোস বলে—তা অনেকদিন হল।

হতশেপসুতের খবর আছে গতরাতেই ফ্যারাও আসেত-এর কক্ষে কাটিয়েছে, একটু হেসে বলে—তাই নাকি। তাহলে পুন্ত-এর সুগন্ধি মেখে কালো রঙের

কামিজ পরে কাল রাতে কার কক্ষে ঢুকেছিলে ?

চবরোস বোকা হয়ে যায়। তাকায় সে, সহজ হবার জন্য হেসে উঠে বলে—ধরে ফেলেছ দেখছি। হ্যাঁ, কাল ওর কাছে ছিলাম।

—এই কথাটা চেপে যাওয়ার কোন দরকার ছিল না।

—না। ভাবলাম তুমি রাগ করবে বুঝি।

—তাহলে হারেমে অন্যান্য নারীদের সংস্পর্শে রোজ আসছ, তাতেও রাগ করতাম।

—ওদের কথা আলাদা।

—আমার কাছে সবাই সমান। তুমিও।

—আমিও ? আমিও কি ?

—কিছু না। মিসাফ্রিসকে সত্যিই চেন না।

—না।

—তোমার পুত্র।

—ও।

হতশেপসুত বুঝল পুত্র সম্বন্ধে সে একেবারে অনাগ্রহী। এক দিক দিয়ে ভালই।

ওরা দুজনা একসঙ্গে সভাকক্ষে প্রবেশ করে।

মায়ের মত রূপচর্চার দিকে বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও নিজের স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য সম্বন্ধে আদৌ অনাসক্ত নয় হতশেপসুত। মায়ের কাছে রূপচর্চা ছিল নেশার মত। তাতে তিনি চিকিৎসকদের পরামর্শ বড় একটা নিতেন না। তবে কোন দ্রব্য বেশী ব্যবহারের জন্য ত্বক অথবা চোখের কোণে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে হকিমকে ডেকে পাঠাতেন। কিন্তু সে সব সময় হাকিমের অভিমত নিয়েই রূপচর্চা করে থাকে। সে জানে হকিমরা শুধু অসুখ-বিসুখের নিরাময়ের জন্য নয়, তারা রূপচর্চা বা গৃহকে দূষণমুক্ত করতেও পরামর্শ দিতে পারে। তারা সবাই সবজান্তা নয়। কিন্তু সবাই কোন না কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তাই নিজের কেশদামকে উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় করে তুলতে কোন দ্রব্য ব্যবহার করবে, কোন জিনিস মুখের প্রলেপের জন্য নিরাপদ, সব কিছুতেই চিকিৎসকের মতামত জেনে নেয়। কোন তেল গায়ে মাখলে ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখাবে তাও হকিম বলে দেয় তাকে। কতটা পরিমাণ কতক্ষণ ধরে ব্যবহার করতে হবে সেকথাও বিস্তারিতভাবে জেনে নেয় সে। বাহুদ্বয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও হকিমের প্রয়োজন হয় তার। তবে মায়ের মত বাড়াবাড়ি করে না কখনো। প্রতিদিনের অন্যান্য রাজকার্যের মত, প্রতিদিনের আহার বা স্নানের মত এটাও নৈমিত্তিক।

একজন হকিম এসে প্রতিদিন প্রাসাদকে দূষণমুক্ত করে। সে চুনের জল ছিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। বিষাক্ত মাছির কামড় থেকে প্রাসাদবাসীকে রক্ষা করার জন্য কাঠঠোকরার চর্বি ব্যবহার করে। অন্যান্য কীটপতঙ্গ যাতে দংশন

না করে সেজন্য খেজুর গাছের রস দিয়ে তৈরী টাটকা মদ ব্যবহার করে। প্রাসাদ প্রাঙ্গণ এবং উদ্যানে মাঝে মাঝে গর্ত দেখা যায়। সাপের আশঙ্কা থাকে। সাপ যাতে গহ্বর থেকে বাইরে বের হতে সাহসী না হয় সেজন্য গর্তের মুখের কাছে শুঁটকি মাছ ফেলে রেখে দেয়। ইঁদুরের উৎপাত থেকে বাঁচার ব্যবস্থাও হকিম করে। যেখানে ইঁদুরের উৎপাত বেশী সেখানে বেড়ালের চর্বি ফেলে রাখা হয়। ইঁদুর ভাবে আশেপাশে কোথায় বেড়াল রয়েছে। আস্তানা থেকে বাইরে আসতে পারে না। শস্যভাণ্ডারে যাতে ইঁদুরের উৎপাত না হয় তার ব্যবস্থাও হকিম করে। হরিণের মল সংগ্রহ করে শস্যভাণ্ডারের কোন স্থানে সেগুলো আগুনে পোড়াতে হয়। তারপর ভাণ্ডারের প্রতিটি দেওয়াল জল দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা হয়।

রোগ নিরাময়ের জন্য কুকুরের মল ও মাছের কাঁটাও অনেকক্ষেত্রে ব্যবহার করে হকিম। আর ডাইনিবিদ্যার প্রভাবে রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে ভাল করতে প্রয়োজন হয় একটিমাত্র বড় দেখে গুবড়ে পোকা। প্রথমে তার মাথা কেটে এবং পাখা ছিঁড়ে, মাথা ও পাখা একপাশে রেখে দিতে হবে। তারপর বাকী দেহটুকু জলে সেদ্ধ করে তেলের মধ্যে রাখতে হবে। তারপর তার মাথা ও পাখা সেদ্ধ করে সাপের চর্বিতে ফুটিয়ে নিয়ে দুটি একত্রে রোগীকে সেবন করতে দিতে হবে, ডাইনীর প্রভাব কেটে যাবে।

কন্যা হতশেপসেত বড় হয়ে উঠছে। মাঝে কয়েকদিন আসেত চেষ্টা করেছিল হতশেপসেত-এর সঙ্গে তার পুত্র যেন নিয়মিত খেলা করে। হতশেপসেত খুব একটা আগ্রহ দেখায় নি। ভবিষ্যতে কি হবে তা অবশ্য বলা যায় না। তবে এত তাড়াতাড়ি দুজনার মধ্যে খেলাধুলার ছলেও মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়া তার পছন্দ নয়। বলা যায় না, এই বয়সেই মনের মধ্যে ছাপ পড়ে যেতে পারে। তাছাড়া তার কন্যাকে এখন থেকেই সচেতন করে দিতে হবে যে তার ধমনীতে যে শোণিত প্রবাহিত সেই শোণিতের জাত আলাদা। মিসাক্সিসের শোণিত ততটা খাঁটি নয়।

কিন্তু সে লক্ষ্য করে একা একা থেকে তার কন্যা মনমরা হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। তাকে আনন্দ দেবার জন্য নিজেই একদিন তাকে নিয়ে বের হল। নগরী ছাড়িয়ে চলে গেল বহু দূরে নদীর তীরে, যেখানে কৃষকেরা কৃষিকাজে ব্যস্ত। এবারে নদীর জল কূল ছাপিয়ে অনেক ভেতরে চলে গিয়েছিল। সেই জল কয়েক-দিন হল সরে গিয়েছে। তাই কৃষকেরা এখন ভূমিকর্ষণে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। কারণ অল্প সময়ের মধ্যে তাদের চাষের কাজ সম্পূর্ণ করে বীজ বপন করে ফেলতে হবে জমির জল শুকিয়ে যাবার আগেই। তারা ভারী লাঙলের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছে। হালকা লাঙল টানছে বলদের পরিবর্তে মানুষ। কোথাও কোথাও বীজ বপনের কাজও চলছে। সদ্য কর্ষিত ভূমির ওপর বীজ ছড়িয়ে দিয়ে অনেকগুলো সারিবদ্ধ ভেড়াকে জমির একদিক থেকে আর একদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যাতে বীজগুলো সমানভাবে মাটির অল্প ভেতরে

প্রবিষ্ট হয়।

হতশেপসুত লক্ষ্য করে কৃষকদের মধ্যে বাড়াতি উদ্যম। কারণ নদীতে জল বেশী আসায় এবারে প্রচুর ফসল ফলবে। গতবছর জল বেশী আসেনি বলে প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা হয়েছিল দেশে।

তার শকট দেখে কৃষকেরা প্রথমে বুঝতে পারেনি। কিন্তু সঙ্গে দেহরক্ষীদের দেখে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সবার লাঙল থেমে যায়। সম্রাজ্ঞী হয়ে হতশেপসুত এটা চায় না। সে তাড়াতাড়ি ওদের কাছে লোক পাঠিয়ে নির্দেশ পাঠায় কাজ চালিয়ে যেতে। লাঙল আবার চলতে শুরু করে। শকটের পেছনে পেছনে এত দেহরক্ষী এলে সবাই জেনে যায়। এভাবে শিশুকন্যাকে বেড়াতে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। প্রতিদিন তাকে আনবেই বা কি করে? তাছাড়া কন্যা খেলা করতে চায়। কৃষিকাজের প্রতি তার মায়ের আগ্রহ থাকতে পারে, তার নয়। নিসর্গের শোভাও সে দেখতে চায় না। হতশেপসুত বুঝতে পারে আসেত-এর পুত্রের সঙ্গে খেলতে দেওয়াই কন্যাকে আনন্দে রাখার সবচেয়ে সহজ পন্থা।

প্রাসাদে ফিরে সে আসেতকে ডেকে পাঠায়। আসেত এসে দাঁড়ালে প্রশ্ন করে—তোমার ছেলে কোথায়?

—ঘরে আছে।

—সব সময় তোমার কাছে থাকে নাকি?

—অধিকাংশ সময়।

—কেন? ওকে পরিচারিকাদের কাছে রাখ না?

—রাখি। তবে সব সময় নয়। সব সময় ওদের কাছে থাকতে ভালবাসে না। আমাকেই বেশী চায়।

—তোমার ভাল লাগে?

—খুব ভাল লাগে। আপনার জীবন কর্মব্যস্ত। আমার অলস জীবন। ও কাছে থাকে তাই সময় কাটে।

—ওর তো প্রায় ছয় বছর বয়স হল, তাই না?

—হ্যাঁ।

—ওর জন্য শিক্ষক ঠিক করেছ?

—এত তাড়াতাড়ি?

—তাড়াতাড়ি কোথায়? শিক্ষার আগে পরে আছে নাকি? ওই বয়সে আমার শিক্ষক ছিলেন।

—আমি কালই খোঁজ নেব।

—আর ওকে মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে হতশেপসেতের কাছে পাঠিয়ে দিও।

আসেত একটু বিস্মিত হয়। তার ধারণা হয়েছিল নিজের কন্যাকে সম্রাজ্ঞী সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রাখতে চান। ধারণাটা সঠিক নয়।

সে বলে—আচ্ছা।

হতশেপসুত আর কোন কথা খুঁজে পায় না। সে জানে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কথার পর কথা বলে যেতে পারে। দুটি মেয়ে একসঙ্গে হলে তাদের কথা শেষ হতে চায় না। সেই সব কথার মাথামুণ্ডু নেই, গুরুত্ব তো আদৌ নেই। তবু সময় কাটে। হতশেপসুতের এই নারীসুলভ অভ্যাসটি একেবারে নেই। তার মায়েরও ছিল না। সে না হয় প্রশাসন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার মা একাই থাকতেন প্রাসাদে। গল্প করার পরিবর্তে রূপচর্চার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। সেইভাবেই সময় কাটিয়ে দিতেন। তাঁর মধ্যে বোধহয় একটা অহমিকা ছিল যে তিনিই তাঁর পিতা অমেনহোটেপের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। তাঁকে বিবাহ করেই তাঁর স্বামী ফ্যারাও হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। হতশেপসুত ভাবে, এই অহমিকাবোধ যে তার মধ্যেও রয়েছে সেই বিষয়ে সে যথেষ্ট সচেতন। তারই প্রভাবে আজও দ্বিতীয় থুথমসের দিকে সে অনেক উঁচু থেকে দৃষ্টি ফেলে।

আসেত আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ হয়ে গেল দুজনার মধ্যে কোন কথা হয় নি। সম্রাজ্ঞী অনুমতি না দিলে আসেত যেতেও পারে না। অথচ অনুমতি দেবার কথা ভুলে বসে আছে সম্রাজ্ঞী।

শেষে বলে—তুমি বাইরে বেড়াতে যাও না ?

—খুব কম।

—যেতে পার মাঝে মাঝে। আমার মেয়েকেও সঙ্গে দিতে পারি।

একটু আনন্দ প্রকাশ করে আসেত বলে—তাহলে তো ভালই হয়।

—আমি ব্যবস্থা করে দিতে বলে দেব।

আসেত কক্ষ ত্যাগ করে।

হতশেপসুত হৃষ্টমনে একটা গোটানো প্যাপাইরাস নিয়ে পড়তে বসে। কিন্তু পড়ায় মন বসে না তার। উয়াচমেস যখন বেঁচে ছিল তখন প্রেমের কবিতা পড়তে খুব ভাল লাগত। একটা রোমাঞ্চ অনুভব করত তখন। কবিতার কথা আর ছন্দের মধ্যে উয়াচমেসের প্রেমের উষ্ণতা অনুভব করত। তারপর সেই ভয়ংকর দিনের পর থেকে তার হৃদয় শূন্য হয়ে গিয়েছে। এতটুকু প্রেমও নেই সেখানে। প্রেমের কবিতা পড়লে আগে কেন যেন কান্না পেত। এখন পড়তেই ইচ্ছা করে না। তখন কবিতার কথাগুলো মনের মধ্যে গুঞ্জন তুলত। সেই কথা উয়াচমেসের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ কথোপকথনে কতবার ব্যবহার করেছে। এখন সেকথা ভাবলে দীর্ঘশ্বাস পড়ে শুধু।

তাই বলে কবিতা পাঠ সে ছেড়ে দেয়নি। মাঝে মাঝে পড়ে। অনেক ধরনের কবিতাই তো রয়েছে। দেবদেবীকে নিয়ে লেখা অনেক সুন্দর সুন্দর রচনাও রয়েছে। পড়তে খুব ভাল লাগে। আর রয়েছে নাটক। দেবতা হোরাস আর সেথকে নিয়ে লেখা অধিকাংশ নাটক। কী রোমাঞ্চকর। এই নাটক প্রতি বছর মেচির মাসের একুশ তারিখে এডফু-র মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। থীবস থেকে দূরে হলেও সুযোগ পেলে সেই দিনটিতে সেখানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করে সে। নাটকগুলিতে কোথাও হোরাসের পিতৃহন্তা সেথকে দেখানো হয় জলহস্তীরূপে,

কোথাও বা শূকর রূপে। ওসিরিসের হত্যাকারীকে অধিকাংশ মিশরবাসী ক্ষমা করতে পারে না।

প্যাপাইরাস পড়তে পড়তে একসময় কিছুতেই আর মন বসে না। গুটিয়ে পাশে সরিয়ে রাখে। আসেত-এর মুখখানা ভেসে ওঠে। সুন্দর না হলেও সেই মুখের একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ওই বৈশিষ্ট্যই বোধহয় পুরুষকে আকৃষ্ট করে। একটা শান্তশ্রী, দেখলেই বোঝা যায় তার ভেতরে কোন যন্ত্রণা নেই। চবরোস তাকে কতটুকু দিয়েছে আর কতটা বঞ্চিত করেছে এ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। যতটুকু পেয়েছে তাতেই সে সন্তুষ্ট, তাতেই সে পরিপূর্ণ। সেইজন্য বোধহয় তার সন্তান দেখতে অমন সুন্দর হয়েছে। মায়ের মনের ছাপ সন্তানের ওপর পড়ে বৈকি। আসেতকে দেখলে মনে হয়, আজ যদি তাকে বলা হয় প্রাসাদে তার আর স্থান হবে না, সে বিনা বাক্যব্যয়ে চলে যাবে। শুধু সন্তানটিকে চেয়ে নেবে। পুত্রকে নিয়ে সে পরিপূর্ণ। এখন হয়ত তার স্বামীকেও প্রয়োজন নেই। কোন দাবী নেই তার। ভোগবিলাস এসব বোধহয় তার কাছে বাহুল্য। উচ্চাশা কাকে বলে সে বোধহয় জানেই না।

চিন্তা করতে করতে হতশেপসুতের মনে কেন যেন ঈর্ষার উদ্রেক হয়।

মেয়ের বয়স দুবছর হয়ে গিয়েছে। চবরোসকে তার আর একবার প্রয়োজন। একটি মাত্র সন্তান কখনো যথেষ্ট হতে পারে না। যে কোন মুহূর্তে কিছু ঘটে যেতে পারে। দুটি সন্তানও যে অনেক সময় যথেষ্ট নয়, তার দুই ভাই-এর মৃত্যু তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর একটি সন্তান তার চাই এবং সেই সন্তান পুত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যদি পুত্র না হয় বুঝতে হবে ভাগ্য খারাপ। তখন আসেত-এর পুত্র হবে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। তাকে দেখতে সুন্দর হয়েছে। তার প্রতি আপাতত কোন বিদ্বেষভাব জাগে না। তবে নিজের পুত্রসন্তান হলে কী হবে বলা যায় না।

চবরোস আজকাল কদাচিৎ আসে। যখন আসে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে আসে। অথচ দিনের বেলায় সে হারেমের রমণীদের মধ্যে নাকি খুবই তৎপর। নেসামুন এই খবর এনে দিয়েছে। পিতার আমলে যে সব নারী সবে কৈশোর অতিক্রম করেছিল এখন তারা পূর্ণযৌবনা। তাদের মধ্যে অধিকাংশই সুন্দরী ললনা। চবরোসকে লাভের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা যা অনেক সময় চাপা থাকে না। কারণ পিতার মত ব্যক্তিত্ব চবরোসের নেই। সে প্রায়শই সুন্দরীদের ছলাকলা আর মিষ্টি কথায় মোহগ্রস্ত হয়ে বেফাঁশ কথা বলে ফেলে।

রাতে আসেত-এর কক্ষেও সে স্বচ্ছন্দ। আসেত-এর পরিচারিকার সঙ্গে নেসামুন ভাব জমিয়েছে। তার কাছ থেকে কথা বের করে নিয়েছে। যত সঙ্কোচ হতশেপসুতের বেলায়। মনে মনে বেশ একটা কর্তৃত্বের আমেজ উপভোগ করে সে। তবে এবারে আবার সঙ্কোচ ভাঙাবার পালা। তার জন্য অনেক অভিনয় করতে হবে। এমন ভাব দেখাতে হবে যেন চবরোস ছাড়া পৃথিবীতে তার আর দ্বিতীয় কেউ নেই। সম্রাজ্ঞী হয়েও চবরোস ছাড়া সে একান্ত অসহায়।

ভাবেভঙ্গিতে কথায় আচরণে এই সবই প্রকাশ করতে হবে তাকে। তার ওপর রয়েছে নিজের সৌন্দর্যের ডালি তুলে ধরা। শাসনকার্যের খাতিরে পাশাপাশি বসলেও পরস্পরের প্রতি অত নজর দেবার সময় থাকে না। কিন্তু নিশুতি রাতে নিভৃত কক্ষে স্বল্প আলোয় একটাই শয্যায় শয়ন করে, সুগন্ধে আমোদিত পরিচ্ছদ পরিধান করে। হকিম দ্বারা নির্বাচিত কস্তুরী তৈল ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা মুখের শোভা বৃদ্ধি করে রূপের পসরা সাজিয়ে বসা অন্য জিনিস! তখন চবরোসের সঙ্কোচ সহজেই কেটে যাবে। আগের বারেও কেটে যেতে দেখেছে হতশেপসুত। তখন চবরোসের খেয়াল থাকে না যে এই নারী স্বয়ং হতশেপসুত। তখন সম্রাজ্ঞীকে মনে হতে থাকে হারেমের অন্যান্য নারীদের মত আর একজন দেহসর্বস্ব রমণী মাত্র।

এবারেও দ্বিতীয় সন্তানের জন্য সেই পর্যায়ে পৌঁছোতে হবে। তাই একদিন তাকে নিয়ে বেড়াতে বের হয় সূর্যোদয়ের পূর্বেই। এভাবে সারাদিন তার কাছাকাছি থাকলে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। ফ্যারাও সহজ হবে। প্রথমে ভেবেছিল কর্ণক, লুক্সর হয়ে এডফুর পথে যতদূর যাওয়া যায় তাই যাবে। পরে ভাবে, না একদিনে অতটা যাওয়া সম্ভব নয়। তার চেয়ে দার-এল-বাহরি কিংবা কোপটাস বা ডেনডেরার দিকে যাওয়াই ভাল। দুইটি স্থানই দুই বিশেষ দেবদেবীর আবাসস্থল। পবিত্র ভূমি। কোপটাসে রয়েছে দেবতা মীন-এর মন্দির। মীন হচ্ছেন বংশবৃদ্ধির দেবতা। দেশের দুই অংশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় তাঁরই আশীর্বাদে। তাই তাঁর সম্মানে কোপটাসে অনুষ্ঠিত হয় নানা উপাসনা। তাঁর চেহারা খুবই মেদবহুল এবং পুরুষঙ্গটি বৃহদাকার। তিনি খুবই আমুদে এবং কৌতুকপ্রিয়।

ডেনডেরায় রয়েছে দেবী হথোরের মন্দির। সব দেবীর মধ্যেও তিনি স্বমহিমায় ভাস্বর। তিনি স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতালের অধীশ্বরী। তিনি জ্ঞানবতী এবং মৃদু স্বভাবের। জীবিত এবং মৃত সবাই তাঁর সাহায্য পায়। সন্তান প্রসবের পূর্বে এবং পরে তিনিই সন্তানবতীকে রক্ষা করেন। সুন্দরী মেয়েরা তাঁর অতি প্রিয়।

তবু সে আজ এই সব স্থানে না গিয়ে নীল নদের পশ্চিমে দার-এল-বাহরিতে যাওয়া ঠিক করল। পিতার সঙ্গে শৈশবে একদিন সে সেখানে গিয়েছিল। তখনই স্থানটি তাকে প্রথম আকৃষ্ট করে। তারপর সে তিনবার সেখানে গিয়েছে। রাজধানী থেকে বেশী দূরেও না। প্রতিবারই তার সেখানে গিয়ে আরও বেশী ভাল লেগেছে। অথচ সেখানে দর্শনীয়বস্তু বলতে তেমন কিছুই নেই। রয়েছে শুধু পুরাকালের ভগ্ন দেবালয়, যা অব্যবহার্য অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। হতশেপসুত কল্পনায় দেখত, এই স্থানে নির্মিত হবে একটি অত্যাশ্চর্য মন্দির যা আকারে হবে বৃহৎ, যার সৌন্দর্য হবে মনোমুগ্ধকর। মনে মনে সে তখনই সংকল্প করে, ফ্যারাও হলে তার কল্পনার বাস্তব রূপ দেবে। তরুণ মুখ্যামাত্য হাপু-সেনেবকে সে ইতিমধ্যেই তার অভীপ্সার কথা জানিয়েছে। হাপু তাকে উৎসাহিত করেছে। ভাস্করের কথা উঠলে সে সেন-মুত সম্বন্ধে

বলে। বলেছে, যখনই প্রয়োজন হবে তাকে ডেকে পাঠাবে। যুবকটি খুবই প্রতিভাবান। খুবই উচ্চ বংশ অথচ ধনবান নয় আদৌ।

তবু হতশেপসুতের মনে রয়েছে স্বধা। এত বড় একটা কাজে হাত দেবার আগে থুথমসের মতামতটা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ এতে অসংখ্য শ্রমিকের দরকার হবে। রাজকর্মচারীদের অনেককে এই কাজ দেখাশোনা করার জন্য নিযুক্ত করতে হবে। সুতরাং থুথমসের সম্মতি পেলে তার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে সুবিধা হবে। তাকে তাই কোপটাস বা ডেনডেরার দিকে না নিয়ে গিয়ে দার-এল-বাহরির দিকে নিয়ে যাওয়া ঠিক করে। কোপটাসের দিক থেকে শকট ঘুরিয়ে নদীর দিকে যেতে বলল শকট চালককে।

থুথমস প্রশ্ন করে—ওদিকে ঘোরালে কেন। আমি ভেবেছিলাম কোপটাসে যাবে।

—না। ওপারে যাব।

—বেশ। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

হতশেপসুত মিষ্টি হেসে বলে—না, তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা।

তার হাসি দেখে থুথমসের ভাল লাগে। আজকের হতশেপসুত যেন অন্য কেউ। অন্যদিনের গাম্ভীর্য নেই। সঙ্গে এত লোক না থাকলে নিশ্চয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।

—ওপারে কোথায় যাবে ?

—দার-এল-বাহরি।

—সেখানে কি আছে !

—কিছু নেই।

—তাহলে ?

—তুমি তো পাশে থাকবে। তুমি থাকলে আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

—আমাকে তুমি পছন্দ কর ?

—এতদিন ধরে কি বুঝলে তাহলে ?

—সেই ছোটবেলা থেকে আমার ধারণা তুমি আমাকে দেখতে পার না।

হতশেপসুতের খুব মজা লাগে। তার প্রথম কন্যার জন্মের আগের অভিনয়ে যে ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল, এবারের ধরনও প্রায় সেই রকমই। যেন ছাঁচে ফেলা।

সে বলে—ওটা ব্যাহ্যিক। মেয়েদের দুই রূপ।

—তাই নাকি ? কি কি ?

—একটা আসল। আর একটা নকল।

—আজকের ব্যাপারটা আসল ?

—তোমার কি মনে হয় ?

চবরোস হাত উল্টে বলে—আইসিস জানেন।

—বেশ। আজ রাতে আমার কাছে যেও, বুঝিয়ে দেব। যাবে কিনা জানি না। তোমার আবার আসেত রয়েছে।

—তুমি ডাকলে কেউ কিছু নয়।

—আমাকে এত ভালবাস ?

—আমার মনের কথা তো জানতে চাইলে না কোনদিন।

—মনের কথা জানতে হলে মুখের কথার প্রয়োজন হয় না।

—কিন্তু তুমি তা বুঝতে পারলে না কোনদিন।

—পেরেছি। আজ গেলে আরও ভালভাবে হয়ত বুঝতে পারব। শুধু আজ কেন ? কাল পরশু তার পরের দিন, তারও পরের দিন।

থুথমসকে রীতিমত উত্তেজিত দেখায়। দূরে দণ্ডায়মান রক্ষীবৃন্দ তার মনে অপরিসীম ক্রোধের সঞ্চার করে।

সে রক্ষীদের দেখিয়ে বলে—ওদের এই মুহূর্তে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

হতশেপসুত হেসে ওঠে।

ওরা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। কখনো ডুমুর গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করে। সঙ্গের পরিচারকবৃন্দ জলযোগের ব্যবস্থা করে দেয়। তারপর আবার তারা ঘোরে। চলে যায় ক্ষুদ্র একটি জলাশয়ের পাশে। নদীর জল সরে গেলেও জলাশয় এখনো পরিপূর্ণ। অতি স্বচ্ছ সেই জল। হতশেপসুত কল্পনায় দেখতে পায় এই জলাশয়ের পাশ থেকে শুরু হবে তার সেই মহামন্দিরের এলাকা। নদীর জল শত বন্যাতেও এর বেশী এগিয়ে যেতে পারে না।

হতশেপসুত বলে—এখানে একটা প্রকাণ্ড দেবমন্দির গড়ে তুলব।

—এখানে ? এত জায়গা থাকতে ?

—আমার জায়গাটা খুব পছন্দ।

—কি জানি। আমার তো অতটা ভাল লাগছে না।

—যদি আমি মন্দির নির্মাণ শুরু করি তুমি আমাকে সাহায্য করবে ?

—আমার সাহায্যের প্রয়োজন কি ?

—যাতে তোমার সম্মতি নেই, আমি কি তা করতে পারি ?

—তুমিও ফ্যারাও।

—তাতে কি ? তুমি আমার ভাই, আমার স্বামী আর প্রেমিকও। তোমার সমর্থনে আমি কতটা উৎসাহিত হব বুঝতে পার না ?

থুথমস একটু চুপ করে থেকে বলে—থীবস-এর ওদিকে কোথাও করলে ভাল হয়। তাছাড়া বিশাল মন্দির করে লাভ কি ? তার চেয়ে আমাদের দুজনার সমাধিস্থল নির্মাণ শুরু করলে ভাল হয়।

হতশেপসুত জানে চবরোসের মত তার মুখে কোন কঠিন রেখা ফুটে ওঠে না। কিন্তু সে জানে না তার সারা মুখ কতটা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। চবরোস সেই মুখ দেখলে চমকে উঠত। কারণ সেই মুখে ছিল চূড়ান্ত কিছু করে ফেলার সংকল্প। পৃথিবীতে দ্বিতীয় থুথমস যদি না থাকে তাহলে তার পথ পরিষ্কার।

একবার আকাশের দিকে চেয়ে নিয়ে স্বামীকে বলে—তুমি যা বলবে তাই হবে। তোমার সমাধিমন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নেব আগে।

—শুধু আমার একার কেন ?

—তুমিই তো প্রকৃত ফ্যারাও। কারণ তুমি পুরুষ। তোমার সমাধিস্থল যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। তারপর আমারটা।

থুথমস খুশী হয়।

মিশরের দক্ষিণভাগ অর্থাৎ ওপরের অংশের মহামাত্য হাপু-সেনেবকে হতশেপসুত নির্দেশ দেয়, সেই প্রতিভাবন তরুণ সেন-মুতকে যেন খবর দেওয়া হয় প্রাসাদে আসার জন্য। হাপু-সেনেব সম্রাজ্ঞীর আজ্ঞা অনুযায়ী সেইদিনই সেন-মুতের বাড়িতে লোক না পাঠিয়ে নিজে গিয়ে উপস্থিত হয়। তাকে দেখে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়ে সেন-মুত, প্রধান অমাত্যকে সবাই চেনে। নানান কারণে তার দ্বারস্থ প্রায় সবাইকে হতে হয়। সে শুধু অমাত্য নয়, সে প্রধান পুরোহিতও বটে। বলতে গেলে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ফ্যারাও-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন।

সেন-মুতের ক্ষুদ্র কুটির। কুটিরের কোন প্রাঙ্গণ নেই। সে নিজের হাতে দুতিনটি বৃক্ষ রোপণ করে অনেক যত্ন করেছিল বলে সেই গাছগুলো বড় হয়ে কুটিরটিকে তবু একটু শ্রীদান করেছে। কিন্তু গৃহের অভ্যন্তর অগোছাল। চারদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের টুকরো আর প্যাপাইরাসের গাদা। পাথরের টুকরোগুলিতে সে বাটালি দিয়ে আপন মনে নানা মূর্তি ফুটিয়ে তুলছে। প্যাপাইরাসে সে ছবিও এঁকেছে।

সেন-মুত বলে—আমার কুটিরে আপনি !

—হ্যাঁ। ব্যস্ত হয়ো না।

—আমি কি কোন অন্যায় করেছি ?

হাপু-সেনেব হেসে বলে—না অন্যায় করবে কেন ?

—তবে ?

পাথরগুলিতে খোদাই করা অপূর্ব মূর্তিগুলোর দিকে চেয়ে হাপু বলে—সম্রাজ্ঞী ডেকে পাঠিয়েছেন। তাই নিজেই চলে এলাম।

—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?

—হ্যাঁ।

—আমার কোন শাস্তি হবে না তো ?

—কখনই না। বরং পুরস্কৃত হবার আশা আছে।

—আমি সম্রাজ্ঞীকে কাছ থেকে কখনো দেখিনি। তাঁর সঙ্গে কথা বলা স্বপ্নের অতীত।

—সেই স্বপ্ন এতদিনে সত্য হবে।

—কখন যাব ?

—কাল সকালে। ছেলেরা যখন মায়ের হাত ধরে পাঠাভ্যাসের জন্য বিদ্যালয়ের দিকে রওনা হয় ঠিক সেই সময় বেরিয়ে পড়বে।

—আপনি থাকবেন তো ?

—হ্যাঁ। প্রধান দ্বারে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। নইলে তোমার ভেতরে প্রবেশ করতে অসুবিধা হবে।

সেন-মুতের মুখে অনিশ্চয়তার ছায়া নেমে আসে। সে বলে—আমার কিছু হবে না তো?

তার কাঁধে হাত রেখে হাপু-সেনেব বলে—ভবিষ্যতে আজকের দিনটির কথা তোমার সর্বদা মনে পড়বে। তখন ভাববে স্বয়ং অমন রা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

সেন-মুত নিশ্চিন্ত হয়।

পরদিন যথাসময়ে সে প্রাসাদের প্রধান দ্বারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়, কিন্তু হাপু-সেনেবকে দেখতে পায় না। সে অস্বস্তি অনুভব করে। প্রধান অমাত্য তুচ্ছ ব্যক্তি নন। তিনি নিজে তার বাড়িতে গিয়ে রসিকতা করে আসেননি কখনো। তার সঙ্গে তাঁর তেমন পরিচয়ও ছিল না। অন্যের কাছ থেকে তার কুটিরের সন্ধান নিয়েছিলেন নিশ্চয়। বাইরে তাঁর নিজের দেহরক্ষী অপেক্ষা করছিল কথাবার্তা বলার সময়।

তবে কেন তিনি আসেন নি? এই কথা যখন ভাবছিল ঠিক তখন সে দেখতে পেল হাপু-সেনেব প্রাসাদের ভেতর থেকে বাইরে এল। তাকে দেখে বলে—ও, তুমি এসে গিয়েছ।

—আপনাকে না দেখতে পেয়ে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। দ্বাররক্ষী আমার দিকে বারবার ভ্রু কুঁচকে তাকাচ্ছিল।

—কিছু বলেছে সে।

—না।

—বলতো না। সে জানত একজন আসবে। ভাবছিল, সেই ব্যক্তি তুমি কিনা। আমি সম্রাজ্ঞীকে খবর দিয়ে এলাম।

—আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না। অত সহজে দেখা হয় না। সময় লাগে। তুমি যে এখনি আসবে সেই খবরটা দিয়ে এলাম। আমি জানতাম, তুমি ঠিক সময়ে আসবে। চল ভেতরে গিয়ে অপেক্ষা করি।

ওরা দুজনা ভেতরে একটি কক্ষে অপেক্ষা করে। প্রাসাদে আজ সেন-মুত প্রথম প্রবেশ করল। চারদিকে চাইতে থাকে বারবার। যেন একটি বিরাট দেব-মন্দির। দেবমন্দির তো বটেই। জীবন্ত দেবতা হোরাসের মন্দির।

ডাক আসে একটু পরে। সেন-মুতের হৃদয়ে প্রবল আলোড়ন। স্বয়ং সম্রাজ্ঞী তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এখনি তাঁর দর্শন মিলবে। তিনি কথা বলবেন তার সঙ্গে।

সম্রাজ্ঞী সত্যই সুন্দরী। দেবী আইসিস যেন। অনেকে বলাবলি করে তাঁরও মধ্যে বিরাজ করে হোরাসের অংশ। তিনি নারীরূপী পুরুষ, কিন্তু ওই নয়ন ভোলানো রূপকে তো অস্বীকার করা যায় না। প্রথম দেখছে বলে সেন-মুত খুঁটিয়ে দেখতে পারে না। কিংবা সে দেখছে একজন ভাস্করের দৃষ্টিতে। সত্যই

তাই। সে ভাবছিল, এই রূপসী নারীকে পাথরে খোদাই করে যদি সে অক্ষয় করে রাখতে পারত তাহলে ধন্য হত। সে অমর হয়ে থাকত। হাপু-সেনেবও সম্রাজ্ঞীকে সেভাবে লক্ষ্য করে না। তাই তাদের দুজনার কেউ-ই হতশেপসুতের চোখের কোলে রাত্রি জাগরণের কালিমা লক্ষ্য করেনি। তারা ভেবেছে ওই সামান্য কালচে ভাব রূপচর্চারই অঙ্গ বুঝি। আসলে তা নয়। বাধ্য হয়ে চবরোসকে দেহদান করার পর মনের মধ্যে একটা ক্লেদ জন্মায়। সেই ক্লেদ নিয়ে সে সারারাত্রি ছটফট করে নিদ্রিত থুথমসের পাশে। এক এক সময় তার মনে হয় ভারী কোন বস্তু দিয়ে স্বামীর মাথায় আঘাত করে সব শেষ করে দেয়। আবার ভাবে, কত ক্রীতদাসকে সে দেখে। কী সুন্দর তাদের দেখতে। সবাই তো আর নুবিয়ার দক্ষিণ দিক থেকে আসে না। পূর্বদেশ থেকে যে সব অসংখ্য বন্দীকে ধরে আনা হয়েছিল পিতামহের আমলে তাদের বংশের নারী পুরুষ প্রায় সবাই দেখতে ভাল। তাদের যে কোন একজনকে প্রাসাদে নিজের কক্ষে নিয়ে যেতে পারে। অমন সুঠাম দেহ আর দীর্ঘ চেহারা যাদের তাদের দ্বারা উৎপাদিত সন্তান দেখতে অনেক ভাল হবে। কিন্তু উপায় নেই। সে এখন সম্রাজ্ঞী। রাজকুমারী থাকা অবস্থায় সেটা সম্ভব ছিল। তেমন কোন আপত্তিও হত না কারও। এ তো আর নতুন কিছু নয়।

থুথমসের অসহনীয় সংস্পর্শ তাকে মেনে নিতে হচ্ছে। যেদিনই সে বুঝতে পারবে যে তার গর্ভসঞ্চার হয়েছে সেদিন থেকে ওটাকে বর্জন করবে সারা জীবনের মত। যে মানুষটার রুচি স্থূল, যার মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতির ছাপ খুবই নগণ্য, তাকে সহ্য করা কঠিন।

সেন-মুতের দিকে দৃষ্টি পড়তেই হতশেপসুত আকৃষ্ট হয়। বড় সুন্দর দেখতে তো। চোখের দৃষ্টিতে গভীরতা। আবার সেই চোখেই রয়েছে উদাসীনতা ও অনিশ্চয়তা।

হাপু-সেনেব পরিচয় করিয়ে দেয়। বলে—এরই নাম সেন-মুত। এর কথা আপনাকে বলেছিলাম।

সেন-মুত অভিবাদন করে।

—বসুন আপনারা।

ওরা বসলে হতশেপসুত সেন-মুতকে বলে—শুনেছি আপনি ভাল ভাস্কর। আপনার ওপর কিছু কাজের ভার দিতে চাই। পারবেন কি?

—কোন্ ধরনের কাজ করতে হবে অনুগ্রহ করে আমাকে জানালে আমি বলতে পারি।

—মন্দিরের গায়ে পাথর কেটে বড় বড় মূর্তি খোদাই করতে হবে।

—পারব। আমি বাড়িতে ছোট ছোট পাথর কেটে অভ্যাস করি।

—কিন্তু ছোট আর বড়র মধ্যে অনেক পার্থক্য।

—হ্যাঁ, অনেক পার্থক্য। কিন্তু আমার কোন অসুবিধা হবে না।

—আপনার ওপর যদি সম্পূর্ণ একটা মন্দিরনির্মাণের ভার দেওয়া হয়, আপনি তাহলে গ্রহণ করতে পারবেন?

—করব। আমি বরাবর এমন একটা মন্দির নির্মাণের স্বপ্ন দেখি এদেশে যা কেউ কখনো করেনি।

হতশেপসুতের মুখে এই প্রথম কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে—আপনি দেখছি ইমহোটেপকে ছাড়িয়ে যেতে চান।

—ইমহোটেপ আমার আদর্শ। তাঁর কাজ আমি দেখে এসেছি। নীচের মিশরে কয়েক বছর ছিলাম। অতুলনীয় সেই কাজ। কিন্তু সে তো পুরাকালের কীর্তি। এই নতুন যুগে অনেক কিছুর উন্নতি হয়েছে। তাঁকে ছাপিয়ে যাওয়া খুব একটা অসম্ভব নয়।

সেন-মুতের কথা শুনে হাপু-সেনেব অস্বস্তি অনুভব করে। প্রথম দিনেই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলল এই যুবক। নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে শেখেনি।

হতশেপসুত কিন্তু সন্তুষ্ট হয়। সে লক্ষ্য করেছে অনিশ্চয়তার ভাব কেটে গিয়েছে। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে আত্মবিশ্বাস। সম্রাজ্ঞীকে সে যথাযোগ্য সম্মান দিচ্ছে বটে, কিন্তু কথাবার্তায় এতটুকুও আড়ষ্টতা নেই। সে নিজের কাজ খুব ভালভাবে বোঝে।

হতশেপসুত তাকে বলে—হিকসোসরা থাকার সময় অনেক মন্দির বিনষ্ট করেছে। আমাদের সংস্কৃতির ওপর তারা তীব্র আঘাত হেনেছিল। মন্দির ধ্বংস তার মধ্যে অন্যতম। তারা চলে গিয়েছে বহুদিন। তার পর থেকে ভগ্ন মন্দির আর তার মূর্তিগুলো অবহেলায় সেইভাবেই পড়ে রয়েছে। আমার এক ভাই এগুলি সংস্কারে হাত দেবে ভেবেছিল। শুরুও করেছিল। কিন্তু তার আকস্মিক মৃত্যু হয় বড় অসময়ে মন্দিরের মধ্যেই। ওপর থেকে পাথর খসে তার কাঁধে পড়েছিল। আমি নতুন কোন মন্দির নির্মাণের আগে ভগ্ন মন্দিরগুলো সংস্কারে হাত দিতে চাই। আপনাকে সেগুলির পুরোনো রূপ ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে। কিছু মূর্তিও আবার নির্মাণ করে দিতে হবে।

—আমি অবশ্যই করে দেব। আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনিই করে দেব।

হাপু-সেনেবকে দেখিয়ে হতশেপসুত বলে—এঁর কাছে তালিকা আছে। আপনি কাল থেকেই শুরু করুন। থীবস্-এর বাইরেও যেতে হবে। লোকজন পাবেন। কোন অসুবিধা হবে না।

সেন-মুত হৃষ্টচিত্তে প্রাসাদ পরিত্যাগ করে। আজ থেকে তার অন্য জীবন। নতুন জীবন।

হতশেপসুতের দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। তবে পরিপূর্ণরূপে নয়। কারণ দ্বিতীয় সন্তানটিও কন্যা। নাম রাখা হল নেফরুরা। অসাধারণ সুন্দরী হয়েছে কন্যাটি। হতশেপসুত নিজে কম রূপসী নয়, তার মা অহমেস তো ভালই সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু এই কন্যাকে দেখে মনে হয় সবাইকে ছাপিয়ে যাবে এর রূপ। সাক্ষাৎ কোন দেবী বলে মনে হয়। চবরোসের রূপ ধরে কোন দেবতা তার কাছে এসেছিলেন নাকি? মনে হয় না।

দেবতা এলে তার মন নিশ্চয় অপার আনন্দে ভরে উঠত। তেমন একদিনও হয় নি। সে কতবার মনে মনে প্রার্থনা করেছে উয়াচমেস যেন একটি রাতের জন্য অন্তত ওই জগত থেকে নেমে আসে তার কাছে। সেটা সম্ভব নয় জেনেও সে প্রার্থনা করত। চবরোস যখন অন্তত ঘনিষ্ঠভাবে তাকে জড়িয়ে ধরেছে তখন সে ভাবতে চেষ্টা করেছে ওটা তার স্বামী নয়, উয়াচমেস। কিন্তু চেষ্টা করলেই কি ভাবা যায়। উয়াচমেসের শরীরের গড়ন ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকমের। এর মত থলথলে নয়। মনে হত উয়াচমেসের দেহের পরিপূর্ণতার জন্যই যেন তার সৃষ্টি। উয়াচমেসের দেহের ঘ্রাণ অন্যরকম। এর দেহে যেন শূকরের গন্ধ। উয়াচমেসের মাথার কেশদাম ওর মুখের ওপর ভেঙে পড়ে মুখ ঢেকে দিত। এ অতি সাবধানী হয়ে বারবার তার কেশরাশি ওপর দিকে ঠেলে দেয়। ভাবে, সেগুলো নীচের দিকে ঝুলে পড়লে সেগুলোর মুখ দিয়ে বুঝি রক্ত বের হয়ে পড়বে।

জ্যেষ্ঠা কন্যার বেলায় অভিজ্ঞতা হওয়ায় এবারে আর বিশেষ অসুবিধা হয়নি হতশেপসুতের। তবে দুজন ধাত্রী আনা হয়েছে যারা পালা করে শিশুকে স্তন্যদান করে। আগের বারে হতশেপসুতের বুকের দুধ গড়িয়ে পড়ত। এবারে পড়ে না। এবারে অত দুধ হয়নি। হকিম বলেছে উৎকণ্ঠা বেশী থাকলে অনেক সময় দুধ আসে না বেশী। কী যে তার উৎকণ্ঠা নিজেও জানে না সে। হকিম মন্তব্য করেছে, সে-ও শুনে গিয়েছে। নেসামুন আবার অন্য কথা বলে। সে বলেছে, দুধ এলে এমনিতেই আসে। এমনকি ভালভাবে খাওয়ার সম্পর্ক নেই যার, তার বুকেও অঢেল দুধ আসে। সবই হল হথোর দেবীর কৃপা। ত-আর্তের কাজ হল গর্ভে সন্তান আনা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই তার কর্তব্য শেষ হয়ে যায়। শিশুকে এবং প্রসূতিকে রক্ষা করেন হথোর দেবী।

হতশেপসুত সংকল্প করে মনে মনে, পুত্রসন্তানের জন্য সে আর চবরোসকে প্রশ্রয় দেবে না। দুই কন্যাই যথেষ্ট। তার চেয়ে বরং আসেত-এর সঙ্গে সম্পর্কটা আর একটু সহজ করে তোলা ভাল। খুব ধীরে ধীরে তাকে ঘনিষ্ঠ করে নিতে হবে। সে যাতে বুঝতে না পারে। তার পুত্রটির দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, ধরে নিতে হবে সে হবে ভবিষ্যতের ফ্যারাও। যা সত্য তাকে অস্বীকার করে কোন লাভ নেই।

নেফরুরার জন্মের কয়েক মাস পরে আসেতকে ডেকে একদিন সে বলে—তোমার পুত্রকে পাঠাও না কেন?

—আপনি হুকুম করলেই পাঠিয়ে দেব।

—আমার তো ধারণা ছিল, তোমাকে পাঠাতে আমি বলেছিলাম। বলিনি?

আসেত মাথা নীচু করে। সম্রাজ্ঞী বললেও তার মনে হয়েছিল তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল।

হতশেপসুত ওর নীচু মাথার দিকে চেয়ে বলে—তাছাড়া এতে আর হুকুমের কি আছে? সেও তো ফ্যারাও-এর পুত্র। আমার দুই কন্যার ভ্রাতা। তুমি আগে কিছুদিন আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে নিয়ে বাইরে যেতে। এখন আর যাও না।

—আমার চোখের অসুখ হয়েছিল। তার পরে আর নতুন করে যাওয়া হয় নি।

—আবার শুরু করতে পার। আমারও খুব যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু একেবারে সময় পাই না।

—আপনার পক্ষে সম্ভবও নয়। সম্রাজ্ঞী কোথাও গেলে অনেক আয়োজনের প্রয়োজন হয়। আমার জন্যে অতটা দরকার হয় না।

—তুমি প্রাসাদেই মিসাফ্রিসকে আমার কন্যার কক্ষে পাঠিয়ে দিতে পার। দুজনা খেলা করবে। কন্যাটি অনেকসময় একেবারে মনমরা হয়ে থাকে। আমি সময় দিতে পারি না। সবকিছু কি বাঁদীদের দ্বারা সম্ভব? শিশুদেরও মন রয়েছে। সেই মন খুব স্পর্শকাতর। শৈশবে আমি যে সব আঘাত পেয়েছি সব স্পষ্ট মনে আছে।

আসেত বিস্মিত হয়। সম্রাজ্ঞীর কথা শুনে। শিশুমন নিয়ে তিনি এত ভাবেন? সে বলে—আমারও মনে রয়েছে।

—সব শিশুরই থাকে বোধহয়। বাঁদীরা অতশত বোঝে না। খেলার সঙ্গী পেলে ওরা সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হয়। মিসাফ্রিস যদিও একটু বড় হয়েছে তবু সে এখনো শিশু। ও এলে দুজনারই আনন্দ হবে।

—আমি পাঠিয়ে দেব।

হতশেপসুত নিশ্চিন্ত হয়।

পুন্তদেশ থেকে আর একটা জাহাজ সওদা করে ফিরেছে। থীবস্-এর অধিবাসীরা ভাবে সমুদ্র যদি নগরীর পাশে হত. তাহলে জাহাজের পাশে গিয়ে তারা দাঁড়াতে পারত। জাহাজ থেকে বিচিত্র সব দ্রব্যসম্ভার নামানো হয় তখন দেখেও সুখ। সেই সুখ রাজধানীর অধিবাসীরা পায় না। নিদেন মধ্যে যে বিরাট খাল সমুদ্র থেকে দেশের অভ্যন্তরে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে, তার ভেতর দিয়ে বড় বড় জলযান পর্যন্ত চলে আসে। সেই খালটা যদি আরও দীর্ঘ হয়ে এসে থীবস্কে স্পর্শ করত তাহলে কত ভাল হত। কিন্তু যতটুকু খাল কাটা হয়েছে তার নাব্যতা রক্ষা করতে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। বালির ঝড় বয়ে যাচ্ছে অহরহ। সেই বালির স্তর গিয়ে পড়ছে খালে। সবসময় খাল থেকে বালু তোলা হয়, সেটিকে জলযান চলাচলের উপযুক্ত করে রাখার জন্য। তবু তো ভারী জাহাজ আসতেই পারে না। এই খালকে যদি দুএক বছর অযত্নে ফেলে রাখা হয় তাহলে তার অস্তিত্বই বোধহয় মুছে যাবে। ভবিষ্যতে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে সমুদ্রে যাবার জন্য এককালে এইরকম চমৎকার একটি জলপথ ছিল।

অথচ ওই খাল দিয়েই তো জাহাজের মালপত্র নামিয়ে বড় বড় নৌকায় তুলে নিয়ে আসা হয় ভেতরে অনেকটা দূরে। সেখান থেকে মাথায় আর কাঁধে করে ক্রীতদাসরা বয়ে আনে প্রাসাদ পর্যন্ত। প্রতিবারই অমন রা তাঁর একটা বড় অংশ পেয়ে থাকেন। তারপর ফ্যারাও। তারপরে এর সুযোগ পায় বংশপরম্পরায়

যারা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত তাদের পরিবারবর্গ। অবশিষ্ট যেটুকু পড়ে থাকে সেগুলো অন্যান্যদের মধ্যে দেওয়া হয়। তবে অমন রা আর ফ্যারাও ছাড়া অন্য কেউ বিনা খরচায় ওসব পায় না। পরিবর্তে তাদের রাজভাণ্ডারে কিছু দিতে হয়, ক্ষেতে উৎপাদিত ফসলই সাধারণত গ্রহণ করা হয়। কিংবা কোন ফল যা সহজে নষ্ট হয় না। অথবা সোনা রূপা ইত্যাদি ধাতু। কারণ ব্যবসা করা হয় সমৃদ্ধির জন্য, বিলিয়ে দেবার জন্য নয়।

হতশেপসুত স্বপ্ন দেখে পুন্ত থেকে যেমন আসছে তেমনি পূর্বের বহুদেশ থেকেও বণিকেরা আসবে কেনাবেচা করতে। এ দেশের বণিকেরা যাবে সেই সব দেশে। মিশর ধীরে ধীরে ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠবে। সে শৈশব থেকে আবানা-পুত্র এবং অনেকের কাছে শুনে এসেছে তাদের পিতৃপুরুষের বীরত্বের কথা, হিকসোসদের বিতাড়ন করার কাহিনী। দূর দেশে গিয়ে যুদ্ধ করে লুণ্ঠিত দ্রব্যের সঙ্গে পরাভূত দেশের শতশত নর-নারীকে নিয়ে আসা হত। তারাই এখানে এখন শ্রমের কাজ করে। তাদের কৃষিকাজে হাত দেবার কোন অধিকার নেই। তারা অন্যান্য পরিশ্রমসাধ্য কাজ করে। হতশেপসুতের এতে শিহরন জাগে না। ক্রীতদাসের পরিবর্তে যদি দলে দলে বণিক আসত বাণিজ্য করতে তাহলে সে অনেক বেশী আনন্দিত হত। যুদ্ধে তার বিশ্বাস নেই, তার বিশ্বাস ব্যবসায়।

পুন্ত-এর জিনিসপত্র বণ্টন হতে না হতেই খবর এল পূর্বদিক থেকে বেদুইনরা এসে প্রজাদের ওপর নানা ধরনের উৎপীড়ন চালাচ্ছে। মিশরের আদিম সভ্যতার সঙ্গে যেন এদের উৎপাতও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গরুর গায়ে ডাঁশ বসে যেমন উৎপাত করে এও তেমনি। এরা যাতে দেশের ভেতরে বেশী ঢুকে পড়তে না পারে তার জন্য স্থানে স্থানে সৈন্যদের স্থায়ী ছাউনি করা হয়েছে। তবু তারা আসে। না এসে তাদের উপায় নেই। ধুধু মরু অঞ্চলে জীবন অতিবাহিত করতে রসদ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে।

থুথমস ওদের ওপর রেগে গিয়ে বলে—এবারে ওদের দমন করতে হবে।

হতশেপসুত প্রশ্ন করে—কি ভাবে ?

—ওদের বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠিয়ে !

—কোথায় পাঠাবে ? কোন্ দেশে ?

—মরুভূমির ভেতরে গিয়ে খুঁজে খুঁজে একটা একটা করে শেষ করতে হবে।

হতশেপসুত হেসে ওঠে।

—হাসলে যে ?

—তোমার কথা শুনে। তোমার অভিযানে কোন লাভ হবে না। মাছিকে দমন করতে পার ? মুখে মাছি বসলে তাড়িয়ে দিলে কি হয় ? তখনই আবার এসে বসে। চেষ্টা করে সেটা মেরে ফেললেও একটু পরে আর একটা এসে বসে। মাছির কি শেষ আছে ?

—সব কিছু পরিষ্কার রাখলে মাছি আসে না !

—আসে। তবে কম আসে। বেদুইনদেরও ডেরাগুলো মাঝে মাঝে ভেঙে

দিলে কম উৎপাত করবে।

আসলে বেদুইনদের প্রতি হতশেপসুতের মনের কোণে অনুকম্প রয়েছে। এর কারণ আর কিছুই নয়, অল্পবয়সে শোনা একটি গল্প। তাতে সিনুহে নামে একটি চরিত্রের কথা রয়েছে। সে ছিল মিশরবাসী এবং মিশরের সম্রাজ্ঞীর আত্মীয়। যে কোন কারণেই হোক যখন সে শুনল যে বৃদ্ধ ফ্যারাও-এর মৃত্যু হয়েছে, কোন এক অজানা আতঙ্কে সে দেশ ছেড়ে পালালো। যখন সে সিনাই মরুভূমি অতিক্রম করছিল তখন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রায় মৃত্যুর দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হল। সে যখন অচেতন হয়ে বালুকারাশির মধ্যে লুটিয়ে পড়ল তখন একদল বেদুইনের দৃষ্টি পড়ে তার দিকে। তারা খাদ্য ও পানীয় দিয়ে তার জীবন রক্ষা করে। তারপর তাকে তাদের সর্দারের সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করে। বেদুইন-সর্দার তার আচার-আচরণ এবং কথাবার্তায় মুগ্ধ হয় এবং স্বীয় কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দেয়। শুধু তাই না, তাকে একটি সুন্দর ভূখণ্ড দান করা হল এবং সেখানকার সর্দার করে দেওয়া হল। সে বেদুইনদের পক্ষ নিয়ে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করল এবং জয়ী হল। তার সন্তানেরা বড় হল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হল। তারও বয়স হল। তারপর বৃদ্ধ বয়সের একাকীত্ব তাকে একদিন গ্রাস করল। তখন তার মনে পড়ল মাতৃভূমির কথা। বহুদিন পরে শৈশবের এবং প্রথম যৌবনের কত ঘটনার কথা একে একে তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠতে থাকে। দেশকে দেখার জন্য ভেতরটা আকুল হয়ে ওঠে। মন কাঁদতে থাকে। সে তখন একদিন মিশরের ফ্যারাও-এর কাছে অত্যন্ত বিনীত ভাবে একটি পত্র প্রেরণ করল। সেই পত্রে আবেদন করা হল তাকে যেন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়। কারণ এখানে মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন লাভের কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে দেহ বিনষ্ট হয়ে যায়।

কিছুদিন প্রতীক্ষা করার পর ফ্যারাও-এর পত্র আসে। সিনুহে সেই পত্র দেখে প্রথমে উত্তেজিত হয়। তারপর পত্রের বক্তব্য শুনে বিমোহিত হয়। পড়ে মিশরে ফিরে এসে সে বলেছিল—"পত্রটি যখন আমার কাছে পৌঁছয় তখন আমি আমার দলের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিলাম। পত্রটি আমাকে পাঠ করে শোনান হয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহটা ভূমির ওপর নিক্ষেপ করলাম। আমি বালুকা স্পর্শ করলাম এবং আমার মস্তকে সেই বালি ছড়িয়ে দিলাম। আমি আমার শিবিরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আনন্দে বিড়বিড় করে বলতে লাগলাম—কি করে এমন ব্যবহার সম্ভব হল? সম্ভব হল এমন একজন ভৃত্যের প্রতি যে নিজে একটি বর্বর দেশে চলে এসেছিল? সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। তিনিই আমাকে রক্ষা করেছেন। আমার জীবনের শেষপ্রান্তে তিনিই আমাকে স্বগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।"

সিনুহে খুব শীঘ্র সব কিছুর ব্যবস্থা করে মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সে যখন মিশরের প্রাসাদে পৌঁছলো তখন তাকে অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানান হল। তাকে প্রাসাদে নিয়ে যাবার সময় সুন্দর পোশাক পরিহিত দশজন ব্যক্তি সম্মুখে এবং দশজন পশ্চাতে সারিবদ্ধভাবে তার সঙ্গে

চলল। ফ্যারাও পরিবারের রাজকুমার ও রাজকুমারীরা প্রাসাদের প্রধান দ্বারে তাকে স্বাগত জানায়। তাকে এমন একটি অট্টালিকায় থাকতে দেওয়া হয় যা খুবই উচ্চপদস্থ সভাসদগণ শুধু পায়। প্রাসাদের রসুইখানা থেকে তার জন্য দিনে তিন চারবার খাবার আসতে লাগল। মৃত্যুর পর তার শেষ আশ্রয়স্থল রূপে একটি পিরামিড নির্মাণ শুরু হয়ে গেল অন্যান্য পিরামিডের পাশে। শ্রেষ্ঠ স্থপতি, করিগর, ভাস্কর ও লিপিকার এবং চিত্রশিল্পীকে নিযুক্ত করা হল সেখানে। সুমিষ্ট কণ্ঠে আবৃত্তির জন্য সিনুহেকে পুরোহিত দেওয়া হল। অন্যান্য সবকিছুই স্বয়ং ফ্যারাও-এর তত্ত্বাবধানে হত।

এই গল্পটির শেষে একটা কবিতা ছিল। হতশেপসুতের সেই কবিতার সুন্দর কথাগুলি মনে আছে। সেই থেকে কেন যেন বেদুইনদের প্রতি নির্মম হতে পারে না সে। হয়ত একজন মৃত্যুপথযাত্রী নিরাশ্রয় মিশরবাসীকে ওরা আশ্রয় এবং সম্মান দিয়েছিল বলে। অথচ এটা নিছক গল্পও হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ গল্পই তো কোন সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। এ গল্পের পেছনে তেমন কোন ঘটনাও থাকতে পারে। বেদুইনদের রক্তে কি মিশরবাসীর রক্তের মিশ্রণ ঘটেনি কখনো ?

আসেত তার পুত্রটিকে একদিন পাঠিয়ে দিল। একজন পরিচারিকা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। খবর পেয়ে হতশেপসুত কক্ষের বাইরে আসে। সেখানে অপেক্ষা করছিল উভয়ে। হতশেপসুত লক্ষ্য করে পরিচারিকা বালকের হাত ধরার চেষ্টা করতেই সে হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে। পরিচারিকা তাকে দেখে অভিবাদন করে একপাশে সরে দাঁড়ায়। সে বালক সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

হতশেপসুত ডাকে তাকে—কোথায় যাচ্ছ ?

—মায়ের কাছে। এ আমাকে ধরে এনেছে।

—ও ধরে আনেনি। আমি তোমাকে নিয়ে আসতে বলেছিলাম।

বালক সম্রাজ্ঞীর দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে—তুমি কে ?

হতশেপসুত বুঝতে পারে আগে যে কয়বার বালকটি সামনে এসেছে, তাকে ভালভাবে দেখেনি। সে বলে—বল তো আমি কে ?

—জানি না।

—দেখনি আমাকে ?

—না।

—দেখেছ। মনে নেই।

—আমি দেখি নি।

হতশেপসুত পরিচারিকাকে ইশারায় চলে যেতে বলে। সে যাবার উপক্রম করতেই মিশাফ্রিস বলে ওঠে— ও চলে যাচ্ছে কেন ?

—তুমি এখন আমার কাছে থাকবে। তোমার একটা ছোট বোন রয়েছে। তার সঙ্গে খেলবে। আর একটা বোনও আছে। তবে সে খুবই ছোট।

—সত্যি ?

মিসাফ্রিসের বিস্ময়ভরা চোখদুটির দিকে তাকিয়ে হতশেপসুতের ভাল লাগে। মেয়ের স্বামী এবং প্রেমিকরূপে একে কল্পনা করে। ভালই হবে। খুবই ভাল হবে। তার যেমন ছিল উয়াচমেস, হয়ত তেমনই হবে। অমন রা-এর কি ইচ্ছা তিনি জানেন।

মিসাফ্রিসের থুতনিতে হাত দিয়ে হতশেপসুত বলে—সত্যি। দেখবে চল।

—চল। সেই বোনটা খেলতে পারে ?

—খুব পারে। দেখলেই বুঝতে পারবে।

সম্রাজ্ঞী বালককে নিয়ে কন্যা হতশেপসেত-এর কক্ষে প্রবেশ করে। একজন বাঁদী তখন তার কাছে বসে ছিল। সে একটি পুতুল নিয়ে একমনে খেলা করছিল। সম্রাজ্ঞীকে দেখে বাঁদী ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। সে ভাবে, নিশ্চয় অজ্ঞাতে কোন অপরাধ করে ফেলেছে। নইলে এই অসময়ে সম্রাজ্ঞী কখনো কন্যার কাছে আসেন না।

হতশেপসুত বাঁদীর দিকে না তাকিয়ে কন্যাকে ডাকেন। কন্যা খেলা বন্ধ করে ওপর দিকে চাইতেই মিসাফ্রিসকে দেখতে পায়। সে উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে হাসতে থাকে।

হতশেপসুত মিসাফ্রিসকে জিজ্ঞাসা করে—পছন্দ হয় ?

সে ঘাড় হেলিয়ে বলে—হ্যাঁ।

কন্যা হতশেপসেত গুটি গুটি এগিয়ে আসে বালক আগন্তুকের দিকে। একেবারে কাছে এসে হেসে তার গায়ে হাত দেয়। মিসাফ্রিসও হাসে।

হতশেপসুত তখন বলে—তোমরা দুজনা তাহলে খেলা কর। আমি যাই।

মিসাফ্রিস জিজ্ঞাসা করে—এ আমার সঙ্গে কি খেলবে ? এ তো পুতুল। গায়ে জোর নেই।

—তুমি যা বলবে তাই খেলবে।

—পারবে না। একটুও জোর নেই।

—জোর না থাকলে খেলা যায় না।

—ও কুস্তী লড়তে পারবে আমার সঙ্গে ?

—কুস্তী ছাড়া আরও কতরকমের খেলা আছে।

—শিকার শিকার খেলতে পারবে ?

—তুমি শিখিয়ে দিও। তাহলে আর একটু বড় হলে দুজনে একসঙ্গে বড় হয়ে সত্যি সত্যি শিকার করতে পারবে।

মিসাফ্রিসের মুখ এতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে—আমি শিখিয়ে দেব। কিন্তু শিকার শিকার খেলা এখানে হবে না।

—কোথায় খেলতে হবে !

—বাইরে। উদ্যানে।

—বেশ তো, সেখানেই যেও। তুমি যখনই বলবে তখনই ওখানে নিয়ে যাওয়া হবে।

—সত্যি ?

—সত্যি। এখন বরং গান গাও। তুমি গান গাইতে জান ?

—মা খুব ভাল জানে। আমাকে শিখিয়েছে।

—নাচতে পার ?

—না। নাচ দেখেছি।

হতশেপসুত বাঁদীকে হুকুম করে ওদের উদ্যানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে। সঙ্গে আরও দুজনকে নিয়ে যেতে বলে। আর লক্ষ্য রাখতে হবে তারা যেন উদ্যানের সরোবরের একেবারে কাছে না যায়।

সেই সময় নেসামুন এসে প্রবেশ করে সম্রাজ্ঞীর খোঁজে। তাকে দেখে হতশেপসুত বলে—তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। এদের দুজনাকে উদ্যানে নিয়ে যেতে হবে। ওদের শিকার শিকার খেলার ইচ্ছা হয়েছে। সঙ্গে কয়েকজনকে দিতে হবে। জল আছে।

নেসামুন বলে—আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

কয়েক বছর পরে একবার নীলনদে সেভাবে জল এল না। প্রতিবার দুকূল ছাপিয়ে নদীর জল বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়ে ভূমিকে সরস করে দেয়। দূরবর্তী নীচু জমি জলপূর্ণ হয়ে যায়। এবারে তেমন কিছুই হল না। কৃষকদের মাথায় বজ্রাঘাত। দ্বিতীয় থুথমস সভায় ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে—কেন এমন হল ? কোন্ দেবতা কুপিত হলেন ? হাপি দেবতা কি ?

হতশেপসুতেরও চিন্তার শেষ নেই। কারণ কৃষিনির্ভর এই দেশে কৃষিকাজ ভাল না হলে বাণিজ্যে প্রভূত ক্ষতি হবে। তাছাড়া শুধু কৃষক নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই অনাহারে থাকতে বাধ্য হবে। অনেকে স্বল্পাহারে কৃশ হবে। আর এই দুর্দিনের সুযোগ নিতে পারে কোন শত্রুপক্ষ। হতশেপসুতের দৃঢ়বিশ্বাস পূর্বদিকের অন্ধকারের দেশ থেকে কোন অশুভ শক্তি এই অনর্থ ঘটিয়েছে। তারা কোনদিনই মিশরের মঙ্গল দেখতে পারে না। মিশরের দেব-দেবীকে তারা ঈর্ষা করে। দেবতা হাপির ওপর তাদের কু-প্রভাব পড়েছে। হাপি যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও সেই প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি এ বছরে। তাঁর কোন অসতর্ক মুহূর্তে এই ক্ষতিসাধন করেছে অন্ধকারের দেশের অশুভ শক্তি।

থুথমস সভার মধ্যে যখন প্রশ্ন তোলে হাপি দেবতা ক্রুদ্ধ হয়েছেন কিনা তখন হতশেপসুত খুব অসন্তুষ্ট হয়। এতদিন ফ্যারাও হয়েও তার বুদ্ধি পরিণত হল না। এভাবে কখনো বাইরে প্রকাশ করতে হয় নিজের অজ্ঞতা ? সে ভুলে যায় যে নিজে সে দেবতার অংশবিশেষ। তাই হতশেপসুত স্বামীর কথা শেষ হতে না হতেই বলে—দেবতা হাপি কখনো কুপিত হতে পারেন না। তাহলে আমাদের জানাতেন। আমাদের কৃষকদের তিনি ভালবাসেন। কারণ তারা সজ্ঞানে কখনো তাঁর অবাধ্য হয় না বা তাঁর অসন্তোষ উদ্রেককারী কোন কাজ করে না।

স্ত্রীর কথায় থুথমসের খেয়াল হয় যে সে ভুল করেছে। সংশোধন করে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে—হ্যাঁ, হাপি দেবতার ক্রোধ হলে আমরা জানতে পারতাম।

হতশেপসুত বলে—অন্ধকারের দেশের সেই অশুভ শক্তির কাজ এটা।

সবাই একবাক্যে হতশেপসুতকে সায় দেয়। মুখ্যামাত্য হাপু-সেনেব সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমর্থন করে। বলে—হ্যাঁ, অন্ধকারের দেশের সেই শক্তি। এটা তাদের অদৃশ্য শক্তি। হিকসোসদের মাধ্যমে তাদের একবার পাঠানো হয়েছিল।

সবাই বলে ওঠে—ঠিক।

হাপু-সেনেব বলে—কিন্তু কৃষকদের এবং সাধারণের এই দুর্গতির প্রতিবিধানের উপায় বের করতে হবে।

হতশেপসুত জানে প্রতিবিধানের একটি উপায় পুরাকালে প্রচলিত ছিল। শুধু হতশেপসুত কেন, সবাই জানে। তারা অনাহারে থেকে থেকে মৃতপ্রায় হয়ে সেই পুরাতন প্রথার পুনঃপ্রবর্তনের দাবী জানাতে পারে। সেটি হল ফ্যারাও-এর রক্ত। সেই রক্ত ভূমিতে পড়লে ভূমি উর্বর হয়ে উঠবে।

ফ্যারাও নিজে দেবতা। তিনি সর্বশক্তিমান, কারণ তিনি দেবতা। তিনি ফ্যারাও, কারণ তিনি দেবতা। তাঁর নামে শপথ নিয়ে মিথ্যা বলার অর্থ দেবতাকে অবিশ্বাস। সেটা মহা পাপ। এই পাপের একমাত্র শাস্তি হল মৃত্যু। সবাই জানে ঈশ্বরকে ভয় করার অর্থই হল ফ্যারাওকে সম্মান করা। ফ্যারাওকে নিজেদের অন্তরের সিংহাসনে বসাতে হবে। কারণ তিনি মিশরকে নীলনদের চেয়েও বেশী শস্যশ্যামল করতে পারেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি মানবজাতির অস্তিত্বকে রক্ষা করেন। তিনি একাধারে মানুষ এবং দেবতা। দেবতা রূপে তিনি তাঁর প্রজাদের সব কিছু প্রদান করেন। আবার মানুষ রূপে তিনি তাঁর নিজের দেবতারই সৃষ্ট জীব। সাধারণ মানুষের স্তরের চেয়ে তাঁর স্তর সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর উপাস্য দেবতাও ভিন্ন। প্রজাদের নিকট তিনি অবতার। জীবন্ত প্রতীক। জীবন্ত বলেই তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। তাঁকে পূজা করা যায়। কিন্তু ফ্যারাও নিজে পূজা করেন সূর্যদেবতাকে। শুধু তাঁরই কাছে ফ্যারাও-এর বাধ্যবাধকতা। কারণ তিনি সাক্ষাৎ তাঁরই অংশে জন্ম নিয়েছেন। সূর্যদেবতা শুধু তাঁকেই ভালবাসেন। দেবতার নামের সঙ্গে তাই তাঁর নাম জড়িত। কারণ তখন তিনি ওসিরিস, যার অর্থ মসনদের অধিকর্তা।

ফ্যারাও মানবদেহধারী দেবতা বলেই উর্বরতার উৎস স্বরূপ। তাই জনহিতার্থে দুর্ভিক্ষ বা খরার সময়ে ভূমির উর্বরতা সুনিশ্চিত করতে ফ্যারাও ব্যতীত আর কাকেই বা জীবন উৎসর্গের জন্য বেছে নেওয়া হবে? ভূমিকর্ষণের পূর্বে তাঁকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাঁর শোণিত ভূমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হত। হত্যা করা হত তিনভাবে। বিষাক্ত সর্পদংশনে, দমবন্ধ করে কিংবা ওসিরিসের মত দেহকে টুকরো টুকরো করে মাটিতে প্রোথিত করে। ওসিরিস হলেন যেমন মৃত্যুর দেবতা তেমনি তিনি পুনর্জীবনের দেবতাও বটে। বীজ যেমন ভূমিতে বপন করার পর অংকুরিত হয়ে বেঁচে ওঠে, ওসিরিসও

তেমনি। তবে বিষধর সর্পদংশনই অধিক প্রচলিত ছিল একথা হতশেপসুত জানে। আর ফ্যারাওকে তাঁর এই শেষ পরিণতির খবর পৌঁছে দেবার ভার নিতেন পুরাকালে স্বয়ং অনুবিস এবং পরে অনুবিসের মন্দিরের প্রধান পূজারী। পূজারী খা-বাউ-সেকের ফ্যারাওকে এই ভয়ংকর পরিণামের সংবাদ পৌঁছে দেবার সময় অনুবিসের রূপ ধারণ করার জন্য শৃগালের একটি মুখোশ পরিধান করতেন।

কিন্তু সর্পদংশনে ফ্যারাও-এর মৃত্যু হলে ভূমি কিভাবে উর্বর হবে? সাধারণভাবে হত্যা করা হলে ফ্যারাও-এর শোণিত পাওয়া যেত। কিন্তু সর্প-দংশনের মৃত্যুতে তো শোণিত পাওয়া যায় না। তাই ফ্যারাও-এর শবদেহ মমিতে রূপান্তরিত করার পূর্বে দেহ থেকে তাঁর হৃদপিণ্ড এবং ফুসফুস বের করে নেওয়া হত। কারণ সাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস দেশের শস্যক্ষেত্রের উর্বরতা ও জীবনীশক্তি ফ্যারাও-এর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত। তাই তাঁর হৃদপিণ্ড আর ফুসফুস বের করে নিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলা হত। কারণ সেই দুটি চালু থেকে ভূমিকেও জীবন্ত রাখবে। অনুবিসের মন্দিরের পুরোহিত অসময়ে শৃগালের মুখোশ ধারণ করে ফ্যারাও-এর নিকট উপস্থিত তিনি বুঝতে পারতেন এবারে তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে।

তবে ফ্যারাওকে হত্যার প্রথা বহুদিন পূর্বেই অবলুপ্ত হয়েছে বলে সেই প্রথা পুনরায় চালু করার মত মরিয়া কেউ হবে না। এখন আর তারা সেই প্রথায় অভ্যস্ত নয়। ফ্যারাওকে হত্যার প্রথা বন্ধ হবার পরে কিছুদিন ফ্যারাও-এর প্রতীকরূপে কোন মানুষকে হত্যা করা হত। তাও এখন বন্ধ। এখন অনেক সময় পশুবলি দেওয়া হয়।

হতশেপসুত লুব্ধ সভাকে জানায়—এবারে অবিদসে ওসিরিসের মন্দিরে ভাল করে পূজা দিতে হবে।

সবার দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ হলে সে বলে—প্রকৃতপক্ষে ওসিরিসই হলেন উর্বরতা শক্তিবৃদ্ধির আদি দেবতা। তাই পরলোকে তাঁর রাজত্ব অত গৌরবময়। সেখানে দুর্ভিক্ষ বলে কিছু নেই। সেখানে ক্ষুধা নেই, অনাহার নেই। সেখানে কৃষিকাজ কখনো কোন কারণে ব্যর্থ হয় না। ক্ষেত্র সব সময় শস্যে পরিপূর্ণ। এখানে সুদিনে যতটা শস্য উৎপন্ন হয়, সেখানে তার চেয়েও শতগুণ বেশী পরিমাণ উৎপন্ন হয়। তাই অবিদসে গিয়ে ওসিরিসের কাছে প্রার্থনা জানাতে হবে সবাইকে।

সভাসদগণ মুক্ত কণ্ঠে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে। খুবই হৃদয়গ্রাহী প্রস্তাব এটি। পূর্ব দেশের অশুভ শক্তি এবারে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

হতশেপসুত স্বস্তিবোধ করে। সে জানে মানুষকে হত্যা করা বন্ধ হলে পশু হত্যার প্রচলন হয়। অনেক ক্ষেত্রে পশুর পরিবর্তে রুটি দিয়ে পশুর আকৃতি তৈরী করে তাকে হত্যা করা হয়, প্রাজ্ঞ হেকেরনেহহ্ শৈশবে তাদের তিন ভাই বোনকে সব কিছুই বলেছেন। এই প্রাচীন দেশের সুদূর অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত কত তথ্য কত রহস্য এক এক করে উন্মোচন করে

দিতেন তিনি। উৎসর্গীকৃত পশু খুবই পবিত্র। তাই যে কোন অবস্থায় তাকে স্পর্শ করা যায় না। যে পশু খুবই নোংরা তাও অস্পৃশ্য। আদিকালের একটি পবিত্র পশু দিনে দিনে কেমন করে অপবিত্র হয়ে গেল তাও সে জানে। শূকর আগে ছিল পবিত্র। ওসিরিসের কাছে শূকর উৎসর্গ করা হত এককালে। ওসিরিসের উৎসবের পূর্ণিমার সন্ধ্যায় প্রত্যেকেই তাদের গৃহদ্বারের সম্মুখে শূকর হত্যা করত। আবার অন্য কেউ যদি অনবধানবশত সেই পশু স্পর্শ করত তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে নীলনদে অবগাহন করে দোষস্খালন করতে হত। নীলনদ নিজেই যে ওসিরিসের আর এক রূপ। তাই সর্বপাপহর। দারিদ্র্য-বশত কেউ যদি শূকর উৎসর্গ করতে না পারত তাহলে সে রুটি দিয়ে শূকর তৈরি করে নিত এবং পরে সবার মত ভক্ষণ করত।

তারপর শূকর ধীরে ধীরে তার পবিত্রতা হারাল। সে পরিণত হল একটি অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য জীবে। এখন তাকে স্পর্শ করলে নিজেকে আবার শুদ্ধ করে নিতে নীলনদের জলে গিয়ে ডুব দিতে হয়। শূকর এখন অপাংক্তেয়।

হতশেপসুত ওসিরিসের পূজার ব্যবস্থা করবে বলে থুথমসকে সঙ্গে নিয়ে সেদিনের মত সভাকক্ষ পরিত্যাগ করে।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে যেতে যেতে থুথমস বলে—তোমার ক্ষমতা আছে বটে। আমি তো ভাবছিলাম আমার কাছে বুঝি অনুবিসের পুরোহিত খা-বাউ-সেকের শৃগালের মুখোশ পরে এসে উপকৃত হবেন।

—তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হচ্ছে।

—কেন ?

—আমার ধারণা ছিল তোমার এত গভীরভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা নেই।

—তুমি আমাকে যতটা নিরেট ভাব ততটা আমি নই।

—সেকথা ভালভাবেই জানি।

—কেমন করে জানলে ?

—নইলে আমাকে হেয় করার জন্য বন্ধুবান্ধব এবং কোন কোন কর্মচারীর কাছে ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলতে না।

থুথমস থমকে দাঁড়ায়। সে বলে—তোমাকে কে বলেছে একথা ?

হতশেপসুত বলে—তোমার যে সমস্ত চক্ষুকর্ণ ঘরে বাইরে রয়েছে, আমার চক্ষুকর্ণ তাদের চেয়ে অনেক বেশী সজাগ। তুমি প্রতিপদে ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দাও সবাইকে যে আমি পুরুষ নই। সুতরাং ফ্যারাও-এর পরিপূর্ণতা আমার মধ্যে থাকতে পারে না। কিন্তু তোমার এই প্রয়াস খুব একটা সফল হয়নি। কারণ আমার লোকজন অনেককেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছে যে আমি স্বয়ং অমন রা-এর ঔরসজাত। তিনি ফ্যারাও প্রথম থুথমসের রূপ ধরে রাত্রিকালে আমার মায়ের কক্ষে প্রবেশ করেন।

—সবাই জানে এ কথা ?

—সবাই কখনো জানতে পারে ? তবে অনেকেই জেনেছে। কেন, তোমার চক্ষুকর্ণেরা এই খবরটুকু তোমার কাছে পৌঁছে দিতে পারেনি ?

দ্বিতীয় থুথমস আবার চলতে শুরু করে, বলে—তেমন শুনিনি এখনো।

—তোমার লোকেরা অপদার্থ।

হতশেপসুত লক্ষ্য করে বহুদিন পরে চবরোসের মুখের সেই কঠিন রেখাটি ভেসে উঠছে। সে হতশেপসুতের কথার জবাবে একটু হেসে নিয়ে বলে—কার লোকেরা অপদার্থ কে জানে। তোমার লোকেরা তোমাকে ভোলাচ্ছে হয়ত।

এই খোঁচা দেওয়া কথা শুনে হতশেপসুতের মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। সে নিজের কক্ষের দিকে চলতে চলতে মন্তব্য করে—পরে বুঝবে।

রানী আসেত তার পুত্রকে নিয়মিত সম্রাজ্ঞী হতশেপসুতের কন্যা হতশেপসেতের কাছে পাঠিয়ে দেয়। ফলে উভয়ে উভয়কে খেলার সঙ্গীরূপে ভাবতে শিখেছে। হতশেপসুত লক্ষ্য করে তার কন্যাটির মধ্যে নারীসুলভ গুণ বা দোষের আধিক্য খুব বেশী। সে অত্যন্ত কোমলস্বভাবের। তার দেহটিও খুব কমনীয়। সে নিজে উদ্যোগী হয়ে কিছুই করতে পারে না। বড় বেশী পরনির্ভরশীল। ফলে এখন থেকেই সে আসেত-পুত্র মিসাফ্রিসের হাতের পুতুল। খেলার মধ্যেও মিসাফ্রিসের প্রতাপ বা আধিপত্য ষোল আনা। সে যেভাবে খেলায় হতশেপসেত সেইভাবে খেলে। সেইভাবে খেলতে আনন্দ পায়। খেলতে খেলতে মিসাফ্রিস হেসে উঠলে সেও হেসে ওঠে। মিসাফ্রিসের দুঃখ হলে সে বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে ওঠে তার দুঃখ ঘোচাতে। হতশেপসুত জানে মানুষের স্বভাব কখনো পালটায় না। শুষ্কতা জলের গুণ নয়। আর্দ্রতা নয় বালির গুণ। কন্যার সেই রূপ আর সৌন্দর্য অবশ্যই রয়েছে যা মিসাফ্রিসকে অবসর সময়ে আবিষ্ট করবে। কিন্তু তার মধ্যে সেই ব্যক্তিত্ব নেই যা মিসাফ্রিসের মনে সমীহের ভাব সৃষ্টি করবে। উপায় নেই। মেনে নিতে হবে।

বরং কনিষ্ঠা কন্যা নেফরুরা এখনো শিশু হলেও মনে হয় বড় হলে সে ব্যক্তিত্বসম্পন্না হয়ে উঠবে। তার গাম্ভীর্য আর জেদ দেখলে সেইরকম মনে হয়। হতশেপসুতের ইচ্ছা দুজনকেই আসেত-এর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবে, জ্যেষ্ঠা না পারলেও কনিষ্ঠা বশে রাখতে পারবে স্বামীকে।

আসেত-এর পুত্র সম্রাজ্ঞীকে নিয়মিত দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়েছে। এখন সে তার সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা বলে। হতশেপসুত তার সঙ্গে খুব ধৈর্য ধরে কথা বলে। স্নেহ দিয়ে তার মন জয়ের চেষ্টা করে। সফলও হয়। তাই মাঝে মাঝে মিসাফ্রিস হতশেপসুতের কাছে আবদারও করে। কখনো কখনো ক্রোধও প্রকাশ করে।

সেদিন কক্ষে প্রবেশ করে বলে—তোমাকে কত করে বললাম নদীর ওপারে নিয়ে যেতে। এখনো গেলে না।

—শিগ্‌গির যাব। একটু সময় পেলেই যাব।

—রোজ এক কথা। তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও না।

—কে বলল সে কথা। আমি সত্যিই নিয়ে যেতে চাই।

—জান এখন আমি বড় হয়েছি। সব বুঝতে পারি।

—তাই নাকি? তাই তো। অনেক বড় হয়েছ দেখছি। আমার খেয়ালই হয় নি। ঠিক আছে, কালই নিয়ে যাব।

—মনে থাকে যেন। জান আমি শিকার করতে পারি।

—জানতাম না তো? কোথায় শিখলে?

মিসাক্রিস মিটমিট করে হেসে বলে—একা একা। আমাকে তীর ধনুক এনে দেবে?

—সব দেব। সময় হলে সব পাবে। শিকার করতে বুঝি খুব ভালবাস?

—হ্যাঁ। শিকার করতে করতে যুদ্ধ শিখে যাব। যুদ্ধ করে কত জিনিস নিয়ে আসব। তোমার আর মায়ের জন্য অনেক ক্রীতদাস এনে দেব।

—ক্রীতদাসের কথাও জান দেখছি। কে শেখাল?

—কেন, মা গল্প করে। নুবিয়ায় যুদ্ধ করব। পুবের দিকে যাব। হিকসোসরা কোনদিন আসতে পারবে না।

বিস্মিত হতশেপসুত বলে—হিকসোসদের কথাও তোমার মা বলেছে?

—হ্যাঁ। মা বলে পুরুষেরা হবে বীর। তারা যুদ্ধ করবে।

—মা খুব ভাল কথা বলেছে।

—মা বলেছে তুমি খুব ভাল। দেবীর মত তোমার শক্তি।

কথাটা শুনে আসেত-এর ওপর মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে হতশেপসুতের। সে আসেতের পুত্রের হাত ধরে কন্যার কক্ষের দিকে যায়। এ এখন রীতিমত বালক। এর হাত বেশ শক্ত। দেহের গঠন মজবুত। উয়াচমেসও এমন ছিল। এমন একজন পুরুষের স্ত্রী হলে ব্যক্তিত্ব না থাকলেও বোধহয় চলে। ঠিক জানে না সে। এখন সেই অভিজ্ঞতা তার হয়নি। তবে মনে হয়, এর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলে সে অসুখী হবে না।

দুদিন পরে নিজের দুই কন্যা এবং মিসাক্রিসকে নিয়ে হতশেপসুত নীলনদের ওপারে যাবার জন্য যাত্রা করে। সে আসেতকে আনতে চেয়েছিল, আসেত সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে।

হতশেপসুত প্রথমে আসেত-এর এই ব্যবহারকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বলে মনে করেছিল। তাকে বলেছিল—তোমার পুত্র যাচ্ছে, অথচ তুমি যাবে না কেন?

—আপনি যখন রয়েছেন আমার যাবার কোন অর্থই হয় না। আমি না থাকলে ও আপনার সাহচর্য বেশী পাবে। তাতে ওর উপকার হবে অনেক বেশী। আমি গিয়ে আপনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতায় বিঘ্ন ঘটাতে চাই না।

আসেত-এর অভিমত যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়েছিল। তাই তাকে না নিয়েই রওনা হয়।

যাত্রাপথে দেখা গেল মিসাক্রিস একটাও কথা বলছে না। অথচ কন্যা হতশেপসেত অনর্গল কথা বলে চলেছে। এই কথার মধ্যে অতি সাধারণ স্তরের কৌতূহলই বেশী।

হতশেপসুত বালককে প্রশ্ন করে—তুমি কথা বলছ না কেন? বেড়াতে এসে ভাল লাগছে না?

—খুব ভাল লাগছে।

—তাহলে চুপ করে আছ কেন ?

—আমি দেখছি।

—কি দেখছ ?

—আচ্ছা বালির ওপর দিয়ে দৌড়তে মানুষের অসুবিধা হয়, তাই না ?

—কি করে জানলে ?

—দেখলাম। একজন দৌড়চ্ছিল। তখন দেখলাম।

—হ্যাঁ, অসুবিধা হয়।

—কিন্তু ঘোড়ার বোধহয় অতটা হয় না।

—জানি না।

—আমি দেখলাম। ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ করলে সহজে জেতা যায়।

—তোমার এত যুদ্ধ করার ইচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

—যুদ্ধ করলে মানুষ মরে।

—কিন্তু যুদ্ধ না করলে ওরা যদি এসে আমাদের মেরে ফেলে ?

হতশেপসুত কোন উত্তর দেয় না।

কন্যা তখন বলে—ও খুব যুদ্ধের গল্প বলে। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ দেখিয়ে আনবে। আমার কিন্তু ভয় করে।

বালক হেসে বলে—ভয় কিসের ? আমিই তো সঙ্গে থাকব।

শকটের এক কোণ থেকে নেফরুরা আধো আধো কণ্ঠে বলে—আমি যাব।

সবাই হেসে ওঠে।

মিসাফ্রিস তখন বলে—তাই ভাল। আমি ওকে নিয়ে যাব।

হতশেপসুত প্রশ্ন করে—রাখবে কোথায় ?

—আমার শিবিরে।

—শত্রুরা যদি হামলা করে ?

—আমার শিবিরের ওপর ? সাহসই পাবে না।

বালকের আত্মবিশ্বাস হতশেপসুতকে মুগ্ধ করে। কিন্তু এত বেশী ভাল নয়। এ ফ্যারাও হয়ে শুধু যদি দিগ্বিজয়ের নেশায় মাতে তাহলে দেশ উঠতে পারবে না। দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে হলে যুদ্ধ নয়, শান্তির প্রয়োজন। কারণ দেশে শান্তি বিরাজ করলে কৃষকেরা নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কৃষিকাজ করতে পারে। ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যের দিকে মন দিতে পারে।

নদীর ওপারে কিছুদূরে গেলে একটা জলাশয় দেখা যায়। সেই জলাশয়ের কাছে গিয়ে সবাই উপস্থিত হয়।

বালক প্রশ্ন করে—এখানে আমরা কি করব ?

হতশেপসুতের ইঙ্গিতে একজন দেহরক্ষী একটি ধনুক এবং তীর এনে তার হাতে দেয়।

বালক কল্পনাও করতে পারে নি যে সে তীর ধনুক পাবে। তার চোখ মুখ

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে সব কিছু হতশেপসুতের দৌলতে। তার চোখের দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

সে বলে—জানি, তুমি দিয়েছ। কিন্তু এখনো শিখিনি।

একজন এগিয়ে এসে বলে—আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।

হতশেপসুত বালককে বলে—তুমি এখানে শেখ। আমরা একটু ঘুরে আসি।

বালক ঘাড় কাত করে সায় দেয়।

জলাশয়ের ধারের জমিতে কিছু কৃষক কৃষিকাজে রত ছিল। সেখানে যব বোনা হয়েছে। এবারে নদীতে তেমন জল আসেনি। তবু জলাশয়ে জল রয়েছে। যে কোন কারণে হোক এটি গভীর। নদীর খুব নিকটে বলে মরুভূমির উত্তাপ একে একেবারে বিশুষ্ক করে দিতে পারে না। হতশেপসুত লক্ষ্য করে কৃষকেরা কী আপ্রাণ প্রয়াসে শাদুফ দিয়ে জলাশয় থেকে জল তুলে চাষের জমির ভেতরে সিঞ্চনের ব্যবস্থা করছে। শাদুফে জল উত্তোলিত হচ্ছে। সেই জল গিয়ে পড়ছে অতি অগভীর নালার মধ্যে। সেই নালা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে শস্যভূমিতে।

জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রশ্ন করে—ওই অত বড় জিনিসটা জলের মধ্যে ডুবছে আর উঠছে কেন?

—দেখছ না, ওটা জল তুলে নিয়ে এদিকে ঢেলে দিচ্ছে?

—তাতে কি হচ্ছে?

—সেই জল চলে যাচ্ছে খেতের ভেতরে। ফলে মাটি ভিজে উঠছে। তাতে ফসল বাঁচবে।

কথাটা বলেই জ্যেষ্ঠা কন্যার মুখের দিকে চায় হতশেপসুত। কিন্তু সেই মুখে আর কোন আগ্রহের প্রকাশ দেখল না। আর কোন প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হল না। এই কন্যা রূপবতী হলেও তেমন বুদ্ধিমতী কখনো নয়। মাতা অহমেসের মত এখন থেকেই তার সাজগোজের দিকে ঝোঁক। কিন্তু রূপচর্চার দিকে মায়ের প্রচণ্ড আগ্রহ থাকলেও, তাঁর বুদ্ধির দীনতা ছিল না। এখনো এই বয়সেও কালেভদ্রে পশ্চিমের নির্জন কক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি যে সমস্ত প্রশ্ন করেন, তার মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে। কথাবার্তা চালচলনে আজও তিনি সপ্রতিভ। বরং সেই তুলনায় মুতনেফার্ত যথেষ্ট নিষ্প্রভ। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হয় বলেই যেন বেঁচে রয়েছে। পুত্রকে ফ্যারাও হতে দেখার পর ইহজগতের সব কিছুর ওপর থেকে তাঁর আগ্রহ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে যেন।

কৃষকেরা এত বেশী নিবিষ্টভাবে কাজ করে যাচ্ছিল যে তাদের সম্রাজ্ঞী এত নিকটে দাঁড়িয়ে রয়েছে, খেয়াল করেনি তারা। তাদের জলোত্তলনের মধ্যে একটা ছন্দ ছিল। সেই ছন্দের যাদু হতশেপসুতকেও আবিষ্ট করে রেখেছিল। এক-সময় ওদের বোধহয় বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। সেই সময় মুখ তুলে চেয়ে দেখে সম্রাজ্ঞী স্বয়ং দেখছেন তাদের কাজ।

কাজ ফেলে তারা এগিয়ে এসে অভিবাদন জানায়।

—যব কেমন হবে ?

—ভাল হবে। তবে নদীতে জল নেই। নদীর দুই পাশের অবস্থা ভাল নয়।

—এ বছর খারাপ বছর। অন্ধকারের দেশের কুপ্রভাবে নদীর জল বাধা পেয়েছে। তোমাদের খুব কষ্ট হবে। তবে মরতে দেব না কাউকে। আগামী বছরে আবার সুদিন ফিরে আসবে।

কৃষকেরা যেন স্বয়ং আইসিসের মুখের বাণী শুনছে। তাদের চোখে মুখে স্বস্তির লক্ষণ। তারা সম্রাজ্ঞীকে চেনে। দূর থেকে কত সময় দেখেছে। কিন্তু এত কাছাকাছি কখনো দেখেনি। দেবীর অঙ্গের সুঘ্রাণ তাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে শরীরকে স্নিগ্ধ করে দিচ্ছে। যেন নতুন বল পেল তারা।

দুই কন্যা হাঁ করে কৃষকদের দিকে চেয়ে থাকে। প্রাসাদে এধরনের মানুষকে তারা কখনো দেখে না। এত ঘর্মাক্ত ও কর্দমাক্ত দেহ কখনো দেখেনি তারা। এত স্বল্পবাস পরিহিত মানুষকে দেখতে তারা অভ্যস্ত নয়।

কনিষ্ঠা কন্যা বলে—মা এরা এমন কেন ?

হতশেপসুত গম্ভীর হয়ে বলে—কাজ করছে বলে।

কনিষ্ঠা কন্যার কৌতূহলের নিবৃত্তি হলেও জ্যেষ্ঠা কন্যার হয় না। সে বলে—কাজ করলে এমন বিশ্রী হয় ?

কৃষকেরা কি করবে ভেবে পায় না।

হতশেপসুত বলে—বিশ্রী কোথায় ? এরা কাজ করে বলে ফসল ফলে। সেই ফসল খেয়ে মানুষ বাঁচে।

—এই কাজ ভাল নয়।

হতশেপসুতেরও রোখ চেপে যায়। কন্যার বয়স যত কমই হোক তার উক্তি কৃষকদের আহত করেছে। সুতরাং নিজের বক্তব্যটুকু বলতেই হবে। সে বলে—এই কাজ সবচেয়ে ভাল। এর চেয়ে ভাল কাজ পৃথিবীতে নেই। যুদ্ধজয়ের চেয়েও এই কাজ ভাল। এই কাজ এত ভালু যে হাপি দেবতা এদের সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। ওসিরিসের আশীর্বাদ রয়েছে এদের ওপর। তুমি খুব ছোট বলে জান না।

—হাত পায়ে অত নোংরা কেন ?

হতশেপসুত যারপরনাই বিরক্ত হয়। কন্যা যেন তাকে অপদস্থ করার জন্য বদ্ধপরিকর। সে বলে—ওকে নোংরা বলছ তুমি ? ওই নোংরা দেবদেবী সবচেয়ে ভালবাসেন। কারণ ওর মধ্যেই রয়েছে আমাদের জীবন। ওই মাটির মধ্যে রয়েছেন ওসিরিস স্বয়ং। বড় হও বুঝতে পারবে।

কৃষকেরা মুগ্ধ হয়ে সম্রাজ্ঞীর কথা শোনে। এত ভাল ভাল কথা তারা জীবনে কখনো শোনেনি। এত সুন্দর আর মিষ্টিভাবে যে কথা বলা যায় তাদের ধারণার অতীত ছিল।

হতশেপসুত তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলে।

সেই সময় বালক মিসাফ্রিসের চিৎকার শুনতে পায়। পেছন ফিরে দেখে বালক আনন্দে চিৎকার করছে। হাত তুলে তাদের ডাকছে।

কৌতূহলী সম্রাজ্ঞী এগিয়ে যায়। কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে—কি হয়েছে ?

মিসাফ্রিস হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে—পাখি মেরেছি।

হতশেপসুত অবাক হয়। কোনদিন যে তীর নিক্ষেপ করেনি তার পক্ষে এত কম বয়সে কি লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব ?

যার তত্ত্বাবধানে তাকে রেখে গিয়েছিল তার দিকে চাইতেই সে সমর্থন করে বলে—হ্যাঁ দেবী, বালক যথার্থ বলেছে। অদ্ভুত এর প্রতিভা। দুবার দেখিয়ে দিতে নিজেই তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। তারপর আমার কাছে জানতে চাইল, কোন্ বস্তুকে বিদ্ধ করবে। আমি একটা পাখিকে দেখিয়ে দিলাম। তীরবিদ্ধ পাখিটা জলের মধ্যে পড়ে রয়েছে।

সম্রাজ্ঞী বালকের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ভাবে, এ মসনদে বসে রাজ্যশাসনের ছেলে নয়।

মিসাফ্রিস ভেবেছিল, হতশেপসুত খুব বাহবা দেবে তাকে। কিন্তু তেমন কোন লক্ষণ না দেখে বলে—তুমি রাগ করেছ ?

—রাগ করব কেন ? আমার খুব আনন্দ হয়েছে। বড় হলে তুমি মস্ত বীর হবে।

জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দেখিয়ে বালক বলে—ও কিছু বলছে না তো ?

—ও এসব বোঝে নাকি ?

হতশেপসেত মায়ের কথায় রাগ করে বলে ওঠে—বুঝি না আবার। ওই তো পাখিটা এখনো ভাসছে। এর গায়ে এত জোর, এর সঙ্গে আমি খেলব না।

বালক তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—কেন ? গায়ে জোর আছে বলে তোমাকে মারব নাকি ? তুমি কি পাখি ?

—আমি জানি তীরধনুক দিয়ে যুদ্ধে মানুষ মারে।

—আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব নাকি ? যা তা বলছে। তোমাকে শিখিয়ে দেব।

—আমি শিখতে চাই না।

—কেন ?

—হাতে নোংরা লাগবে।

বালক হেসে ওঠে।

সেন-মুত সারা দেশের মন্দিরে মন্দিরে কাজ করে বেড়াচ্ছে। লুক্সর ও কর্নক, কোপটাস ও ডেনডেরা, অবিদস ও দিওসপোনিস ইত্যাদি যেখানেই রয়েছে দেবদেবীর মন্দির সর্বত্র যাচ্ছে সে। সর্বত্রই সংস্কারের অভাবে, বহু মূর্তির বহু সৌধের জীর্ণ দশা।

সেন-মুত অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সেগুলি সংস্কারে হাত দিয়েছে। সে সারা দেশ থেকে নিজে নির্বাচিত করে গড়ে তুলল একটি সুদক্ষ দল। এরা কেউ ভাস্কর, কেউ চিত্রকর, কেউ বা স্থপতি বিদ্যায় সুনিপুণ। কারও বিদ্যালয়ের শিক্ষা আছে, কারও রয়েছে শুধু অভিজ্ঞতা। আবার এমন কয়েকজন রয়েছে,

যাদের শিক্ষাও নেই, অভিজ্ঞতাও নেই, রয়েছে শুধু প্রতিভা। সেন-মুত জানে, এদের সবাইকে কার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে। তাই এদের নিয়ে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরছে সে।

ঘুরতে ঘুরতে সে অনুভব করে সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন একবার। কোন কাজ কত দূর অগ্রসর হয়েছে, কোন কাজ শেষ হয়েছে সব কিছু বিস্তারিত ভাবে জানানো প্রয়োজন। কিন্তু সে এখনো ভরসা পায় না নিজে থেকে যেতে। অথচ সে না গেলে তাকে সম্রাজ্ঞী ডেকে পাঠাতেন এটাও প্রত্যাশা করা যায় না।

অবশেষে রাজধানীতে গিয়ে হাপু-সেনেবের সঙ্গে দেখা করে। হাপু-সেনেব সব কিছু শুনে বলে—এসে ভালই করেছ। মাঝে মাঝে সম্রাজ্ঞীকে কাজকর্ম সম্বন্ধে জানানো তোমারই কর্তব্য।

—আমি সাহস পাইনি।

—সেকি! তুমি তো সম্রাজ্ঞীর প্রিয়পাত্র।

—আমি?

—হ্যাঁ, তোমার সম্বন্ধে কথা উঠলে বোঝা যায়।

—কিন্তু আমার সঙ্গে তো তেমন পরিচয় হয়নি।

—প্রিয়পাত্র হতে হলে সব সময় ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন হয় না। তোমার কাজ তাঁকে খুশী করেছে।

—নিজে এখনো দেখেননি।

—খবর পেয়েছেন। নিজে নিশ্চয় যাবেন একদিন।

—তাহলে খুব ভাল হয়। আমিও উৎসাহ পাই।

—কাল সকালে এসো। আমি ব্যবস্থা করে রাখব। তুমি নিজেই তখন বলো সেকথা।

পরদিন পূর্বের সেই একই কক্ষে সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দেখা হয়। কাজকর্ম সম্বন্ধে নানা খোঁজখবর নেয় হতশেপসুত। সেন-মুত আগ্রহের সঙ্গে সবকিছু বলে।

সে বিনয়ের সঙ্গে বলে—আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার কাজ একবার পরিদর্শনে যান, আমরা খুবই উৎসাহিত হব।

—আমার যাবার ইচ্ছা কম নয়। একটু সুযোগ পেলেই যাব।

সব কিছু নিয়ে বিস্তারিত কথা বলার পর সেন-মুতের বলার আর কিছু থাকে না। এবারে কি তাহলে বিদায় নেওয়া উচিত? কিন্তু সম্রাজ্ঞী নিজে থেকে না বললে সে কি করে চলে যাবে?

বোধহয় তার মনোভাব বুঝতে পারে সম্রাজ্ঞী। সে বলে—আপনি ব্যস্ত হবেন না যাবার জন্য। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

সেন-মুত লজ্জা পায়। তবে সে নিশ্চিন্ত হয়।

—আপনি যাদের সঙ্গে কাজ করছেন, তাদের কেমন মনে হয়?

—বেশ ভাল। দক্ষ এবং পরিশ্রমী। সবচেয়ে বড় কথা তারা তাদের নিজের নিজের কাজকে ভালবাসে।

—আপনাকে যদি বলা হয় নতুন একটা দেবালয় নির্মাণ করতে আপনি সাহসী হবেন সে কাজ হাতে নিতে ?

—অবশ্যই। আমার জীবনের স্বপ্নই তাই।

—কত বড় দেবালয় নির্মাণ করা আপনার স্বপ্ন ?

—অবিদসের মন্দির।

হতশেপসুতের মুখে এতক্ষণে ফিকে হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে—তাহলে আপনাকে দিয়ে হবে না।

—কেন দেবী ?

—আমি চাই অবিদসের মন্দিরের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড় মন্দির। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ সেই মন্দির দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

সেন-মুত স্থান কাল পাত্র সব বিস্মৃত হয়। সে উঠে দাঁড়িয়ে একটু উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে—আমি অবশ্যই পারব। সমস্ত দেশ জুড়ে একটা সুবিশাল মন্দির যদি গড়তে দেওয়া হয়, আমি অবশ্যই পারব। আমার সেই সাহস আছে।

—কাজে হাত দিয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসবেন না ?

—না দেবী, আপনি আমাকে দিয়ে পরীক্ষা করুন। আপনার স্বপ্ন আমি সফল করে তুলব। আমার স্বপ্ন আপনার মত অতটা সাহসী ছিল না। কারণ আমার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু আপনি যখন আমার সহায় তখন আমি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারব।

—বেশ আপনি একটা নকশা তৈরী করুন।

—কিন্তু কোথায় হবে সেই মন্দির ? স্থানটি না দেখলে নকশা তৈরী করা অসুবিধা।

—বলছি। তবে এই কথা এখন যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও না জানে। মন্দিরটি হবে দার-এল-বাহারিতে।

—আমি কালই সেখানে যাব।

হতশেপসুত আরও কিছুক্ষণ কথা বলল সেন-মুতের সঙ্গে। তারপর কথা শেষ করে যখন ভেতরে চলে যায় তখন সেন-মুত প্রাসাদ ছেড়ে রাস্তায় নামে। সে আজ ভাসতে ভাসতে চলে যেন। স্বপ্ন দেখতে দেখতে চলে সে। ভাবে পুরাকালে ইমহোটেপ যা পেরেছেন, একালে সে পারবে না কেন ? তখন তিনি রাজকীয় আনুকূল্য পেয়েছিলেন। এখন সে-ও পাচ্ছে। ইমহোটেপের কীর্তির মত তার কীর্তিও অবিনশ্বর হবে না কেন ? ইমহোটেপকে অতিক্রম করার জন্য তাঁরই আরাধনা করে সে। তাঁর সহায়তা চায়।

পুন্তদেশের সঙ্গে ব্যবসা ভালই চলতে থাকে। অনেক দ্রব্য আসে। আসে কত রকমের সুগন্ধি। হতশেপসুত জানে তার দেশের অবস্থিতি এমন একটি স্থানে যা বাণিজ্যের পক্ষে আদর্শ। নীচের দিকে সাক্কারা, মেমফিস আর গিজা ছাড়িয়ে আরও উত্তরে বিশাল সমুদ্র। সেই সমুদ্রের আশেপাশে কত দেশ। আবার অন্ধকার দেশের দিকে রয়েছে হাত্তিতি, সিরিয়া এবং আরও কত জনপদ। তাদের

সঙ্গে এদেশের উৎপাদিত সামগ্রীর বিনিময়ে কতরকমের বাণিজ্য করা যেতে পারে। দেশের নীলনদ তো বাণিজ্যের প্রশস্ত রাজপথ। আর জলযান হল সেই রাজপথের মালবাহী শকট। এতে স্থলপথে চলা শকটের চেয়ে অনেক গুণ বেশী পণ্য বহন করা যেতে পারে এবং অতি সহজে। সমুদ্রের পাশের দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা করতে হলে নুবিয়া থেকে নৌকা করে কাটাখাল দিয়ে সমুদ্রের উপকূলে নিয়ে যাওয়া যায়। এমন দেশ আর কোথায় আছে? পিতা বলতেন, পূর্বের দিকেও দুটি বড় নদী রয়েছে। তাদের নাব্যতা থাকলেও এতটা উপযোগী নয়। তাছাড়া সেই নদীর দুই কূলে এত ফসল ফলে না। বাণিজ্যের পক্ষে খুব একটা উপযোগীও নয়। তবে নদীর আনুকূল্য সব দেশই গ্রহণ করে। ওই সব দেশও করে নানাভাবে।

তাছাড়া নৌকা তো এদেশের একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। নদীর জল যখন দুকূল প্লাবিত করে তখন নীচের দিকে যেখানে নদী অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে সেখানে ওই সময়ে পায়ে হেঁটে বা শকটে কোথাও যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। নৌকাই তখন এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাবার একমাত্র ভরসা। হতশেপসুত জানে, পুরাকালে এদেশের মানুষ প্যাপাইরাস দিয়ে নৌকা তৈরী করত। অসংখ্য প্যাপাইরাসের নল বা শর একসঙ্গে বেঁধে তার ওপর পিচের আস্তরণ দিয়ে দিত যাতে ভেতরে জল প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু এই সমস্ত নৌকা সাধারণত ধীবরেরা ব্যবহার করত মৎস্য শিকারের জন্য। কিংবা এই নৌকায় তারা নীচের জলাভূমির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করত। অথবা খেয়া পারাপারের জন্যও এর প্রচলন ছিল। এমন কি এই সময় অন্য কোন রকমের নৌকার অস্তিত্ব ছিল না বলে সমুদ্রযাত্রার মত দুঃসাহসিক অভিযানেও প্যাপাইরাসের নৌকা ব্যবহৃত হয়েছে। হতশেপসুত প্রাসাদের পুস্তকালয়ের অসংখ্য গোটানো প্যাপাইরাসের কিতাব ঘাঁটতে ঘাঁটতে এর প্রমাণ পেয়েছে।

কাষ্ঠনির্মিত জাহাজ প্রথম সমুদ্রযাত্রা করে ফ্যারাও স্নেফরুর রাজত্বকালে। তিনি ষাটটি জাহাজের একটি নৌবহর নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে যুদ্ধবিগ্রহের নামগন্ধ ছিল না। তাই তিনি তাঁর পোতবহরকে নিয়োজিত করেছিলেন প্রধানত কাষ্ঠ ও অন্যান্য পণ্য আমদানীর জন্য। একবার তো চল্লিশটি নৌকা বোঝাই কাঠ আমদানী করেছিলেন স্নেফরু।

হতশেপসুত দেশের এইসব ইতিহাসের কথা জানে। সে আরও জানে এখন যেমন ফ্যারাওদের সমাধিস্থল নির্মিত হয় পশ্চিমের রাজকীয় উপত্যকার পূর্বে ফ্যারাওদের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল অবিদস। কারণ সেখানে রয়েছেন প্রিয়তম দেবতা ওসিরিস। ফ্যারাওদের দেহ নৌকা করেই সেখানে নিয়ে যাওয়া হত। ফ্যারাও-এর সমাধিস্থলের নিকটে কাষ্ঠনির্মিত নৌকাও প্রোথিত করা হত। কারণ ধর্মে নৌকার গুরুত্ব অপরিসীম। স্বয়ং সূর্যদেবতা আকাশ পরিক্রমা করেন একটি নৌকায়। সেই নৌকাতেই তিনি রাত্রিকালের দেশগুলি অতিক্রম করেন। অমন রা-এর রয়েছে নৌকা-সদৃশ একটি উপসনাস্থল। নৌ-সদৃশ মন্দির অনেক দেবতারই পছন্দ।

তবে ধর্মীয় কারণে বা নৌভ্রমণের জন্য নৌকা যতই ব্যবহৃত হোক না কেন তাকে প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যের জন্যই ব্যবহার করা হত। বিভিন্ন দেশ থেকে আসত মৃন্ময় পাত্র, আসত তাম্র, নীলকান্ত মণি আর নীলা। নানা জাতের বৃক্ষাদিও আসত। আমদানী করা হত গব, আঙুর ইত্যাদি খাদ্যবস্তুও। সমুদ্রের উপকূল ছাড়াও সমুদ্রের মধ্যে যে সমস্ত দ্বীপ রয়েছে সেখান থেকে অনেককিছু আমদানী করা হত।

পুস্তকালয় হতশেপসুতের অতি প্রিয় স্থান। তার মনে এই পাঠাভ্যাসের সৃষ্টি করেছেন হেকারনেহেহ্। আজ তিনি নেই। কিন্তু তাঁর প্রভাব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে তার ওপর। আজও সে এই পুস্তকালয়ে বসেই এত আকাশ পাতাল ভাবছে। এখানে কন্যা হতশেপসেত নেই, নেফরুরা নেই। ফ্যারাও দ্বিতীয় থুথমসও সচরাচর এখানে আসে না। এখানে এলে প্যাপাইরাসের গন্ধে নাকি তার গা গুলায়। স্থানটি নিরাপদ।

আজ কিন্তু এখানে এসে উপস্থিত হয় নেসামুন। কখনো সে আসে না। তাকে দেখে রীতিমত বিরক্ত হয় হতশেপসুত।

—এখানে কেন?

—ছোট রাজকুমারীর বাঁদী বলল, রাজকুমারী দুবার বমি করেছেন।

—কি খেয়েছিল?

—নতুন কিছু নয়। রোজ যা খান।

—হকিমকে খবর পাঠানো হয়েছে?

—আমি বলে এসেছি ডাকতে।

—যাচ্ছি একটু পরে।

—ছোট রাজকুমারী খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন।

—দুবার বমি করেই কাতর হয়ে পড়েছে? চল।

অতিমাত্রায় অসন্তুষ্ট হয়ে নেসামুনের সঙ্গে হতশেপসুত বের হয়ে আসে পুস্তকালয় থেকে। আরও অনেকক্ষণ তার ওখানে অতিবাহিত করার ইচ্ছা ছিল।

নেফরুরার কক্ষে তখনো হকিম আসেনি। বাঁদী কন্যার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে অশ্রুবিসর্জন করে চলেছে। কারণ সে ভালভাবে জানে রাজকন্যা বাঁচলেও তাকে প্রাসাদ থেকে দূর করে দেওয়া হবে। বিতাড়িত করা হলে সে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে। কারণ পৃথিবীতে তার কোন আত্মীয় নেই। অন্য একজন বাঁদীর হাত ধরে অল্পবয়সে সে এখানে এসেছিল। দেখতে সে বেশ সুশ্রী। তাকে সবাই আশা দিত ভাগ্য ভাল হলে হারেমে জায়গা মিলে যেতে পারে। কিন্তু তার ভাগ্য খুবই খারাপ। তাই বিতাড়িত হবার ভয়ের চেয়েও সে শঙ্কিত হচ্ছে তাকে হয়ত চরম শাস্তি দেওয়া হবে। অথচ সে অন্যায় কিছু করেনি। সে ভেবেছিল যে সুগন্ধি তেল রাজকুমারীর সর্বাঙ্গ অমন সুবাসিত করে তোলে, তার থেকে দুচার ফোঁটা পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে সর্বদেহ চিরকালের জন্য সুবাসিত হয়ে থাকবে। তাই মিশিয়ে দিয়েছিল। তাতে কি এমন হতে পারে?

হতশেপসুত কন্যার অবস্থা দেখে চমকে ওঠে। চোখ একেবারে বসে গিয়েছে। মুখ রক্তশূন্য। তাড়াতাড়ি কন্যার পাশে বসে পড়ে তার নাম ধরে ডাকে।

নেফরুরা কোনরকমে নাকিসুরে উত্তর দেয়।

—খুব কষ্ট হচ্ছে ?

—হুঁ।

—কি খেয়েছিলে ?

—গন্ধ।

—গন্ধ ?

নেফরুরা আর কথা বলতে পারে না।

হতশেপসুত অবাক হয়। গন্ধ আবার কি ? বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করে—কি দিয়েছিলে ?

—দুধ।

—গন্ধের কথা বলছে কেন ?

—আমি জানি না।

সেই সময় হকিম এসে প্রবেশ করে ব্যস্ত হয়ে। এসেই রোগীকে দেখে সে চমকে ওঠে। বলে—এ যে সাংঘাতিক অবস্থা। কি খেয়েছিল ?

বাঁদী বলে—দুধ।

—কখন দিয়েছিলে ?

—অনেকক্ষণ হল।

—কোন্ পাত্রে দিয়েছিলে ?

বাঁদী কক্ষের দ্বারের পাশে একটি উচ্চস্থান দেখিয়ে দেয়।

হকিম উঠে গিয়ে সেই পাত্রটি হাতে নেয়। সেটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তারপর তার ভেতরের ঘ্রাণ নেয়।

—একি ?

হতশেপসুত বলে ওঠে—কি হয়েছে ?

হকিম পাত্রটি এনে সম্রাজ্ঞীকে দেয়। হতশেপসুত সেটি শুঁকে দেখে সদ্য পুন্তদেশে থেকে আনা আতরের গন্ধ।

—আতর এর মধ্যে ঢালল কে ?

বাঁদী নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

হকিম ইতিমধ্যে চিকিৎসার সব রকমের চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু কিছুই করা গেল না। অল্প সময়ের মধ্যে নেফরুরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

বাঁদীকে সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদরক্ষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সবাই জানে চরম শাস্তি এর হবে।

হতশেপসুত শক্ত হয়ে বসে থাকে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মৃত কন্যার ক্ষুদ্র দেহের দিকে। কন্যার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন আর নেই। ঘুমিয়ে রয়েছে যেন। শুধু একটুখানি ক্লান্তি লেগে রয়েছে ওষ্ঠদ্বয়ের পাশে।

হতশেপসুত ত-আর্ত দেবীকে মনে মনে প্রশ্ন করে—এমন হবার তো কথা ছিল না। পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ থেকে এত তাড়াতাড়ি এই শিশু কেন বঞ্চিত হল? এর হৃদয় নিষ্কলুষ। মানদণ্ডের ওপর যখন সেটি রক্ষিত হবে তখনই বোঝা যাবে। এত ক্ষুদ্র শিশুর মধ্যে কখনো কোন পাপ প্রবেশ করতে পারে না। অনুবিস হৃদপিণ্ডকে মানদণ্ডের ওপর রাখার পূর্বেই দেবতা থথ কন্যাকে পাঠিয়ে দেবেন ওসিবিসের কাছে। বিচারের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এখানে ও যে শূন্যতার সৃষ্টি করে গেল তার পূরণ হবে কি করে? হতশেপসুতের হৃদয়ের ভেতরে হাহাকার করে ওঠে। এই কন্যা তার বক্ষের অনেকখানি জুড়ে ছিল। একে ঘিরে তার অনেক স্বপ্ন ছিল। কারণ এ ছিল অসাধারণ।

প্রাসাদে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়ে জ্যেষ্ঠা ভগিনী হতশেপসেত ছুটে এসে নেফরুরার কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে—তুমি ফিরে এস। আমি একা একা থাকতে পারব না। আমার সঙ্গে খেলা করবে কে? মিসাক্রিস তো সব সময় থাকে না।

একসময় আসেত-ও পুত্রের হাত ধরে মৃতার শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ায়। নিদারুণ যন্ত্রণায় তার বুকের ভেতরে কেমন করে। মিসাক্রিসও স্তম্ভিত।

অবশেষে শিশুর দেহ সমাধি করার পূর্ব-প্রস্তুতির জন্য সেই বিশেষ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়।

হতশেপসুতকে সমস্ত সময় অমন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখে আসেত বলে—অমন কন্যা কয়জন পায়? ওকি যেতে চেয়েছিল। ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হয়ত অনুবিসের প্রিয়পাত্রী ছিল। সেখানে ভালই থাকবে। পরিশ্রমসাধ্য কোন কাজ করতে হবে না।

আসেত-এর কথা শুনে তার প্রতি অনুকম্পা হয় হতশেপসুতের। কারণ সে বুঝতে পারে আসেত তাকে কাঁদাতে চেষ্টা করছে। কাঁদলে দুঃখের লাঘব হয়। কিন্তু সে তো সাধারণ নারী নয়। সে যে ফ্যারাও। অত সহজে কাঁদলে তার চলে না। নিজের কন্যার মৃত্যু হলেও নয়। হয়ত কাঁদত, যদি উয়াচমেস বেঁচে থাকত। কিংবা যদি উয়াচমেসের মৃত্যু তার সবটুকু অশ্রু নিঃশেষ করে না দিত। সেবারে যতটা অশ্রু নির্গত হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী অশ্রু দেহের মধ্যেই উত্তাপে শুকিয়ে গিয়েছিল।

নেফরুরার কা এবং বা দুই-ই এখন কক্ষের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। শ্মশ্রুগুম্ফ সমন্বিত পক্ষিরূপী বা সামনে বাতি নিয়ে ঘুরছে নিশ্চয়। আজ কনিষ্ঠভ্রাতা অমেনমেস বেঁচে থাকলে ঠিক দেখতে পেত। কিন্তু সে তো নেই। কন্যার কা দেহের পাশেই রয়েছে। সে তো বা-এর মত পরে পরলোকে চলে যায় না। পৃথিবীতে দেহের পাশেই থাকে তার চিরসাথী হয়ে।

সত্তর দিন পরে নেফরুরার দেহ সমাধিস্থ করে তোলার উপযুক্ত করা হয়। হতশেপসুতের নির্দেশে তার জন্য একটি নতুন ধরনের শবাধার নির্মাণ করা হয়, যা আগে কখনো হয়নি। এতদিন কাষ্ঠনির্মিত শবাধারের প্রচলন ছিল। পিতার মৃত্যুর সময়ে সেই শবাধারকে কারুকার্যখচিত করার ব্যবস্থা করেছিল

হতশেপসুত। কিন্তু এবারে কাষ্ঠ নয়, প্রস্তরদ্বারা নির্মিত হল শবাধার। সেই শবাধারের সর্বাঙ্গে সুন্দর সব খোদাই করা মূর্তি, ফুল গাছপালা পাথর কেটে অঙ্কিত করা হল। সে বলেছিল নেফরুরার শবাধার যেভাবে নির্মিত হল সেই-ভাবে এবার থেকে যেন সব শবাধারই নির্মিত হয়।

বছরের পর বছর অতিবাহিত হতে থাকে। দেশে শান্তি অটুট। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুসময় চলছে। বিদেশী বণিকদের রাস্তাঘাটে আনাগোনা। নৌ-যান চলেছে সাগরের দ্বীপগুলিতে। স্থলপথে বেদুইনদের আস্তানা পার হয়ে পুবের দিকে হাতিতি প্রভৃতি দেশেও চলেছে এ দেশের বণিকেরা। বড় রকমের যুদ্ধ-বিগ্রহের আশু সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় থুথমস খুব সুখে রয়েছে। সামান্য যেটুকু বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে বা বেদুইনদের উৎপাত যতটুকু হচ্ছে তাকে দমন করতে বিরাটাকারের সৈন্য অভিযানের প্রয়োজন হচ্ছে না।

হতশেপসুত জানে, আজ যদি তার পিতা জীবিত থাকতেন তাহলে চবরোসের মত অমন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতেন না। তিনি বেরিয়ে পড়তেন দেশের সীমানা বিস্তারের জন্য। তিনি এবং তাঁর পিতাও নাকি বলতেন মাঝে মাঝে অন্য দেশ আক্রমণ না করলে শান্তি স্থায়ী হয় না। অন্যান্য দেশ ভাববে, মিশর দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা তখন ঘোঁট পাকাতে থাকবে। এইভাবে শেষে তারা অনেক সময় দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণও করে বসে। অতীতে অনেকবার এমন হয়েছে। তখনই দুবার মিশরের পতন ঘটে। সারা দেশে নেমে আসে অশুভ ছায়া। কয়েক শতাব্দী এর জন্য অসীম দুর্ভোগের মধ্যে যেতে হয়।

কিন্তু চবরোস উদ্যোগী পুরুষ নয়। সবচেয়ে বড় কথা, সে হল কাপুরুষ। যুদ্ধে যাবার হিম্মত তার কতটুকু সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সেই সিংহ শিকারের দিনের কথা জীবনেও ভুলবে না হতশেপসুত। সে যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক বলে আজও অসন্তুষ্ট নয় হতশেপসুত। কারণ সে নিজেও যুদ্ধের বিরোধী। যুদ্ধে জয় ঘটলেও মিশরীয় ঐতিহ্যে বাইরের স্পর্শ লাগে। বাইরের নতুন অনেক কিছু রপ্ত করে আসে সৈন্যবাহিনী এবং সেগুলো ধীরে ধীরে এদেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে যায়। হতশেপসুত এটা সহ্য করতে পারে না। তার একান্ত কাম্য হল বাইরের স্পর্শ বাঁচিয়ে মিশরের প্রাচীন ঐতিহ্য অটুট থাকুক। সে জানে দীর্ঘদিন অলসভাবে বসে থাকতে থাকতে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একটা অসন্তোষ ধিকিধিকি জ্বলছে, যার জন্য সেনাধ্যক্ষরাও স্বস্তিতে নেই, তারা কয়েকবার ফ্যারাওকে বলেছে কোন একটি অভিযানের ব্যবস্থা করতে। তবু মন থেকে সায় পায় না হতশেপসুত। থুথমস এই প্রসঙ্গ যতবার তার কাছে তুলেছে সে বলেছে—"ওরা তো কত কথাই বলে থাকে। সবকিছুকে অত গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই।" চবরোস তার কথায় সন্তুষ্ট হয়।

দার-এল-বাহরিতে দেবালয় নির্মাণের বিষয়ে এ পর্যন্ত দ্বিতীয় থুথমসের সঙ্গে কোন আলোচনা হয়নি তার। মনের ইচ্ছা এতদিন সঙ্গোপনে রেখেছে সে। একমাত্র সেন-মুত জেনেছে অনেক আগেই। তারপর সে ঘুরে দেখে এসেছে

স্থানটি। কিন্তু নকশা তৈরী করার আগেই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নীচে মেমফিসে। সেখানে গিয়ে সে আটকে পড়েছে। অনেক কাজ সেখানে।

থুথমস এখন সদয় রয়েছে হতশেপসুতের ওপর। কারণ সে স্বামীর যুদ্ধযাত্রায় সায় দেয়নি। তাই সুসময় ভেবে দার-এল-বাহরির প্রসঙ্গটা তার কাছে উত্থাপন করে। কারণ যুগ্ম ফ্যারাও রূপে তার নিজের প্রভূত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দার-এল-বাহরির কাজের মত অতবড় এক কর্মকাণ্ডের শুরুতে উভয়ের মধ্যে বিশেষ বোঝাপড়া থাকা প্রয়োজন। কোনভাবে থুথমসকে অসন্তুষ্ট রাখা চলবে না। সে তাহলে কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। কোন গঠনমূলক কাজ করতে না পারলেও, কাজ ভণ্ডুল করার ব্যাপারে তার বিশেষ পারদর্শিতা আছে।

বহুদিন পরে সভাকক্ষ থেকে তার সঙ্গে বাইরে এসে হতশেপসুত থুথমসকে নিয়ে উদ্যানের দিকে চলতে থাকে।

—এদিকে কোথায় চললে ?

—কেন ? এই পথ কি তোমার অজানা ?

—তা নয়। তবে এখন এই অবেলায় কিনা।

—অবেলাতেই তো এদিকে আসতে হয়। অবশ্য তোমার আবার এখন হারেমে যাবার অভ্যাস। কত সুন্দরী আকুল হয়ে বসে রয়েছে তোমার প্রতীক্ষায়।

—হয়ত আছে। তাতে আমার অত মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তোমাকে কখনো এদিকে আসতে দেখি না।

—আজ ইচ্ছা হল।

—আমাকে নিয়ে এলে কেন ?

—ক্ষতি কি ? আগের কথা ভুলে গেলে ?

—ভুলব কেন ?

—তবে ? এক একবার অতীতের মধ্যে ডুবে যেতেও তো ইচ্ছা হয়। ধর, আমার বয়স যখন ষোল, সেই সময়ের কথা।

—আমার কোন সুখস্মৃতি নেই সেই সময়ের। তুমি আমাকে বিষনজরে দেখতে। উয়াচমেসের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ তখন।

—অমনভাবে বলছ কেন ? উয়াচমেস তখনো প্রেমের মর্যাদা সেভাবে বুঝতে শেখেনি। সে অতটা পরিণত হয়ে ওঠেনি তখনো।

—ওই একই কথা। তখন না হোক তার কিছুদিন পরে।

হতশেপসুত বুঝতে পারে, যে কোন কারণেই হোক মানুষটার মন মেজাজ ভাল নেই আজ। হয়ত সেনাপ্রধান আজও তাকে বলেছে আবার কোন অভিযানের ব্যবস্থা করতে। পিতা জীবিত থাকতেই সে নিজে যেচে সেনাবাহিনীর ভার নিয়েছিল। তখন অবশ্য তার একার দায়িত্ব ছিল না। ফ্যারাও হয়ে সব দায়িত্ব যদিও এখন তার, তবু বাণিজ্য এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের মত বাহিনীর দায়িত্বভার তাকে দিতে পারলে বোধ হয় বেঁচে যায়।

—চল সরোবরের সোপানে গিয়ে বসি।

থুথমস একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—তোমার কি হয়েছে বল তো?

—কিছুই হয়নি। মাঝে মাঝে নূতনত্বের স্বাদ একটু নিতে হয়। নইলে জীবন বড় একঘেঁয়ে হয়ে ওঠে। তোমার ক্লান্তি আসে না কখনো?

—ভেবে দেখিনি।

ক্লান্তিটা ভেবে দেখার বিষয় নয়।

—তোমরা মেয়ে, এসব কাজে তোমরা অভ্যস্ত নও। তাই অমন হয়।

কথাটা শুনে হতশেপসুতের ভেতরে জ্বলে ওঠে। কিন্তু মুখে তার প্রকাশ না ঘটিয়ে হেসে বলে—তোমার অনুমান বোধহয় ঠিক।

স্ত্রীর উত্তরে থুথমস আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

হতশেপসুত তখন বলে—আমি ভাবছি, আমার কাজগুলো তোমাকে দিয়ে আমি একটা বিশেষ কিছু করব।

—সেটা কি?

—একটা খুব বড় দেবালয়। আমার ছেলেবেলার স্বপ্ন, আমার যৌবনের সাধ, এমন একটি মন্দির যা দেখে দেশবিদেশের সবাই চমৎকৃত হবে। তাতে অনেক শ্রমিক লাগবে। অনেক ব্যয় হবে তাতে। তুমি আমার সহায় হবে তো?

থুথমস কোনরকম দ্বিধা না করে চটপট্ জবাব দেয়—না।

এত তাড়াতাড়ি এই ধরনের উত্তর হতশেপসুতের প্রত্যাশার অতীত ছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মত নারীরও কথা বন্ধ হয়ে যায়। খুব দ্রুত সেই হতচকিত ভাব কাটিয়ে উঠে সে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে—তুমি রসিকতা করছ।

—মোটেই না।

এবারে হতশেপসুত লক্ষ্য করে থুথমসের মুখের সেই কঠিন রেখাটি বিশ্রীভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। ওদিকে চাইতে পারে না সে। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে—আমি তো অন্যায় কিছু করতে যাচ্ছি না। তবে তুমি এমন করছ কেন?

—তুমি বুদ্ধিমতী হতে পার, তাই বলে আমাকে একেবারে মূর্খ ভেব না। তোমার উদ্দেশ্য আমার কাছে স্পষ্ট।

—উদ্দেশ্য? দেবালয় নির্মাণে উদ্দেশ্য?

—অবশ্যই।

—কি সেই উদ্দেশ্য?

—সবাই তোমার নাম করবে। তোমার মৃত্যুর পরেও তোমার নাম থেকে যাবে। ওপারে বসে বসে তুমি তাই দেখবে আর তৃপ্তি পাবে। এই মন্দির নির্মাণের জন্য তোমার হৃদপিণ্ড হবে পাপশূন্য। ওসিরিসের কক্ষে পৌঁছতে তোমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না।

এতদিনে হতশেপসুতের সম্যক উপলব্ধি হয় যে লোকটা মোটেই মূর্খ নয়। রীতিমত কুটিল সে। ক্ষুরধার বুদ্ধি তার না থাকতে পারে, কিন্তু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে সে খুব সচেতন। সে চায় না হতশেপসুত তাকে ছাড়িয়ে যাক।

সে সব সময় উঁচুতে থাকতে চায়। যার জন্য একটা অপূর্ব সৃষ্টিতে বাধাদানেও তার দ্বিধা নেই। অথচ নিজে থেকে সৃষ্টিশীল কিছু করার কোন ক্ষমতাই তার নেই।

মনে মনে হতশেপসুত হাসে। তার উদ্দেশ্য সাধনে বাধা দিতে চায় মুতনেফার্তের পুত্র। কী দুঃসাহস। কেউ কখনো পেরেছে? আজ যদি সে হতশেপসুতকে সমর্থন করত, তাহলে বিনা দ্বিধায় ফ্যারাও-এর মহিমা নিয়ে রাজত্ব করে যেতে পারত। কিন্তু সম্রাজ্ঞীকে শত্রুপক্ষ বলে ঘোষণা করে সে কি করে আশা করে যে নিরুপদ্রবে রাজ্য শাসন করবে? এতদিনেও কি চিনতে পারল না সে হতশেপসুতকে, যে ফ্যারাও-এর সবটুকু ক্ষমতা লাভের স্বপ্ন শৈশব থেকে দেখে আসছে? এতদিনেও কি বুঝতে পারল না যে তার সামনের সমস্ত বাধাকে বালির ঝড়ের মত উড়িয়ে দিতে পারে সে।

হতশেপসুত উঠে দাঁড়িয়ে বলে—চল, যাওয়া যাক।

—এরই মধ্যে? আর একটু বস না। দায়-এল-বাহরি ছাড়া কি কথা নেই আর?

—আছে বৈকি। কিন্তু সেসব কথা অন্য সময়েও বলা যায়।

থুথমস উৎকট ভাবে হেসে উঠে বলে—শুধু দায়-এল-বাহরি ছাড়া, তাই না?

—হাসলে কেন?

—আমাকে মূর্খ ভাব বলে।

মনে মনে হতশেপসুত বলে, তুমি যে কতবড় মূর্খ তার কিছু নিসর্গও যদি জানতে তাহলে অসম্মতি জানালে, মনের কথাকে ওভাবে প্রকাশ করে দিতে না।

মুখে সে বলে—তোমাকে মূর্খ ভাবার শিক্ষা ভালই হল।

—এবার থেকে একটু সম্মানের দৃষ্টিতে দেখ। শত হলেও আমি পুরুষ।

—অবশ্যই।

ফসল যখন ক্ষেতে থাকে তখন মিশরের প্রকৃতি যেন হাসে। তখন এক আধদিন বৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনাও থাকে। কিন্তু বাকী সময় প্রকৃতি উদাস। তার ঔদাস্য মানুষের মনকে স্পর্শ করে। রাত্রি অতিবাহিত হতে না হতেই, সূর্যদেবকে যখন বলা হয় হের-পা-খার্ট, তখন তিনি তাঁর প্রবল পরাক্রম নিয়ে পূর্ব দিক থেকে উদিত হল। ডুমুর খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষে তাঁর ছোঁয়া। বালির ঝড় উঠে দাপিয়ে বেড়ায় এদিক ওদিক। তারই মধ্যে নীলনদ তাঁর কর্তব্য পালন করে যায় কোন রকমে। মনে মনে হাপি অমন রা-এর কাছে নিয়ত প্রার্থনা জানায় এই জলধারা যেন বিশুষ্ক না হয়ে যায়। আদি দেবতা প্টহ্, যার চক্ষুদ্বয় থেকে অন্যান্য সমস্ত দেবতা নির্গত হয়েছেন, যাঁর মুখগহ্বর থেকে বের হয়েছে সমগ্র মানবজাতি, যিনি এক কথায় দেবতা ও মানুষ সবার জন্মদাতা তাঁর স্ত্রীর নাম সেখমেত। এই সেখমেত সূর্যালোকের ভেতরে ভয়ঙ্কর প্রদাহের সৃষ্টি করেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানায় কৃষকেরা। তিনি যেন নিবৃত্ত হন। আকুল কাকুতি জানায় দেবতা সেবেকের কাছে। তিনি যেন তাঁর ধ্বংসাত্মক উত্তাপের জন্ম না

দেন ওই সূর্যরশ্মিতে। তারা সঙ্গোপনে প্রণতি জানায় দেবতা বাস্তকে। এই বাস্ত হচ্ছেন তাপবিহীন নম্র সূর্যালোকের জন্মদাতা যে আলোক নদীর দুই পার্শ্ব ফুল ফল ফসল আর বৃক্ষ ও তৃণগুল্মে পরিপূর্ণ করে দেয়। বাস্ত-এর কৃপায় সূর্য তাঁর প্রচণ্ড উত্তাপ পরিহার করেন। তখন সূর্যকিরণ প্রতিভাত হয় করুণা রূপে।

কৃষকদের কাকুতিতে দেবদেবীরা বিচলিত হন। তাই নীল নদ আজও প্রবাহিত হয়ে চলে অক্ষয় অব্যয়। আজও তাই প্রায় প্রতিবছরই নদীর জল দুকূল প্লাবিত করে রাখে দীর্ঘ সময়ব্যাপী যাতে ভূমি সরস হয় ও তার উর্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কৃষকেরা সুযোগ পায় সেই ভূমি কর্ষণ করে ফসল ফলাতে।

হাপি হলেন নীলনদের দেবতা। এই হাপি এবং মেমফিসের বৃষ আপিসকে এক এবং অভিন্ন বলে মনে করা হয়। পুরাকাল থেকে দেশের চার প্রান্তের চারটি বৃষ দেবজ্ঞানে পূজা পেয়ে আসছে। এরা হল মেমফিসের আপিস, হেলিও-পোলিশের নেডিস, হারমোনথিসের বুচিস এবং কানোপুমের সুবর্ণ বৃষ। এদের মধ্যে আপিসই হল সবচেয়ে বিখ্যাত। এই আপিস এমন একটি গাভীর বৎস যে গাভী জীবনে শুধু একবারই গর্ভধারণ করতে পারে। দ্বিতীয় বার সে সন্তানসম্ভবা হতে অক্ষম। এই আপিসের কতকগুলি লক্ষণ আছে। এ হবে কৃষ্ণবর্ণের। এর কপালে থাকবে একটি চতুষ্কোণ শ্বেত চিহ্ন। এর লাঙ্গুলের শেষ প্রান্ত দুই ভাগে বিভক্ত। এর জিহ্বায় আরশুলা অংকিত। যদি শোনা যায় কোথাও কোনো নতুন আপিস জন্মগ্রহণ করেছে তাহলে মিশরবাসী নানারকম সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে আনন্দে মেতে ওঠে।

আপিস আর হাপি বলতে গেলে একই। ওসিরিসও আবার ফসল ও নীলনদের অধিষ্ঠাতা দেবতা। ফলে আপিস-এর সঙ্গে ওসিরিসের নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। তাই আপিসকে বলা হয় রক্তমাংসের দেহধারী স্বয়ং ওসিরিস। দেবতার আত্মা রয়েছে আপিসের দেহের ভেতরে। সুতরাং সে পূজিত। যার ফলে তার পরিণতিও হয় মনুষ্যরূপী অবতারের পরিণতি হত যেমন এককালে, ঠিক তেমনি। আপিসকে বার্ধক্যের স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করতে দেওয়া হয় না। তাকে তার আগেই নানাপ্রকার অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে হত্যা করা হয় এবং তার স্থলে নতুন একজন আপিসকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বৃদ্ধ আপিসকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করে তার মাংস ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রন্ধন করে ভক্ষণ করা হয়। দেহের বাকী অংশ অর্থাৎ চর্ম, অস্থি এবং অবশিষ্টাংশকে মমি করে রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়। ওসিরিসের দেহের অংশগুলিও এক সময়ে এইভাবে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

আপিস বৃষের সমাধিস্থল প্রচুর অর্থব্যয়ে মাটির নীচে নির্মিত একটি বিশাল স্থান। প্রতিটি বৃষের দেহাবশেষ পৃথক পৃথক কারুকার্যময় শবাধারে রেখে পৃথক পৃথক বক্ষে সংরক্ষিত করা হয়। শবাধারের ওপর একটি ফলক থাকে। সেই ফলকে লেখা থাকে কোন ফ্যারাও-এর রাজত্বে তার জন্ম, তার

মৃত্যুই বা কোন ফ্যারাও-এর রাজত্বের কোন বৎসরে হয়েছে।

দরিদ্রতম ব্যক্তি থেকে শুরু করে ধনবান, সবার কাছেই ওসিরিস প্রিয়তম দেবতা। সুখে দুঃখে তিনিই আশ্রয়দাতা। তিনি যেমন কৃষিনির্ভর দেশে কৃষির সহায়ক, তেমনি মৃত্যুর পরেও তিনি সর্বময় অধিকর্তা। তিনিই দেশে সর্বপ্রথম কৃষিকর্মের প্রবর্তন করেন। একসময়ে কৃষিকর্মে ব্যবহারের জন্য যব-এর বীজ ছিল না। তিনিই এই বীজের আমদানী করেন। তিনি নিয়ে আসেন আঙুরলতা। শুধু তাই নয়, যব দিয়ে হালকা ধরনের মদিরা প্রস্তুত প্রণালীও তিনিই শিখিয়ে দেন মানুষকে, যেমন শেখান আঙুর দিয়ে সুস্বাদু সুরা তৈরীর প্রক্রিয়া। তাঁর চেয়ে প্রিয়তম দেবতা আর কে হতে পারেন? মিশরবাসীর হৃদয়ের প্রায় সবটুকুই জুড়ে রয়েছেন তিনি।

হতশেপসুতের দৃঢ় ধারণা কদাচিৎ দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও মিশরবাসীরা ধ্বংস হবে না কখনো। ওসিরিস তাদের ভালবাসেন। আর ভালবাসেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নী আইসিস। তিনিই মসনদের সম্রাজ্ঞী। দেব-মাতাও তিনি। তিনি স্বর্গের দেবী এবং স্বামীগতপ্রাণা। স্বামীর মৃতদেহের অনুসন্ধানে তিনি দুস্তর মরুভূমি থেকে শুরু করে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছেন। তাঁকে তিনি জীবনদান করেছেন। বিচারের সময় নিষ্ঠাবতী স্ত্রীর ন্যায় তাঁর পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনিই হলেন মমতায় ভরা আদর্শ জননী, দেবতা হোরাসকে তিনি গর্ভে ধারণ করেন। তাঁর শৈশবে তাঁকে রক্ষা করেন। তারপর পরবর্তী কালে শত্রু সেথ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি পুত্রকে আইনবিষয়ক পরামর্শ দেন। তাঁর অপূর্ব যাদুবিদ্যার প্রভাবে তিনি পুত্রকে সেথ-এর বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিজয়ী করেন।

আইসিস সমস্ত দেবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ যাদুবিদ্যা শুধু তাঁর আয়ত্তে। তিনি একমাত্র দেবী যিনি যাদুমন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শিনী। সেই মন্ত্রে যে কেউ মুগ্ধ এবং স্থাণুবৎ হয়ে যায়। সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে একমাত্র তিনিই শুধু দেবতা রা-এর প্রকৃত নাম জানেন। যে কোন অসুস্থতা, বিশেষ করে শিশুদের পীড়া হলে তাঁর কাছেই মিনতিপূর্ণ প্রার্থনা জানান হয় নিরাময়ের জন্য। কারণ হোরাসের শৈশবে তিনি তাঁকে সুস্থ রেখেছিলেন।

আইসিসের ভগিনী নেফথিসের বিবাহ হয়েছিল প্রথমে ওসিরিসের হত্যাকারী তাঁর ভ্রাতা সেথ বা সেতেথের সঙ্গে। কিন্তু ওসিরিসের মৃত্যুর পর তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করে একজন বিলাপকারিণী রূপে শবযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন, কারণ ওসিরিসের প্রতি তাঁরও ছিল গভীর প্রেম। শবযাত্রার সময় তিনি ওসিরিসের শবাধারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গিনী রূপে ছিলেন নীথ। সমাধিস্থলে যে চারজন দেবী মৃতদেহকে রক্ষা করেন তাঁরা হলেন আইসিস, নীথ, সেলকেত ও নেফথিস।

প্রতিটি দেবদেবীর কথা গভীর ভাবে জানে হতশেপসুত। সে বুঝতে পারে ওসিরিসের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ কত বেশী। তাই সে ওসিরিসের সমাধিস্থল অবিদসে প্রায় প্রতি বছরই যাবে বলে স্থির করে। তার কানে

সেদিনের পরে থুথমসের কথাটা বারবার ঝঙ্কৃত হতে থাকে। কথাটা হল, "শত হলেও আমি পুরুষ।" থুথমস দল গড়ার চেষ্টা করছে নিজের গুরুত্বকে সর্বসাধারণের মধ্যে তুলে ধরার জন্য। যত কুটিলই হোক না কেন সে কোন বিষয়ে লেগে থাকার ক্ষমতা তার নেই। তাকে ঠকতে হবে। দারুণ ভাবে ঠকতে হবে। সে যদি তার সম্রাজ্ঞীর ওপর নির্ভর করে থাকত, তাহলে নিশ্চিন্তের জীবনযাপন করতে পারত। কিন্তু যে কারণেই হোক সে তাকে অতিক্রম করতে চায়। কখনো তা হতে দেওয়া হবে না। তার মুখের সেই বিশ্রী নিষ্ঠুর রেখাটি সেদিন ফুটে উঠতে দেখার পর থেকে হতশেপসুত বদ্ধপরিকর চবরোসের ডানা ছেঁটে ফেলতে হবে। সেই ডানা ছাঁটতে গিয়ে যদি সেটা কেটে যায় তাহলে-উপায় নেই। চবরোসের নিজের হয়ত কোন উদ্দেশ্য ছিল না। নিশ্চয় রাজকর্মচারীদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী অধৈর্য হয়ে উঠেছে। তারা শান্তি চায় না। তারা চায় যুদ্ধবিগ্রহ। অন্যের দেশে গিয়ে লুণ্ঠন করে ধনবান হতে চায় তারা। তাতে একঘেয়েমীও কাটে। তাদের প্ররোচনার চবরোসও সম্প্রতি রঙীন কল্পনায় মশগুল হয়েছে। ভুল করেছে সে। মসনদ লাভের পর আট নয় বছর কেটে গিয়েছে। এতদিন পরে তার মস্তিষ্কে ওই দুষ্ট বুদ্ধির উদয় সত্যই দুর্ভাগ্যের।

দেবদেবী পুরোহিত আর মন্দিরের সঙ্গে আরও বেশী করে জড়িত করে নিজেকে হতশেপসুত। ফ্যারাও-এর পরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পুরোহিত-কুল। প্রধান পুরোহিতের ক্ষমতা তো প্রায় ফ্যারাও-এর ক্ষমতাকে স্পর্শ করে। তাই প্রধান অমাত্যই অধিকাংশ সময় হয় প্রধান পুরোহিত। যত চক্রান্তই করুক থুথমস, এদের হয়ত দেখলে সে কিছু করতে পারবে না। তাই অবিদসের উদ্দেশে যাত্রা করে সে। সেখানে প্রতি বছর যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় হেব-সেদ উৎসবের চেয়েও সেটি অনেক বড়। তার চেয়ে বড় উৎসব এদেশে হয় না। এই সময় যে চিত্তাকর্ষক নাট্যাভিনয় হয় ,তার বিষয়বস্তু ওসিরিসকে ঘিরে। সেই নাটকে দেখান হয় ওসিরিসের প্রচণ্ড আবেগ ও প্রণয় এবং পরিশেষে তাঁর মৃত্যু। দেখান হয় তাঁকে সমাহিত করার ঘটনা এবং সব শেষে দেখান হয় তাঁর পুনরুত্থান। যব গম এবং অন্যান্য ফসলের বীজ বপন করা হয় মাটির নীচে, ওসিরিসকে যেমন সমাধিস্থ করা হয়। সেইসব ফসলের বীজ মাটির ভেতর থেকে অঙ্কুরিত হয়ে নির্গত হয়ে বৃক্ষে পরিণত হয়। ওসিরিসের পুনরুত্থানও তেমনি। তাই অবিদসের এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বীজবপন ও ফসল উৎপাদনের প্রতীক রূপে। অনেক পূর্বে এই নাটকের কুশীলবরা ছিল নিষ্প্রাণ পুত্তলিকা। এখন অবশ্য জীবন্ত মানুষেরাই এই সমস্ত ভূমিকার অবতীর্ণ হয়।

হতশেপসুতের এই নাটক দেখতে খুব ভাল লাগে। এতে তার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। এবারে সে সঙ্গে নেয় ওপরের দেশের প্রধান অমাত্য হাপু-সেনেবকে। বংশপরম্পরায় সে প্রধান পুরোহিতও বটে। এক ঢিলে দুই পাখি। তাছাড়া হাপু-সেনেব তার প্রতি বিশ্বস্ত। থুথমস কোন চরিত্রের মানুষ হতশেপসুতের পরে বোধহয় সে-ই সবচেয়ে ভালভাবে জানে। জানে অনেকেই। কিন্তু তাদের

মধ্যে কিছু কিছু ব্যক্তি ফ্যারাওকে ভাঙিয়ে নিজেরা কিছু কিছু করে নিতে চায়।

অবিদসে এবারে দুদিন থাকে সে। কন্যা হতশেপসেত একা রয়েছে প্রাসাদে। যদিও নেসামুনকে সঙ্গে না এনে রেখে এসেছে কন্যার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে। কন্যার জীবনের মূল্য অপরিসীম। নেফরুরা তো বেঁচে রইল না। তাই সম্রাজ্ঞীর একমাত্র সন্তান এবং উত্তরাধিকারী। মাতা অহমেসের বংশের ধারা তার মধ্যে দিয়েই বয়ে চলেছে। তাকে যে বিবাহ করবে সে হবে পরবর্তী ফ্যারাও। আসেত-এর পুত্রকে মনে মনে ঠিক করে রাখলেও কত লোকের কত রকমের খারাপ উদ্দেশ্য থাকে কে বলতে পারে? প্রাসাদের প্রতিটি প্রস্তরখণ্ড যেমন ইতিহাসবেত্তা তেমনি তারা প্রতিটি ষড়যন্ত্রের অংশীদার। তারা সব জানে, সব করতে পারে। অতীতে হারেমে তো কত বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছে, প্রাসাদে কত ফ্যারাও-এর উত্থানপতন ঘটেছে, এই প্রস্তরগুলিতে প্রশ্ন করলে তারা ফিস্ ফিস্ করে সব বলে দেবে। হতশেপসুত কাউকে বিশ্বাস করে না। ফ্যারাওকে তো নয়ই। তাকে আজকাল সুযোগসন্ধানী বলে মনে হয়। নিজের সম্মান আর গুরুত্ব বাড়াতে সে সবকিছু করতে পারে। হয়ত তার অনুপস্থিতিতে নিজ কন্যা হতশেপসেতকে বিবাহ করে বসবে। তাহলে সে হবে নিশ্চিন্ত।

কথাটা মনে হতেই অস্থির হয়ে ওঠে হতশেপসুত। অবিদস থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বারবার তার মনে হতে থাকে, হয়ত সত্যই কন্যার বিবাহ হয়ে গিয়েছে। শকটচালককে নির্দেশ দেয় যত দ্রুত সম্ভব রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছতে। এত অধৈর্য আর অস্থির সে জীবনে কখনো হয়নি। চবরোস যে শেষপর্যন্ত এতটা অশান্তির কারণ হয়ে উঠবে ভাবতে পারে নি সে।

প্রাসাদে পৌঁছেই প্রথমে নেসামুনকে ডেকে পাঠায় তার কক্ষে। নেসামুন এসে উপস্থিত হলে জিজ্ঞাসা করে—সব ঠিক আছে?

—হ্যাঁ, সম্রাজ্ঞী।

—হতশেপসেত কোথায়?

—তার নিজের কক্ষে।

—কি করছে?

—এই সময়ে তো খেলা করে মিসাফ্রিসের সঙ্গে।

—চল দেখব।

নেসামুন একটু বিস্মিত হয়। সম্রাজ্ঞীকে সে প্রায় শৈশব থেকেই চেনে বলতে গেলে। কিন্তু তাকে পূর্বে কখনো এত অধৈর্য হতে দেখেনি। সে হতশেপসুতের সঙ্গে যায়।

মাকে দেখে কন্যা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে। মিসাফ্রিসও পাশে এসে দাঁড়ায় হাসতে হাসতে।

সে বলে—আমার এখন আর এর সঙ্গে খেলতে ভাল লাগে না। আমি বড় হয়েছি।

—হ্যাঁ, তুমি বেশ বড় হয়েছ।

—আমি শিকারে যাব।

—মাঝে মাঝে নিশ্চয় যাবে। প্রত্যেকদিন তো যাওয়া যায় না।

—কবে নিয়ে যাবে ?

—তুমি তো সাঁতার জান না।

—না।

—আগে সাঁতার শিখে নাও। যুদ্ধ করতে গেলে সাঁতারও জানতে হয়।

—কেন, জলে যুদ্ধ করে নাকি ?

—হ্যাঁ, জলেও যুদ্ধ হয়। তাকে বলে নৌ-যুদ্ধ। আমাদের যুদ্ধের জাহাজ তুমি এখনো দেখনি। একদিন তোমাকে পাঠিয়ে দেব দেখে আসতে।

—তুমি যাবে না আমার সঙ্গে ?

—সময় পেলে যাব। নইলে তোমার মাকে পাঠিয়ে দেব।

—না, তুমি যাবে।

—বেশ, আমি যাব। কিন্তু স্থলযুদ্ধেও সাঁতার কাজে লাগে।

—কেন ?

—সামনে যদি বড় নদী থাকে। তখন সব সময় তো নৌকো পাবে না। দরকার হলে সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে হবে। আমাদের পূর্বে অনেক দেশ রয়েছে। সেখানে দুটো বড় নদী রয়েছে। তাদের নাম টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ওই নদী পর্যন্ত জয় করে নিয়েছিলেন।

বালকের চোখের দৃষ্টি স্বপ্নালু হয়ে ওঠে। সে ধীরে ধীরে বলে—আমিও যাব।

—নিশ্চয় যাবে। আগে বড় হও আর সাঁতার শিখে নাও।

হতশেপসুত নিজ কক্ষে ফিরে গিয়ে নেসামুনকে পাঠায় আসেতকে ডেকে আনার জন্য। আসেত এলে সে নেসামুনকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে।

—মিসাফ্রিসের সাঁতার শেখার প্রয়োজন।

—এই বয়সে ?

—বয়স কম হল নাকি ? আট গিয়ে ন'য়ে পড়বে। এর চেয়ে অনেক কম বয়সেও আমি নীলনদে সাঁতার দিতে দেখেছি কৃষকদের ছেলেদের। প্রথম প্রথম আমিও অবাক হতাম। যে বয়সে হাঁটা শেখে সেই বয়সে ওরা সাঁতার শেখে। না শিখে বোধহয় উপায় নেই ওদের। ফ্যারাও-পুত্রদেরও উপায় নেই।

—বেশ তো আপনি যখন বলছেন ওকে শেখাব।

—আমি ব্যবস্থা করে দেব। তবে নদীতে শিখবে না। উদ্যানের সরোবরে। নদীতে দিতে ভরসা হয় না। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলার জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

—বলুন।

—কথা দিতে হবে, যা বলব দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে বলতে পারবে না।

—আপনি আদেশ করলে কখনো বলব না।

—আদেশ নয় অনুরোধ। ফ্যারাওকে বলতে পারবে না।

—ফ্যারাওকে আমি অনেক কিছু বলি না।

—আমার কন্যার সঙ্গে মিসাফ্রিসের বিবাহ দিয়ে দিতে চাই।

স্তম্ভিত আসেত দাঁড়িয়ে থাকে। সে কোন কথা বলতে পারে না।

হতশেপসুত বলে—চুপ করে রইলে কেন? তোমার মনঃপূত নয়?

একটু সময় নিয়ে আসেত বলে—এ বিষয়ে মন্তব্য করা বাহুল্য মাত্র। আমি খুব ভাল ভাবে জানি হতশেপসেতের সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ হলে সে হবে ভবিষ্যতের ফ্যারাও।

—ঠিক তাই।

—এই অভাবনীয় প্রস্তাবে আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

—বেশ, তবে এটাই ঠিক রইল। আমার ইচ্ছা খুব দ্রুত যাতে এদের বিবাহ হয়।

—এখনো ওরা শিশু।

হতশেপসুত হেসে ওঠে। বলে—প্রাসাদের শিশুরা আবার শিশু নাকি? তারা সব সময়েই সাবালক আর সাবালিকা। আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, ওই থুথমস সঙ্গে সঙ্গে আমার কন্যাকে বিবাহ করে বসবে। নইলে তার মসনদ টলে উঠবে। ফ্যারাও-এর পদে সুনিশ্চিত হবার জন্য নিজ কন্যাকে বিবাহ করাই তখন তার একমাত্র পথ হবে।

আসেতের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে বলে—আপনি যত তাড়াতাড়ি হোক, ব্যবস্থা করুন।

বহুদিন পরে সমস্ত বাইরের কাজ মিটিয়ে সেন-মুত প্রাসাদে এল একদিন তার পরিকল্পিত দেবমন্দিরের নকশা নিয়ে। সে বুঝতে পারে অসাধারণ একটা কিছু নির্মাণ করে সম্রাজ্ঞী অমর হয়ে থাকতে চান। তার নিজের উদ্দেশ্যও অভিন্ন। নিজের সৃষ্টির মধ্যে সে বেঁচে থাকতে চায়, ইমহোটেপ যেমন বেঁচে রয়েছেন। তবে সে জানে না, অক্ষয় কীর্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাজ্ঞীর একটি আশু উদ্দেশ্য রয়েছে যা দেশকালের সীমারেখা অতিক্রম করবে না কখনই। এই উদ্দেশ্য হল তার প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা এবং তাকে মজবুত করা। এই দেবমন্দির নির্মাণ করে সে প্রজাদের এবং রাজকর্মচারীদের মন জয় করতে চায়। পুরুষ হলে এত সব ভাবতে হত না। নিজেকে যতই পুরুষের সমকক্ষ বলে ভাবুক সে সাধারণ মানুষ তাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে মনে প্রাণে সেকথা মানতে চায় না। সাধারণ মানুষের কাছে সে প্রমাণ করতে পারে না যে তার বিদ্যা এবং বুদ্ধি থুথমসের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। প্রমাণ করার কোন পথ নেই। তাই তাকে বিবাহ করার দৌলতে ফ্যারাও হয়েও চবরোস তাকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। সে কিছুতেই হতে দেবে না।

সেন-মুত অপেক্ষা করে সম্রাজ্ঞীর জন্য। সে জানে না মাঝে মাঝে সম্রাজ্ঞীর রূপচর্চার শখ হয়। সাতদিনে অন্তত দুটি দিন নিজেকে সাজিয়ে তোলে সে। মায়ের সাজঘরই সে নিয়েছে। তাই ওখানে প্রবেশ করলে মায়ের পুরোনো

দিনের কথা মনে পড়ে। এখন মায়ের কোন শখ নেই। তিনি বেঁচে রয়েছেন এইমাত্র। পিতার মৃত্যুর পর মা উপলব্ধি করলেন তাঁর কর্তৃত্বের দিন শেষ হয়েছে। ইচ্ছা করলে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারতেন, কিন্তু অত নীচে নামতে পারেন নি। তিনি নিজে থেকেই সরে গিয়েছেন।

মায়ের সাজঘরে এখনো তাঁর দেহের আঘ্রাণ ভেসে বেড়ায়। তাঁর কোলের ভেতরে মুখ গুঁজলে যেমন ঘ্রাণ পেত হতশেপসুত, ঠিক তেমনি। আজ সেখানে বসেই সেন-মুতের আগমন সংবাদ পেল সে। তাই একটু তাড়াতাড়ি করে। তরুণটির চেহারার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা মানুষকে আকৃষ্ট করে। অথচ তাকে খুব সুদর্শন বলা যায় না। তাব মুখমণ্ডলে যে কয়টি খুঁত রয়েছে সেই খুঁতগুলিই তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। যদি দেখতে সে নিখুঁত হত তাহলে মোটেই ভাল লাগত না। প্রথম দুবার তাকে যেমন সঙ্কুচিত বলে মনে হত, এখন আর তেমন মনে হয় না। প্রথম প্রথম হয়ত তার আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি ছিল। এখন আর নেই। এখন বাইরের মন্দিবে কাজ করে নিজের ওপর তার সম্পূর্ণ আস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থা তাকে এক বিবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তুলেছে। উয়াচমেসের ভেতরে এই ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যেত। শুধু এই ব্যক্তিত্বটুকু থাকলেই বোধহয় পুবুষেরা যে কোন নারীর হৃদয় জয় করে নিতে পারে। তাছাড়া সেন-মুতের চোখদুটির দৃষ্টি অন্য ধরনের। সব সময় যেন স্বপ্ন দেখে। কবিদের দৃষ্টি নাকি অমন হয়। সেন-মুত তাহলে কবিও। হতশেপসুতের ধারণা যারা সৃষ্টি করে তারাই এক ধরনের কবি।

রূপচর্চা অর্ধসমাপ্ত রেখে উঠে পড়ে হতশেপসুত। সেন-মুতের আগমনবার্তা পেলেই তার চোখেব সামনে ভেসে ওঠে দার-এল-বাহরির বালুকাময় প্রান্তর। সেখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে এক অপূর্ব দেবালয় যা ধরিত্রীর যে কোন প্রান্তের দেবালয়ের চেয়ে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। সেটি দেখতে কেমন হবে এখনো সঠিক ধারণা নেই তার। আজ হয়ত সেন-মুত সেই ধারণাব সৃষ্টি করতে পারবে। শুধু ধারণা কেন, স্পষ্ট হয়ে উঠবে সেই সৌধশ্রেণীর ছবি।

দার-এল-বাহরিকে শুধু প্রান্তর বললে ভুল হবে। এখন সেখানে একাদশ বংশের দ্বিতীয় মেনটুহেটেপের পিরামিড দাঁড়িয়ে রয়েছে একাকী নিঃসঙ্গ। তারই পাশে ধীরে ধীরে নীলপদ্মের মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে তার স্বপ্নের মন্দির।

সে প্রবেশ করতেই সেন-মুত উঠে দাঁড়ায়। মুহূর্তের জন্য অভিবাদন করতে বিস্মৃত হয় সে। কারণ হতশেপসুত যতটুকু রূপচর্চা করেছে তাতেই তার লাবণ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হতশেপসুত বুঝতে পারে সে কথা। আত্ম-সন্তোষ অনুভব করে সে। তারপর সেন-মুতের অভিবাদনের উত্তরে তাকে বসতে বলে।

—এনেছেন ?

—হ্যাঁ সম্রাজ্ঞী।

—দেখি।

সেন-মুত একটি গোটানো প্যাপাইরাস ধীরে ধীরে মেলে ধরতে থাকে। কিন্তু সামনাসামনি বসে দেখতে অসুবিধা হয়।

—আপনি এখানে এসে বসুন।

হতশেপসুত তার পাশের শূন্য স্থানটি দেখিয়ে দেয়। সেন-মুত ইতস্তত করে। কারণ ইতিমধ্যেই সম্রাজ্ঞীর পোশাক-পরিচ্ছদের সুবাসে তার মনে মুগ্ধ মাদকতার সৃষ্টি করেছে। হতশেপসুত দেবী। মানবী রূপে দেবী। তাঁর রূপ বা দেহের সুঘ্রাণ মনকে মুগ্ধ করতে পারে। কিন্তু মাদকতা বাঞ্ছনীয় নয়। এটা মতিভ্রম। এর একমাত্র পরিণতি হল হৃদয় কলুষিত হওয়া। ফলে পরপারে তার হৃদপিণ্ড মানদণ্ডে রক্ষিত হলে পাপের ভাগ বেশী দেখা যাবে।

—আমি এখানে বসেই বরং দেখাই দেবী।

—না না এখানে বসুন।

সেন-মুত হতশেপসুতের পাশে খুব সন্তর্পণে গিয়ে বসে। তার হৃদপিণ্ড লাফাতে শুরু করে। এই লাফানো ভয় থেকে উদ্ভূত। আনন্দ বা উত্তেজনা প্রসূত নৃত্য নয় এটি।

তার দেহ সম্রাজ্ঞীর দেহকে এত সাবধানতা সত্ত্বেও একটু যেন স্পর্শ করল। দেহের সমস্ত শোণিত তার মুখে এসে জমা হয়। সম্রাজ্ঞী স্বয়ং দেবী। তিনি নিশ্চয় তার হৃদপিণ্ডের দ্রুততাল শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। কি ভাবছেন তিনি? একটু সরে বসে সে। ইনি শুধু সম্রাজ্ঞী নন, ইনি ফ্যারাও। সম্রাজ্ঞী বা ফ্যারাওকে দর্শন করতে হয় অনেকটা দূর থেকে। তাঁরা বসে থাকেন সুউচ্চ আসনে। মাঝখানে থাকে বিরাট ব্যবধান। দর্শনপ্রার্থী নীচে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে দর্শন করে। তাঁর কৃপাদৃষ্টি নিম্নাভিমুখী হয়ে দর্শনপ্রার্থীর দুই চক্ষুর ওপর আশীর্বাদ বা অভিশাপ রূপে বর্ষিত হয়। কিন্তু আজ সে সম্রাজ্ঞীর একেবারে পাশে, তাঁর দেহকে প্রায় স্পর্শ করে বসেছে। এ অভাবনীয়, কল্পনাতীত।

হতশেপসুত সেন-মুতের অবস্থা বুঝতে পারে। তাকে সামলে নিতে সময় দেয় সে। জানে, একটু পরেই সে স্বাভাবিক হবে। জীবনে প্রথম এমন পরিস্থিতিতে পড়েছে বলে কিছুটা বিচলিত। এমন অবস্থায় মিশরের কোন পুরুষ কোন কালে পড়েছে বলে মনে হয় না। অনেক পুরুষকে যৌনপ্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু সাধারণভাবে শুধু কাজের জন্য সম্রাজ্ঞীর পাশে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার উদাহরণ হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়েও সেন-মুতের প্রথমে অসুবিধা হয়েছে।

হতশেপসুত বলে—হ্যাঁ, এবারে দেখান আপনার নকশা।

সেন-মুত প্যাপাইরাস সামনে মেলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সব কিছু ভুলে যায়। সে প্রথমেই নকশার ভেতরে দ্বিতীয় মেনটুহেটেপের পিরামিডটির অবস্থান দেখিয়ে দেয় সম্রাজ্ঞীকে।

সে বলে—এই পিরামিডের পাশে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল আমাদের সৌধ নির্মাণের আদর্শ স্থান।

—আপনি যখন স্থানটি নির্বাচন করেছেন তখন বলার কিছু নেই। কারণ আপনিই হলেন স্থপতি। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, যে সুযোগ আপনি পাচ্ছেন, তাতে কিংবদন্তী হয়ে থাকা ইমহোটেপকে অতিক্রম করা চাই।

—তিনি হলেন দেবতা। তবে দেবতাও অনেক সময় মানুষের কাছে পরাজিত হন। আমি চেষ্টার ত্রুটি রাখব না এটুকু বলতে পারি। এতে আমারও স্বার্থ রয়েছে। আপনার নামের সঙ্গে আপনার আশ্রিত রূপে আমার নামও একটু আধটু উচ্চারিত হবে।

—হ্যাঁ, কথাটা মনে রাখবেন।

—আমার তৈরী এই দেবালয় ধূসর মরুতে পিরামিডের মত দাঁড়িয়ে থাকলে তা যত উঁচুমানেরই হোক না কেন বিবর্ণ দেখাবে। তার সর্বাঙ্গের শিল্পকর্ম ওই পরিবেশে বিকশিত হতে পারবে না। তাই আপনার কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা, পুন্ত থেকে এবং পৃথিবীর যেখানে যে বৃক্ষ দেখতে সুন্দর তাদের নিয়ে আসার অনুমতি দিন।

—ওটি নির্মাণে এবং ওটিকে সুষমা দান করতে আপনার যখন যা খুশী যেখান থেকে হোক নিয়ে আসতে পারবেন। এই অধিকার আপনাকে দেওয়া হবে।

—আর কিছু চাই না। ওই বৃক্ষশ্রেণী এবং অন্যান্য বহুরকমের পুষ্প মন্দিরকে দেবতার বাসের উপযুক্ত করে তুলবে।

নকশার ওপর তর্জনী রেখে সেন-মুত বলে—এই জায়গায় পুন্ত থেকে আনা গাছ লাগানো হবে সারি সারি। সেগুলো দেবালয় নির্মাণ শেষ হবার আগেই বড় হয়ে উঠবে। এখানে থাকবে চতুষ্কোণ সব পুষ্পশয্যা। প্যাপাইরাসের শয্যাও থাকবে। আর এই যে দেখছেন উন্মুক্ত স্থানটি এখানে বাধাহীন বাতাস বইবে। এখানে তৈরী হবে অমন রা-এর সুবৃহৎ কক্ষ। তার পাশের এই কক্ষটিতে সাময়িক ভাবে শব রাখা হবে। আর এখানে হথোর এবং অনুবিসের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেবালয়। আর সেই রাস্তায় দুধারে পরপর থাকবে স্ফিংকস্-এর মূর্তি। এই রাস্তা ধরে ওপর দিকে চলতে চলতে পুণ্যার্থীরা পৌঁছে যাবে প্রথম উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। তারপর আবার ওপরের দিকে গেলে পাওয়া যাবে আর একটি চত্বর। এখানেই থাকবে পরপর বহু স্তম্ভ। প্রতিটি স্তম্ভে খোদিত থাকবে আপনার মূর্তি।

সেন-মুত এই প্রথম সম্রাজ্ঞীর দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে। সম্রাজ্ঞী হাসে।

সেন-মুত বলে—আরও স্তম্ভ থাকবে। সেই সব স্তম্ভে অঙ্কিত থাকবে, আপনি প্রথম পুন্তদেশে যে দলকে পাঠিয়েছিলেন, সেই অভিযানের চিত্র। ওই চিত্র দেখে সবাই বুঝতে পারবে পুন্ত কোন রহস্যময় স্থান নয়। ওখানে দৈত্য-দানব বলে কিছু নেই। সর্পও রাজত্ব করে না ওখানে। আমাদের মত সাধারণ মানুষেরাই বাস করে ওই দেশে।

হতশেপসুত বলে—এখনো একটু বাকী রয়েছে।

—জানি দেবী। সেটাই প্রধান বলে সবশেষে বলার জন্য রেখেছিলাম।

স্তম্ভে স্তম্ভে ভাস্কর্যের মাধ্যমে কীর্তি হবে আপনার জন্মরহস্য। আপনার পিতা স্বয়ং অমন রা। আপনার মাতা অহমেস এবং অমন রাকে সেই অবস্থাতেই দেখান হবে যাতে প্রতিটি মানুষ বিশ্বাস করে যে আপনার জন্মদাতা স্বয়ং অমন রা। আর নারী হয়েও যে আপনি ফ্যারাও তার জাজ্বল্য প্রমাণ থাকবে অন্য একটি অঞ্চলে যেখানে আপনার মুখমণ্ডল আবৃত থাকবে নকল শ্মশ্রু দ্বারা এবং আপনার বক্ষদ্বয় সমুন্নত না হয়ে হবে পুরুষের মত সমতল।

হতশেপসুতের মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। কিন্তু নিজেকে সংযত রেখে সে বলে —ঠিক আছে।

—ওই মন্দিরের প্রধান দ্বার এত প্রশস্ত হবে যে পাশাপাশি বেশ কয়েকজন অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে সেই দ্বারের ভেতর দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে।

—আপনার নকশা আমার কল্পনাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। আমি যারপর-নাই প্রীত। আপনি কর্ণকে অমন মন্দির সুন্দর ভাবে গড়েছেন। অন্য মন্দির-গুলোতেও আপনার মেরামতির কাজ প্রশংসার যোগ্য। আপনার কাজে রয়েছে আশ্চর্য এক সুষমা। বুঝতে পারা যায় সবগুলিতেই রয়েছে শিল্পীমনের পরশ। কিন্তু দায়-এল-বাহরির নকশা এক কথায় অতুলনীয়। এখন শুধু বাস্তবে ওটি দেখার অপেক্ষা। আপনার স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে কতটা প্রভেদ তখনই শুধু বোঝা যাবে।

সম্রাজ্ঞীর কথায় সেন-মুতের হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হয়। সে উঠে দাঁড়িয়ে চলে যাবার আগে অভিবাদন জানায়। তারপর হঠাৎ বলে—কিন্তু কবে শুরু করব আমার কাজ?

এবারে হতশেপসুতকে গম্ভীর দেখায়। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে থুথমসের মুখ। সে বলে—কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

সেন-মুত কক্ষ পরিত্যাগ করে।

আসেত একদিন হতশেপসুতের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়ে পাঠায়। হতশেপসুত বলে পাঠায়, অপরাহ্ণে প্রাসাদের সরোবরের সোপানে সে যেন অপেক্ষা করে। স্থানটি তার বড় প্রিয়। অনেক স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ওই স্থানটি। তাই অবসর সময়ে যদি প্রাসাদের বাইরে না যায় তাহলে ওখানে গিয়ে বিশ্রাম নেয়। নেসামুন অবশ্য কাছাকাছি থাকে। নেসামুনের বয়স হয়েছে। কিন্তু তার শরীর আগের মতই মেদবর্জিত। চলাফেরায় এতটুকুও শ্লথতা নেই। শুধু কয়েকগুচ্ছ কেশ সাদা হয়ে গিয়েছে। হতশেপসুত অনেক সময় ভাবে এর দেহে যৌবনের ঢল নামতে দেখেছে একদিন, আবার চলে যাবার ইঙ্গিতও দেখতে পাচ্ছে এখন। অথচ একটি দিনের জন্যও তার মধ্যে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখতে পায় নি সে। এতটুকু মন-মরা ভাব বা অবসাদ চোখে পড়ে নি। সে চিরকাল সজাগ, সদাসতর্ক। তাকে কখনো অসুস্থ হতে দেখেনি। এমন কি চোখের রোগও কখনো হয়নি তার। সত্যই সে রহস্যময়ী। কতবার তাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়েছে, তার ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা বলে কি কিছু নেই?

যৌবনের ক্ষুধা ? গর্ভে সন্তান ধারণ ? তাকে স্তন্যদান এবং মানুষ করা। কোন সাধই কি তার নেই ? শেষপর্যন্ত তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়ে ওঠে নি। পারে নি করতে। এ বিষয়ে সে যেন সবার ঊর্ধ্বে।

অবসর সময়ে হতশেপসুত দু-একদিন কন্যা হতশেপসেতকে সঙ্গে করে আনে। কিন্তু বড় বেশী বিরক্ত করে সে। ওর ধরনধারণ কথাবার্তা অনেকটা মাতা অহমেসের মত। ব্যক্তিত্বের প্রখরতা কম। একটু নির্ভরশীল। নিজের পুরুষটিকে ভালবাসতে পারলে সুখী হবে। নইলে মায়ের মত সারাজীবন ভুগতে হবে। তবে আসেত-এর পুত্রকে সে ভাল না বেসে পারবে না। ছেলেটি সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। মায়ের মত দুর্ভাগ্য তার হবে না।

সরোবরের দিকে অগ্রসর হতে হতশেপসুত দেখে আসেত অপেক্ষা করছে। সে নিশ্চয় কোন কারণে উৎকণ্ঠিত। নইলে নিজে থেকে সাধারণত দেখা করতে চায় না।

হতশেপসুত কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানায়। হতশেপসুত তাকে পাশে বসিয়ে বলে—আমরা যেখানে বসেছি এখানে আবানার পুত্র বসতেন।

—ও।

—এখানে বসে তাঁর কাছ থেকে কত কথা শুনেছি এককালে, বলে শেষ করতে পারব না।

—ও।

আসেতকে অন্যমনস্ক দেখে হতশেপসুত। তাই বলে—কেন দেখা করতে চেয়েছ ?

—আপনি সেদিন একটা মন্তব্য করেছিলেন যা আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

—কোন্ মন্তব্য ?

—আপনি বলেছিলেন কোন কারণে হঠাৎ যদি আপনার মৃত্যু হয় তাহলে ফ্যারাও আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে পারেন।

—অবশ্যই করবেন। এর মধ্যে কোনরকম অনিশ্চয়তা নেই।

—আপনি অনুগ্রহ করে আমার পুত্রের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করে ফেলুন।

হতশেপসুত মৃদু হেসে বলে—কেন, আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখছ নাকি ?

—আমি কখনই চাই না আপনার মৃত্যু হোক। তবে আমি পুত্রের মা। পুত্রের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হোক কোন্ মা না চায় ? ফ্যারাও-এর ওপর আমার একটুও ভরসা নেই। তাঁর একটি কথা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

—কি কথা ?

—বহুদিন পরে কাল রাতে আমার কাছে এসেছিলেন একটু মত্ত অবস্থায়। আমি বলেছিলাম, হঠাৎ আমার কাছে কেন প্রভু ? সম্রাজ্ঞী তো রয়েছেন। উত্তরে

তিনি বললেন—হুঃ সম্রাজ্ঞী। ও আমাকে টপ্‌কাতে চায়। ভাবে, আমি ওর অনুগ্রহে ফ্যারাও হয়ে আছি। কদিন যাক না, বুঝতে পারবে। ও ভুলে যায় ওর গর্ভে আমারই এক কন্যাসন্তান জন্মেছে। ও না থাকলেও কিছু এসে যায় না।

হতশেপসুত নড়েচড়ে বসে। মুহূর্তে উদ্যান এবং সরোবর তাদের সমস্ত সৌন্দর্য হারিয়ে বসে। মরুভূমি সহসা এগিয়ে এসে উদ্যানকে যেন গ্রাস করে ফেলে।

সে বলে—তুমি ঠিক শুনেছ ?

—শুনেছি বলেই বিবাহ দেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। তাতে আপনার কন্যা এবং সেই সঙ্গে আমার পুত্রেরও মঙ্গল হবে। আমার ভয় শুধু এই বিবাহে ফ্যারাও যদি বাধা দেয় তাহলে কি হবে।

—তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমি দেখছি কি করা যায়।

দ্বিতীয় থুথমস সহসা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সম্রাজ্ঞী হতশেপসুত মিশরের সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের প্রাসাদে ডেকে পাঠায়। তাদের প্রত্যেককে সে নির্দেশ পাঠায় তারা যেমন মিলিত ভাবে পরামর্শ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কোনরকম ত্রুটি যেন না ঘটে। ফ্যারাও-এর কক্ষের পাশে একটি বৃহৎ কক্ষে তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। তাদের মধ্যে দুজন পর্যায়ক্রমে ফ্যারাও-এর রোগশয্যার পাশে থাকবে।

ফ্যারাও-এর অবস্থা দেখে চিকিৎসকদের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর তারা আলোচনায় বসে। দেখা যায়, কোন বিশেষ রোগের কথা কেউ বলছে না। তবে রোগটির উৎপত্তিস্থল যে পাকস্থলী এ বিষয়ে মোটামুটি একমত হয় তারা। আর এই রোগ অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফ্যারাও-এর হৃদপিণ্ডকেও দুর্বল করে ফেলেছে। ওষুধ বিষয়েও সবাই একমত নয়। শেষে অধিকাংশের সম্মতিতে চিকিৎসা পদ্ধতি স্থির করা হয় এবং কোন্ কোন্ ওষুধ দিতে হবে তাও স্থিরীকৃত হয়।

হতশেপসুত নিজে এসে মাঝে মাঝে তদারক করে যায়। একবার ফ্যারাও-এর সঙ্গে কথা বলতে চায়। চিকিৎসকেরা কক্ষের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করে।

ফ্যারাও বলে—আমি তোমাকে কখনো আপন বলে ভাবিনি। তাই এই দশা।

—ওসব কথা এখন থাক। ভাল হয়ে ওঠো আগে।

—আমি জানি, আর ভাল হব না।

—এর চেয়ে অনেক কঠিন রোগ নিরাময় হয়।

—সুরাপান করে আমার এমন হয়েছে।

—তুমি একা সুরাপান করা না। অনেকেই করে।

—সেকথা নয়, কাল সুরাপানের পরে আমার এমন হয়েছে।

—অতিরিক্ত পান করেছিলে নিশ্চয়। যাক্ আগে ভাল হয়ে ওঠো।

—আমি ভাল হব না। মাঝে মাঝে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

কখনো পেটের ভেতরে তীব্র যন্ত্রণা। ওই সুরা ভাল ছিল না।

হতশেপসুতের ভ্রূকুঞ্চিত হয়। বলে—সুরাপানের আগে কাউকে দিয়ে পান করাও নি ?

—নিজের কক্ষের সুরা কাকে দিয়ে পান করাব ?

—সেই সুরাপাত্রটি কোথায় রেখেছ ? বিষ মেশায়নি তো কেউ ?

—সেখানে আর কে যাবে ? নারীরক্ষীরা ছাড়া ? তারা সবাই বিশ্বাসী।

—পাত্রটি কোথায় রেখেছ ?

—সেই সময় আসেত আসছিল, তার হাতে দিয়েছিলাম।

—সে তোমার কাছে যায় ?

—খুব কম। আমিই তার কাছে যাই মাঝে মাঝে। তুমি তো আমাকে দেখতে পার না। দেখতে পার না বলে তোমার ওপর আমার খুব রাগ। আমাকে তুমি সব সময় তোমার চেয়ে নীচু ভাব। এক এক সময় মনে হত তোমাকে শেষ করে দেব।

—দিলেই পারতে। নিশ্চিন্ত হতে।

—না।

—আসেত কি করল পাত্রটি নিয়ে ?

—জানি না। কি আর করবে। কোন বাঁদীর হাতে দিয়ে দিয়েছে বোধহয়।

—তুমি শান্ত হয়ে শুয়ে থাক। তোমার চিকিৎসা খুব ভাল হচ্ছে। ভাল হয়ে উঠবে।

—আসেত-এর পুত্রটিকে ফ্যারাও করো।

—তুমি বেঁচে উঠবে। ভয় পেও না।

ফ্যারাও দ্বিতীয় থুথমস কণ্ঠের মধ্যেও একটু হাসে। পরক্ষণেই সে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়। চিকিৎসকেরা ছুটে আসে। সম্রাজ্ঞী কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

কিন্তু কক্ষে গিয়ে হতশেপসুত নেসামুনকে বলে—আসেতকে গিয়ে বল, তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

একটু পরেই আসেত আসে। হতশেপসুত তার চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। সেই চোখ নির্বিকার। তাতে আনন্দ বা দুঃখ কোন কিছুরই লক্ষণ নেই।

—ফ্যারাওকে দেখতে গিয়েছিলে।

—না। শুনলাম অবস্থা ভাল নয়।

—আমি দেখে এলাম।

—কেমন দেখলেন ?

—বুঝতে পারলাম না। হয়ত বাঁচবে না। মনে হয় সুরা খেয়ে অমন হয়েছে। কেউ বিষ মেশায় নি তো ?

—সবই সম্ভব।

—তোমাকে কোন সুরাপাত্র দিয়েছিল রেখে দিতে ?

—অসুস্থ হবার আগে দিয়েছিল।

—সেটা কোথায় রেখেছ ?

—ঠিক মনে নেই। নিশ্চয় কারও হাতে দিয়েছিলাম।

এরপর হতশেপসুত আর আসেত উভয়ে উভয়ের চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কারও চোখের পলক পড়ে না।

শেষে আসেত-এর মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

—হাসছ যে ?

—এমনিতে।

—ফ্যারাওকে একবার গিয়ে দেখে এসে। তোমাকে কিছু বলতে পারে।

—আমি যন্ত্রণা দেখতে পারি না।

—তবু যাওয়া ভাল।

—আপনি যখন বলছেন নিশ্চয় যাব।

—এখনি যাও। পরে হয়ত সময় পাবে না। তুমি সম্রাজ্ঞী না হলেও রানী।

—যাচ্ছি।

শত চেষ্টা সত্ত্বেও দ্বিতীয় থুথমসকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না। কদিন পরে তার মৃত্যু হল। পরিণত বয়স হয়নি। অকালেই চলে যেতে হল। চিকিৎসকরা মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে এক একজন এক এক কথা বলল। অধিকাংশের ধারণা সুরা পানের পরে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ফ্যারাও-এর। সুরা প্রস্তুতে গলদ ছিল। কারণ এর পেছনে কোন ষড়যন্ত্র থাকলে আভাস পাওয়া যেত। কিন্তু সেই সুরা পাত্রটির হদিস মিলল না।

দ্বিতীয় থুথমসের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথানুযায়ী দেশের আপামর জনসাধারণ কাঁদতে শুরু করল। সমস্ত মন্দিরের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। বাহাত্তর দিনের জন্য দেবদেবীর কাছে কেউ আর পশু উৎসর্গ করবে না। বন্ধ হল উৎসব অনুষ্ঠান। স্ত্রী পুরুষের জনতা মস্তকে কর্দম লেপন করে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। তারা প্রত্যহ শোকযাত্রাকালীন সঙ্গীত গাইতে লাগল দিনে দুবার। সেই সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে মৃতের নানাবিধ গুণাবলী বর্ণিত হতে থাকে। তারা গমজাত খাদ্য থেকে বিরত রইল এবং পশুর মাংস ভক্ষণও বন্ধ রাখল। তারা মদ্য স্পর্শ করবে না শোক প্রকাশের এই বাহাত্তর দিন। কোনরকম আনন্দোৎসব করবে না। এমনকি প্রেম নিবেদন এবং প্রেমিক প্রেমিকার মিলনও বন্ধ থাকবে। প্রথম থুথমসের মৃত্যুর সময়ের মত এই বাহাত্তর দিন শুধু শোকের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হতে থাকে।

জীবিত থাকলে ফ্যারাওদের দেবদেবীর সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ থাকে। তাই তাঁর দেহকে এমন অবস্থায় রাখতে হবে যাতে তাঁর বা অর্থাৎ আত্মা এবং তাঁর আখু অর্থাৎ মনন ও তেজ যখনই সমাধিমন্দিরে শায়িত তাঁর ইহকালের দেহের নিকট সমুত্থিত হবে তারা তখন যেন কাকে সেখানে অপেক্ষারত দেখতে পায়। এই বা এবং আখু ও কা তখন দেহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে পুনর্মিলনের আনন্দে নিমগ্ন হবে। ফ্যারাও-এর এই চারটি অংশকে কোন অবস্থাতেই

পরস্পরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে দেওয়া হবে না। আর নশ্বর দেহকে অক্ষয় রাখতে প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে এক এক দেবতার সঙ্গে অভিন্নরূপে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িয়ে রাখতে হবে এবং সম্পূর্ণ দেহটি ওসিরিসের সঙ্গে একাত্মভাবে রাখতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সমাধিস্থলকে এমনভাবে নির্মিত করতে হবে যেন সেটি কা-এর বাস করার পক্ষে যথোপযুক্ত হয়। কারণ যতদিন পর্যন্ত শবদেহ সেখানে অক্ষত থাকবে তার কা-ও সেই দেহের সঙ্গে থাকবে।

মানুষের বা হচ্ছে একাধারে বাস্তব এবং অবাস্তব, শরীরী এবং অশরীরী। কারও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এটি তার দেহ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং পরলোকে চলে যায়। তাই মৃত্যুর উদ্দেশে অনেকে বলে—"তোমার বা দেবতাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।" কখনো বলে—"তোমার বা আকাশের তারা হয়ে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে।"

কিন্তু মানুষের কা এমন নয়। সে মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় এবং মৃত্যুতেও তার দেহের সঙ্গে থেকে যায়। কা সমাধি মন্দিরেই থাকে। প্রতিদিন যে ভোজ্যদ্রব্য দেওয়া হয় সে তাই ভক্ষণ করে। খাদ্যসামগ্রী দেওয়া বন্ধ হয়ে গেলে ক্ষুধার্ত কা ঘুরে ঘুরে ঘৃণ্য ও নোংরা পদার্থ ভক্ষণ করে বেড়ায়। তাতে সেই বিশেষ মানুষের বা-এর অস্তিত্বও বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। মমি বিনষ্ট হলে তার বা-ও বিনষ্ট হয়। কা হল মানুষের প্রতিভা, তার ব্যক্তিত্ব, তার জীবনীশক্তি এবং তার শুভ ক্ষমতা।

সুগন্ধি দ্রব্যাদি লেপনপূর্বক তাজা রাখার প্রক্রিয়া যেখানে হয়, দ্বিতীয় থুথমসের মরদেহ সেই কক্ষে নীত হবার কয়েকদিন পর খের-হেব বা পুরোহিত সেখানে যায় এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তার অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গকে মৃত ফ্যারাও-এর দেহে অস্ত্রোপচার শুরু করতে বলে। তখন দেহটিকে অতি সযত্নে খুব ভালভাবে প্রক্ষালন করা হয়। প্রক্ষালনের পরে সেটি কক্ষের ভূমিতে শায়িত করা হয়। তখন একজন বিশেষজ্ঞ দেহের কুঁচকির কাছে অর্থাৎ উরুর সঙ্গে দেহের সংযোগস্থলে কালো কালি দ্বারা একটি দীর্ঘ রেখা টানে। অপর এক ব্যক্তি একটি ধারালো ছুরি দ্বারা সেই রেখা বরাবর গভীর ভাবে চিরে ফেলে। তারপর সেই কাটা অংশ দিয়ে দেহের ভেতর থেকে বৃহদান্ত্র এবং হৃদপিণ্ড ফুসফুস ও পিত্তাশয়, যকৃৎ ও পাকস্থলী সাবধানে বের করে নেওয়া হয়। দেহের অভ্যন্তরের এই সমস্ত অংশকে খুব ভালভাবে খর্জুর বৃক্ষের সুরা দ্বারা ধৌত করা হয়। এদের অভ্যন্তরে সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত মশলা এবং আঠা ভরে দেওয়া হয়। তারপর তাদের গায়ে মলম মাখানো হয় এবং শেষে শেষে ফালি ফালি লম্বা লম্বা সুতিবস্ত্র দ্বারা সেগুলিকে জড়ানো হয়। এই বস্ত্রখণ্ডগুলির প্রত্যেকটিতে হোরাসের চারপুত্রের নাম লেখা থাকে। এঁরা হলেন মেসতা, হাপি, তুয়ামুতেফ এবং কুয়েভসেনুফ। সেই সঙ্গে চারজন দেবীও থাকেন বক্ষ ও উদরের অভ্যন্তরস্থ এইসব অংশগুলির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য। ইতিমধ্যে খের-হেব-এর তোশাখানা থেকে চারটি স্ফটিকস্বচ্ছ পাত্র আনা হয়। প্রতিটি পাত্রে দেহের চারটি করে অংশ রাখা হয়। প্রতিটি পাত্রের গায়ে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিধি

লিখিত থাকে। পাত্রের ঢাকনার আকৃতি হয় হোরাসের এক এক পুত্রের মস্তকের মত। যাঁকে যে পাত্রটি উৎসর্গ করা হয় তাঁর মস্তক সেই পাত্রের ঢাকনারূপে ব্যবহৃত হয়। মেসতার পাত্রটির ঢাকনা হয় একজন পুরুষের মস্তকের মত। এই পাত্রটিতে ফ্যারাও-এর পাকস্থলী রক্ষিত হয়। হাপির পাত্রের ঢাকনা বালকের মুখাকৃতি। এতে রক্ষিত হয় ক্ষুদ্রঅন্ত্র। এর রক্ষার দায়িত্বে থাকে দেবী নেফথিস। তুথামুতেফ-এর পাত্রটির ঢাকনা একটি শৃগালের মস্তক। এতে থাকে দ্বিতীয় থুথমসের হৃদপিণ্ড। দেবী নীথ-এর ওপর থাকে এটির নিরাপত্তার ভার। কুয়েভসেনুফের পাত্রটির মুখ হল একটি বাজপাখির মাথা। এর মধ্যে রাখা হয় যকৃত এবং বৃহদান্ত্র। দেবী সারকিত এটির রক্ষাকর্ত্রী। এই পাত্র চারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এদের ভেতরে রক্ষিত দেহের অংশগুলি ব্যতীত মানুষের আবার বেঁচে ওঠার সম্ভাবনা থাকে না।

এরপরে বের করে আনা হয় মস্তিষ্ক। একটি ধাতুর শলাকা, যার অগ্রভাগ বক্র, তাকে নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে মস্তকে চালিত করা হয়। সেই ভাবে মস্তিষ্ককে নিষ্কাশিত করে তাকে একপাশে রেখে দেওয়া হয় শুষ্ক হবার জন্য। তাকে দেহের সঙ্গেই সমাহিত করা হয়। সবকিছু করা হয় ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গে এবং পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে। এরপর দেহটিকে একটি বৃহদাকার পাত্রে খনিজ তৈলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয় সত্তর দিনের জন্য। সত্তর দিন পরে এই দেহকে বের করা হয়। আবার প্রক্ষালন করে শুষ্ক করে তোলা হয়। দেখা যায় দেহটির বর্ণ হরিৎ। দেহের ত্বক অস্থির সঙ্গে লেগে থাকে। তবে কেশদামকে সযত্নে রাখা হয়। হাত-পায়ের নখ ঠিকই থাকে। মুখ যদিও একটু লম্বা ধরনের এবং পাতলা দেখায় তবু চিনতে ভুল হয় না। হাত-পায়ের আঙুল, বাহু, উরু লম্বালম্বিভাবে চেরা হয় এবং তাদের ভেতরে খনিজ তৈল মিশ্রিত সুগন্ধি মশলা ভরে দিয়ে সেলাই করে দেওয়া হয়। মাথার ভেতরের শূন্য স্থান মশলায় পূর্ণ করা হয়। যে নাসারন্ধ্রের ভেতর দিকে মস্তিষ্ককে বের করে আনা হয়েছিল সেই নাসারন্ধ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রাংশ তৈলে নিষিক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। চক্ষুগোলকের মধ্যে শ্বেতবর্ণের প্রস্তর স্থাপন করে কৃষ্ণবর্ণের চক্ষু তারা অঙ্কিত করা হয়। লম্বা-লম্বি কাটা স্থানগুলির ভেতর দিয়ে মশলা, আটা এবং আরও বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বুক ও পাকস্থলীও এইভাবে ভরাট করা হয়। মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে এই সমস্ত প্রক্রিয়া চালু থাকার সময় একটি সুবর্ণনির্মিত ফলক স্থাপন করা হয় কর্তিত অংশের ওপর যাতে উত্চাত্ বা হোরাসের চক্ষু অঙ্কিত রয়েছে। হাতের নখ রঙ করা হয়। আঙুলে থাকে অঙ্গুরীয়। এই অঙ্গুরীয়ই মৃত ব্যক্তিকে দেয় নিরাপত্তা এবং সূর্যদেবতার শক্তি। শুধু ফ্যারাওকে নয় কোন ব্যক্তিকেই অঙ্গুরীয় ব্যতীত সমাধিস্থ করা হয় না। এমনকি যারা দরিদ্র এবং স্বর্ণরৌপ্য ক্রয়ের ক্ষমতা নেই, তারাও কোন না কোন ধরনের সস্তা অঙ্গুরীয় গড়িয়ে দেয় মৃতের জন্য।

এরপর পা দুটিকে পাশাপাশি জড়ো করে রাখা হয়। তারপর হাত দুটিকে শরীরের ওপরে রাখা হয়। একটি হাতের কব্জী অপর হাতের কব্জীর ওপর

থাকে। খের-হেব তখন গুটিপোকার আকারের সোনা-বাঁধানো মণিবিশেষ একটি সোনার তারের সঙ্গে বেঁধে মৃতের গলায় ঝুলিয়ে দেয়। এই মণিতে লেখা থাকে মৃতের কিতাবের ত্রিংশ অধ্যায় এবং সেই সঙ্গে থাকে প্রার্থনা। এই গুটিপোকাই হল হৃদয়। সেই হৃদয়ের কাছে প্রার্থনা জানান হয়, সে যেন তাকে ওসিরিসের বিচারকক্ষে মানদণ্ডের ওপর ওঠালে বিরূপ কোন কিছু না বলে।

এরপর সর্বদেহ ফালি ফালি বস্ত্র দ্বারা জড়ানো হয়। প্রথমে আঙুল এবং বাহু ও পায়ের পাতা পৃথক পৃথক ভাবে জড়ানো হয়। পরে পায়ের দিক থেকে ওপর দিকে জড়ানো হয়। প্রতিটি লম্বা ফালির প্রান্তে আঠা লাগানো থাকে। ফলে সেটি দেহের সঙ্গে শক্তভাবে লেগে থাকে। প্রতিটি বস্ত্রখণ্ডে মৃতের কিতাব থেকে উদ্ধৃতি লিখিত থাকে। অনেক মন্ত্রও লিখিত হয়। বাহুদ্বয়কে শরীরের দুইপাশে শক্তভাবে জড়ানো হয় এবং হস্তদ্বয়কে উদরের ওপর রাখা হয়। এ ছাড়া আঠারো থেকে পঁচিশ ভাঁজের বস্ত্রখণ্ড ঘাড়ের নীচে রাখা হয়। পায়ের নীচেও ওইভাবে ভাঁজ করে মোটা বস্ত্র রাখা হয় যাতে মমিকে দাঁড় করালে সেটিতে আঘাত না লাগে।

মস্তকে বস্ত্র জড়ানোর সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করা হল ঃ

"হে মহিমান্বিতা দেবী, হে পূর্ব এবং পশ্চিমের সর্বময় কর্ত্রী! আসুন এবং মৃতের দুই কর্ণবিবরের মধ্যে প্রবেশ করুন। হে দ্বিগুণ ক্ষমতাশালী চির-যৌবনা পশ্চিমের দেবী এবং পূর্বের কর্ত্রী পরলোকে যেন মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্কে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হয়। সেখানে তাঁর দুই চক্ষু যেন দৃষ্টি পায়। তিনি যেন কর্ণদ্বারা শুনতে পান। তাঁর নাসিকা যেন শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে। তার মুখ যেন বাক্য উচ্চারণ করতে পারে এবং জিহ্বা যেন কর্মক্ষমতা ফিরে পায়। সত্য এবং ন্যায়ের কক্ষে তাঁর বক্তব্য যেন আপনি শোনেন।"

রাজকীয় উপত্যকায় সমাধিস্থল পূর্ব থেকেই নির্মিত ছিল। হতসেপসুত নিজের জন্যও সমাধিস্থল শুরু করেছিল একই সঙ্গে। সে নিজে ফ্যারাও, সুতরাং একই জায়গায় হবে তারও শেষ আশ্রয়স্থল।

প্রথম থুথমসের সময়ের মতই সবকিছু হল। একজন উচ্চপর্যায়ের রাজ-কর্মচারী বা ফ্যারাও-এর আত্মীয়ের শোকযাত্রাতেই কত ঘটা হয়। আর এ হল স্বয়ং ফ্যারাও-এর শবযাত্রা। এর গুরুত্ব আর আড়ম্বর অনেক বেশী। এবারের শোকযাত্রা প্রথম থুথমসের শোকযাত্রাকেও ছাপিয়ে গেল কোন কোন ক্ষেত্রে। শোকে ক্রন্দনরত রমণীদের মধ্যে স্বয়ং রানী আসেত গিয়ে যোগদান করল। সবার সঙ্গে একইভাবে গায়ে মাথায় কাদা মাখল। পথিপার্শ্বের সাধারণ মানুষের চক্ষু তাই দেখে সিক্ত হল।

হতশেপসুত নিজে ফ্যারাও। নারী হয়েও সে হোরাস। তাই সাধারণ নারীদের মত সে কাঁদতে পারে না। থুথমসের মৃত্যু হওয়ায় সে এখন পরিপূর্ণ ফ্যারাও। একবার ভেবেছিল পুরুষের বেশ ধারণ করবে সে। ফ্যারাওরা যেমন ধাতুনির্মিত শ্মশ্রু পরিধান করে মুখে, সেও তেমনি করবে আজ। তাছাড়া একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা বক্ষদ্বয় চেপে বেঁধে পুরুষের মত করবে সে। নেসামুনকে সেজন্যে ডেকেও ছিল

পেছনদিকে বস্ত্রকে সজোরে চেপে বেঁধে দিতে।

নেসামুন অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলেছিল—আজকের দিনে আপনি এইসব করতেন দেবী? আজকে এই বেশ মানাবে না।

—আমি দেবী নই, আমি হোরাস।

—তবু আমার মনে হয় আজকের দিনে এমন করলে এক বিশ্রী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। তার ফল ভাল হবে না।

হতশেপসুত কিছুক্ষণ ভেবেছিল। তারপর বুঝল, নেসামুন ঠিক কথাই বলেছে। সে একচ্ছত্র ক্ষমতার মোহে বিচারবুদ্ধিহীনা হয়ে পড়েছিল।

তাই সে সাধারণ বেশেই ফ্যারাও-এর মর্যাদা নিয়ে শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে গেল। জীবনে এই পথে সে কতবার এল শোকযাত্রার সঙ্গে? চারবার। তাছাড়া উয়াচমেস আর অমেনমেসের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে অশ্রু ঝরাতে একা একা অনেকবার এসেছে। সেই সময় পিতার সমাধিতেও পুষ্প দিয়েছে। কিন্তু কোন শোকযাত্রাতে সে এমন শোকহীন হয়ে থাকেনি। তার গাম্ভীর্য আর ব্যক্তিত্ব আজ তাকে মুখোশ হয়ে রক্ষা করছে। নইলে ধরা পড়ে যেত। আসেত-এর সুবিধা আছে সে চিৎকার করছে। হাত-পা ছুঁড়ছে, সর্বাঙ্গে কর্দম লেপন করছে। অত সব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তার মুখের দিকে বিশেষভাবে চাইল না কেউ, চাইলেও কিছু বুঝতে পারত না।

দিনান্তে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের পথে নদী অতিক্রমের পরে হতশেপসুত দ্বিতীয় থুথমসের রানী আসেতকে নিজের শকটে তুলে নেয়। অন্যান্য নারীদের মত পদব্রজে যাবার আর প্রয়োজন নেই তার।

শকটে উঠে সম্মুখের আসনে বসে আসেত। তার অবস্থা দেখে হাসি পায় হতশেপসুতের।

সে বলে—প্রাসাদে ফিরে ভালভাবে স্নান করে ফেলবে।

—হ্যাঁ।

—খুব কষ্ট করলে। ভালই করেছ। আমি অনেককে বলাবলি করতে শুনেছি তোমার সম্বন্ধে। তোমার প্রতি সমবেদনায় তাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

—আমার প্রতি?

—আমি সম্রাজ্ঞী। ফ্যারাও। আমি হোরাস। এই সব শোক আমাকে স্পর্শ করে না বলে বোধহয় তাদের ধারণা।

—এবারে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে তো কোন আপত্তি নেই?

হতশেপসুত হেসে বলে—না। নিশ্চিন্ত থাক। তোমার পুত্রই ভবিষ্যতের ফ্যারাও। সে হবে তৃতীয় থুথমস।

মনে মনে হতশেপসুত সমস্ত দেবদেবীর প্রতি প্রণতি জানায়। আজ আদি দেবতা পটেহ-এর সঙ্গে মনে পড়ছে দেবতা খনেমুকে, যিনি কুমোরের চাকার সাহায্যে কর্দম থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। তাই পটেহ আর খেপেরা-এর সঙ্গে তাঁকেও মনুষ্যজগতের সৃষ্টিকর্তা বলে ধরা হয়। আজ মনে পড়ছে

শু দেবতাকে, যিনি আলো বাতাস ও তাপের দেবতা। মনে পড়ছে দেবতা তেফনুতের কথা যিনি আর্দ্রতার দেবতা। কত দেবতার কথাই মনে পড়ছে। আর একজন দেবতার কথা তার মনে প্রায়ই উঁকি দেয়, অথচ যাঁকে সে শ্রদ্ধার সঙ্গে বারবার মন থেকে সরিয়ে দিতে চায়। অথচ এই দেবতার বিগ্রহ দেখলে আসেত-এর পুত্র মিসাফ্রিসের খুব আনন্দ হয়। ইনি হলেন দেবতা বেস্। যুদ্ধের দেবতা ইনি। এঁর চেহারা খুব মজবুত। এঁর জিহ্বা মুখের বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। পা দুখানা হাঁটু থেকে বাঁকানো এবং অনেকখানি ফাঁক। পালকের মুকুট এঁর মস্তকে। শরীর আবৃত রয়েছে একটি চিতাবাঘের চর্মদ্বারা। এঁর এক হাতে ঢাল, অন্য হাতে তল্যোয়ার। কখনো কখনো এঁর হাতে তীর-ধনুকও শোভা পায়। হতশেপসুত কেন যেন এই দেবতার সঙ্গে ওসিরিসের ভ্রাতা ও হত্যাকারী শেথ-এর সাদৃশ্য খুঁজে পায়। তাই এঁর কথা ভাবতে চায় না। অথচ মিসাফ্রিসের ঝোঁক শুধু এঁর প্রতি। যেভাবে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠছে এই বয়সেই, মনে হয় যুবা বয়সে যুদ্ধের প্রতি এর আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্র হবে। শেষ পর্যন্ত হয়ত দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পড়বে।

সে সব অনেক পরের কথা। এখন সে বালক। প্রাপ্তবয়স্ক হতে অনেক তো বাকী। ততদিনে দেশকে শান্ত পরিবেশের মধ্যে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারবে সে। এখন দেশ স্থিতিশীল হবে। এখন চবরোস কথায় কথায় আর বাধার সৃষ্টি করবে না।

কিন্তু সবার আগে কন্যা হতশেপসেতের সঙ্গে আসেত-এর পুত্রের বিবাহ এবং দার-এল-বাহরির মন্দির নির্মাণের কাজে হাত দিতে হবে।

দার-এল-বাহরির মন্দির নির্মাণের স্বপ্নকে প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বপ্ন বলা যায়। হতশেপসুত জানে তার পিতা প্রথম থুথমসের পিরামিডের ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। পিতার কাছ থেকে সে কিছু জেনেছে, জেনেছে শিক্ষকদের কাছ থেকে এবং নিজে প্রাসাদের পুস্তকাগারে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে। সে জানে অতি প্রাচীনকালে যখন কোন রাজবংশের পত্তন হয়নি তখন মিশরবাসীরা সৎকার করত বালুকার মধ্যে চতুষ্কোণ বা ডিম্বাকৃতি গর্ত খনন করে। মৃতদেহকে জড়ানো হত নল-খাগড়া, পশুচর্ম কিংবা কোন বস্ত্র দ্বারা। দেহকে শয়ন করানো হত বক্রভাবে। সঙ্গে দেওয়া হত মৃতের নিজের কিছু অলঙ্কার এবং সাজসজ্জার সরঞ্জাম এবং পাত্রে থাকত পানীয় ও খাদ্য। ইহলোক থেকে পরলোকে ভ্রমণের সময় এই খাদ্য এবং পানীয়ের প্রয়োজন হত। তার অস্ত্রাদিও তার সঙ্গে ভূমিতে প্রোথিত হত। কারণ যাত্রাপথে খাদ্যের অন্বেষণে থেকে হয়ত অনেক সংগ্রাম করতে হতে পারে। বালুকার ভেতরে এইসব গর্তের গায়ে কখনো কখনো কর্দমের প্রলেপ দেওয়া হত। কখনো বা কাঠের তক্তা বা কর্দমের ইঁট গর্তের দেওয়াল রূপে ব্যবহার করা হত।

তারপর যখন ফ্যারাওদের রাজত্বকালের সূচনা হল তখন এক ধরনের সমাধিস্থল নির্মাণ শুরু হল যাকে বলা হয় মস্তব। প্রাচীনতম মস্তবের নিদর্শন

রূপে দেখা যায় মিশরের দ্বিতীয় রাজবংশের আহ নামে এক নৃপতির মস্তব। এই মস্তবের পাঁচটি কক্ষ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজবংশেও এই মস্তব চালু ছিল।

চতুর্থ রাজবংশের রাজত্বকালে প্রস্তরনির্মিত মস্তবের প্রচলন হল। সবাই জানে, এইসব চুনা পাথর আনা হত মোকাত্তাম পাহাড়ের তুরা অঞ্চল থেকে। জীবিতকালে যেমন একজন অমাত্যের প্রয়োজন হয় নৃপতির মৃত্যুর পরেও সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না। তাই একজন জীবন্ত অমাত্যকেও নৃপতির সমাধির অদূরে সমাধিস্থ করা হত। অমাত্যবর্গেরও আকাঙ্ক্ষা থাকত প্রভুর সমাধির পার্শ্বে সমাধিস্থ হতে।

চতুর্থ রাজবংশের মস্তব ছিল ভূমিগর্ভস্থ একটিমাত্র বৃহৎ কক্ষ এবং সেই কক্ষে বৃহদাকার একটি কুলুঙ্গী যেখানে শবাধার রক্ষিত হত। সেখানে একটি গর্ত মত থাকত, যেখানে সম্ভবত ব্যবহৃত হত দেহের অভ্যন্তরের অংশগুলি রাখার জন্য। পরে ওই অংশগুলি পাত্রে রাখা হত। বিশাল ভারী ধাতুনির্মিত মজবুত শিকের দরজা কক্ষের বাইরে স্থাপন করা হয় যাতে কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। এই প্রায় অগম্য কক্ষটির নাম সেরডাব। এই সেরডাবের ভেতরে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকত মৃত ফ্যারাও-এর মূর্তি। তার সম্মুখে সমান উচ্চতায় লম্বালম্বি চেরা উন্মুক্ত স্থান। অন্য কোন বাতায়ন ছিল না বলে, ঐ স্থান দিয়ে আত্মার আশ্রয়স্থল ওই মূর্তি বাইরের মন্দিরের প্রার্থনারত ব্যক্তিদের অবলোকন করত!

ষষ্ঠ রাজবংশের রাজত্বকালে সমাধিস্থলে ত্রিশটি কক্ষ থাকত। আর রাজাদের দৈনন্দিন জীবনধারা, তাদের পোশাক পরিধান করা, শাসনকার্য পরিচালনা করা, মৎস্য ও পশুশিকার, পূজা আরাধনা, পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ও বন্ধুদের সঙ্গে আসর বিনোদন ইত্যাদি সব বিষয়ের চিত্র এই সমস্ত কক্ষে অঙ্কিত হত। এই দেওয়াল চিত্রগুলি শুধু নিজেদের ধনসম্পদের গরিমা প্রকাশের জন্যই অঙ্কিত হত না, এগুলি পরলোকে যাতে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করে তার জন্যও অঙ্কিত হত।

কিন্তু এত বৈচিত্র্যপূর্ণ মস্তব নির্মিত হলেও চতুর্থ রাজবংশের শুরু থেকে মধ্যযুগীয় ফ্যারাওদের শাসনকালের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সমাধি-মন্দির নির্মাণের কাজ আরম্ভ হল। এর নাম পিরামিড। বস্তুত তৃতীয় রাজ-বংশের সময়েই মস্তব থেকে পিরামিডে রূপান্তরের সূচনা। তৃতীয় রাজবংশের সময়ে একটি নতুন ধারণার সৃষ্টি করল। সেটি হল, মৃত রাজা ওপরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে স্বর্গে পৌঁছে যেতে পারে। সেই সময়ের একটি পিরামিডে লেখা রয়েছে, "ফ্যারাও-এর জন্য স্বর্গের সিঁড়ি পাতা রয়েছে। এই সিঁড়ি দিয়ে তিনি স্বর্গারোহণ করতে পারেন।" নির্মাণকালে প্রথম প্রথম পিরামিডের আকার এমন হত যে মনে হত যে বিরাট সোপানশ্রেণী ধীরে ধীরে ওপর দিকে আকাশের মধ্যে চলে গিয়েছে। তারপর পিরামিডের শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করা হত। তখন তার চারপাশটা স্পষ্ট হয়ে উঠত।

গণ্য করার মত প্রথম পিরামিড হল সাক্কারার সোপান-পিরামিড। এটি

নির্মাণ করেছিলেন তৃতীয় রাজবংশের ফ্যারাও জোসেরের অমাত্য ইমহোটেপ। শুধু এই পিরামিডই নয়, এটিকে উপলক্ষ্য করে ইমহোটেপ আশেপাশে গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য ইমারত। কোন ইমারত শুধু পরপর সুদৃশ্য স্তম্ভদ্বারা শোভিত। কোনটা ওসিরিসের বিচারালয়। কোনটা হেব-সেদ বিচারালয়। এ ছাড়া দশটি বড় বড় মন্দির, অনেক সেরডাব, মৃতদেহ রাখার স্থান ইত্যাদি বহু সৌধ তিনি গড়ে তুলেছিলেন। সৌধগুলির গঠনপদ্ধতি এত সূক্ষ্ম, এত কমনীয় ও জীবনীশক্তিতে ভরপুর যে ভবিষ্যতেও এই স্থপতিবিদ্যার প্রভাব মিশরীয়রা আর কাটিয়ে উঠতে পারল না।

এরপর দহশুরের বক্র পিরামিড। এর স্থপতি যেন পিরামিড গড়ে তুলতে তুলতে সহসা শেষের দিকে সেটিকে দ্রুত শেষ করার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। এই পিরামিড তৃতীয় রাজবংশেরই স্নেফরুর সময়ে নির্মিত হয়েছিল।

এরপরই হল গিজার তিনটি পিরামিড। গিজার প্রস্তরময় মালভূমির ওপর এগুলি নির্মিত হয়েছে। এগুলির নির্মাতা হলেন খুফু, খেফরা এবং মেনকাউরা। খুফুর পিরামিডের অভ্যন্তরে অনেক সংযোজক পথ রয়েছে। ভেতরে রয়েছে ওপরে ওঠার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি কখনো নিয়ে যাবে রানীর কক্ষে, কখনো রাজার কক্ষে। রাজার কক্ষের ছাদ সাতটি বিশালাকার পাথরের ফলক দিয়ে তৈরী। এই কক্ষ থেকে দুটি সরু নির্গমন-পথ পিরামিডের একেবারে মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে বাইরে বাতাসের সংস্পর্শে। এই পথ ধরে বাইরে থেকে খুফুর আত্মা ভেতরে গিয়ে তাঁর দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এই পিরামিড নির্মাণ করতে ত্রিশ বৎসর লেগেছিল। তার মধ্যে দশ বৎসর লেগেছিল শুধু উঁচু বাঁধানো পথ তৈরী করতে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল এই কর্মযজ্ঞে।

খেফরার পিরামিড তার পিতার বৃহত্তম পিরামিডের অদূরেই একটু উচ্চস্থানে নির্মিত হয়েছিল। এর চতুর্দিক আরও খাড়া হয়ে ওপর দিকে উঠে গিয়েছে। ফলে আয়তনে এটির নীচটা ক্ষুদ্রতর হলেও দেখতে অনেক বেশী উঁচু দেখায়।

খেফরার উপত্যকার পাশেই স্ফিংক্স্। খেফরার শ্রমিকেরা একটি সুদৃশ্য বিরাট প্রস্তর খোদাই করে সৃষ্টি করে এটি। এর মুখ মানুষের মত, কিন্তু দেহ সিংহের। এর মাথায় কিরীট এবং মুখে নকল শ্মশ্রু। এর সম্মুখের দুই পায়ের থাবার মধ্যে দণ্ডায়মান রয়েছে খেফরার মূর্তি। এই স্ফিংক্স্ই হচ্ছে নীচের জগতের দ্বাররক্ষক। গিজার তৃতীয় পিরামিডটি হল ফ্যারাও মেনকাউরার। তিনটির মধ্যে এটিই ক্ষুদ্রতম। এটির কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। বোঝা যায় কোন কারণে শেষের দিকে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার চেষ্টা চলেছিল। কারণ এর প্রস্তরগুলি খুব মসৃণ নয়। ফ্যারাও মেনকাউরার পনেরোটি অর্ধসমাপ্ত মূর্তি এখানে পড়ে থাকতে দেখতে পাওয়া যায়।

পিরামিড ব্যতীত পঞ্চম রাজবংশের ফ্যারাওরা কিছুসংখ্যক সূর্যমন্দির

নির্মাণ করেছিল। পঞ্চম বংশের শেষ ফ্যারাও উনাস-এর পিরামিড এবং ষষ্ঠ রাজবংশের চারটি পিরামিডের কক্ষগুলির দেওয়ালে মন্ত্র লেখা রয়েছে। সপ্তম রাজবংশের ফ্যারাওরা মাত্র একটি পিরামিড রেখে গিয়েছে, তাও অসমাপ্ত।

এরপরে মিশরে নেমে আসে অন্ধকারের রাজত্ব। তখনকার কোন ইতিহাস নেই। অন্তত হতশেপসুত অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও খুঁজে পায় নি। এই অন্ধকার কেটে যেতে একাদশ রাজবংশের বিখ্যাত সমৃদ্ধিশালী বীরযোদ্ধা দ্বিতীয় মেনটুহেটেপের রাজত্বকাল এসে পড়ে। তিনি থীবস-এর নিকট দায়-এল-বাহরিতে নতুন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত একটি মন্দির নির্মাণ করান। একাদশ রাজবংশের পরে দ্বাদশ রাজবংশ আবার ফিরে যায় মেমফিসে। সেখানে তারা পুরোনো ঐতিহ্যকে মর্যাদা দিয়ে আবার পিরামিড নির্মাণ শুরু করে। কিন্তু সেগুলোর কোনটিই শিল্প হয়ে না উঠে, থেকে গিয়েছে অতি সাধারণ পর্যায়ের।

দ্বাদশ রাজবংশের পরেও কোন পিরামিড বা স্মরণীয় কোন সৌধ নির্মিত হয়নি। এইভাবে চলে সপ্তদশ রাজবংশ পর্যন্ত। অনেক সৌধ হয়েছে, মন্তব হয়েছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই হয়নি, তারপর শুরু হল আর এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। আচমকা বহিরাক্রমণের ঝাপটায় স্বভাবত শান্তশিষ্ট এবং স্ব স্ব কৃষিকর্মে নিযুক্ত মিশর ভেঙে পড়ে। দেশে এমন কোন সুসংহত সৈন্যদল ছিল না, এমন কোন অসমসাহসী দিগ্বিজয়ে উন্মুখ নরপতি ছিল না যে এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। তাই বহিরাগত হিকসোসদের পদানত হয় সমগ্র দেশ। তারা এসেই মিশরের ধর্ম এবং ঐতিহ্যের ওপর আঘাত হানতে থাকে। এইভাবে চলে কয়েক শতাব্দী।

এরপর শুরু হল অষ্টাদশ রাজবংশের সূচনা। সেই ইতিহাস হতশেপসুত জানে। জানে, প্রতিটি মিশরবাসী। হিকসোসদের পরাভূত করে দেশকে মুক্ত করেন প্রথম অহমেস। এই অহমেস হচ্ছেন অষ্টাদশ রাজবংশের প্রবর্তক। তাঁর পুত্র অমেনহোটেপ এবং তাঁরই পুত্র হতশেপসুতের পিতা প্রথম থুথমস।

দ্বিতীয় থুথমসের অকালমৃত্যুর চাঞ্চল্য একটু থিতিয়ে যেতে একাধারে ফ্যারাও ও সম্রাজ্ঞী হতশেপসুত বেশ ঘটা করে নিজ কন্যা হতশেপসেতের সঙ্গে আসেত-এর পুত্রের বিবাহ দেয়। হেব-সেদ ভোজ অনুষ্ঠিত হয় এই উপলক্ষে। তারপর একদিন কন্যা জামাতা এবং আসেতকে নিয়ে যাত্রা করে অবিদসের উদ্দেশ্যে। সেখানে তারা ওসিরিসের মন্দিরে পূজা দেবে এবং প্রার্থনা জানাবে।

যাত্রাপথে আসেত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে—আপনার জন্যই আমার পুত্রের এই উজ্জ্বল ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়ে গেল।

উদাসীন হতশেপসুত বলে—আমি কে? আমি তো নিমিত্ত মাত্র। সবই ওসিরিস, আইসিস এবং অন্যান্য দেবদেবীর আশীর্বাদ। চেবরোসকে আমি পছন্দ করতাম না, সে তো তুমি জানই। কিন্তু শত হলেও সে আমার প্রেমিক না হতে পারে, স্বামী তো বটেই। তাছাড়া সে আমার পিতার পুত্র। এক

মায়ের গর্ভজাত না হলেও, সে আমার ভ্রাতা। তাই তার পুত্র আমারও পুত্র এবং আমার স্নেহভাজন।

—আমি ওর গর্ভধারিণী হলেও যা আমার সাধ্যাতীত ছিল আপনি তা ওর হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছেন। সেদিক থেকে দেখলে আপনি ওর প্রকৃত জননী।

একটু হেসে হতশেপসুত বলে—তা হয় না। পৃথিবীতে কখনো তা হবে না। নিজের গর্ভে ধারণ করে নিজের উত্তাপে তিল তিল করে বড় করে তাকে পৃথিবীতে আনে যে নারী, তার বিকল্প কখনো হয় না। হতে পারে না!

—আপনার স্নেহের তুলনা নেই।

হতশেপসুত মনে মনে বলে—তুমি তো জান না নারী। আজ যদি তোমার পুত্রের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ না দিতাম তাহলে প্রধান সেনাপতি কিংবা অন্য কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক কর্মচারী আমার কন্যাকে বিবাহ করে ফেলতে পারত। আমাকে বেকায়দায় ফেলতে সুযোগ তাদের ছিল। তাই ওরা বুঝে ওঠার আগেই তোমার শিশুপুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে দিলাম। তোমার পুত্রের সাবালক হতে কিছুটা দেরী আছে। ততদিন অন্তত আমি একাকী সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করব। আমার অঙ্গুলি হেলনে মিশরের সমস্ত কিছু পরিচালিত হবে। কেউ এর প্রতিবাদ করতে পারবে না। এ যে কত বড় সুখ, এতে যে কী নিদারুণ উত্তেজনা আর উন্মাদনা তোমার মত অতি সাধারণ স্তরের রমণী তার মর্ম কি করে বুঝবে?

মুখে সে আসেতকে বলে—হ্যাঁ, তোমার পুত্রকে আমি সত্যই স্নেহ করি। আমার কন্যার পরেই তার স্থান।

আসেত তৃপ্তির হাসি হাসে।

অবিদসে ওরা দুদিন থাকে। তারপর রাজধানীতে ফিরে এসে আসেত-পুত্রকে ফ্যারাও-এর পদে অভিষিক্ত করার দিন ঘোষণা করা হয়।

হাপু-সেনেব এবং সেন-মুত উভয়েই এতে আনন্দিত হয়। কারণ হতশেপসুত তাদের উভয়কেই মাত্রাতিরিক্ত অনুগ্রহ করে। সুতরাং বালককে ফ্যারাও রূপে ঘোষণা করলে হতশেপসুত হবে প্রকৃত শাসনকর্ত্রী। এ কথা সেন-মুতকে না হলেও হাপু-সেনেব এবং নিজের গোষ্ঠীর রাজকর্মচারীদের পূর্বেই আভাস দিয়েছিল হতশেপসুত।

ওদিকে সামরিক কর্মচারীবৃন্দও খুশী। তারা জানে, হতশেপসুত রাজ্য-শাসন করলে তাদের সৈন্যদল অলস হয়ে বসে থেকে থেকে অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। তাদের মধ্যে নানা ধরনের দুষ্টবুদ্ধি জাগ্রত হবে। ফলে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। তাছাড়া সামরিক বাহিনী চায় মাঝে মাঝে যুদ্ধাভিযান হোক। তাতে উত্তেজনা আছে, লাভও আছে। পররাজ্য আক্রমণের ফলে লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ কম হয় না। অমন রা-এর মন্দিরের জন্য প্রাপ্য অংশ বাদ দিলেও তারা যথেষ্ট অর্থবান হয়ে উঠতে পারে।

নির্দিষ্ট দিনে বালক মিসাফ্রিসকে যথোচিত পোশাক-পরিচ্ছদে ভূষিত করে সভাকক্ষে আনা হয়। হতশেপসুত নিজে তার হাত ধরে হাসিমুখে সভাকক্ষে

প্রবেশ করে। তার অপর হস্ত দৃঢ়মুষ্ঠিতে ধরে রাখে তার কন্যা হতশেপসেত। সে-ও অপূর্ব সাজে সজ্জিত। তাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হর্ষোৎফুল্ল ধ্বনি ওঠে। মিসাফ্রিসের মাতা আসেতও তাদের পশ্চাতে এসে প্রবেশ করে।

হতশেপসুত সভাসদগণের দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে বলে—আজ আমাদের একটি অতি পুণ্যের দিন। এই দিনে সমস্ত দেবদেবী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আজ আমার এই শিশুকন্যা হতশেপসেতের সঙ্গে বিবাহের সুবাদে দ্বিতীয় থুথমসের পুত্র মিসাফ্রিস ভবিষ্যতের ফ্যারাও হবার যোগ্যতা অর্জন করে এখানে উপস্থিত হয়েছে। আশা করি এতে আপনাদের সবার সম্মতি রয়েছে।

সবাই অতি উৎসাহের সঙ্গে এক বাক্যে সমর্থন করে এই প্রস্তাব।

এর পরে দুজন পুরোহিত সভাকক্ষে প্রবেশ করে। তাদের একজনের মুখে হোরাসের মুখোশ, অপরজন থথ-এর মুখোশ পরিহিত। তারা উভয়ে নতুন ফ্যারাওকে সবার সমক্ষে নানা প্রক্রিয়ায় পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে তুলল। তাদের কাজ সমাপ্ত হলে পুরোহিত দুইজন একপাশে সরে দাঁড়ায়।

তখন হতশেপসুত বলে—এই বালক এখন সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ ও পবিত্র। সুতরাং এখন এ স্বয়ং হোরাস। আপনারা একে ফ্যারাওরূপে গ্রহণ করে অভিবাদন জানান।

সবাই অভিবাদন জানায়।

তখন দেশের ওপর ও নিম্নখণ্ডের অমাত্যদ্বয় বলে—ইনি আমাদের ফ্যারাও। ইনি তৃতীয় থুথমসরূপে অভিহিত হবেন।

সভায় আনন্দধ্বনি ওঠে!

এরপর তৃতীয় থুথমসের মস্তকে দুইবার রাজমুকুট পরানো হয়। প্রথমে দেশের ওপর অর্থাৎ দক্ষিণাংশের প্রধান অমাত্য হাপু-সেনেব বালকের মস্তকে দেশের উপরিভাগের শ্বেতবর্ণের রাজ-কিরীট পরিয়ে দেয়। এরপর নিম্ন অংশের অমাত্য রক্তবর্ণের রাজমুকুট বালক ফ্যারাও-এর মস্তক শোভিত করে।

সেই সময় সম্রাজ্ঞীকন্যা হতশেপসেত ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—আমার মাথায় কিছুই দিল না এরা।

হাসির গুঞ্জন উঠতে গিয়েও উঠল না। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝে সবাই সংযত হল।

হতশেপসুত বলে—তোমারও আছে।

তার ইঙ্গিতে একজন একটি সুদৃশ্য পেটিকা থেকে মুকুট বের করে। পুরোহিতদ্বয়ের মধ্যে থথ-এর মুখোশধারী সেটি নিয়ে শিশুর মাথায় পরিয়ে দিয়ে বলে—আপনি হলেন সম্রাজ্ঞী।

তৃতীয় থুথমসকে দেখিয়ে কন্যা বলে—ও আমাকে খেপাবে না তো?

—না। কারণ আপনার জন্যই ইনি ফ্যারাও।

কথাটা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলায় হতশেপসুত সন্তুষ্ট হয়। কারণ মন্তব্যটি সবার কর্ণগোচর হয়েছিল।

হতশেপসুত তখন বলে—দ্বিতীয় থুথমস নিশ্চয় আজকের এই অনুষ্ঠানের

কথা শুনছেন। না শুনলেও আমি নিজে কয়েকদিন পরে তাঁর সমাধিস্থলে গিয়ে জানিয়ে আসব। আমার সঙ্গে তাঁর অপর রানী আসেতও যাবেন। তাঁর বড় আশা ছিল দেশে যেন শান্তি বিরাজ করে। আমি সেই আশা পূর্ণ করার যথাযথ চেষ্টা করব। এই বালক যতদিন না সাবালক হচ্ছে ততদিন আমি শাসনকার্য পরিচালনা করব। কারণ আমিও হোরাস এ কথা সবাই জানেন।

অধিকাংশ সভাসদ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেও সামরিক ব্যক্তিদের কারও কারও মুখ থেকে অনুচ্চ ধ্বনি বের হয়। সেই ধ্বনি অস্ফুট প্রতিবাদের ধ্বনি। কিন্তু অধিকাংশের সম্মতিতে সেই ধ্বনি চাপা পড়ে গেল।

পরদিন হতশেপসুত সভায় এসেই ঘোষণা করে—আমিই হোরাস। সৃষ্টির আদি কাল থেকে আমি আছি এবং থাকব।

সভা তার উক্তিতে হতচকিত।

হতশেপসুত বলে—প্রথম থুথমস আমাকে তাঁর অংশীদার করেছিলেন। দ্বিতীয় থুথমস আমাকে বিবাহ করে মসনদ লাভ করেছিলেন। তৃতীয় থুথমস আমার কন্যা হতশেপসেতকে বিবাহ করে এখন ফ্যারাও। কিন্তু আমি বরাবরই আছি। কারণ অমন রা-এর ঔরসে আমার জন্ম।

হতশেপসুত নিজেকে একবারও রমণী বলে উল্লেখ না করে পুরুষের যাবতীয় গুণাবলী ও উদাহরণে নিজেকে ভূষিত করে। শুধু নিজেকে অন্যান্য ফ্যারাওদের মত শক্তিশালী বৃষ বলে উল্লেখ করতে বোধহয় সংকোচ হল।

সবাই বুঝল তৃতীয় থুথমস সাবালক হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃত শাসক সম্রাজ্ঞী হতশেপসুত। সামরিক কর্মচারীবৃন্দও তাঁর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হল। কারণ মিসাফ্রিস এখনো বালক। তবে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র রশ্মির রেখা হল মিসাফ্রিসের অস্ত্রবিদ্যার অসাধারণ দক্ষতা। যে অস্ত্রকে সে এত ভালবাসে সেই অস্ত্র এবং অস্ত্রধারীদের অবহেলিত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেবে না নিশ্চয়। এখন শুধু সময়ের প্রতীক্ষা ও ধৈর্যের পরীক্ষা।

সেন-মুত উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে কবে তার ডাক আসবে। দ্বিতীয় থুথমসের মৃত্যুর পরে প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হল! অথচ সম্রাজ্ঞী এখনো তাকে আসল কাজের জন্য ডাকছেন না। অথচ তাঁর সঙ্গে অন্য সময় অন্য বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। তবে কি তিনি দার-এল-বাহরির কথা একেবারে বিস্মৃত হলেন? বিশাল মন্দিরের যে নকশা সে তৈরী করেছিল অনেক দিন ও রাতের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল সেটি। এর জন্য তাকে প্রচণ্ড বালুকাময় ঝটিকা উপেক্ষা করতে হয়েছে, ভীষণ সূর্যতাপ সহ্য করতে হয়েছে। স্থানটি যে কতবার সে পরিভ্রমণ করেছে তার হিসাব নেই। রানীকে যে নকশা সে দেখিয়েছিল সেই নকশারও কিছু কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে এর ফলে। তার গাত্রবর্ণ নুবিয়ারও ওপরের দিকে অধিবাসীদের মত প্রায় কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গিয়েছে। সম্রাজ্ঞী একদিন তাকে হঠাৎ দেখে চমকে উঠেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন এত কালো হয়ে গিয়েছে কেন। সে শুধু হেসেছিল। কারণ সম্রাজ্ঞী স্বয়ং দেবী। তিনি নিশ্চয় জানেন

নিখুঁত শিল্পসৃষ্টিতে প্রাণসংশয় হলেও ভ্রূক্ষেপ করে না কোন শিল্পী। তার হাসির বিনিময়ে তিনিও তাই সমর্থনের হাসি হেসেছিলেন। আনন্দে বুক ভরে উঠেছিল সেন-মুতের।

কিন্তু তার পরে অনেকদিন অতিবাহিত হয়েছে। ডাক এলো না। এ কি তবে দেবীর পরীক্ষা? তিনি কি দেখতে চান মহান শিল্প সৃষ্টির মত অটল ধৈর্য তার আছে কিনা? তবে তাই হোক। মন ছটফট করলেও সে নীরব থাকবে।

সেই সময়ে একদিন সম্রাজ্ঞী ডেকে পাঠালেন। এই ডাক আসল ডাক কিনা তার জানা নেই। নিজের উত্তেজনা দমন করতে পারে না সহজে। হাতে সদ্য প্রস্তুত নকশাটি নিয়ে সে প্রাসাদে প্রবেশ করে। প্রাসাদ এখন তার অতি-পরিচিত স্থান।

রানী প্রবেশ করেই বলে—হাতে ওটা কি?

—নকশা। আগের নকশার কিছু পরিবর্তন করে আমি চূড়ান্ত রূপ দিয়েছি। আপনার আরও ভাল লাগবে।

—আমি সেইরকমই আশা করেছিলাম। কারণ প্রথম উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে কোন কিছুই পরিপূর্ণতা লাভ করে না। এবারের নকশা আগের চেয়ে অনেক ভাল এ কথা আমি না দেখেও বলে দিতে পারি। কিন্তু আজ আমি দার-এল-বাহরি সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য ডাকিনি আপনাকে।

সেন-মুতের চোখে হতাশা ফুটে ওঠে। তবে সেই হতাশা যাতে সম্রাজ্ঞী লক্ষ্য না করেন সেজন্য ওপরের দিকে দৃষ্টি ফেলে।

—হতাশ হলেন?

—না, আমি—

—আমি সব বুঝি। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার স্বপ্ন সফল হবেই। আর বেশী দেরি নেই।

—সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

—আপনাকে ডেকেছি কিছু ভার দিতে। আপনি জানেন না, আমার খুব ইচ্ছা ছিল আপনাকে আমার কনিষ্ঠা কন্যার শিক্ষার ভার দেব। কিন্তু তা আর হল না। সে খুব বুদ্ধিমতী ছিল।

—আমি শুনেছি। সেই সৌভাগ্য আমার হল না।

—আপনাকে শুধু মন্দির নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে বোধহয় আপনার প্রতি অবিচার করা হবে। আপনি আপনার বিদ্যা ও বুদ্ধি অন্য কাজেও ব্যবহার করে মিশরের উন্নতি ত্বরান্বিত করতে পারেন।

সেন-মুত নীরব থাকে।

—আপনার আপত্তি আছে?

—আপত্তি? আপনি আমাকে কাজের ভার দেবেন, তাতে আপত্তি। আপনার ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ।

—আপনাকে তাহলে খোলাখুলি ভাবেই বলি। আমার ইচ্ছা ছিল ইমহোটেপের মত আপনি হবেন আমার প্রধান অমাত্য। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

কারণ যাঁরা দুজন রয়েছেন তাঁরা বংশপরম্পরায় রয়েছেন এবং দুজনেই দক্ষ। তাই আপনাকে আমি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনের কাজ দিতে চাই। আমার মনে হয় এতে আপনার মন্দির নির্মাণের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে না।

সেনমুত ভাবে সম্রাজ্ঞীর এই সিদ্ধান্ত খুবই সময়োচিত। কারণ তার নিজের যদি কিছু ক্ষমতা থাকে তাহলে সব বিষয়ে সম্রাজ্ঞী কিংবা অমাত্যের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজেও অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

—ক'বে আমাকে জানাবেন ?

—খুব শিগগির। আগে ঠিক করে নেব, কোন্ কোন্ বিভাগের ভার আপনাকে দেব।

—নকশাটা আজ দেখবেন ?

—না। অন্যদিন। আজ আমি একটু ব্যস্ত থাকব।,

সেন-মুত বিদায় নেয়।

হতশেপসুতের অনুমতি নিয়ে প্রধান সেনাপতি একদিন তৃতীয় থুথমসকে শিকারে নিয়ে গেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধা দিতে পারেনি সে। শত হলেও মিসাফ্রিস বালক হলেও এখন ফ্যারাও। ফ্যারাও রূপে এটাই তার প্রথম মৃগয়ায় গমন। তাতে বাধা দেবার প্রতিক্রিয়া খারাপ হবে। ফ্যারাওকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দায়বদ্ধতা সামরিক ব্যক্তিদেরও রয়েছে। জীবনহানির সম্ভাবনা থাকলে অবশ্য হতশেপসুত বাধা দিতে পারত। তবে সেই জীবনহানিও মৃগয়াকালে স্বাভাবিক জীবনহানি বলা হয়। তেমন মৃত্যু তো যে কোন মানুষের যখন তখন হতে পারে। সামান্য একটু ভুল, সামান্য একটু বিলম্ব বা নিছক দুর্ঘটনাতে পড়েও এই জাতীয় মৃত্যু হতে পারে। এতে মানুষের হাত থাকে না। যেখানে মানুষের হাতের প্রশ্ন সেখানেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। দেখতে হয় ফ্যারাও যেন কোন চক্রান্তেব শিকার না হয়। তেমন চক্রান্তের আশু সম্ভাবনা নেই সামরিক কর্মচাবীদেব তরফ থেকে। হতশেপসুত জানে এখনকার সেনানায়কদের তেমন কোন গুপ্ত পরিকল্পনা থাকতে পারে না। কারণ এখন তাদের মধ্যে একতা বলে কিছু নেই। কেউ যদি কোনরকম উচ্চাশা পোষণ করে, অন্যেরা তাকে আদৌ সমর্থন করবে না। আগেভাগে প্রকাশ করে দিয়ে তাকে জব্দ করবে। এদেব মধ্যে তেমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজনও নেই যে নরম-গরম ভাবে অন্যদের দলে টানবে। সবাই বংশের দৌলতে ভাল ভাল পদে আসীন। তরুণ দুএকজন কর্মচারী রয়েছে যারা দক্ষ ও বুদ্ধিমান। ভবিষ্যতে তারা খুবই পারদর্শী সেনানায়করূপে গড়ে উঠবে। কিন্তু এখনকার উচ্চতম পদাধিকারী ব্যক্তিরা বার্ধক্যজনিত জরাজীর্ণ অবস্থায় না পৌঁছলে এদের হাত পা বাঁধা। তার জন্য আরও অন্তত পনেরো বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। ততদিনে তৃতীয় থুথমস পরিপূর্ণ যুবক এবং নিজেকে রক্ষা করতে নিজেই সক্ষম হবে।

মৃগয়ায় যাবার পূর্ব মুহূর্তে জ্যেষ্ঠা কন্যা বায়না ধরেছিল সেও যাবে সঙ্গে। বাহিনীর কর্মচারীরা অস্বস্তিতে পড়েছিল। হতশেপসুতই তখন তাদের

রক্ষা করে। কন্যাকে বলে যে এই শিকার খুব কষ্টসাধ্য। তার পক্ষে সেই কষ্ট সহ্য করা কঠিন হবে। তাছাড়া রাজধানীতে ফিরতে দু-তিন দিন দেরি হবে।

কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠা কন্যার সেই দাম্ভিকতা প্রকাশ পেয়েছিল। সে বলে উঠেছিল—আমি সম্রাজ্ঞী, আমি যাব না কেন? আমার কথা এরা শুনবে না কেন?

—তোমার কথা না শুনে কেউ পারে? কিন্তু তোমার কষ্ট দেখতে কার ভাল লাগবে? সম্রাজ্ঞীর কষ্ট কোন্ প্রজার দেখতে ভাল লাগে? রাতে কনকনে ঠাণ্ডায় শিবিরে থাকতে হবে। দিনে প্রচণ্ড উত্তাপ। তুমি আবার ঠাণ্ডা জল খেতে ভালবাস। কোথায় পাবে ঠাণ্ডা পানীয় সেখানে? তাই তোমাকে যেতে মানা করা হচ্ছে।

—ঠিক তো?

—হ্যাঁ।

—বেশ। পরের বার কিন্তু যাব।

—নিশ্চয় যাবে।

এই হল জ্যেষ্ঠা কন্যা। সে তার নিজের ইচ্ছাকে আদেশে পরিণত করতে পারে না। সেই আদেশকে কার্যকরী করার মত মানসিক দৃঢ়তা তার নেই। সে নারীদের মধ্যেও নারী।

প্রধান সেনাপতি হতশেপসুতকে শিকারে যাবার আগে বলেছিল, আমরা আগের মত পূর্বের দেশগুলোকে আক্রমণ করছি না বটে, কিন্তু ওরা তো করতে পারে। তার জন্য আমাদের সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। ফ্যারাওকে এই বয়সেই কষ্টসহিষ্ণু করে তুলতে হবে। সাহসী করতে হবে। তিনি মাঝে মাঝে প্রাসাদের বাইরে না গেলে কি করে সম্ভব হবে সেটা। আমরা প্রায়ই তাকে শিকারে নিয়ে যাব। শিকার হল রণকৌশল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।

হতশেপসুত আপত্তি করতে পারেনি।

কিন্তু দুদিনের জায়গায় তিনদিন অতিবাহিত হতেই আসেত এসে তার দুর্ভাবনার কথা প্রকাশ করে যায়। বলে—আজও এল না। এত দেরি হবার তো কথা ছিল না।

দুশ্চিন্তা হতশেপসুতেরও কম হয়নি। কিন্তু সে তা প্রকাশ করে না। মুখে বলে—দূরে গেলে একটু এদিক ওদিক হয়ে যায়। অত ভেব না। সে ফ্যারাও। তার সঙ্গে অনেক লোক রয়েছে। কোন বিপদ ঘটার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। কারণ সবাই ফ্যারাওকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আশ্বস্ত হয়ে আসেত ফিরে যায়। সেইদিনই রাতে মিসাক্সিস ফেরে হৈ হৈ করতে করতে। একটি সিংহ শিকার করে এনেছে।

হতশেপসুত কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে—কে মেরেছে?

—আমি।

—তুমি? তোমার বাহুতে অত শক্তি আছে?

প্রধান সেনাপতি নিজেই এগিয়ে আসে এবার। তার চোখে আর মুখে

আনন্দ চাপা থাকে না। সে বলে—আপনি বিশ্বাস করুন দেবী। ফ্যারাও নিজে সর্বপ্রথম একে তীরবিদ্ধ করেন। তাতে সিংহ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তখন সবাই ছুটে যায় তার দিকে। সে উঠে দাঁড়াবার আগেই তাকে পিটিয়ে বধ করা হয়। ফ্যারাও-এর সাহসের তুলনা হয় না। সিংহ তাঁকে লক্ষ্য করে লাফ দিল অথচ তিনি অবিচল দাঁড়িয়ে শরসন্ধান করে তার ঘাড় লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন। আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় রইলাম।

হতশেপসুতের চোখে প্রশংসা এবং আসেত-এর বুকে গর্ব। আসেত পুত্রকে জড়িয়ে ধরে। সেই সময় জ্যেষ্ঠা কন্যা হতশেপসেত নিদ্রিত ছিল। সে জেগে থাকলে তার কী প্রতিক্রিয়া হত বোঝা গেল না। পরদিন সকালে মিসাফ্রিসকে চোখের সামনে ঘুরতে দেখেও তাকে না দেখার ভাণ করতে থাকে।

—আমি সিংহ মেরেছি।

হতশেপসেত কথার উত্তর দেয় না।

মিসাফ্রিস তখন তার গায়ে খোঁচা দিযে বলে—এই, আমি সিংহ মেরেছি।

কথাটা মায়েব কাছ থেকে আগেই শোনা হয়ে গিয়েছিল। তাই সে বলে—সিংহ শিকারে গিয়ে কেউ জলহস্তী শিকার করে নাকি?

—আমি নিজে শিকার করেছি।

—তাতে কি হয়েছে?

—তাই বলছি। আমাকে দেখতেই পাচ্ছ না কিনা?

—না দেখার কি আছে?

—কথা বলছিলে না কেন?

—তুমিও তো বলনি।

—শিকার কবে এলাম তুমি তো আগে বলবে।

—রাতে ফিবলে কেন? দিনের বেলায় ফিরলে আগে কথা বলতাম।

—রাত্রি হয়ে গেল যে।

—আমাকে ডাকনি কেন?

—তুমি ঘুমোচ্ছিলে।

—তাতে কি? আমি না সম্রাজ্ঞী? সব কথা আমার আগে জানা দরকার।

—তা ঠিক। বেশ এবার থেকে তোমাকে আগে জানাব।

—এবার থেকে তোমাকে একা যেতে দিলে তো? ভাবনায় ঘুম হয় না আমার।

—সর্বনাশ! ওখানে গেলে তুমি কেঁদে ফেলবে। খুব কষ্ট।

—ইস্, অত সহজ নয। তুমি কার জন্যে ফ্যারাও?

—মা বলে, তোমার জন্যে নাকি।

—তবে? পরের বার থেকে আমি যাব।

—আমি লুকিয়ে চলে যাব। তোমাকে নিয়ে যেতে পারব না। অত কষ্ট কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

—একবার নিয়ে গিয়ে দেখই না।

অনেকক্ষণ ভেবে তৃতীয় থুথমস বলে—বেশ।

হাপু-সেনেব একদিন হতশেপসুতকে বলে যে দার-এল-বাহরিতে যাবার বাঁধানো রাস্তা তৈরীর মালমশলা সেখানে পৌঁছতে শুরু করেছে। এবারে সেন-মুত সেখানকার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

—কিন্তু তার আগে যে আমি তাকে কতকগুলো গুরুদায়িত্ব দেবার কথা ভাবছিলাম।

—দিলে এর মধ্যেই দিতে হবে। কারণ একবার ওখানে গিয়ে কাজে জড়িয়ে পড়লে এখানে আসতে পারবে না।

—এখানে আসতেই হবে। কারণ রাজধানীতে তাঁর উপস্থিতি প্রায় সব সময়েই বাঞ্ছনীয়। আমি তাকে আমার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের একজন হিসাবে নির্বাচিত করেছি।

—খুব ভাল করেছেন। সে যোগ্য ব্যক্তি। আমি আজই একথা ঘোষণা করে দেবে।

—হ্যাঁ আজই ঘোষণা করে দিন। কারণ তিন দিন পরে সভাকক্ষে আপনাকে আরও একটি গরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করতে হবে।

—কোন ঘোষণা দেবী।

—সেন-মুতকে যে যে দায়িত্ব দেব, সব খোলাখুলিভাবে সভায় বলতে হবে। আপনিই বলবেন।

—কোন্ কোন্ দায়িত্ব দেবেন বলে ভেবেছেন?

—মিশরের নিম্নভূমির শীলমোহর বা নামমুদ্রার ভার দেব তাঁকে। পদটা শূন্য পড়ে রয়েছে বহুদিন।

—আপনার সিদ্ধান্ত যথার্থ।

—এছাড়া তিনি পাবেন অমন দেবতার তত্ত্বাবধায়কের পদ।

—উত্তম প্রস্তাব।

—শস্যক্ষেত্র, উদ্যান আর গোজাতির উপদর্শকের পদও তিনি পাবেন।

—হ্যাঁ, এই পদের প্রয়োজন ছিল বটে।

—জোতদার কৃষক এবং অমন দেবতার শস্যভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়কের পদটিও তাঁকে দিলে কেমন হয়?

—ভালই হয়।

—তাঁকে দেবতা অমনের পবিত্র পালতোলা নৌকার প্রচারকের ভূমিকাও পালন করতে হবে।

হাপু-সেনেব এবারে নীরব থাকে।

—কি হল? আপনার সমর্থন নেই?

—না না, সমর্থন থাকবে না কেন?

—তাহলে চুপ করে আছেন কেন?

—আমি অন্য কথা ভাবছি।

—কোন্ কথা ? অসঙ্কোচে বলুন।

—সভাসদগণের আত্মীয়স্বজন রয়েছে। তাঁরাও দুএকটি পদের প্রত্যাশী, একথা আপনার অজানা নয়।

—না, কখনই অজানা নয়। কিন্তু আমি সেন-মুতকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে চাই, তাঁর মত যোগ্য ব্যক্তি আপনি ব্যতীত দ্বিতীয় কাউকে দেখি না। সেন-মুত অমাত্য হতে পারেন না বলে আমার আফসোস।

—তাহলে অবশ্য বলার কিছু নেই। কারণ সেন-মুত যে যোগ্যতম ব্যক্তি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

—সেন-মুতকে করা হবে দেবী নুত-এর স্বামী দেবতা গেব-এর আরাধনা স্থানের প্রবক্তা।

—আমি সমর্থন করছি।

—শ্বেতবর্ণের মুকুট যে স্থানে রক্ষিত হয়, সেই স্থানের ভারও তাঁকে দেওয়া হবে।

—আর ?

—হ্যাঁ, আরও একটি ভার দেওয়া বাকী রয়েছে।

—বলুন।

—সৈন্যবাহিনী যেমন রয়েছে প্রহরায় থাকুক। তবে প্রাসাদের অন্য সব কিছুর ভারও তাঁকে দেব।

—সব কাজের ভার কি একদিনেই দেবেন ?

—ক্ষতি আছে ?

—বুঝতে পারছি না। এক একদিন একটি একটি করে দিলে সভাসদগণের মধ্যে অসন্তোষ ধুমায়িত হতে থাকবে। তার চেয়ে সব একদিনে দিয়ে ফেলাই ভাল।

—পরশু ?

—হ্যাঁ। আমি সেন-মুতকে বলে রাখব সভায় উপস্থিত থাকতে।

দুদিন পরে সভায় সবার সঙ্গে সেন-মুতও উপস্থিত। তাকে অনেকেই সুনজরে দেখে না আজকাল। কারণ সবার জানা হয়ে গিয়েছে যে হতশেপসুতের ওপর তার যথেষ্ট প্রভাব। মন্দির নির্মাণের ধুয়ো তুলে প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে অনেকে। তবে লোকটি যে যথেষ্ট শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং করিৎকর্মা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু সবার ভয় লোকটি অন্য সবাইকে হতশেপসুতের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

হাপু-সেনেব উঠে দাঁড়িয়ে বলে—শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ফ্যারাও সেন-মুতকে মন্দির নির্মাণের কাজ ছাড়াও আর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করতে চান।

একজন বলে ওঠে—আবার কোন্ কাজ ? মন্দির নির্মাণ কি সহজ কাজ ?

—কখনই নয়। তবে সেন-মুত-এর মত ব্যক্তির পক্ষে সেটা এমন কিছুই নয়। ভুলে যাবেন না, তিনি স্থপতি। তিনি শ্রমিক নন। সব সময় সেখানে তাঁকে

উপস্থিত না থাকলেও চলবে। বাকী সময় দেশের স্বার্থে তাঁকে নিয়োজিত করা হবে।

হাপু-সেনেব-এর গোষ্ঠীর একজন বলে ওঠে—নিশ্চয়। আপনি বলুন, কোন কোন পদ দেওয়া হবে তাকে ?

হাপু-সেনেব তখন গড়গড় করে সবগুলো পদের নাম করে যায়। নকলনবিশ আগে ভাগেই সব লিখে প্রস্তুত করে রেখেছিল। হাপু-সেনেব-এর পাঠ শেষ হতেই নকলনবিশ সেটি হতশেপসুতের কাছে নিয়ে এসে দস্তখত করে নেয়।

স্তম্ভিত সভাসদগণ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব হয়ে গেল। তারপর গুঞ্জন উঠল।

হতশেপসুত হাত তুলে সভাকে নীরব হতে বলে। তারপর সে বলে—আপনাদের ঘনিষ্ঠজনদের একটি তালিকা আমাকে দেবেন। আমি তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করব।

একজন বলে ওঠে—রাজধানীর বাইরে যেতে পারবে না।

হতশেপসুত হেসে বলে—অধিকাংশই রাজধানীতে থাকবে। তবে সবাইকে কি এখানে নিয়োগ করা সম্ভব ? সেনাবাহিনীর উঁচু পদে নিয়োগ করলেও তো বাইরে যেতে হতে পারে। আপনারা দেখবেন সেন-মুতকে যে সমস্ত ভার দেওয়া হল, তা অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালিত হবে। তাছাড়া সেন-মুত নিশ্চয় কিছুদিন পর থেকেই আপনাদের দার-এল-বাহরি পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।

সেন-মুত উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আমি এখন থেকেই সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি। আপনারা মাঝে মাঝে ওখানে গেলে শ্রমিকরা এবং আমিও অত্যন্ত উৎসাহিত হব। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের প্রেরণা যোগাবে।

সবাই দেখল সেন-মুত ধূমকেতুর মত উদিত হয়ে সব কিছু গ্রাস করল অথচ কিছু বলতে পারল না। ফ্যারাও-এর বিরুদ্ধাচরণ করা তাদের রক্তে নেই।

সেই সময় এক বিদেশী বণিক প্রবেশ করায় সেন-মুতের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল। কারণ বণিকটি অনেক সভাসদের পরিচিত। দুদিন হল রাজধানীতে এসেই গায়ে পড়া কতকগুলো মন্তব্য করে সবার বিরাগভাজন হয়ে উঠেছে।

সে প্রবেশ করতেই দুএকজন বলে ওঠে—এই সেই বণিক।

বণিকের এই দেশ ঘুরে ধারণা হয়েছে যে মিশরবাসীরা মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবার জন্য সদা ব্যস্ত। মৃত্যু তাদের জীবনের ওপর সর্বদা ছায়া বিস্তার করে তাদের সবাইকে মানসিক রোগগ্রস্ত করে তুলেছে।

আজ এসে বাণিজ্য সম্বন্ধে টুকটাক কথা বলেই সেই একই মন্তব্য সে করে বসে।

সভার সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হতশেপসুত উপস্থিত রয়েছে বলে তারা বেশী কিছু করতে পারে না। তবে প্রবল আপত্তি জানাতে থাকে।

হতশেপসুত হস্ত উত্তোলন করে তাদের ধৈর্যচ্যুত হতে নিষেধ করে বলে—এভাবে প্রতিবাদ জানালে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশী। ওঁরা বিদেশী।

বাইরে থেকে আসেন। ওপর ওপর দেখে একটা ধারণা নিয়ে ফিরে যান। সেই ধারণা সঠিক হতে পারে, আবার ভুলও হতে পারে। তবে এঁদের মাধ্যমেই এঁদের দেশবাসীর মনে মিশর সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি হয়। পুন্তদেশের সেই সর্পরাজের গল্প আপনাদের মনে নেই? কত যুগ ধরে আমরা একথা বিশ্বাস করতাম। তাই এভাবে রুখে না উঠে সংযত ভাবে আমাদের কথা বুঝিয়ে বললে লাভ হয় বেশী।

অমাত্যবর্গ হতশেপসুতের কথায় লজ্জিত হয়। তারা উপলব্ধি করে, মিশরের বাহ্যিক রূপ দেখে বণিকদের মত ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে আসা অস্বাভাবিক নয়। এখানে মৃত্যুর পরে যত ঘটা, বিশেষ করে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের বেলায়, পৃথিবীর অন্যত্র তার নিদর্শন নেই। এখানে মৃত্যুর পরে মৃতদেহকে অক্ষয় করে রাখার চেষ্টা, তাকে সুন্দরভাবে বসবাসের জন্য জীবন্ত মানুষের বাসগৃহের চেয়েও বহুগুণ মূল্যবান সমাধি মন্দির ইত্যাদি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়ায় পশ্চিমের অনেকখানি অঞ্চল জুড়ে রাজকীয় উপত্যকার অস্তিত্ব ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করতেই পারে। ভাবতে পারে, মৃত্যু এখানে জীবনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তার বিপরীত। বণিকটি এখানকার উৎসব দেখেনি নিশ্চয়। সেই সব উৎসবের বাঁধভাঙা আনন্দোচ্ছ্বাসে গা ভাসানোর সুযোগ পায়নি এখনো। মিশরবাসীরা জীবনকে যতটা উপভোগ করতে পারে অন্য কেউ কি তা পারে? কারণ অন্যদেশের মানুষেরা জানে মৃত্যুই জীবনের শেষ। সেটাই জীবনের সীমারেখা। তার আগে যত পার আনন্দ কর। কিন্তু যতই তারা আনন্দ করুক শেষের সেই দিনের কথা বারবার মনের মধ্যে উঁকি দেয়। কিন্তু মিশরবাসীদের তা দেয় না। কারণ তারা জানে, মৃত্যুতেই তাদের জীবন শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর পরেও জীবনস্রোত অবিচ্ছিন্নভাবে বইতে থাকে। কোন ছেদ নেই তাতে। এই নিশ্চিন্ততা, আশাবাদ এবং জীবনতৃষ্ণা তাদের উৎসবকে করে তোলে সম্পূর্ণ নির্মল। এখানকার সমাধি মন্দিরের গাত্রে যে সব চিত্র অঙ্কিত হয় তাতে মৃত্যুর করাল ছায়ার বিন্দুবিসর্গও থাকে না। সেই সব চিত্র হল ফসল ফলানোর চিত্র। যাতে রয়েছে প্রকৃতির সুষমাময় অভিব্যক্তি। মৃগয়ার উত্তেজনাময় আনন্দও প্রকাশ পায় সেই সব চিত্রে। ক্রীড়া এবং ভোজের বর্ণনাময় চিত্র শিল্পীর হাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে সৌধগুলিতে।

এই দেশের জীবন তাই প্রদীপ্ত এবং অপরিমেয়। মৃত্যুভয়-জনিত স্নায়বিক রোগগ্রস্ত মানুষের অস্তিত্ব নেই এদেশে। এরা নিশ্চিন্ত যে অনেক দেবদেবী এদের অহর্নিশ দেখাশোনা করছেন। তাঁদের মধ্যে একজন আবার রয়েছেন মনুষ্যরূপী দেবতা। তিনি হলেন স্বয়ং ফ্যারাও। এদের এই বিশ্বাস এত প্রবল যে শত ঝড়ঝাপটার মধ্যেও এরা বিপুলভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। হিকসোসরা পর্যন্ত কিছু করতে পারেনি এদের। বিশ্বাস এদের মনে এই প্রত্যয়ের জন্মদান করেছে যে পৃথিবীতে এরাই সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য বিদেশীরা কখনই এদের সমতুল্য নয়। বণিকটির দিকে সভাসদগণ সেই দৃষ্টিতে চায় যে

দৃষ্টিতে ওদের পূর্বপুরুষেরাও চেয়েছে বিদেশীদের দিকে।

ওইসব বিদেশীদের দিকে একবার ভালভাবে চেয়ে দেখ। ওরা যেখানে থাকে সেখানেই অসুখবিসুখ আর মহামারী। সেখানে হয় প্রাকৃতিক বন্যা আর জলোচ্ছ্বাস। ওদের দেশ অরণ্যসংকুল। ওখানকার পথঘাট দুর্গম। কারণ ওখানে ঘন ঘন পর্বতশ্রেণী মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আদিম যুগ থেকে ওরা শুধু যুদ্ধই করে চলেছে। কিন্তু বিজয়ী হতে পারেনি কখনো। ওদের নিয়ে মাথা ঘামিও না। ওদের কেউ হয়ত বিক্ষিপ্তভাবে একজন মিশরবাসীকে অপহরণ করতে পারে, কিন্তু সংঘবদ্ধ ভাবে কোন নগরীর ওপর আঘাত হানার সাধ্য ওদের নেই।

হতশেপসুতকে বণিক সবিনয়ে বলে—আমি সত্যই এদেশ সম্বন্ধে খুব কম জানি। আমার ভুল হতে পারে। ওপর ওপর দেখে হয়ত বুঝতে পারিনি।

হতশেপসুত বলে—আপনি আরও ভালভাবে ঘুরুন। পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলুন। দেখুন তারা মৃত্যুকে কিভাবে গ্রহণ করে।

—তাই দেখব।

এরপর বণিক তার বাণিজ্য বিষয়ে কথা শুরু করে।

দার-এল-বাহরির কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। সেন-মুত এখন রাজধানীতে বেশী থাকতে পারে না। তার অধীনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক শিল্পী কাজ করছেন। তারা পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু এবং একনিষ্ঠ। সেন-মুত তাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক কাজের ভার দিয়ে ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। এতে তারা গর্বিত। প্রত্যেকের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। কারণ এক একটি কাজ শেষ হলে সেন-মুত সবাইকে ডেকে একত্রিত করে তাদের সদ্যসমাপ্ত কাজকর্মগুলির ভালমন্দ বিশ্লেষণ করে। যদি কোথাও কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তাও বলে দেয়। কখনো কখনো কোন শিল্পীর শিল্পকর্মের উচ্চ প্রশংসা করে নির্দ্বিধায়। এতে অন্যেরা যে একেবারে ঈর্ষান্বিত হয় না তা নয়। তবে তাদের মধ্যে একটা জিদ-এর সৃষ্টি হয় সেন-মুতের প্রশংসা অর্জনের জন্য। ফলে মন্দিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ থেকে বড় বড় সমস্ত কাজই প্রায় নিখুঁত হতে থাকে।

হতশেপসুত মাঝে একদিন পরিদর্শনে আসে। যেটুকু হয়েছে তাতেই যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত হয়!

সে জিজ্ঞাসা করে সেন-মুতকে—আমাদের পুন্তদেশ অভিযান এবং সেখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে চিত্রটি কোথায় শোভা পাবে?

সেন-মুত বলে—অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে একটু অন্যদিকে যেতে হবে।

—চলুন।

সেন-মুত হতশেপসুতকে যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে থামে। একটি প্রকাণ্ড ফলক দেখিয়ে দিয়ে বলে—এইখানে। মন্দিরে কেউ পূজা দিতে এলে কিংবা দেখতে এলেও সহজেই তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে।

হতশেপসুত সন্তুষ্ট হয়। ভাবে, এবারে আর পুন্ত সাধারণ মিশরবাসীর

কাছে রহস্যঘেরা দেশ হয়ে রইবে না।

এরপর হতশেপসুত বলে—আমার জন্মরহস্য বৃত্তান্ত কোথায় শোভা পাবে ?

—দয়া করে যদি ওইদিকে আমার সঙ্গে আসেন।

—চলুন।

স্থানটি দেখিয়ে দেয় সেন-মুত। খুবই প্রকাশ্য স্থান। যে কেউ মন্দির দেখতে এলে তার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

—আর আমার মূর্তি ? কতগুলো হবে ?

—প্রতিটি স্তম্ভের গায়ে একটি করে খোদিত হবে। আপনার অস্তিত্ব থাকবে মন্দিরের সর্বত্র। শুধু তাই নয়, পুন্তদেশ থেকে আনা এইসব বৃক্ষগুলি যা আরও বড় হয়ে উঠবে তখন দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। দেবদেবীর বাসস্থান আর দার-এল-বাহারির মন্দিরের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকবে না।

হতশেপসুত আরও অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। শ্রমিকেরা একমনে কাজ করে চলেছে।

—এরা অবসর সময়ে থাকে কোথায় ?

—এদের জন্য ছাউনি করা আছে। তবে অধিকাংশই সেই ছাউনিতে না থেকে রাতে এদিকে ওদিকে শুয়ে পড়ে। মন্দিরের চাতালেও থাকে অনেকে।

—সেটা কি ভাল ? চাতাল অপরিষ্কার হয় না।

—না। এদের ওপর কড়া নির্দেশ আছে। ধরা পড়লে শাস্তি পেতে হবে।

—এরা কি খায় ?

—নিজেরা সংগ্রহ করে আনে নিজেদের মত।

সেই সময়ে পুরাকালের এক ফ্যারাও-এর বিবৃতির কথা হতশেপসুতের মনে পড়ে যায়ঃ যারা নিরাশ্রয় আমি তাদের আশ্রয় দিয়েছি। যারা অনাথ তাদের আমি মানুষ করেছি। যার এই পৃথিবীতে কিছুই পাওয়ার ছিল না, আমি তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি।

বহু পুরাকালে দেশের অপর এক নৃপতি তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেনঃ প্রতিভাবানদের সুযোগ দাও, যাতে তারা তাদের কাজ ঠিকমত করে যেতে পারে। কিন্তু দরিদ্ররাও রয়েছে যারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী দাবী করতে পারে না। অথচ তাদের সহায়তাতেই প্রতিভাবানেরা পুরস্কৃত হয়। একজন ব্যক্তি তখনই মহান, যখন তার অধীনস্থ ব্যক্তিরাও মহান। সেই নৃপতিই শৌর্যশালী যাঁর যোগ্য সভাসদবৃন্দ রয়েছে।…একজন ধনবান বা রাজবংশীয় ব্যক্তির পুত্রের সঙ্গে একজন দরিদ্রের পুত্রের মধ্যে সীমারেখা টেনো না। মানুষের পরিচয় তার তাদের কাজে।

হতশেপসুত সেন-মুতকে বলে—ওরা নিজেরা সংগ্রহ করলেও আপনি ওদের খাদ্যের দিকে নজর রাখবেন। এটা কোন নগরী নয়। এখানে এত লোকের খাদ্য যোগাড় করা দুঃসাধ্য ওদের পক্ষে। ওরা সুস্থ থাকলে, ওদের মন স্ফূর্তিতে থাকলে আপনারই লাভ। আপনার সৃষ্টি তাতে আরও পরিপূর্ণ হবে।

সেন-মুত বলে—এবার থেকে আমি অবশ্যই নজর রাখব।

হতশেপসুত আরও কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে বিদায় কালে বলে—শ্রমিকের সংখ্যা এত কম কেন?

—এখন ফসলের সময়।

—হ্যাঁ, আপনাকে ফসল ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

দ্বিতীয় থুথমসের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে দশ বৎসর অতিবাহিত হল। দার-এল-বাহরির মন্দির প্রায় সমাপ্তির পথে। ইতিমধ্যে হতশেপসুতের ইচ্ছা অনুযায়ী সেন-মুত নিজে আসওয়ানে গিয়ে অখণ্ড পর্বত-প্রস্তরের দুইটি চতুষ্কোণ ও সরু স্তম্ভ নিয়ে এসে এখানে প্রোথিত করেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পৃথিবীর এই অত্যাশ্চর্য মন্দির দেখতে লোক আসতে শুরু করেছে। এটি যেন একটি স্বপ্নপুরী। মন্দিরের প্রধান অংশের প্রতিটি কারুকার্যময় স্তম্ভের গাত্রে হতশেপসুতের শ্মশ্রুমণ্ডিত সমতল বক্ষের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি শোভা পাচ্ছে। একস্থানে দেখা যাচ্ছে সময় দেবতা অমন রা হতশেপসুতের মাতা অহমেসের সঙ্গে প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় মৈথুন-রত। তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হল হোরাস হতশেপসুতের জন্মগ্রহণ। অপরদিকে বড় বড় পালতোলা নৌকায় মিশরবাসীর পুন্তদেশ অভিযানের চিত্র। ওদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে দ্রব্য-সম্ভার লেনদেন শোভা পাচ্ছে সেই বিশাল চিত্রে।

দর্শকেরা এখানে এসে যা দেখে তাতেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারা সন্দেহ প্রকাশ করে সেন-মুত আদৌ একজন রক্তমাংসের মানুষ কিনা। তারা ভাবে, সেন-মুত নিশ্চয় ফ্যারাও-এর মত কোন মানব-দেহী দেবতা।

কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও হতশেপসুত লক্ষ্য করে তৃতীয় থুথমস ইতিমধ্যে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের প্রভাতে পৌঁছে গিয়েছে। দেখতে সে অসাধারণ হয়েছে। তার সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা চলে উবাচমেসের। কিন্তু নারীর প্রতি তার কতখানি আসক্তি ঠিক বুঝে উঠতে পারে না হতশেপসুত। নিজের কন্যার দিকে চাইলে তো বেশ সুখী বলেই মনে হয়। কোন দিন কোন কটূক্তি করতে শোনেনি স্বামীর বিরুদ্ধে। শুধু একদিন বলেছিল—মনে হচ্ছে, ওর জন্যে এখন থেকেই হারেমে মেয়ে আনতে হবে।

হতশেপসুত আগ্রহভরে বলে উঠেছিল—কেন? কেন?

—বুঝতে পার না?

—না বললে কি করে বুঝব?

—তাহলে আর বোঝার প্রয়োজন নেই।

হতশেপসুত পরদিনই ফ্যারাও-এর হারেম পরিদর্শন করে। দেখে, সেখানে সব কক্ষই প্রায় শূন্য। দ্বিতীয় থুথমসের সময়ের কয়েকজন বয়স্কা রমণী রয়েছে শুধু।

বিরক্ত হয়ে সে বলে—এরা এখানে কেন?

হারেমের অধিকর্তা সভয়ে বলে—এদের সম্বন্ধে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নি।

—আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নি কেন ?

অধিকর্তা নীরব।

—আজই এদের সরিয়ে দিয়ে সব কক্ষ পরিষ্কার করে ফেলা হোক।

সেইদিনই হাপু-সেনেবকে ডেকে পাঠায় হতশেপসুত। সে এলে বলে—হারেম তো শূন্য। দ্বিতীয় থুথমস তরুণ।

—হ্যাঁ দেবী। অনেকদিন যুদ্ধবিগ্রহ হয়নি। তাই বিদেশী নারী সংগ্রহ করা হয় নি।

—দেশে কি নারীর অভাব ?

—অবশ্যই নয়। তবে সবদেশের নারী থাকলে হারেমের শোভা বৃদ্ধি পায়।

—আপাতত দেশের কিছু সুন্দরী ললনাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। হারেমের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী আর সেখানকার নারীরক্ষীদের জন্য শুধু শুধু ব্যয় হচ্ছে। তাদের কোন কাজই নেই। আলস্যে আর নিদ্রায় দিন কাটাচ্ছে তারা।

—আমি আজই নির্দেশ জারি করছি।

হতশেপসুত তরুণ থুথমসকে মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে উঠতে দেখেছে। এই অধৈর্য যৌবনের অসহিষ্ণুতা কিনা ঠিক বোঝা যায় না। তবে সে একটানা বেশীদিন রাজধানীতে থাকতে চায় না। মাঝে মাঝে দলবল নিয়ে মৃগয়ায় বেরিয়ে পড়ে। দলের মধ্যে সামরিক বাহিনীর তরুণ কর্মচারীর সংখ্যাই বেশী।

হতশেপসুতকে শৈশব থেকেই ভালবাসে মিসাফ্রিস। কিন্তু ইদানীং যেন তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। ডাকলেও দুচার কথা বলে চলে যায়। বুঝতে পারে ভালবাসায় ভাটার টান পড়েছে, কত লোক কত রকমের পরামর্শ দিচ্ছে। বিশেষ করে সেনাবাহিনীর ওই লোকেরা। মন বিগড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

দিগ্বিজয়ের মোহ শৈশব থেকেই তার। নানা কথায় সে একথা বারবার প্রকাশ করেছে। সে চায় তার দেশের সীমা আরও বৃদ্ধি পায়। টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর নাম সে অনেকদিন থেকেই জানে। জানার পর থেকেই তার স্বপ্ন দেখা শুরু। সেই স্বপ্নকে কতভাবে যে দানা বাঁধতে দেয়নি হতশেপসুত তার ইয়ত্তা নেই। কারণ এই স্বপ্ন একবার দানা বাঁধলে হতশেপসুতের ক্ষমতার বজ্রমুষ্ঠি শিথিল হয়ে পড়বে। সুতরাং তার প্রতি শৈশবের ভালবাসাকে যতদিন পর্যন্ত ভাঙানো যায় ততদিনই তার মঙ্গল। পিতার পুত্র হয়েও থুথমস সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের যুবক। তার সব কিছুই আছে। সব কিছুর যোগ্যতা সে অর্জন করেছে। রাজ্যশাসন সে কৃতিত্বের সঙ্গে করতে পারে। আজ যদি সে যুদ্ধাভিযানে যাত্রা করে তবে তার জয় সুনিশ্চিত। তবু একটি বিষয়ে সে এখনো সচেতন নয়। এখনো তার স্পষ্ট ধারণা হয়নি যে হতশেপসুত তার ক্ষমতা লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে জানে না, যতদিন সম্ভব হতশেপসুত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকতে চায়। কারণ ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে

তার দেবীত্ব খসে পড়বে। সে আর হোরাস থাকবে না। হয়ে পড়বে অতি সাধারণ এক মানবী মাত্র।

তাই হতশেপসুত চায় কোন সংকল্পই যেন থুথমসের মনে দৃঢ়মূল হয়ে না বসে। আর তার প্রকৃষ্ট পথ হচ্ছে থুথমস যাতে মদির যৌবনের মাদকতায় গা ভাসায়।

কিন্তু হতশেপসুত ভুলে যায় যে যৌবনের মত্ততায় সেও আবিষ্ট হয়েছিল এককালে। উয়াচমেসকে পেয়ে সে প্রায় পৃথিবীকে বিস্মৃত হতে বসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংকল্প থেকে কখনো সে বিচ্যুত হয়নি। মিসাফ্রিসের বেলাতেও তেমন হতে পারে, একথা মনে থাকে না। সে জানে না, মিসাফ্রিসের চোখের মধ্যে সন্দেহ উঁকি দিলেও এখনো সে হতশেপসুতকে একেবারে অবিশ্বাস করতে পারে না। এখনো সে বিশ্বাস করতে চায় হতশেপসুত তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী। নইলে সেই শৈশবেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ কন্যাকে তার হস্তে সমর্পণ করত না। সেইদিন থেকেই তো ভবিষ্যতের ফ্যারাওরূপে সে চিহ্নিত হয়ে এসেছে।

তবু একদিন তৃতীয় থুথমস সোজাসুজি তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কি খবর মিসাফ্রিস। এত সকালে ?

—আপনার গুপ্তচরেরা কি কোন খবর দেয় না আপনাকে ?

—হঠাৎ এ কথা কেন ?

—আমার চরেরা নতুন খবর এনেছে।

—তোমার চরেরা ? তোমার চর আর আমার চরের মধ্যে তফাৎ কোথায় ? তুমিই তো ফ্যারাও।

—সে তো শুধু নামে।

হতশেপসুত ঢোঁক গেলে। এত সোজাসুজি তাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান এই প্রথম।

—শুধু নামে না মিসাফ্রিস, কাজেও। বেশ আজ থেকে তবে আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার অল্প বয়স, স্ফূর্তি আনন্দ করছ, তাই আমি হাল ধরে বসে রয়েছি। নইলে আমি কে ? সবই তো তোমার জন্য।

তৃতীয় থুথমসের অনুশোচনা হয় একটু। শুধু শুধু আঘাত করল সে হতশেপসুতকে। না করলেও পারত। মা-ও নিষেধ করেছিল। মা বলেছিল, অত তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন কি ? মা এখনো হতশেপসুতকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু সে নিজেকে যাচাই করে দেখেছে হতশেপসুতের কিছু কিছু কার্যকলাপের জন্য তার শ্রদ্ধায় অনেক আগে থেকেই ফাটল ধরেছে। তাছাড়া সে বড় বেশী পুরাতনপন্থী।

থুথমস স্থানত্যাগ করতে উদ্যত হলে হতশেপসুত বলে—এ কি, চলে যাচ্ছ কেন ? কোন্ খবর পেয়েছ বলে যাও। প্রতিবিধানের প্রয়োজন হতে পারে।

—পূর্বদেশের রাজাদের মনে ধারণা জন্মেছে যে মিশর এখন একটা দুর্বল জাত। মিশর মন্দির নির্মাণ করতে পারে, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে, কিন্তু তাদের সৈন্যবাহিনী বাইরের আক্রমণ প্রতিহত করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

—তাহলে তারা আক্রমণ করছে না কেন ?

—এখনো ভরসা পাচ্ছে না। তাছাড়া তাদের মধ্যে তেমন শক্তিশালী কেউ নেই যে একা এদেশ আক্রমণ করতে পারে ?

—তবে আর ভয় কিসের ?

—ভয় আছে বৈকি। তারা দলবদ্ধ হবার চেষ্টা করছে।

হতশেপসুত হেসে বলে—অত সহজ নয়। বেদুইনরাও তাহলে এতদিনে মিশরকে অধিকার করে নিত।

—এতটা হালকা ভাবে নেবেন না। আগের দুবার আমাদের দেশের সর্বনাশ হয়েছিল এই একই আত্মসন্তুষ্টির জন্য।

—তুমি কি বলতে চাও।

—আমার মনে হয় ওদের জন্য অপেক্ষা না করে ওদের দেশে গিয়ে নিশ্চিহ্ন করা অনেক সহজ।

—এখনো সময় হয়নি।

—ঠিক আছে।

মিসাফ্রিস আর কথা না বলে দ্রুত কক্ষত্যাগ করে।

হতশেপসুত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, এভাবে আর কতদিন ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে পারবে ? মিসাফ্রিস আজও মোটামুটি বিনম্র। আজও সে তার ওপর কিছুটা নির্ভরশীল। হয়ত তার মায়ের প্রভাবে। কিন্তু একদিন ওই নম্রতা খসে পড়বেই। সেদিন ? হতশেপসুত বুঝতে পারে দুজনার মধ্যে শুরু হয়েছে আদর্শগত দ্বন্দ্ব। একজন অতীতকে ধরে রাখতে চায়, অতীতের ঐতিহ্যকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে চায়। অপরজন ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলতে চায়। একজন পুরাকালের মত অন্য সমস্ত দেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাচীন উন্নততর সংস্কৃতির বাহক হয়ে থাকতে চায়। অন্যজন এই দেশের এই উন্নততর সংস্কৃতির কথা বাইরের দেশগুলি যাতে মেনে নিতে বাধ্য হয় তার জন্য সেই দেশকে আক্রমণ করে তাকে অধিকার করে দেশের সীমানা বাড়িয়ে তুলতে চায়। সংস্কৃতির ধুয়া তুলে দেশকে রক্ষা করা যায় না বলেই থুথমসের বিশ্বাস। তাই সে সামরিক ও রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। নিরাপত্তার জন্য দেশের ভৌগোলিক সীমান্ত আরও দূরে ঠেলে দিতে চায় নতুন অঞ্চল অধিকার করে। এমন কি বহির্বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্যও দেশের সামরিক ও নৌবাহিনীর দ্বারা পরিচালিত করতে চায়।

মিসাফ্রিস সম্বন্ধে এত কথা তার মা আসেত-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে হতশেপসুত। মিসাফ্রিস বীর এবং সাহসী। যুদ্ধক্ষেত্রেও সে নিশ্চয় সফল হবে। উয়াচমেসের মত যার শারীরিক গঠন সে কখনো নিষ্ফল হয় না। মিসাফ্রিস সব কিছু গভীর ভাবে চিন্তা করে। তার যথেষ্ট পড়াশোনা আছে। হতশেপসুতই তার পাঠাভ্যাসের মূলে। নিজের স্বভাব আর চরিত্রের দৃঢ়তায় রাজকর্মচারীদের মন জয় করেছে সে। হয়ত এতদিনে হতশেপসুতকে সরে যেতে হত। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ এখনো তাকে চায় আর চায় পুরোহিতকুল।

এর মূল কারণ দার-এল-বাহরির মন্দির। ওই একটি মন্দিরই তার ক্ষমতার আসনকে কিছুটা দূর করে রেখেছে আজও। তার স্বামী দ্বিতীয় থুথমসের প্রভাব এখন মিশরে একবিন্দুও নেই। কর্নক, লাক্সার প্রভৃতি মন্দিরের গাত্রে অন্যত্র যেখানেই দ্বিতীয় থুথমসের মূর্তি ছিল খুব ধীরে ধীরে হতশেপসুত সেগুলি সরিয়ে ফেলেছে বা ভেঙে ফেলেছে। তাতে দেখতে কেমন ছিল বিস্মৃত হবে সবাই। কিন্তু সম্রাজ্ঞী হতশেপসুতকে কি ভুলতে পারবে কেউ? কখনই নয়। দার-এল-বাহরির মন্দিরের সঙ্গে তার মূর্তিগুলি থাকবে অক্ষয় অমর হয়ে।

কিন্তু আর কতদিন তৃতীয় থুথমসকে সামলে রাখা যাবে?

হাপু-সেনেব প্রায়ই হতশেপসুতকে এসে বলে যে দেশবাসীর মনে পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। তারা তাদের নবীন ফ্যারাওকে বেশী করে দেখতে চায়। সেই সঙ্গে তরুণী সম্রাজ্ঞীকেও। হাপু-সেনেব সাহসে ভর করে বলতে পারে না, দেশবাসীরা হতশেপসুতকে দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠেছে। তারা বিরক্ত।

তরুণী সম্রাজ্ঞীকে প্রজারা দেখতে চায় শুনে নিজের কন্যার প্রতি প্রথম ঈর্ষান্বিত হয় হতশেপসুত। সেই ঈর্ষাকে আরও বেশী ইন্ধন যোগায় কন্যার এক উক্তি।

—সেইদিনই অপরাহ্নে মায়ের কাছে এসে সে বলে—আমি বাইরে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে। তুমি আবার ভাবতে বসো না।

হতশেপসুত বুঝতে পারে সঙ্গে তৃতীয় থুথমসও যাচ্ছে। কারণ কন্যা খুব কমই একা বের হয়।

হতশেপসুত বলে—এত ঘন ঘন বাইরে গেলে সম্রাজ্ঞীর প্রতি আগ্রহ কমে যায় সাধারণ মানুষের।

—তোমার পুরোনো ধারণাগুলো পালটে ফেলতে শুরু কর।

কথাটার মধ্যে বড় বেশী ঝাঁঝ ছিল। যে মেয়ে নিজের রূপচর্চা ব্যতীত বিশেষ কিছুই বুঝত না সে এসব কথা নিজে থেকে বলেনি। নিশ্চয় অন্যের শেখানো।

সে উত্তর দেয়—অনেক ধারণাই আবার চিরকাল নতুন থাকে।

—যেমন?

—যেমন কন্যার প্রতি মায়ের স্নেহ।

—আর স্বামীর প্রতি পত্নীর অনুরাগ?

—তাও।

তীব্র শ্লেষ মিশিয়ে হতশেপসেত মাকে বলে—তাহলে দ্বিতীয় থুথমসের অত সুন্দর মূর্তিগুলো ধীরে ধীরে উধাও হয়ে গেল কেন মন্দিরের গা থেকে।

হতশেপসুত বুঝতে পারে কন্যা তার আওতার বাইরে চলে গিয়েছে। যতদিন তৃতীয় থুথমস অপরিণত ছিল ততদিন সেটা সম্ভব হয়েছিল। এখন আর হবে না। এখন নিজের স্ত্রীকে তৃতীয় থুথমস অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে। সোজাসুজি বলতে এখনো দ্বিধাবোধ করে। কিন্তু সেদিন আসতেও আর বেশী

দেরি নেই। সে বুঝতে পারে পায়ের নীচ থেকে খুব ধীরে ধীরে বালি সরে যাচ্ছে। এক একবার ভাবে নিজে থেকে সরে যাবে সে। পরমুহূর্তে একটা ভীতি এসে তার টুঁটি চেপে ধরে। তাকে কেউ মানবে না, কেউ তার নাম উচ্চারণ করবে না। রাজপথ দিয়ে শকটে গেলেও কেউ গুরুত্ব দেবে না। হয়ত ভাববে, হোরাসের এ কি হাল? পূর্বকালে নবীন ফ্যারাও এলে বৃদ্ধদের আত্মত্যাগ করতে হত, এখন সেই ব্যবস্থাও নেই। বৃদ্ধের স্থান নেই। এমনকি দেবতারা বৃদ্ধ হলেও গুরুত্বহীন হয়ে পড়েন। তার অবশ্য ততটা বয়স হয়নি। সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাও রয়েছে হয়ত এখনো। পূর্বে যদি জানত এই পরিস্থিতিতে পড়তে হবে তাহলে কন্যার পরিবর্তে চবরোসের মৃত্যুর পর নিজেই মিসাফ্রিসের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হত। কিন্তু তখন কল্পনাতেও এই দিনের কথা আসেনি। তখন যদি আসেত-এর কাছে এই প্রস্তাব করত আসেত হাতে চাঁদ পেত। কারণ সেদিন তার পুত্র সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয় পেত। কিন্তু সে সব কথা ভেবে আর লাভ নেই। এখন ফ্যারাও হল তৃতীয় থুথমস আর তার সম্রাজ্ঞী হচ্ছে কন্যা হতশেপসেত।

কন্যার কথার উত্তরে সে বলে—সাধারণ মানুষ চায় না তার মূর্তি।

—মিথ্যা কথা। তুমি নিজের মূর্তি তৈরী করছ, আর পিতার মূর্তি অপসারিত করেছ।

হতাশ হতশেপসুত বলে—তুমি তো এত উদ্ধত ছিলে না কোনদিন। আজ এমন ব্যবহার করছ কেন?

—আজ তোমাকে কিছুটা চিনতে পেরেছি বলে।

—কে এভাবে চিনিয়ে দিল। মিসাফ্রিস?

—শুধু সে কেন? প্রাসাদের যেমন কান আছে, তেমনি ফিসফিসানি কথাও আছে। কান পাতলে শুনতে পাবে।

—প্রাসাদের ফিসফিসানি বরাবরই রয়েছে। তার অধিকাংশই এক একজনের চক্রান্ত থেকে উদ্ভূত।

—তোমার জামাতা বলে, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসে।

—আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। কিন্তু একথা তো মান যে আমি তোমার মা।

—না মানার কোন কারণ নেই।

—সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহকে স্বীকৃতি দাও তো?

—এই প্রাসাদে? বলতে পারি না। শৈশবে অবশ্যই কন্যার প্রতি স্নেহ থাকে। তারপর কন্যা বড় হলে, অন্যসব স্বার্থ বিজড়িত হলে সেই স্নেহের কতটা অবশিষ্ট থাকে বলা কঠিন।

—এটাও কি জামাতার কথা?

—নিশ্চয়। কারণ আমার অত সূক্ষ্ম বুদ্ধি নেই। মা হয়ে সেকথা তোমার মোটেই অজানা নয়। তোমার সঙ্গে চালাকি করে লাভ নেই। কারণ তুমি হলে

মিশরের সবচেয়ে বিদুষী এবং বুদ্ধিমতী নারী।

—এটুকু তাহলে স্বীকার করছ।

—তোমার বুদ্ধির বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই। এটা তোমার জামাতারই অভিমত।

সেই সময় বৃদ্ধা নেসামুন এসে বলে—সেন-মুত অপেক্ষা করছেন।

তার কথা শেষে হবার সঙ্গে সঙ্গে কন্যা বলে ওঠে—আবার সেই সেন-মুত।

—কেন, সে আবার কি অপরাধ করল? অতবড় একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করো না হতশেপসেত।

—তুমি ওর বাড়ি দেখেছ?

—না, শুনেছি।

—কি শুনেছ?

—সুন্দর অট্টালিকা সেটি।

—শুধু সুন্দর? ওই অট্টালিকা এই প্রাসাদকেও লজ্জা দেবে।

—তাতে ক্ষতি কি?

—ক্ষতি কিছুই নয়। শুধু একটা ক্ষতি এই যে, যত সব দেবালয় প্রস্তুত হয়েছে এবং হচ্ছে তার মালমশলা থেকে কিছু কিছু নিয়ে গড়ে উঠছে সেন-মুতের প্রাসাদ।

কথাটা হতশেপসুতের একেবারে অজানা নয়। কিন্তু সে কথাটা যে এতটা প্রচার লাভ করেছে সে জানত না। আজ তার অতি শৈশবের কথা মনে পড়ে যায়। তখন প্রতিবারই মায়ের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তিনি আগে দৃষ্টি সরিয়ে নিতেন। তিনি প্রায় প্রতিবারই পরাজিত হতেন। আজ নিজ কন্যার কাছে সেও পদে পদে পরাজিত হচ্ছে। এটাই বোধহয় নিয়ম। কিংবা মা যদি নিঃস্বার্থ হন, কন্যার প্রতি তাঁর মমতায় যদি কোন খাদ না থাকে তাহলে নিশ্চয় তাঁকে এভাবে পরাজিত হতে হয় না। সেখানে মা অনেক ওপরে। মিশরের ধর্মে তাই মাতা আর পিতার স্থান সবার উপরে। সেই মা মেয়ের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

হতশেপসুত কন্যাকে বলে—সেন-মুত অত্যন্ত প্রতিভাবান। মিশরকে সে অনেক দিয়েছে। এখনো দিয়ে চলেছে। তবু সে মানুষ। তার মধ্যে মানুষের দুর্বলতা থাকতে পারে বৈকি। তাই বলে সে ঘৃণ্য জীব নয়।

—তোমার মত সেও অমর থাকতে চায়। তাই গোপনে নিজের কিছু মূর্তিও গড়ে রেখেছে।

এবারে হতশেপসুত রুখে ওঠে—কে বলেছে একথা?

—খবর আছে।

—আমি তোমার অনেক কথা সহ্য করেছি। আর নয়। যদি সত্যিই তেমন খবর থাকে, আমাকে বল। আমি সেই সব মূর্তি ভেঙে ফেলব।

হতশেপসেত এবারে চুপ করে যায়।

—ভুলে যেও না আমি এখনো ক্ষমতায় আছি। তুমি কন্যা বলেই এতক্ষণ

ধৈর্য ধরে ছিলাম। কিন্তু বড় বেশী বেড়েছ তুমি। যাও, কোথায় বেড়াতে যাবে বলেছিলে, সেখানে যাও। আমাকে এভাবে উত্ত্যক্ত করো না।

হতশেপসেত বেশ দাপটের সঙ্গেই কক্ষ ত্যাগ করে।

হতশেপসুত কিছুক্ষণ নীরবে নীচের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর চোখ তুলে দেখে বৃদ্ধা নেসামুন তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার দৃষ্টি থেকে বিষণ্ণতা ঝরে পড়েছে।

—কি দেখছ ?

—আপনাকে।

—আমাকে এত বছর ধরে দেখেও কি সাধ মেটেনি ?

—না।

—কেন ?

—নানান্ পরিস্থিতিতে, নানান্ অবস্থায় দেখি কিনা। তাই আপনি চিরনতুন।

—আজ কোন পরিস্থিতির মধ্যে দেখলে ?

—আজ পূর্বাকাশের সূর্য আর পশ্চিমাকাশের সূর্যকে একসঙ্গে দেখলাম।

—বুঝেছি। পূর্বগগনে সূর্য ওঠার অর্থই হচ্ছে, পশ্চিমগগনের সূর্য ডুবে গিয়েছে।

—ঠিক তাই। তাকে স্বীকার করে নিলে একটা সুষমা থেকে যায়। সূর্য অস্তগমনকালে আকাশের দিকে চেয়ে থাকলে বিরহ-বেদনার সুখ অনুভব করা যায়। সমস্ত আকাশটা কিরকম রঙীন হয়ে ওঠে। বালির ঝড়ের মধ্যে সূর্যাস্তের কোন শোভা নেই। কেউ দেখতে পায় না। কখন সূর্য ডুবল। অন্ধকার নেমে আসে আচম্বিতে।

—ওসব হল তত্ত্ব কথা। বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

—আপনি বিদুষী। আপনার চেয়ে বেশী কে জানে যে বাস্তবই হল তত্ত্বের জন্মদাত্রী ?

—তুমি বৃদ্ধা হয়ে দেখতে যেমন কুৎসিত হয়েছ, তোমার কথাবার্তাও তেমনি কদাকার হয়েছে।

নেসামুন হেসে ফেলে। তার হাসি দেখে হতশেপসুতও না হেসে পারে না।

মুখে সেই হাসি নিয়েই সে অপেক্ষারত সেন-মুতের সামনে এসে দাঁড়ায়। সেন-মুত ভাবে, বহুদিন পরে সম্রাজ্ঞীর মুখে হাসি দেখল। নিশ্চয় কোন সুখবর আছে। সে অপেক্ষা করে।

কিন্তু হতশেপসুত নিজে থেকে কিছু না বলে সেন-মুতের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ভাবে, মানুষটা আজ কতখানি ক্ষমতাশালী দেখলে বোঝা যায় না। সে এতটা উঠতে পেরেছে শুধু তারই জন্য। অথচ কন্যার কথা শুনে মনে হল, অনেক কিছুই করছে সে তার অগোচরে, তাকে গোপন রেখে। মুখের দিকে চাইলে ধারণা করা যায় না, তার মধ্যে গোপন কিছু থাকতে পারে। তাতে আজও রয়েছে সেই উদাসীন দৃষ্টি আর শিল্পীর সরসতা। তবে কি

সব মিথ্যা ?

—বলুন।

সেন-মুত একটু থতমত খায়। ভেবেছিল, সম্রাজ্ঞীই প্রথমে কিছু বলবে।

সে বলে—আপনার কাছ থেকে একটা অনুমতি নিতে এসেছি। অনেক আগেই আপনাকে বলা উচিত ছিল, কিন্তু বলা হয়ে ওঠেনি। আপনার প্রশ্রয়ে সাহসী হয়ে উঠেছি বলেই হয়ত।

—নির্ভয়ে বলুন তাহলে।

—আপনি আমার আশ্রয়দাতা। আপনার পদতলে আমার স্থান, সেই স্থানটিকে স্থায়ী করার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারিনি আমি।

—কেমন করে ?

—দার-এল-বাহরি মন্দিরে আপনার নীচে আমার নিজের মূর্তি রাখার বাসনা। তাই গড়ে তুলেছি সেঁটি।

—কথাটা বলে ভাল করেছেন। নইলে অন্তত আপনার সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হত। আপনি যে নিজের মূর্তি গড়েছেন সেই সংবাদ আমার অজানা নয়।

সেন-মুতের মুখ কাল হয়ে গেল। সে কথা বলতে পারে না।

হতশেপসুত বলে—এখন অবশ্য আপনি আপনার বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছেন। আপনি কিভাবে আপনার গৃহ নির্মাণ করেছেন সেই সব প্রশ্ন তুলব না। যে বিরাট কাজ আপনি করেছেন, তার তুলনায় ওসব তুচ্ছ। তবু যদি বলতেন, আরও ভাল হত।

—আমি লজ্জিত।

—লজ্জিত হবার কারণ ঘটেনি। আজ আপনি আমাকে আপনার মূর্তির কথা বলায় আমি প্রীত। কিন্তু এসব কি থাকবে ?

বিস্মিত সেন-মুত বলে—থাকবে না কেন ?

হতশেপসুত মনে মনে ভাবে, তুমি শিল্পী। রাজনীতির কোন সংবাদই তুমি রাখো না। নেসামুনের যতটুকু জ্ঞান রয়েছে তোমার তাও নেই। নিজের কল্পনা নিয়ে মশগুল থাক সব সময়। তাই তোমাকে আগে থেকে কোন আঘাত দিয়ে লাভ নেই। যদি সেই ভয়ংকর দিন কখনো আসে, নিজেই দেখতে পাবে। হয়ত তোমার প্রাণসংশয়ও হতে পারে। ওদের কাছে আমি যদি প্রথম শত্রু হই, তুমি অবশ্যই দ্বিতীয় শত্রু।

মুখে হতশেপসুত বলে—একমাত্র অমন রা বলতে পারেন।

তৃতীয় থুথমসের হারেমের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল হতশেপসুত নিজে। সেই হারেমের শোভাবর্ধনের জন্য নারীর অভাব হয়নি। এখন তো বলা চলে পত্রপুষ্পে শোভিত। কয়েকজনকে হতশেপসুত নিজের চোখে দেখেছে। ঈর্ষণীয় রূপ বটে। এরা এসেছে নীচের বদ্বীপ অঞ্চল থেকে। সেখানে অনেক

পরিবারে সমুদ্রের অপর পারের শ্বেতবর্ণের মানুষের রক্তের মিশ্রণ ঘটে যায়। পিতা এবং চবরোসের হারেমেও এমন ছিল কয়েকজন। ক্রীতদাসীর সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। তবে পূর্বের ক্রীতদাসীদের কয়েকজন কন্যা স্থান পেয়েছে এখানে। তাদের ধমনীর শোণিতের খোঁজ নিতে গেলে অভিজাত বংশের কারও কারও রক্তের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। তাই এই নারীরাও রূপসী।

হতশেপসুত জেনেছে, এদের মধ্যে দুজনকে ইতিমধ্যেই রানীর মর্যাদা দিয়ে ফেলেছে মিসাফ্রিস। অপরিণত বুদ্ধি আর কাকে বলে। শুধু মৃগয়া, অস্ত্রচালনা আর যুদ্ধের জন্য ছট্‌ফট্‌ করলে দেশ ও জীবন কোনোটাই গুছিয়ে নেওয়া যায় না। তবু তাদের যখন নিজে থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলার কিছু নেই। কয়েক বছর আগে হলে বলতে পারত। তখনো এতটা স্বাবলম্বী হয়নি সে। তার কথা তখনো শুনত। কিন্তু চবরোসের মৃত্যুর পর এই চোদ্দ বছর পার হয়ে যাবার পরে সেটা প্রত্যাশা করা যায় না। আসলে সে-ই তো প্রকৃত ফ্যারাও, হতশেপসুত তার তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। তাও ততদিনই তত্ত্বাবধায়ক থাকা যায়, ফ্যারাও যতদিন নাবালক থাকে। কিন্তু মিসাফ্রিস বহুদিনই সাবালক। সে তার খোলস ছেড়ে আসতে পারছে না আজও। কেন পারছে না হতশেপসুত নিজেও বুঝে উঠতে পারে না। হয়ত শৈশবের স্মৃতিগুলি খুবই উজ্জ্বল তার মনের মধ্যে। তখন হতশেপসুত যে তাকে প্রকৃতই স্নেহ করত সে অনুভব করে আজও। কিন্তু সেবারে নিজ কন্যার মুখে চবরোসের মূর্তি অপসারণের কথা শুনে বড় আফসোস হয়েছিল তার। ওগুলো ভেঙে না ফেললেই হত। তাহলে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকত না মিসাফ্রিসের মনে। এই দুষ্কর্মের জন্য সে নিশ্চয় হতশেপসুতকে অপরাধিনী বলে চিহ্নিত করে রেখেছে। দার-এল-বাহরিতে সেন-মুতের তৈরী তার অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিগুলির ওপর কখনো যদি আঘাত পড়ে তাহলে শুধু এইজন্যই পড়বে।

একটা অদ্ভুত পরিবর্তন সম্প্রতি লক্ষ্য করছে হতশেপসুত। এই পরিবর্তন বাইরের কোন বিষয়ের নয়। পরিবর্তন তার নিজের অন্তরের। শৈশব থেকে সে সব কিছুকে ওপর থেকে দেখে আসতে অভ্যস্ত। সে নিজে সবার ওপরে। অন্য সবাই তার নীচে। সে কখনো কারও সঙ্গে কোন কথা বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই তার সম্মুখে এসে কথা বলতে কত রকমের অস্বস্তিতে ভুগেছে সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। অথচ আজকাল সে তৃতীয় থুথমসের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কিছুতেই সহজ হতে পারে না। একটা হীনমন্যতা তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এর জন্য নিজেকে নিরালায় কত তিরস্কার করেছে সে। তবু এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না। জীবনে এই প্রথম সে মর্মে মর্মে অনুভব করে পৃথিবীতে তার উচ্চতম স্থানটি আর অটুট নেই। সেই আসন অপর একজন অত্যন্ত ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিত ভাবে দখল করে নিয়েছে। একবার ভেবেছে তার বিবেক ঠিকভাবে কাজ করে না। বিবেক হয়ত অনুচ্চ কণ্ঠে বলছে, তুমি জোর করে ফ্যারাও-এর ক্ষমতাটি কুক্ষিগত করে রেখেছ। কিন্তু তার বিবেক তো এত ঠুনকো নয়। রাজনীতি করতে হলে

বিবেকের মাপকাঠি হয় ভিন্ন। সাধারণের বিবেক আর ফ্যারাও পরিবারের বিবেক এক হতে পারে না।

আকাশপাতাল এমন অনেক কথাই ভাবছিল হতশেপসুত। ভাবতে ভাবতে এক সময় খেয়াল হল সকাল অনেকটা গড়িয়ে গেল, কিন্তু প্রধান অমাত্য হাপু-সেনেবের দেখা নেই কেন? প্রভাতে উঠে তার প্রথম কাজই হল ফ্যারাও-এর দর্শনপ্রার্থী হওয়া। তবে কি সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে? অসুস্থ হলেও সংবাদ প্রেরণ করার রীতি রয়েছে। সেই রীতি সে পালন করেনি। মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে হতশেপসুত। এই ব্যক্তি তার কাছ থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা নিয়েছে। এর আসনের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে তারই জন্য। এ কথা অবশ্য কারও অজানা নেই আজ। সভাসদগণ থেকে শুরু করে সাধারণ প্রজারা অবধি জেনে গিয়েছে হাপু-সেনেব এবং সেন-মুত হচ্ছে হতশেপসুতের ডান এবং বাঁ হাত। সেই হাপু-সেনেব আজ একজন বার্তাবাহক পর্যন্ত পাঠাতে পারল না। কিছুদিন থেকেই সে যেন তার কাছে আর বেশীক্ষণ সময় দিতে চাইছে না। ছটফট করছে। এক একদিন এক একটা অজুহাত খাড়া করছে। হয়ত সত্য। কিন্তু এমন কখনো হয়নি আগে।

ঠিক সেই সময় হাপু-সেনেব এসে প্রবেশ করে অভিবাদন জানায়। তাকে দেখেই মুহূর্তে হতশেপসুতের সব ক্রোধ কোথায় উধাও হয়ে যায়। নিশ্চয় আটকে পড়েছিল বেচারা।

হাপু-সেনেবের অন্তর কিন্তু ভয়ে কাঁপছে। সে কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করেছে যে তার কর্ত্রীর জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। প্রজারা আরও সোচ্চার হয়ে উঠেছে নতুন ফ্যারাওকে সম্পূর্ণ সক্রিয় দেখতে। সভাসদগণের মধ্যে প্রায় সবাই প্রজাদের পক্ষে। আর সামরিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজনও হতশেপসুতকে সমর্থন করে না। তারা শুধু দেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে অন্য কিছু ঘটতে দিতে চাইছে না। হাপু-সেনেব তাই এখন হতশেপসুতের সব সময়ের সঙ্গী হতে সাহসী হয় না। গতকাল যখন প্রাসাদ ছেড়ে বাড়ি ফিরছিল তখন প্রধান সেনাপতি নিজে তাকে পেছু ডাকে। হাপু-সেনেব দাঁড়িয়ে পড়ে।

—আর কতদিন?

হাপু-সেনেব সব জেনে শুনেও বলে—কি?

—কতদিন আর আমাদের ফ্যারাওকে আড়াল করে রাখবেন?

—আমি আড়াল করছি।

—একই কথা। আপনি সম্রাজ্ঞীর পেছনে না থাকলে এতদিন আমাদের ফ্যারাও কখনো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতেন না। ফ্যারাও-এর যত গুণ থাকা প্রয়োজন সবই রয়েছে তাঁর মধ্যে।

—আমি খুব ভাল ভাবে জানি সেকথা।

—জানলে এমন হতে দিতেন না। আপনি হয়ত জানেন না, বেশ কয়েক পুরুষ পরে এমন একজন সমরবিশারদ আমরা পেয়েছি। দেশের সীমানা এখন অতি সহজেই অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া যায়। তিনি যে একজন দক্ষ প্রশাসক

তারও প্রমাণ নিশ্চয় পেয়েছেন।

—আমি জানি।

—সবই যখন জানেন, তখন দেশটাকে এমন অচল করে রেখেছেন কেন? ফ্যারাওকে শাসনভার নিতে দিন।

আপনারা বলছেন না কেন?

—কারণ প্রধান অমাত্য একজনই থাকেন। দায়িত্বটা সম্পূর্ণ তাঁর।

—সভায় তো উত্থাপন করতে পারেন প্রসঙ্গটা। অন্তত বলতে পারেন, ফ্যারাও-এর প্রতিদিন সভায় উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

প্রধান সেনাপতি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে হাপু-সেনেবের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে—আমি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে আপনি সমর্থন করবেন?

—আমি নীরব থাকব। কারণ এতদিন সম্রাজ্ঞীর অধীনে কাজ করে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ওই ভার আপনাদেরই নিতে হবে। শেষে সুযোগ পেলে আমি আপনাদের সঙ্গে সুর মেলাতে পারি।

—তাহলে একটা কাজ আপনাকে আগামীকাল থেকেই করতে হবে।

—কোন কাজ?

—সকালে প্রধান অমাত্য রূপে আপনাকে প্রত্যহ ফ্যারাও-এর দর্শনপ্রার্থী হতে হয়। কাল থেকে তৃতীয় থুথমসের কাছে প্রথম যাবেন।

হাপু-সেনেব আঁৎকে ওঠে—বলেন কি।

—তাও পারবেন না? একথা ভুলে যাবেন না, আমরা শেষ পর্যন্ত উদ্যোগী হতে বাধ্য হব। আর সামরিক ভাবে উদ্যোগী হলে রক্তপাতের সম্ভাবনা সব সময়েই থাকে। বলা যায় না, সেই রক্তপাতে আপনার রক্তও মিশতে পারে। কারণ তখন আপনাকে শত্রুপক্ষ বলে গণ্য করা হবে।

আরও কিছুক্ষণ কথোপকথনের পরে হাপু-সেনেব বাধ্য হয়ে প্রধান সেনাপতিকে কথা দেয় যে এবার থেকে প্রতিদিন প্রভাতে প্রথমে তৃতীয় থুথমসের সঙ্গে দেখা করবে অল্প সময়ের জন্য। মৃত্যুকে সে বড় বেশী ভয় পায়। পরপারে অনেক সুখ আছে বটে, কিন্তু তার আগে হৃদপিণ্ডটিকে মানদণ্ডের ওপর চাপানোর ব্যাপার রয়েছে। প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব ভার তার ওপরে থাকলেও হৃদপিণ্ডটি কতটা নিষ্কলুষ সে বলতে পারে না। দেবতা ওসিরিসের কাছে শেষপর্যন্ত পৌঁছতে পারবে কিনা কে জানে। তার চেয়ে ইহজগতে যতটা ভোগবিলাসের মধ্যে কাটিয়ে দেওয়া যায় ততই ভাল। সম্রাজ্ঞীর পৃষ্ঠপোষকতায় সে তার নিজস্ব সম্পত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সম্পদ দেশ আহরণ করেছে তার একটা বৃহৎ অংশ অমন রা-এর নামে জমা পড়ে দেশের বিভিন্ন মন্দিরে। সেই সব সম্পত্তির অছি হল সে। ফলে অমন রা-এর সম্পদও তার ভোগে লেগেছে অনেক সময়। সে বেশ সুখে আছে। তাই প্রধান সেনাপতির প্রচ্ছন্ন ভীতি প্রদর্শন তার বুকে কাঁপন ধরায়।

এখন তৃতীয় থুথমসের নিকট থেকে এসে হতশেপসুতের সামনে দাঁড়িয়ে তার আবার বুক কাঁপে।

হতশেপসুত তাকে বলে—আজ এত দেরি হল কেন? আমার চিন্তা হচ্ছিল।

হাপু-সেনেব জানে মিথ্যা বলে কোন লাভ নেই। প্রাসাদে এসে প্রধান অমাত্য কোথায় কোথায় যায় সবাই জেনে ফেলে।

একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে সে বলে—ফ্যারাও-এর কাছ থেকে আসছি।

চমকে ওঠে হতশেপসুত। বলে—ফ্যারাও? কোন ফ্যারাও?

হাপু-সেনেব ভাবে, এ আবার কেমন প্রশ্ন? ফ্যারাও আবার কয়জন হয়?

—তৃতীয় থুথমস।

হতশেপসুত আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলে—আপনি আমার কাছে না এসে আগে সেখানে গিয়েছিলেন?

—কি করব, আপনিই বলে দিন দেবী।

—আমার কাছে আসবেন। আমি এখনো ফ্যারাও।

—সে তো বটেই। কিন্তু উনিও তো আপনার অংশীদার। তাই প্রধান অমাত্য হয়ে দুজনার কাছেই আজ থেকে আসব ভেবেছি।

হতশেপসুত প্রথমে কিছু বলতে পারে না। পরে বলে—এতদিন তো একথা মনে হয়নি।

—আমার ভুল হয়েছিল। তৃতীয় থুথমসকেও গণ্য করা উচিত ছিল।

—শেষ পর্যন্ত আপনিও?

—আপনার মঙ্গলের জন্যই আমাকে এই কাজ করতে হয়েছে। আপনাকে আগেই বলেছিলাম, তৃতীয় থুথমসকে অগ্রাধিকার দেবার জন্য প্রবল চাপের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের মানুষেরা ওঁকে প্রবলভাবে চায়। আমার মনে হয় ওঁকে আপনি মেনে নিলে দেশে আরও কিছুদিন শান্তি বজায় থাকবে। নইলে অঘটন ঘটে যেতে পারে। আমি আপনার দাসানুদাস, তাই আপনার মঙ্গলের জন্যই একথা বলছি।

হতশেপসুত কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বলে—ঠিক আছে, আপনি যা খুশী করুন। আমি আমার নিজের পথেই চলব।

অনুনয় করে হাপু-সেনেব বলে—এই পথে আপনি কাউকে সঙ্গী পাবেন না।

—আমি একাই চলব। আপনি এখন যেতে পারেন। দেবতা বিপাকে পড়লে মানুষও যে তাকে গ্রাহ্য করে না তার প্রমাণ আমাদের পুরাণেই রয়েছে। তাই বলে দেবতা কখনো মানুষ হয়ে যায় না।

হাপু-সেনেব বিদায় নিয়ে চলে যায়। হতশেপসুত ইশারায় নেসামুনকে ডাকে। সে আড়ালে অপেক্ষা করছিল।

নেসামুন কাছে এসে দাঁড়ালে সে বলে—এখানে কেউ যেন না আসে। তুমিও এসো না। আমি কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই।

নেসামুন বেরিয়ে যায়।

হতশেপসুতের বারবার সেই কাহিনীর কথা মনে পড়ে ফ্যারাও যেখানে পূর্বদিকের দেশে সসৈন্যে সমবাভিযানে গিয়েছিলেন। সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি

সহসা একসময় দেখতে পান সৈন্যবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়েছেন। সেই সময় তিনি অমন রা-এর কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। আজ এই মুহূর্তে হতশেপসুতের প্রার্থনা একই। প্রার্থনার ভঙ্গীতে সে ফ্যারাও-এর কথাগুলো অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে চলে ঃ

"এ কেমন করে সম্ভব হল পিতা অমন! পিতা কি তাঁর পুত্রের কথা কখনো বিস্মৃত হন? তোমাকে ছাড়া আমি তো কিছুই ভাবিনি। আমি কখনো তোমাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করিনি। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিনি। এই পূর্ব দেশীয় মানুষেরা তোমার কাছে কি চায়? যারা দেবতাকে জানে না, চেনে না, তারা ঘৃণ্য তারা হতভাগ্য। আমি কি তোমার নামে অনেক স্মারক-স্তম্ভ নির্মাণ করে দিই নি? তোমার মন্দিরগুলি কি আমার লুঠের সম্পদে পরিপূর্ণ করে তুলিনি? তোমার জন্য আমি অনন্তকালের বাসগৃহ নির্মাণ করে দিয়েছি এবং সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার বহনের জন্য বাঁধা বৃত্তির ব্যবস্থা করেছি। সমগ্র দেশ তাদের বৃক্ষ এবং শস্যক্ষেত্রের প্রথম উৎপাদন তোমাকে প্রদান করে, যাতে তোমার পবিত্র রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। তোমার নামে দশসহস্র বৃষকে উৎসর্গ করা হয়। ……আমি এলিফ্যান্টাইন থেকে চতুষ্কোণ স্তম্ভ এনেছি এবং প্রোথিত করেছি তোমার মহিমা কীর্তনের জন্য। আমি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে তোমার জন্য উপহার সংগ্রহ করতে সমুদ্রপথে তরী প্রেরণ করেছি। পূর্বে কি কখনো এমন হয়েছে?

"ধিক্ তাদের, যারা তোমার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে। হে অমন দেবতা, তাদেরই শুধু মঙ্গল হয় যারা তোমার বাধ্য। আমি তোমাকে পিতা বলে জানি। এখন আমি অনেকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। আমার সঙ্গে কেউ নেই। আমার পদাতিক বাহিনী এবং আমার শকট বাহিনী আমাকে পরিত্যাগ করেছে। আমি চিৎকার করে তাদের ডাকলাম। কেউ সাড়া দিল না। আমি বুঝলাম শত সহস্র সৈন্য, শত সহস্র ভ্রাতা এবং পুত্রেয় চেয়েও দেবতা অমন অনেক শ্রেয়। ওদের চেয়ে অমন অনেক মূলবান। হে অমন রা, তোমার মুখের কথাতেই আমি এখানে এসেছিলাম, তোমাকে অস্বীকার করে নয়।

"আমি কি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে ডাকছি না? তবু আমার ডাক নিশ্চয় হারমন্থিসে গিয়ে পৌঁছেচে। রা আমার ডাক শুনেছেন। তিনি আমার দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন। আমি আনন্দিত। তিনি পশ্চাৎ থেকে বলেছেন—তুমি নিঃসঙ্গ নও। আমি রয়েছি তোমার সঙ্গে। আমি তোমার পিতা অমন রা। আমার হাত তোমার হাতে।…আমি বিজয়ীর প্রভু। আমি শৌর্যবীর্য ভালবাসি।"

হতশেপসুত আরও কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকে। নিজের মত অনেকক্ষণ প্রার্থনা জানায়। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

তার মনের জ্বালা উপশমিত। তবে কোন আনন্দও নেই মনে। একটা উদাসীন ভাব। কিন্তু কতক্ষণ এমন থাকবে সে জানে না।

নেসামুনকে হাতের তালি বাজিয়ে ডাকে সে। কক্ষের বাইরে থেকে নেসামুন

এসে সামনে দাঁড়ায়।

—আজ আমি মন্দিরে যাব প্রার্থনা জানাতে।

—সভায়?

—আজ যাব না।

নেসামুন ঘাড় হেলায় অর্থাৎ কর্ত্রীর ইচ্ছাই তার ইচ্ছা।

হাপু-সেনেব তারপর তিনদিন সকালে আরও অনেক বেশী দেরী করে হতশেপসুতের দর্শনপ্রার্থী হয়। নিজের থেকেই কৈফিয়ৎ দেয় যে ফ্যারাও তাকে অনেক কিছু প্রশ্ন করায় দেরি হয়ে গিয়েছে। হতশেপসুত কোন কথা বলেনি। প্রধান অমাত্যের কৈফিয়ত যেন সে শুনতেই পায়নি। অথচ মনে তার তীব্র জ্বালা। সেদিনের প্রার্থনার সুফল কোথায় ভেসে গিয়েছে।

সে ঠিক বুঝে উঠত পারে না কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত। একথা ভাল ভাবে সে বুঝে গিয়েছে যে মিসাফ্রিস তার পালের প্রায় সব হাওয়াটুকুই কেড়ে নিয়েছে। এটা তারুণ্যের জয়। পৃথিবীতে চিরকালই এই জয় অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া মিসাফ্রিস সর্বাংশে যোগ্য। তবু এত তাড়াতাড়ি প্রতিপত্তির আসন থেকে সরে যেতে মন চায় না। এই প্রতিপত্তি শৈশব থেকে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রতিফলিত। কারণ সে এবং তার প্রতিপত্তি আজীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হঠাৎ সেটি চলে যাওয়া এবং নিজের বা অথবা কা-এর বিদায়ের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখতে পায় না হতশেপসুত। হাপু-সেনেব যেদিন জানান যে সে তৃতীয় থুথমসের কাছে প্রথম গিয়েছিল সেদিন থেকে দেহে এবং মনে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। এখন হাঁটাতেও তার অলসতা।

কদিন পর থেকে হাপু-সেনেব আর দর্শনপ্রার্থী হল না। অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে থাকল হতশেপসুত। তবু এল না প্রধান অমাত্য। হতশেপসুত নেসামুনকে খবর নিতে পাঠাল সে আদৌ প্রাসাদে এসেছে কিনা। নেসামুন কিছুক্ষণ পরে খবর নিয়ে এল।

—এসেছিল?

নেসামুন নীরব থাকে।

—কি হল? কথা বলছ না কেন? নীরব থাকলে কি আমাকে বেশী করে সান্ত্বনা দেওয়া হবে?

—তিনি যথাসময়েই এসেছিলেন। ফ্যারাও-এর সঙ্গে দেখা করে চলে গিয়েছেন।

হতশেপসুত বলে ওঠে—আমিও ফ্যারাও এ কথা ভুলে যেও না।

নেসামুন কিছু বলে না।

—আমি মিসাফ্রিসের সঙ্গে দেখা করব এখুনি।

—আপনি যাবেন?

—হ্যাঁ। কেন কি হয়েছে?

—আপনি বড়। উনি যখন জন্মান নি তখন থেকে আপনি ফ্যারাও।

আপনার পিতার আমল থেকে আপনি সহ-শাসক। আপনি যাবেন তাঁর কাছে ? হলেনই বা তিনি ফ্যারাও।

হতশেপসুত দেখে নেসামুন উত্তেজনায় কাঁপছে। হতশেপসুতের অবমাননা যেন তারই অসম্মান।

—তাকে ডাকলে সে কি আসবে ?

—ডেকে দেখলে ক্ষতি কি ?

—বেশ। তুমি যাও। গিয়ে ব্যবস্থা কর।

কিছুক্ষণ পরে মিসাফ্রিসের পরিবর্তে কন্যা হতশেপসেত এসে উপস্থিত হয়।

—তুমি ?

—হ্যাঁ।

—আমি মিসাফ্রিসকে আসতে বলেছিলাম।

হতশেপসেত হাসতে হাসতে বলল যে এতদিন সত্যিই বোঝা যায় তোমার বয়স হয়েছে। আচ্ছা মা সকালের দিকে ফ্যারাও-এর কি একদণ্ড অবকাশ থাকে ? আজ থেকে পুরোহিত এসে ওর নিদ্রাভঙ্গ শুরু করেছে। তারপর মন্দিরে যাওয়া। সেখান থেকে এসে প্রধান অমাত্যের কাছে সব খোঁজ-খবর নেওয়া। তারপরই সামান্য একটু ফলাহার করে সভার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা। তুমি তো সবই জানতে। এর মধ্যে সব ভুলে গেলে ? তবু তোমাকে এখনো বৃদ্ধা বলা যায় না।

হতশেপসুত বারবার নিজেকে বলে, ধৈর্য হারিও না নারী। আরও অনেক পরীক্ষার বাকী রয়েছে হয়ত তোমার।

নেসামুনের দিকে চাইতে পারে না সে। বৃদ্ধা অপমানে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। ও তার কর্ত্রীর শবদেহের সঙ্গে জীবন্ত অবস্থায় সমাধি মন্দিরে প্রবেশ করতে চাইবে নাকি ? বলা যায় না। ওর পক্ষে সবই সম্ভব।

কন্যাকে শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করে—অন্য কোন সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে ?

—চেষ্টা করবে।

মিসাফ্রিস সেদিন সন্ধ্যায় আসে তার কক্ষে।

—ডেকেছিলেন ?

—হ্যাঁ। হাপু-সেনেব আমার কাছে সকালে আসা বন্ধ করল কেন ?

—সেটা তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন। তবে আমার মনে হয় ভালই করেছে। এতে কাজের অযথা বিলম্ব। আমার কাছেই তো আসছে।

—আমি অপ্রয়োজনীয় ?

—সে কথা আমার মুখ থেকে না শুনে আর পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করুন।

—তোমাকে এত বড় করল কে ? কে ফ্যারাও করল ?

—আপনি। তবে প্রশ্ন যখন তুলেছেন, তখন এর উত্তরে হয়ত বলা যেতে পারে, না করে আপনার উপায় ছিল না।

—আমার কন্যার সঙ্গে অন্য কারও বিবাহ দিলে সে ফ্যারাও হতে পারত।

—কিন্তু একজন নাবালকের তত্ত্বাবধান করে অনেক দিন ধরে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে পারতেন না।

—শেষে তুমিও এ কথা বললে!

—বলতে চাইনি। আপনি বলালেন। আপনার ওপর আমার বিরাট আস্থা ছিল। পৃথিবীতে আপনাকে আমি সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করতাম। কিন্তু যেদিন শুনলাম পিতার পাথরের মূর্তিগুলো আপনি নষ্ট করে দিয়েছেন সেদিন থেকে বিশ্বাসে ধ্বস নেমেছে। এখন তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তবু আপনার অসম্মান হতে দিতে চাইনি।

—তোমার পিতা ছিল একজন অপদার্থ।

—হয়ত তাই। কিন্তু তবু তিনি ফ্যারাও ছিলেন। তাছাড়া পিতার প্রতি আমার মমতা। তিনি দুর্বল মনের ছিলেন বলেই হয়ত। সবাই তো সমান হয় না। আপনার দুঃখিত হওয়া উচিত।

—আমি আদৌ দুঃখিত নই।

—এটাই শেষ কথা?

—হ্যাঁ।

—তবে আপনাকে বলে রাখি, দার-এল-বাহারিতে আপনার একটি মূর্তিও অক্ষত থাকবে না।

—একি বলছ তুমি? তার শিল্পকর্ম দেখেছ?

—সব দেখেছি। কিন্তু এটাই শেষ কথা। ফ্যারাও রূপে আমি কালই হুকুম দেব।

—আমি বাধা দেব।

—আপনি বাধা দেবার পথ পাবেন না। আপনার সব দিকের দ্বার রুদ্ধ থাকবে পরপর দুদিন।

—আমাকে বন্দী করেছ?

—দুদিন পরে আপনি মুক্ত। সেই দুদিনে কাজ শেষ হয়ে যাবে।

—তুমি হিকসোসদের হার মানালে।

—পিতার মূর্তিগুলো ভাঙার সময়, আশ্চর্য, আমারও ঠিক এই কথাই মনে হয়েছিল।

—নেসামুন নেসামুন।

নেসামুন ছুটে আসে।

—জান নেসামুন আমি বন্দিনী। এই ফ্যারাও আমাকে বন্দী করেছে।

মিসাফ্রিস বলে—ও বাঁদী। ওকে চলে যেতে বলুন।

নেসামুন ফ্যারাও-এর গম্ভীর কথার অবমাননা করতে পারে না। সে তাড়াতাড়ি চলে যায়।

—তুমি মূর্তিগুলো নষ্ট করো না। আমার অনুরোধ।

—সম্ভব নয়। আচ্ছা সেন-মুত কোথায়?

—আমি কি করে বলব?

—সে পালিয়েছে।

—কোথায় ?

—রাজধানীর বাইরে।

—কেন ?

—নিজের মূর্তি তৈরী করে দার-এল-বাহরির মন্দিরে লুকিয়ে রেখেছে। ভেবেছে কেউ সন্ধান জানে না। সেগুলোও কাল চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলা হবে।

—তাকে কি প্রাণে মারবে ?

—বলা যায় না। তবে সে যদি আমার পিতার মূর্তিগুলো নতুন করে গড়ে দিতে পারে, তাহলে ক্ষমা করা যেতে পারে। তবে সে এই কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবে না।

—তুমি কি জোর করে ক্ষমতা দখল করলে ?

—সেকি ? আমি কার ক্ষমতা দখল করলাম ? ক্ষমতা তো আমারই। সেই ক্ষমতার সবটাই আপনি ভোগ করছিলেন। আমি বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছি। তবু আপনার শুভবুদ্ধির উদয় হয়নি। এইভাবে তো অনন্তকাল চলা যায় না। তাই হেস্তনেস্ত করে ফেললাম।

—আমি বন্দিনী ?

—অন্তত দুদিন। তারপর ভেবে দেখব। আপনার শান্তির বার্তা দেশবিদেশে এত বেশী ছড়িয়ে পড়েছে যে সিরিয়ার নগরী মেগিদ্দাতে পূর্বের অনেক দেশের রাজারা এসে মিলেছে। তারা ঘোঁট পাকাচ্ছে কিভাবে মিশরকে পদানত করা যায়। তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই সময় আপনি স্বাধীন থাকলে অসুবিধা আছে।

—অর্থাৎ আমাকে শুধু প্রাসাদের অভ্যন্তরেই থাকতে হবে ?

—হয়ত।

ফ্যারাও তৃতীয় থুথমস কক্ষত্যাগ করে।

কয়েক বছর কাটে। সেন-মুত আর ফেরেনি। দার-এল-বাহরিতে হতশেপসুতের কোন মূর্তি অক্ষত নেই। হতশেপসুতের দিন প্রাসাদেই কাটে। সে অনেক শীর্ণ এবং দুর্বল হয়ে পড়েছে।

মেগিদ্দাতে পূর্বদেশের রাজন্যবর্গ আরও বেশী সঙ্ঘবদ্ধ। তৃতীয় থুথমস সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত। বর্ষা কেটে গেলেই শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ধ্বংস করে দেবে।

হতশেপসুত একদিন অপরাহ্নে নেসামুনের হাত ধরে কন্যার কক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নেসামুন খবর পাঠায়।

কন্যা হতশেপসেত বেরিয়ে আসে।

—তুমি ?

—আমার একটা অনুরোধ আছে। মৃত্যুর পরে যেন রাজকীয় উপত্যকাতেই আমাকে রাখা হয়। আমি যে ফ্যারাও সেই স্বীকৃতি যেন দেওয়া হয়।

—ফ্যারাওকে বলব। এসো ভেতরে।

—না, আমি যাই। সরোবরের ধারে যাব।

সরোবরের সোপানশ্রেণীর যেটি প্রিয়তম স্থান, যেখানে বসে আবানা-পুত্র আর হেকারনেহেহ্‌র কাছে অনেক গল্প শুনেছে, সেখানে গিয়ে বসে আজ। এখানে তার পাশে থাকত অমেনমেস আর উয়াচমেস। এখানে উয়াচমেসকে জড়িয়ে ধরে সে আদর করেছে। উয়াচমেসও করেছে।

—জান নেসামুন, গতকাল স্বপ্নে উয়াচমেসকে দেখেছি। ও ডাকছিল। ও বলছিল, ওর কাছে যেতে।

—আপনার শরীর খারাপ কিনা তাই অমন দেখেছেন।

—হয়ত তাই। আজ নেফরুরার কথা খুব মনে পড়ছিল। কী সুন্দর দেখতে ছিল। আর কী বুদ্ধি ; তোমার মনে আছে ?

—আছে বৈকি ! স্পষ্ট মনে আছে। ওকে দেখে আমার দেবী আইসিসের কথা মনে হত। ভাবতাম, বড় হয়ে আইসিসের মত দেখতে হবে। কিন্তু হল আর কই ?

—না, বাঁচল না। ও বেঁচে থাকলে আমার এই দশা হত না। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার মত আত্মসর্বস্ব কখনই হত না। তুমি লক্ষ্য করেছ নিশ্চয় ওর মধ্যে দয়া ছিল।

—হ্যাঁ। অত অল্প বয়সে ওই মমতা দেখে আমি অবাক হতাম। ভয়ও পেতাম।

—কিসের ভয় ?

—অত ভাল শিশু কি বেশীদিন বাঁচে ?

—হয়ত বাঁচে না।

সেই সময় নেসামুন কাঁপা গলায় বলে ওঠে—দেবী, ফ্যারাও।

—কে ?

—ফ্যারাও আসছেন এদিকে।

—সে কি ? আমাকে এখানেও থাকতে দেবে না ?

—বলতে পারি না।

মিসাফ্রিস সামনে এসে দাঁড়ায়।

হতশেপসুত বলে—আমি মাঝে মাঝে এখানে আসি। বাইরে যাবার তো ক্ষমতা নেই। এখানে এলে অতীতকে ফিরে পাই।

—অতীত বলতে ?

—শৈশব। এখানে আমরা তিন ভাইবোন এসে গল্প করতাম।

—দ্বিতীয় থুথমস থাকতেন না ?

—মাঝে মাঝে আসত।

—আপনার কন্যার মুখে আপনার ইচ্ছার কথা শুনলাম। রাজকীয় উপত্যকাতেই আপনার স্থান হবে। চিন্তা করবেন না।

—বেঁচে থাক। অনেক নাম হোক তোমার।

—আপনার আর কোন সাধ নেই?

—না। হ্যাঁ একটা সাধ আছে। আমার মূর্তি ভেঙে ফেলেছ, বেশ করেছ। কিন্তু মন্দিরের অস্তিত্ব যেন বিপন্ন না হয়। ওটা আমার কীর্তি নয়। ওটা মিশরের মানুষের সৃষ্টি।

—আর কিছু?

সেন-মুত যদি ফিরে আসে, তাকে হত্যা করো না। তাকে কাজে লাগিও।

—মনে থাকবে।

তৃতীয় থুথমস যখন পূর্বদেশে যুদ্ধাভিযানে ব্যস্ত তখন একদিন অপরাহ্নে দেখা গেল সম্রাজ্ঞী হতশেপসুত সরোবরের চতুর্থ সোপানে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেদিন বৃদ্ধা নেসামুন অসুস্থ ছিল বলে সঙ্গে আসতে পারেনি। হতশেপসুত একাই এসেছিল। এসে সেই নির্দিষ্ট সোপানে বসেছিল। তারপর কখন এক সময় তার বা নির্গত হয় দেহ থেকে। তার কা শত চেষ্টাতেও তার বা-কে দেহের অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে পারেনি।